উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

২১শ বর্ষ

(১৩২৫ মাঘ হইতে ১৩২৬ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার

কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।

Printed by Manmatha Nath Dass,

AT THE

UNION PRESS

27-9 Lalaram Dey's Street Calcutta.

সূচীপত্র।

২১ বর্ষ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

আমাদের আদর্শ কি হওয়া উচিত, আমাদের আদর্শ পুরুষ কে, যাঁহার অনুকরণে আমাদের জীবন গঠনের চেষ্টা করা উচিত, তৎসম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যভাবে উন্নতিতেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং যাঁহার ঐরূপ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ। কাম ক্রোধাদিও যখন বৃত্তি, তখন উহাদেরও বিকাশ আবশ্যক, তবে উহাদের দমনই, তাঁহার মতে উহাদের অনুশীলন। ভক্তি আদি বৃত্তির আতিশয্যে কামাদির একেবারে উচ্ছেদ সম্ভবপর বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহার মতে উহা করিলে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না সুতরাং তাঁহার মতে ঐরূপ অনুষ্ঠানকারী যোগী সন্ন্যাসীরা আদর্শ পুরুষ নহেন।

শ্রদ্ধেয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনিও সন্ন্যাসের প্রতি যেন বিরূপ—তিনি সংসারের প্রতি রূপে রসে গন্ধে ব্রহ্মের স্ফুরণ দেখিতে চান—শত বাঁধনের ভিতর মুক্তি দেখিতে তাঁহার প্রয়াস। তাঁহার অনুবর্ত্তী অনেকে আজকাল এই ভাবের কথা লিখিতেছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন দেখা যায়।

সন্ন্যাসকে আজকালকার শিক্ষিত অনেকে Mediæval superstition (মধ্য যুগের কুসংস্কার) বলিয়া উল্লেখ করেন। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস

প্রচারের ফলে ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এ কথা আজকাল যাহার তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

সুতরাং সন্ন্যাসীই আমাদের আদর্শ কি না, তৎসম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়।

বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ—ইঁহারা সকলেই সন্ন্যাসী। ইঁহারা তবে কি আমাদের আদর্শ নহেন?

যাঁহারা সন্ন্যাসের বিরোধী, তাঁহাদের স্পষ্ট অভিপ্রায় কি তাহা অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। বঙ্কিম বাবুর কথাই ধরা যাক্। তাঁহার 'বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য সাধন'—আমার নিকট 'সোণার পাথরবাটী' ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। সামান্য জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেই আমরা আমাদের হৃদয়ে ভাল মন্দ উভয় প্রকার বৃত্তির একটা দ্বন্দ্ব—একটা সংগ্রাম অনুভব করি। ইহাদের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? খানিকটা ভাল—খানিকটা মন্দ—ইহাই কি সামঞ্জস্য? এক সামঞ্জস্য বুঝিতে পারা যায়—যদি মন্দ সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া ভালটাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে, অথবা ভালটা সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া মন্দটাকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়। এখানে আমরা দেখিতেছি, চূড়ান্ত না করিলে অব্যাহতি নাই, দ্বন্দ্বের শেষ নাই। সন্ন্যাসীর অর্থ—যিনি প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছেন—সুতরাং আদর্শ বলিতে আমি ত সন্ন্যাসী ছাড়া কাহাকেও দেখিতে পাই না।

হিন্দুশাস্ত্রের শত শত বচন উদ্ধৃত কর—যথেষ্ট দোহাই দাও—কিন্তু শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিয়াছ কি? গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতাপোষক যথেষ্ট প্রমাণ শুনিয়াছি, গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্মমাহাত্ম্যের ঘোষণা করিয়া সন্ন্যাসকে খর্ব্ব করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই অদ্বৈতকেশরী ভাষ্যকার শঙ্কর যে ভাবে উপনিষদ্ ও গীতাদির ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ত কাহারও উপাদেয়তর যুক্তি চক্ষে পতিত হয় নাই।

প্রবৃত্তিমার্গ মানবের স্বাভাবিক—ইহা সত্য; কিন্তু ঐ প্রবৃত্তিকে

সংযত করিবার প্রবৃত্তিও কি তদ্রূপ স্বাভাবিক নহে? অনেকে সন্ন্যাসী, যোগী ও তপস্বীদিগের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক শরীরনিগ্রহ কঠোরতাদির দৃষ্টান্ত দেন—কিন্তু অতিরিক্ত বিলাসের অস্বাভাবিকতাই বা তাঁহাদের দৃষ্টি কেন এড়াইয়া যায়? এই অস্বাভাবিক বিলাসিতা ব্যক্তিতে বা ব্যক্তির সমষ্টীভূত সমাজশরীরে প্রবেশ করিয়া যখনই মানবকে অত্যধিক হীনবীর্য্য করিয়া তুলে, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অতিরিক্ত কঠোরতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসের সহিত এইরূপ কঠোরতাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

সন্ন্যাস মানব জীবনের স্বাভাবিক চরম পরিণতি। যে ত্যাগের বীজ মানবের মধ্যে দান, দয়া, স্বার্থত্যাগাদিরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই চরম পরিণতি সন্ন্যাসে। অনেকে সন্ন্যাসকে স্বার্থপরতার নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়া অতিশয় বিচারহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহার নামান্তর সর্ব্বস্বার্থবিসর্জ্জন তাহা স্বার্থপরতা হইল। আশ্চর্য্য কথা বটে! হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, উহার বর্ণধর্ম্ম, উহার আশ্রমধর্ম্ম, উহার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার মানবকে চরম সন্ন্যাসের দিকেই অগ্রসর করিতেছে। শুধু হিন্দুশাস্ত্রের কথাই বা বলি কেন?—ধর্ম্ম নামের যোগ্য কোন্ ধর্ম্মের এই প্রবণতা নাই—কোন্ ধর্ম্মের ইহা লক্ষ্য নহে?

আধুনিক জীবনে আবার সেই সন্ন্যাসের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নহে, সমাজ জীবনে ইহাকেই আদর্শ জানিয়া প্রাণপণে এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা আদর্শ হইতে বহু দূরবর্ত্তী হইতে পারি, কিন্তু আদর্শটীকে একবার যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেক বিষয়ে কিরূপ পরিবর্ত্তন আসিতেছে। সাধারণ পিতামাতা ছেলে মেয়েদের কি ভাবে গঠনের চেষ্টা করেন?—লেখাপড়া যাহা শিখান

হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য—কিসে অর্থ উপার্জ্জন হয়। যে যত অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়, তাহারই তত মান—তাহারই তত যত্ন। তারপর বিবাহ দিবার চেষ্টা। ছেলে মেয়ের বিবাহ হইল—তাহাদের ছেলে মেয়ে হইল—ইহাতেই পিতামাতা পরম চরিতার্থ। নীতি বা ধর্ম্ম যদি কিছু শিখান হয়, তাহা এত সামান্য যে, ধর্ত্তব্যের ভিতরই নহে। ছেলে যদি এতটুকু বৈরাগ্যবান্ হয়, অমনি সে পিতামাতার চক্ষুশূল—যাকে প্রকারে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে সংসারী করিতে হইবে। আবার যে সকল পিতামাতা কিছু কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের সংস্রব রাখেন, তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান অনেক সময়ে এমন প্রবল হয় যে, তাঁহারাও পুত্রের সামান্য বৈরাগ্যবীজকে ধর্ম্মসাধনাদি শিক্ষাদানরূপ জলসেচনাদিসহায়ে বর্দ্ধিত করা দূরে থাকুক, তাহাকে গোড়া হইতেই পরীক্ষা করিতে বলেন—বিজ্ঞতার বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, এ এখনও সেই উচ্চ বৈরাগ্যলাভের যোগ্য হয় নাই—এখনও ত দেখিতেছি, সামান্য প্রলোভনেই উহার মন বিচলিত হয়—এ অবস্থায় সন্ন্যাসপথ গ্রহণ উহার পক্ষে ঠিক নহে।

প্রাচীনকালে ভারতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল—প্রায় সকলকেই বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচারী হইয়া কঠোর সংযম শিক্ষা করিতে হইত। এখন আবার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া ছেলে মেয়েদের ত্যাগতপস্যা সাধনভজন শিখান হউক—পরে যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ অধিকার, বয়স হইলে সে তদ্রূপ আশ্রম অবলম্বন করিবে। গোড়ায় সে শিক্ষা কই? অবশ্য এখন ঠিক প্রাচীন কালের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা চলে না—এবং তাহা উচিতও নহে। প্রাচীন কালে গৃহস্থগুরুগণ ব্রহ্মচারীদের শিক্ষক হইতেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকলেই দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং ত্যাগতপস্যাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। বর্ত্তমান কালে সেরূপ গৃহস্থ গুরুর একান্তই অভাব। তাই আমার মতে, বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীর তত্ত্বাবধানে বালকগণ শিক্ষিত হউক। সন্ন্যাস আশ্রমও প্রাচীন কালের মত শুধু পরিব্রাজক আশ্রম হইলে

চলিবে না—এখনকার সকল সন্ন্যাসিগণের মনুর শাসনানুযায়ী গ্রামে একদিন ও সহরে তিন দিন ভিক্ষা করিয়া ঘুরিলে চলিবে না—অন্ততঃ কতকগুলিকে একস্থানে বসিতে হইবে এবং নিজের আত্মোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের শিক্ষার ভার লইতে হইবে। তারপর প্রশ্ন এই, এই সকল শিক্ষার্থীকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? ধর্ম্মশিক্ষা? প্রধানতঃ তাই বটে—আর ধর্ম্মশিক্ষা অর্থে আমি কেবল কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করাইতে বা কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান অভ্যাস করাইতে বলিতেছি না। যাহাতে বাল্যকাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস ও একাগ্রতাসাধন হয়, ইহা শিক্ষা করানই প্রধান—অন্যান্য শিক্ষা যেরূপ আসিয়া পড়ে, তদ্রূপ হইবে। অর্থকরী সাংসারিক বিদ্যা শিখিবার ও শিখাইবার প্রবল উদ্যোগ চলিতেছে। ছেলেদের শিক্ষকের কাছে পড়িবার সময় সর্ব্বদা পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়—যেন পরীক্ষা দেওয়া ও তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যথার্থ আদর্শের দিকে লক্ষ্য হইলে—ব্রহ্মলাভ জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিলে ও বুঝাইলে—অন্যান্য অপরাবিদ্যা যাহা শিখান হইবে তাহারও ভিতর জ্ঞানপিপাসার একটা প্রবল বেগ থাকিবে।

ভাব ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কার্য্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা জ্ঞানও পরিবর্ত্তিত হয়। অনেক বিষয় যাহা আমাদের নিকট অপরিহার্য্যরূপে প্রতীত হইতেছে, তাহা তখন আর তত অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা কি বৃথা কার্য্যে সময় অপব্যয় করি না? যে ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ধর্ম্মবিশ্বাসী নহে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মকর্ম্মে বা ঈশ্বরচিন্তায় সময় ক্ষেপণটাই সময়ের অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মলাভই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। সেইটীকে আদর্শ ধরিলে ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিলে আমরা কামিনীকাঞ্চনের জন্য যে সময় ব্যয় করিতেছি, তাহার যথেষ্ট সংক্ষেপ হইয়া আসিবে।

এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা আবশ্যক। কেবল কামবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য

বিবাহের আবশ্যকতা নাই, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যক নাই। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকেই যদি আদর্শ করা যায় এবং অনেকে যদি বাল্যকাল হইতেই তাহার সাধনে কৃতকার্য্য হয়, তবে সৃষ্টিলোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া থাকেন। উপনিষদে স্থানে স্থানে যথায় সন্ন্যাসের চরমাদর্শ পাওয়া যায়, তথায় ঋষিরা বলিতেছেন, 'কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ'—আমরা সন্তান লইয়া কি করিব? অথবা 'ন ধনেন ন প্রজয়া'—পুত্র দ্বারা বা ধন দ্বারা মুক্তি হয় না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ঐ আদর্শ অনেকে স্বীকার করিলেও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে স্বীকার করিতে অসম্মত। তাঁহাদের যুক্তিগুলির মূল; এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাক্। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকে যদি আদর্শ বলিয়া স্বীকার কর, তবে এক জনের পক্ষে তাহা উন্নতির কারণ হইলে অপরের পক্ষেও বা না হইবে কেন? যদি অধিকারী-ভেদ ধরিয়া অপরসাধারণকে অনধিকারীর ভিতর ফেল, তবে জিজ্ঞাস্য, তাহাদের ঐ বিষয়ে অধিকার আছে কি না, তাহা কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলে? এ বিষয়ে প্রাচীন কালের নিয়ম অর্থাৎ সকলকেই প্রথম অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধন শিখান খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যখন বয়স হইবে, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি হইবে, তখন আচার্য্য বা গুরু তাহার অধিকার বুঝিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যে বা সাময়িক গার্হস্থ্যাশ্রমে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু যাহাকে গার্হস্থ্যে দীক্ষিত করা হইবে, তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বিবাহ পূর্ণব্রহ্মচর্য্যসাধনের একটী সোপান মাত্র। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী—শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে যথাসাধ্য সংযত হইয়া দু একটী মাত্র পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে—আর ইহাও সর্ব্বদা ভাবিতে হইবে যে, কবে এমন অবস্থা আসিবে, যখন কামবুদ্ধি সম্পূর্ণ অপগত হইয়া অপর স্ত্রীতে যেমন মাতৃবুদ্ধি করিতে হয়, নিজ স্ত্রীতেও তদ্রূপ মাতৃবুদ্ধি করিতে পারি। দুজনেই সেই ভগবল্লাভের পথে —মোক্ষপথে চলিয়াছি, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব,

বিঘ্ন কখনই হইব না।* যদি উভয়ের সহাবস্থান বিঘ্নকর হয়, তবে পরস্পরে দূরে অবস্থান করিতে পরাঙ্মুখ হইব না এবং যত শীঘ্র ঐরূপ অবস্থা লাভ হয়, তত শীঘ্র বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা যাহা বলিতেছি, তাহা কেবল পুরুষদের জন্য নহে, নারীগণের জন্যও এবং পুরুষের পুরুষ এবং নারীর নারী শিক্ষকই হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। উভয়ের কোন প্রকার সংস্রব যত কম হয় ততই মঙ্গল, একেবারে না হইলেই ভাল।

যদি বলা যায়, প্রজোৎপাদন যদি কমিয়া যায়, তবে ত সমাজের অনিষ্টই হইবে। ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সাধারণতঃ এত বলবতী যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও তত সহজে উহা একেবারে লোপ পাইবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, ব্রহ্মচর্য্যবান্ হইলে নরনারীর ভিতর এমন বীর্য্য আসিবে যে, তাহাতে বর্ত্তমান কালাপেক্ষা অধিক প্রজাবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তারপর যদি এমন শুভদিন আসে যে, জগতের সকল নরনারীর ভিতর হইতে একই কালে কামভাব একেবারে চলিয়া যায়, (এই সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও) তাহাতেও মনুষ্যবংশলোপের আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা প্রাচ্য দর্শন উভয়ের প্রমাণেই আমরা এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ (Evolution theory) যদি সত্য হয়, তবে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে মনুষ্যের আবির্ভাব হইতে পারে। আর হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যোনিভ্রমণ বিশ্বাস করিলে পশুসমূহের কালে মনুষ্যরূপে উৎপন্ন হইবার কোন বাধা নাই। অবশ্য সকল মানুষের পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা এক সময়ে স্বীকার করিলে আশঙ্কা হয় বটে যে, সেই নিম্নশ্রেণীর জীবগণ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু একটী কথা ভাবিয়া দেখিলেই এ আশঙ্কার তত বলবত্তা থাকে না। ভিতরের প্রবল সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়া মানুষ মানুষের জন্মদান করে আবার প্রবল ক্রোধাদিবশে মানুষ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়—

যেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে। এই জন্ম-মৃত্যুর কারণ আপাতদৃষ্টিতে মানুষই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কি আর কোন উচ্চতর শক্তি নাই? এবং সেই শক্তি স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগরূপ উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েও কি নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না? তারপর এইরূপ মনুষ্যসৃষ্টিপ্রবাহ বরাবর থাকাই ভাল, ইহাই বা কে বলিল? সৃষ্টি-টাকে হিন্দু কখনও ভাল বলিয়া স্বীকার করে না—সৃষ্টির আত্যন্তিক লয়—মোক্ষই হিন্দুর মতে পরম পুরুষার্থ। সুতরাং সকল নর নারীর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য সাধনে মানবজাতির লোপই হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা আমাদের ভয় পাইবার বিশেষ কারণ কি?"

তারপর কাঞ্চনের কথা ধরা যাক্। কাঞ্চন বলিতে শুধু মুদ্রা বিশেষ বুঝিতেছি না—উহার দ্বারা লভ্য ভূমি, পশু, গৃহ, খাদ্য, বস্ত্র সবই ধরিতে হইবে। প্রথমতঃ সন্ন্যাসী হইলে যদি অর্থোপার্জ্জন ত্যাগ করা হয়, অথচ সকলকেই সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে আজ না হউক, একদিন না একদিন সমুদয় সম্পত্তির অভাব হইবে। তখন সন্ন্যাসীই বা খাইবে পরিবে কি? যতই ত্যাগের ভাব সাধন কর না কেন, একেবারে কার্য্যতঃ আক্ষরিক অর্থে সর্ব্বত্যাগে ত এক মৃত্যু ব্যতীত সম্ভব নহে।

ঠিক কথা, সম্পূর্ণ ব্রহ্মানুভূতি যদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে এইরূপ ভাবে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের আর পথ কোথায়? বুদ্ধ না হয় উহাকে 'নির্ব্বাণ' আখ্যা দিলেন, বেদান্ত উহাকে মোক্ষ বলিলেন। যাঁহাদের ভগবল্লীলাস্বাদনই জীবনের চরম লক্ষ্য, সেই ভক্তগণও প্রেমের চরমাবস্থায়—মহাভাবের চরমোৎকর্ষে জড়সমাধিলাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ঐ অবস্থা লাভ করিতে হইলেও ত সর্ব্বত্যাগ করিতে হয়। বলিবে, সে অবস্থা কি সম্ভবপর? আমরা কার্য্যতঃ সন্ন্যাসিগণের ভিতর কি মঠবাস, সম্পত্তি গ্রহণ প্রভৃতি দেখিতে পাই না? সন্ন্যাসীরও যে বিভিন্ন অবস্থা আছে—ত্যাগের সাধনা করিতে গিয়া যে সকল সন্ন্যাসীই চরম ধাপে উঠিতে পারেন নাই। আচ্ছা, না হয়, স্বীকার করিলাম, একেবারে শীতাতপ

সহকারী, আবাসত্যাগী, দিগম্বর সন্ন্যাসীও কোথাও কোথাও দেখা যায় কিন্তু আহার ত্যাগ হয় কি? সন্ন্যাসীর ভিক্ষা চলে কোথা হইতে? আর যদি সকলেই ভিক্ষুক হয় ত ভিক্ষা দেয় কে? যেমন কামিনী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছি, কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধেও সেই সকল কথা অনেক পরিমাণে প্রযুজ্য। প্রথমতঃ এই উচ্চতম আদর্শ প্রচার করিলেও ত সকলে এক সময় পূর্ণ ত্যাগী হয় না। সুতরাং, সন্ন্যাসীর সামান্য অভাব পূরণের জন্য বাস্তবিক কোন ভাবনা নাই। আর যদি কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া সকলকেই পূর্ণ ত্যাগে সমর্থ বলিয়া ভাবা যায়, তবে আর একটু কল্পনা বিস্তার করিয়া যোগশাস্ত্রের সত্যতা স্বীকার করিয়া আহার ব্যতীত প্রাণধারণে সমর্থ অবস্থাই বা স্বীকার কর না কেন? কিন্তু তাহা না করিয়াও প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, যদি সর্ব্বসাধারণে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা বা কোনরূপ বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে, তবে দেহের যৎসামান্য অভাব নিবৃত্তির জন্য কাহারও অভাব বড় হয় না। অতি সামান্য মাত্র চেষ্টায় পৃথিবীকে এমন ফলমূলশালিনী করা যাইতে পারে যে, তাহাতে সকলেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া যায়।

আসল কথা, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমার যথার্থ অভাব কতটুকু? তুমি তোমার অভাব নিবৃত্তি করিতে চাও, না, বিলাসিতা চাও? বিলাসিতারও আবার মাত্রা আছে—এক অবস্থায় যাহা প্রয়োজন এমন কি অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সাধনার উন্নতি সহায়ে তাহাই পরিত্যাজ্য ও অনাবশ্যক প্রতীত হয়। ক্রমে অগ্রসর হইয়া যাও, ত্যাগের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া চরমে পঁহুছিবার চেষ্টা কর, দেখিবে, কত অল্প জিনিষে তোমার চলিয়া যায়। সর্ব্বদা মৃত্যু সম্মুখে এই কথা ভাব। দেখিবে, তোমার জগতে স্থায়ী সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। চাল যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে, যত কমাইবে, তত কমিবে। নিজস্ব বাড়ী, নিজস্ব সম্পত্তি, নিজস্ব গাড়ী ঘোড়া করিবার বাসনা চলিয়া গিয়া ভাড়া বাড়ীতে ভাড়া গাড়ীতেই সন্তোষ আসিবে—শেষে ভাড়া বাড়ী গিয়া পরের দ্বারে, পরের

দাওয়ায় একটুকু স্থান পাইলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিবে। হাঁটিয়া বেড়াইয়াই সুখী হইবে। অক্ষম হইলে একস্থান হইতে অপর স্থানে আর যাইবার আবশ্যকতাই বোধ করিবে না। রেলগাড়ী, মোটর, এরোপ্লেনের আবশ্যকতা আর থাকিবে না।

ভাবিয়া দেখ, বাসনা হইতেই অভাব বোধ, অভাব বোধ হইতেই নানাবিধ চেষ্টা। যত বাসনা কমিয়া আসিবে, তত অভাব বোধ কম হইবে, ততই চেষ্টাও কমিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত করিতে থাকিবে। আমাদের যে দিনরাত্র নানাবিধ চেষ্টা, এ যেন মত্ত ব্যক্তির ইতস্ততঃ ছুটাছুটি মাত্র।—যত স্থৈর্য্য আসিবে, তত আর এ সব চেষ্টা থাকিবে না।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল; তাহাতে নানাবিধ আপত্তি উঠিতে পারে; তাহার ২।১টির উল্লেখ করিতেছি।

১ম। সব বাসনা ত্যাগ করিব কেন? মন্দ বাসনাগুলি ত্যাগ করিব, ভাল বাসনাগুলি রাখিব।

২য়। তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে জগতের সভ্যতাই যে বিলুপ্ত হইবে।

৩য়। ইহাতে ঘোর নিশ্চেষ্টতা আসিয়া লোককে নিরুদ্যম, অলস ও হীনবীর্য্য করিয়া ফেলিবে।

এই আপত্তিগুলি কেবল চিন্তাহীনতার ফলমাত্র তাহা সহজেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

১ম। মন্দ বাসনা, ভাল বাসনায় প্রভেদ কি? কিসে বাসনার ভাল মন্দর বিচার হয়? একমাত্র বিচার করিবার উপায়—যাহা ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর করে তাহাই ভাল, যাহা তাহা হইতে দূরে লইয়া যায় তাহাই মন্দ। সুতরাং আজ যাহাকে ভাল বাসনা বলিতেছ, উচ্চতর আদর্শের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মন্দ বলিতে বাধ্য হইবে। শেষে কোন প্রকার বাসনার লেশমাত্র থাকাটাকেই মন্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধর, এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রসেবাদি নানা সৎকার্য্য করিতেছে, কিন্তু সে যতই জ্ঞানের

পথে অগ্রসর হইবে, ততই বুঝিবে, যথার্থ সৎকার্য্য অর্থের দ্বারা হয় না,—চরিত্রের দ্বারাই হয়, চরিত্রই মূল। তুমি নিজেকে ভাল কর, তাহাতেই তুমি জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে।

২য়। সভ্যতা বিলোপের আপত্তি:—সভ্যতা কাহাকে বল? কতকগুলা বড় বড় বাড়ী, কল কারখানা এই সব? মানুষের প্রকৃতি সংযত না হইয়া ঐ সকল বাহ্য তথাকথিত উন্নতির দিকে যতই ঝুঁকিবে, ততই মানসিক অবনতি হইবে। তাই ফলমূল-ভোজী কুটীরমাত্রবাসী জ্ঞানী ঋষিদের ভিতর যে যথার্থ সভ্যতার বিকাশ দেখিতে পাই, চাকচিক্যময়, ইহসর্ব্বস্ব, জড়বাদপ্রাণ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর তাহার এককণা দেখিতে পাই না। সকল বিদ্যা, সকল বিজ্ঞান যদি স্বার্থপরতার সহায় হয়, তাহাতে জগতে দ্বন্দ্ব, অশান্তি, কোলাহল, যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই আনয়ন করে,—শান্তির শীতল বাতাস তাহাতে আনে না—মানবকে উহাতে ক্রমশঃ তমোময় অজ্ঞানের পথেই অগ্রসর করে।

৩য়। নিশ্চেষ্টতার আপত্তি।—যাহার চেষ্টা উচ্চতর পথে উঠিতে একেবারে অশক্ত তাহার পক্ষে নিদ্রাভন্দ্রারীণ ঘোর তমঃশক্তিকে প্রতিহত করিয়া প্রথমে প্রবল রজোগুণের উদ্দীপনা করা আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু উহাকে আবার তমোরজোগুণের সামঞ্জস্যরূপ প্রশান্তি-ধর্ম্মক সত্ত্বগুণের অভিমুখে প্রধাবিত করিতে হয়। উহার ভিতর যে রজোভাব আছে, তাহাকে কমাইয়া কমাইয়া ক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব বা ত্রিগুণাতীত ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই উন্নতির ক্রম। সুতরাং উচ্চতম আদর্শের যথার্থ প্রচারের ফলে তমোগুণ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। ইতিহাস ত এ বিষয়ে আমাদের পক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ত্যাগপ্রচারের অল্পদিন পরেই ভারত ঐহিক উন্নতিতেও যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, আর কখনও তদ্রূপ হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের চরম আদর্শ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' উপলব্ধি করা। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমা-

দিগকে প্রবল যত্ন করিতে হইবে। এই জগতের হিতসাধন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বলিতেন, চরম আদর্শে পহুঁছিবার পূর্ব্বে যে দেশে বা যে জাতিতে বর্ত্তমানে যে অভাব আছে, সেই অভাব পূরণ করিয়া তাহাকে সেই চরম লক্ষ্যে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণভাবে ভারতে অন্ন ও বিদ্যার অভাব বলিতেন এবং ক্ষুধিতের ধর্ম্মলাভ অসম্ভব বলিয়া অন্নাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা, শিল্পকলার উন্নতি সাধন করা এবং সর্ব্বসাধারণ মধ্যে লৌকিক বিদ্যা বিস্তারের চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন এবং এই সকল কার্য্যসাধনের জন্য ভারতের বর্ত্তমান সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণকেই এই স্বদেশসেবাব্রতে লাগিতে হইবে, ইহাও নির্দ্দেশ করিতেন। তবে এই সকল কার্য্যসাধন যথার্থভাবে করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে প্রবল ধর্ম্মশক্তির প্লাবন তাহার মূলে না থাকিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বলিতেন এবং সর্ব্বদা সেই চরম আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে বলিতেন। নিম্ন-স্তরে তমোগুণকে প্রতিহত করিয়া প্রবল রজঃশক্তির অভ্যুদয়ের জন্য পাশ্চাত্য জাতির প্রবল কর্ম্মপ্রবণতা ভারতে প্রবেশ করাইতে চাহিতেন, কিন্তু পাছে ভারত আবার বিলাসের তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া নিজ লক্ষ্য বিস্মৃত হয় তজ্জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে ধরিতে বলিতেন।

আমরা যে ত্যাগের কথা বলিলাম, তাহাই ভারতের ঘরের সম্পত্তি। এই ত্যাগসাধনে সিদ্ধ হইয়া সেবাব্রত সহায়ে ঐ ত্যাগ সকলের ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তথায় তদ্রূপ চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে যেমন জীবের ভোগ দ্বারা তৃপ্তি না জন্মিলে বৈরাগ্য আসে না, তদ্রূপ জাতীয় জীবনেও চরমাদর্শ ত্যাগের জন্য প্রবল উদ্যম আনিতে হইলে জাতীয় সমৃদ্ধিসাধন ও ভোগ আবশ্যক। সকলকে আদর্শ সন্ন্যাসীর পথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে তাহার মূলে আদর্শ গৃহস্থ থাকাও আবশ্যক নতুবা কোন কালেই ত্যাগ আসিবে না। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ

একেবারে উড়াইয়া দিয়া কেবল ঐহিক উন্নতি সাধনের জন্য বিজাতীয় চেষ্টাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং তাহার জন্যই আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য এই মতেরই আমরা প্রতিবাদ করিয়াছি।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্থিরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিয়া বা রাজাদেশে ঐইরূপ উচ্চতম আদর্শপ্রচারের পক্ষপাতী নহি। আমরা অধিকারিভেদ সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করি। আর একথাও বুঝি যে, উচ্চতম আদর্শের এখনই সকলে অধিকারী নহে বা হইতে পারে না। আমরা যাহাকে আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলাম, অনেকে তাহাকেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এইরূপ জানিলেও এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের বিশ্বাস যথাযোগ্য যুক্তিসহকারে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্রহ্মলাভ বা নির্ব্বাণলাভ এবং তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী পূর্ণ ত্যাগই আমাদের চরম আদর্শ এবং কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলেরই প্রাণপণ যত্নে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে কি জাতির কি সমাজের কল্যাণ বই অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। আশা—যাঁহারা আদর্শ ও তল্লাভের উপায় অকপটভাবে খুঁজিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে।

সংস্কৃত ভারতের নিকট নিবেদন।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

পার্থিব জগতের সকল বন্ধনই যেমন অনিত্য, রাজনৈতিক বন্ধনও তেমনই অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বন্ধন ছিন্নভিন্ন করিয়া একটা বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। স্থিতিশীল মানব তাহা ভাবিতে চায় না। অনিত্যকে সে নিত্য বলিয়া ধরিয়া থাকে। তবুও মানুষ যাহা ভাবিতে চায় না, অসম্ভব বলিয়া চিন্তার গতি ফিরাইয়া দেয়, মানবের ইতিহাসে কখন কখন এরূপ ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। অচিন্ত্য-পূর্ব্ব ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে সকল অসম্ভব ব্যাপার মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্ভব হইয়া পড়ে। মানবের চিন্তারাজ্যে তখন বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং যতদিন পুনরায় সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন উন্নতির গতি বন্ধ থাকে। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবাহে দ্রুত উন্নতির পথে চলিতে চলিতে শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া মানুষ মর্ত্ত্যধামে সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায়ের স্বর্গসুখের কল্পনা করিতেছিল। কল্পনা-উদ্ভাসিত-দৃষ্টিতে মানুষ দেখিতেছিল সম্মুখেই সেই স্বপ্নের দেশ, সেই স্বর্গরাজ্যের শান্তিসৌধ—যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক পরিবারভুক্ত নরনারীর ন্যায় মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির দিব্যপথে চলিতে থাকিবে—পাশবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ চিরতরে অস্তমিত হইবে—বৈষম্যের উপর সাম্যের, হিংসার উপর মৈত্রীর এবং পাশবিক শক্তির উপর ন্যায়ের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু বাস্তব-জীবনের এক আঘাতে যুগযুগান্তরের কল্পনা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মানুষের আশার শত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। যেদিন বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই দিন মানুষের চমক ভাঙ্গিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল সমস্ত পৃথিবী হৃদয়বিদারক রুধিররাগে রঞ্জিত! চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, নরহত্যা, ব্যভিচার ও প্রবঞ্চনার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ

মানব মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ নারী পতি-পুত্র বিরহে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে! যুগ যুগান্তরের শিল্পকলা, শত সহস্র অট্টালিকা, মন্দির ও নগর-নগরী ধূলিকণায় পরিণত হইয়াছে! স্নেহ, দয়া ও ভক্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত পদদলিত করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া, ধর্ম্মমন্দির সমূহ অগ্নিবর্ষণপূর্ব্বক ভস্মসাৎ করিয়া, সমাজহৃদয়-পরিমুক্ত বর্ব্বরতা জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে মানবজাতির বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে— সভ্য মানবের সভ্য দেশ এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কল্পনার স্বর্গরাজ্য অসুরগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পুনরুদ্ধার হইবে কি না কে বলিতে পারে!

কিরূপে এই প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান পৃথিবীর একমাত্র চিন্তার বিষয়। দেশ দেশান্তর হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়া এই সমরযজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে—কর্ম্মীর কর্ম্ম, ধনীর ধন, দাতার দান, শিল্পীর শিল্প, বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় শক্তি একমাত্র যুদ্ধেরই সেবায় নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মানব ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যাকুল। যুধ্যমান শক্তিসমূহের স্বার্থ-সমন্বয়ের সময় যাহাতে জাতীয় স্বার্থের কোনও ব্যাঘাত না হয়, বিভূতির পথ সুগম হয়, এই চিন্তাই এখন সকল দেশে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ যুদ্ধ আর সহজে না হইতে পারে এরূপ জল্পনা কল্পনাও চলিতেছে। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় লোকের যতই সন্দেহ থাকুক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে রাজনীতিকুশল পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য জাতিসকলের স্বার্থের একটা সুব্যবস্থা করিয়া সাময়িক শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

এত বড় একটা যুদ্ধের ফলসমষ্টি যদি শুধু আমাদের আর্থিক অবস্থারই সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটাইয়া নিঃশেষিত হইত, তাহা হইলে কাহারও বিশেষ আপত্তি ও আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত না। যুদ্ধটাকে লোকেরা দৈনন্দিন কাজের মতই একটা সাধারণ ব্যাপার।

বলিয়া মানিয়া লইত এবং শীঘ্রই ভুলিয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফল সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। যে অমানুষিক বর্ব্বরতা বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মানবজাতির অন্তর্জীবনের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে। পাশবিক বলের প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া, আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। সভ্যতার উপাস্য আদর্শ কলঙ্কিত করিয়া, মানব হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি যে প্রবল আঘাত করিয়াছে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মবিপ্লব ও নৈতিক-বিপ্লব।

বর্ত্তমানে যে ধর্ম্মবিপ্লব, মানবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মৃদু করাঘাত করিতেছে, কালে তাহাই ভীষণরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। এই আসন্ন ধর্ম্মবিপ্লব এখনও স্বীকৃত হয় নাই। তাহার গতিরোধের কোন উপায়ও উদ্ভাবিত হয় নাই। বাহ্যজীবনের ব্যাপার, বাহ্য জগতের ঘাত-প্রতিঘাত কতকটা রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে; কিন্তু অন্তর্জগতে ত রাজনীতির প্রবেশ নাই—সুখদুঃখময় মানবজীবনের অল্পাংশের উপরই রাজনীতির প্রভাব। অধর্ম্মের গতিরোধ করিতে একমাত্র ধর্ম্মই অবলম্বনীয়। পাপের স্রোত ফিরাইতে হইলে পুণ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। স্থায়ী শান্তি স্থাপন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাম্য স্থাপন করিতে হইবে ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক বৈষম্য ও আধ্যাত্মিক অবনতিই বাহ্য জগতে যুদ্ধবিগ্রহাদি রূপে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক বন্ধন সাময়িক প্রলেপ মাত্র। কোথায় সেই প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্ট যাঁহার স্বর্গরাজ্যের অস্তিত্ব আজ সন্দেহের কুজ্ঝটিকায় অদৃশ্য হইতে চলিল!—সেই সুদর্শনধারী পার্থসারথিই বা কোথায় যিনি অধর্ম্মভীত মানবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ধর্ম্ম যে আজ প্রাণভয়ে কম্পিত ও পলায়নপর!

রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণ যাহাই নির্দ্দেশ করুন, রাজন্য ও ক্ষাত্রশক্তি যাহাই অবধারণ করিতে যত্নপর

হউন, সাময়িক ইতিহাসে ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই বর্ণিত হউক এবং ঐতিহাসিক বিচারে জাতি-বিশেষের যুদ্ধের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ যতই নিপুণতার সহিত নির্দ্ধারিত হউক না কেন; ধর্ম্মের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহা জাতিসমূহের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরতার পুনরুত্থান মাত্র। ধর্ম্মের চক্ষে এই বাহ্যবিপ্লব অন্তর্জগতের বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। স্বর্গরাজ্যের চিরশত্রু সেই প্রাচীন অসুর—হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতা যাহার প্রাণ এবং মানব-হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ যাহার বাসস্থান,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বিচিত্র বিলাসোপকরণ নির্ম্মাণ, বিভিন্ন প্রকারের স্থলযান, জলযান, ব্যোমযান আবিষ্কার, বৈদ্যুতিক উপায়ে বার্ত্তাবহন এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কলকারখানার বিস্তাররূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রবাহের তরঙ্গাঘাতে গতাসু হয় নাই—মূর্চ্ছিত হইয়াছিল মাত্র। আত্মাভিমান ও স্বার্থপরতা, ভোগতৃষ্ণা ও দেহাত্মবুদ্ধি তাহার নব জাগরণ আনিয়া দিয়াছে এবং মানব-সমাজ পূর্ণ দিবালোকে নিজের অন্তর্নিহিত বর্ব্বরতার নগ্নমূর্ত্তি দর্শনে নিজের যথার্থ পরিচয় পাইয়া বিস্ময়, বিষাদ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য জীবনের চরম লক্ষ্য ভোগ। সংসার তাহার চক্ষে একটা ভীষণ সমরক্ষেত্র—সকলেই যেন এখানে শত্রুমূর্ত্তি ধরিয়া তাহার ভোগের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং সর্ব্বদাই তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করাই তাহার জীবনের সফলতা। অন্যের ভোগে তাহার হৃদয় হিংসায় জর্জ্জরিত। তাহেই সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে। জড়শক্তির খেলায় সে অদ্বিতীয়। যুদ্ধ তাহার ক্রীড়ার বিষয়। যে এই বিলাসক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ সে অসভ্য, বর্ব্বর। এই যুদ্ধের সেবায়ই পাশ্চাত্য জাতির শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক উন্নতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অমৃত যে বিজ্ঞান, যুদ্ধেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। আজিও ত বিজ্ঞান নরহত্যার যন্ত্র-উদ্ভাবনের সাধনায় মগ্ন। এই যুদ্ধের ভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মসমাজও এই যুদ্ধের ভার হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাসই তাহার নিদর্শন। জার্ম্মানীর ক্ষাত্রসমাজে ও বিদ্বৎসমাজেও ইহা স্বীকৃত যে যুদ্ধই উন্নতির মূল এবং মানবজীবনের মহৎকর্ম্ম। যে জাতিসমূহের আন্তরিক ভাব এইরূপ ভীষণ যুদ্ধই যে তাহাদের পরিণাম ইহা ভাবিতে পারা যায়।

একে ত জাতিহৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ। তাহার উপর যদি উন্নত জ্ঞানও সেই অবস্থার অনুমোদন করিয়া সাহায্য করে, তবে ত তাহা আরও শোচনীয় হইবার কথা। মানুষ যদি উন্নতজ্ঞানের সাহায্যে তাহার স্বাভাবিক হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কর্ম্মে সফলতা লাভ করিতে যত্নপর হয়, তবে যে সে কতদূর ভয়াবহ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞানের উপদেশ—জীবজগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য একটা অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। সেই জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বলের বিনাশ এবং যোগ্যতমের প্রভুত্ব লাভ। ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মহতী নীতি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডারউইন এই সত্য উদ্ভাবন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। শক্তিশালী জাতিই জীবিত থাকিবে, দুর্ব্বল জাতির থাকিবার অধিকার নাই—এই নীতিই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

ডারউইনের সময় হইতে ইউরোপের জ্ঞান এই কঠোর নীতি দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টির নিম্নতম বিকাশে যে অন্ধশক্তি কাজ করিতেছে, উচ্চতম বিকাশে—অনন্তভাবসম্পন্ন মানবে সেই অন্ধশক্তি কিরূপে নিয়মিত ও সংযমিত হইয়া মানবহৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূল হইয়া চলিতেছে এবং কিরূপেই বা যোগ্যতমের মাপকাঠি স্থূল বাহ্যশক্তি দ্বারা পরিমাপিত না হইয়া সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পরিমিত হইতেছে, ইউরোপের জ্ঞান এ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। মানবের জ্ঞান স্বভাবতঃ তাহার কামনারই অনুগমন করিয়া থাকে এবং যে জ্ঞান পৃথিবীর কল্যাণের

নিমিত্ত নিয়োজিত হইতে পারিত, পাশ্চাত্য জাতি তাহাই স্বীয় স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা আনয়ন করিয়াছে।

পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিতে হইলে, মানবজাতির উন্নতি কামনা করিতে হইলে এবং অধর্ম্মের গতি রোধ করিতে হইলে, উচ্চতর জ্ঞান ও আদর্শের প্রচার দ্বারা মানবমন হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থমলিন বাসনার বীজ দূরীভূত করিতে হইবে এবং মানবজাতিকে বুঝাইতে হইবে যে বিশ্ব-মানবের কল্যাণেই জাতিবিশেষের কল্যাণ। সমগ্র মানবজাতির উন্নতিতে জাতিবিশেষের উন্নতি। জাতিবিশেষের স্বার্থ, সকল জাতির স্বার্থের বিরোধী ত নয়ই—বরং অনুকূল। সাম্য ও মৈত্রীই মানবজাতির কল্যাণের পথ। জীবন-সংগ্রাম সত্য দর্শনের জন্য,—ভোগের জন্য বা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মরিবার জন্য নহে। ভোগই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। মানবজীবনের সার্থকতা জ্ঞানে। এই সকল বিশ্বনীতি প্রচার করিতে হইলে উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর আদর্শের প্রয়োজন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রয়োজন। একমাত্র সংস্কৃত-ভারতই জ্ঞান ও প্রেমের সেই দিব্য জ্যোতিঃ মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিনিধি ও পরিরক্ষক সংস্কৃত-ভারতই উচ্চতর আদর্শ প্রচার করিয়া অধর্ম্মের গতি রোধ করিতে সমর্থ।

ইউরোপের ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবাদের নিষ্পেষণে হতবল ও গলিতনখদন্ত হইয়া মৃতপ্রায়। বৈজ্ঞানিক মিথ্যাদৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার সামর্থ্য ও তদনুরূপ সাধনা তাহার নাই। কালে হইবার আশাও সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান ইউরোপ প্রবল তমঃপ্রধান রজোগুণ দ্বারা চালিত হইতেছে—তাহার জ্ঞান ও ধর্ম্মের সেই সাত্ত্বিকতা ও সেই অতীন্দ্রিয় সিদ্ধি কোথায়, যদ্দ্বারা এই প্রবৃদ্ধ রজোগুণ প্রশমিত হইতে পারে? যে তামসিক ভাবের উচ্ছ্বাস মানবজাতির বক্ষে নৃত্য করিতেছে, সত্ত্বগুণের প্রবল প্রতিঘাত ভিন্ন

তাহার বিনাশ অসম্ভব। তমোগ্রস্ত মানবজাতিকে পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে, তাহার পক্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আবহাওয়ায় বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। সত্ত্বগুণের সনাতন বিশুদ্ধ ধারা—বিশ্বের মঙ্গলঘট সংস্কৃত-ভারতে সুরক্ষিত রহিয়াছে। জগতে তাহার প্রয়োজন অতুলনীয়।

সংস্কৃত-ভারতের সনাতন আদর্শ দেব-জীবন লাভ। তাহার লক্ষ্য মুক্তি, মোক্ষ, বা নির্ব্বাণ। উপায়, জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম্ম। অহিংসা তাহার পরম ধর্ম্ম। মানবকুল তাহার দৃষ্টিতে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। সংসার তাহার সাধনার তপোবন। তাহার জীবন নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বৈর কর্ম্মের যোগবদ্ধ ধারা। ইহাই বেদের ব্রহ্মবাণী, দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত, কাব্যের মহান্ সঙ্গীত এবং ইতিহাসের অক্ষয় কীর্ত্তি। সংসারের নিখিল পরিবর্ত্তন প্রবাহের মধ্যে ইহাই তাহার নিকট জীবন্ত সত্য। রাজশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির কথা ত তাহারই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যারণ্যে আমরণ পরিভ্রমণ কর, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির বা অশোকের মত রাজা আর কোথায়ও পাইবে না। বিশ্ববিধাতার এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ভারতেই সম্ভব। যে দেব-আদর্শ এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে, বর্ত্তমান কালে জগতে তাহারই প্রচার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যে জাতি বিশ্বজীবনের যে বিভাগে যতটা মন একাগ্র করিতে পারিয়াছে, সে জাতি সেই বিভাগে ততটা সফলতা লাভ করিয়াছে। কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য, কেহ বা বিজ্ঞানাদি বিদ্যার সাধনা দ্বারা মানব জীবনরূপ মহাকাব্যের বিভিন্ন রসমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মানবসভ্যতার শৈশব যুগ হইতে ভারত তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে দেব-জীবন লাভে, জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বরহস্য ভেদ করিয়া অতিমৃত্যুত্ব—অতিমানবত্ব লাভে। ফলে, মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও চিরগৌরবের আস্পদ—জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিতে তাহার সিদ্ধি অতুলনীয়। ভারতীয় জীবন অন্যান্য বিভাগ উপেক্ষার

চক্ষে দেখিয়াছে, এমন নহে। এখনও তাহার প্রাচীন শিল্প ও বিদ্যা-সমূহের ধ্বংসাবশেষ বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান সময় ধর্ম্ম ও নীতি পদদলিত করিয়া বিশ্বসভ্যতার যে গ্লানিকর অঙ্গহানি করিয়াছে, মানবজাতির চির আশা ও আকাঙ্ক্ষার আস্পদ সেই অংশ পূর্ণ করাই ভারতীয় সাধনার কর্ম্ম। স্বার্থসমুদ্র মন্থন করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে যে নৈতিক বিপ্লবের বিষ আবির্ভূত হইয়াছে, ভারতের নীলকণ্ঠ শিব ব্যতীত আর কে তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ ও অগ্রসর হইবে। অতএব সংস্কৃত-ভারতের নিকট নিবেদন যে, তিনি মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার দেব-আদর্শ-প্রচারকার্য্যে ব্রতী হউন।

আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশ জাতীয় জীবনের প্রাণ কিন্তু আত্ম-প্রচারে সে জীবনের চরম সার্থকতা। সেই সাধকেরই সার্থক সাধনা, যিনি আপনার সিদ্ধি মাথায় করিয়া বিশ্বমানবের দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করেন এবং তাহার সেবায় উৎসর্গ করেন। যে জাতির যাহা সাধনা ও সিদ্ধি, তাহার প্রচার ও বিস্তারেই সেই জাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। নব্য ভারতের বীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভারতের প্রতিনিধি হইয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার আদর্শ প্রচার করিলেন। ভারতরবির সে উজ্জ্বল দীপ্তি মহাসাগর পারস্থ ভূখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া আবার ভারতে পতিত হইল। আমাদের আঁধার কুটীর কথঞ্চিৎ আলোকিত হইল। সেই অস্ফুট আলোকে আমরা আত্মপরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। জড়দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিলাম। সুদীর্ঘ কাল আত্মগোপনের ফলে ভারতীয় জীবনে সঙ্কীর্ণতার যে একটা বিপুল জড়তা আসিয়াছে, উক্ত আত্মপ্রচারে তাহা দূরীভূত হইতে পারে। এই উপায়েই জাতীয় আদর্শের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্ব প্রকটিত করিয়া জাতিদেহে নব জীবনের বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। সেই প্রাণস্পন্দনই জাতীয় জীবনে গতিশক্তি প্রদান করিয়া আমাদের অনন্ত উন্নতির পথ সরল করিয়া দিতে পারে।

কোথায় সেই সংস্কৃত-ভারত—আর কোথায় সেই সংস্কৃত-ভারতের প্রতিনিধিগণ, যাঁহারা মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিরে বহন করিয়া সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন এবং দেশ বিদেশের নরনারীর প্রাণে জ্ঞানের দিব্য আলোক আনয়ন করিয়া নবযুগপ্রবর্ত্তনের সহায় হইবেন। দারিদ্র্যের ঘোর নিষ্পেষণে মৃতপ্রায় হইলেও রত্নপ্রসূ ভারতমাতা কখনই সুপুত্র লাভে বঞ্চিতা হন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমান যাহাদিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষার নয়নে দেখিতেছে, তাহাদেরই মধ্যে এখনও বুদ্ধ ও চৈতন্যের আত্মা আহ্বানের প্রতীক্ষায় সুপ্ত রহিয়াছে। স্বর্গচ্যুত দেবগণের ন্যায় এখনও ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ঋষির আত্মা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

হে সংস্কৃত-ভারত, তোমার সেই প্রিয়তম সন্তানগণকে একবার আহ্বান কর। তোমার শত শত সন্তান চতুর্দ্দিকে ধাবিত হউক এবং পৃথিবী ব্যাপিয়া তোমার দেব-আদর্শ প্রচার করুক। তোমার অমৃতবাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হউক। দধীচি মুনির মত তোমার তপস্যাময় জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে উৎসর্গীকৃত হউক, জগতে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হউক এবং তোমার চিরকল্যাণময় নাম চিরতরে ধন্য হইয়া থাকুক। তুমিই ত একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে ধর্ম্ম ও নীতির শান্তিবারি বর্ষণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলে—হিংসাপ্লাবিত জগতে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলে। নৈতিক বিপ্লবের দুর্দ্দিন আবার পৃথিবীতে উপস্থিত। আবার তোমাকে ভিক্ষুবেশ ধারণ করিতে হইবে, আবার পৃথিবীকে জ্ঞানালোকে প্লাবিত করিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্বভার ত তোমার উপরই পতিত হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হও, তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্ম, বিশ্বমানবত্ব ও বিশ্বপ্রেমিকত্বের আদর্শ লইয়া, তোমার সাধনা ও সিদ্ধির মঙ্গলবার্ত্তা লইয়া বিশ্বমানবসমাজে উপস্থিত হও। তোমার কুলধর্ম্ম পালন করিয়া অতীত জীবনের গৌরব ও বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ

কর। তোমার সমস্ত দৈন্য, সর্ব্বপ্রকার বিফলতা, সফলতার অঙ্গাভরণ হইয়া থাকুক এবং তোমার বৃহত্তরজীবনলাভের সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হউক। সম্মুখে বিশ্বমানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর অমূল্য জীবন দেখিয়াও কি এখনও নিশ্চেষ্ট থাকিবার অবসর আছে? বিশ্বনাথের বিরাট্ মূর্ত্তির পার্থিব সংস্করণ বীরেশ্বর বিবেকানন্দের পিণাক ঐ শুন গর্জ্জন করিয়া তোমায় চির-শান্তির রাজ্যে আহ্বান করিতেছে:—"Once more the voice, that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the "Father of Mountains," and descended upon the plains through Krishna, Buddha and Chaitanya in all carrying floods, has spoken again—Enter ye into the realms of light, the gates have been opened wide once more

* যে বাণী প্রাচীনকালে সরস্বতীতীরে ঋষিদিগের কর্ণে মহামন্ত্র শুনাইয়াছিল—যে বাণী পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যপ্রমুখ অবতারগণের আবির্ভাবে ভীষণ জলপ্লাবনের ন্যায় ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছিল—সেই বাণী আবার ঘোষিত হইয়াছে—"স্বর্গদ্বার আবার উন্মুক্ত হইয়াছে—তোমরা জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ কর!"

ভক্তের ভগবান্।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী)

ভগবান্ কে? তিনি কিরূপ, তাঁহার স্বরূপই বা কি তাহা জানি না। তবে শাস্ত্র বলেন তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। রসস্বরূপ পরমাত্মা সৃষ্টির অতীত—বুদ্ধির অগম্য। চিন্তায় সেই অচিন্ত্যরূপের দর্শন হয় না—তর্কে তাঁহাকে মিলে না—তিনি কেবল ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়েন।

ভক্তি জগতে কে না করে? সকলেই পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ভক্তি লৌকিক, এ লৌকিক ভক্তি দ্বারা সে অলৌকিক ধনকে পাওয়া যায় না।

মানুষ যখন বুঝিতে পারে, এ সংসার-নাট্যশালা সুখের নয়, দুঃখের আগার—মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে দিন দিন তাহার জীবনপ্রবাহ বহিয়া কালসিন্ধুর দিকে ধাবিত হইতেছে—তাহার প্রমোদের নন্দন কানন শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আর যখন সে সংসারের ত্রিতাপে তাপিত হইয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করে তখনই তাহার হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু যতদিন সে সংসারের দুর্ব্বিষহ কষাঘাতে জর্জ্জরিত না হয় যতদিন তাহার মন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত না হয়, ততদিন তাহার উপর ভগবানের দয়া হয় না অথবা সে সদ্‌গুরুরও দর্শন পায় না।

প্রথমাবস্থায় ভগবানের নাম শ্রবণ, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ, তাঁহার বিগ্রহাদির পূজা, তাঁহার অর্চ্চনা বা বন্দনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন হৃদয়ের পাপরাশিকে ধৌত করিয়া তবে উচ্চাঙ্গের ভক্তির অধিকারী হইতে হয়।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে তাঁহার নামের মহিমা শ্রবণ করিতে হয়। ব্রহ্মশাপে জর্জ্জরিতদেহ রাজা পরীক্ষিত কেবল সাতদিন মাত্র তাঁহার নামসুধা সেবনেই মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌কে তরণী করিয়া ভক্তচূড়ামণি শুকদেব স্বয়ং নাবিক হইয়া তাঁহাকে অনায়াসে ভবসমুদ্র পার করিয়াছিলেন। এই নামের বলেই পবননন্দন অনন্ত পারাবার এক লম্ফে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নাম শ্রবণ করিতে করিতে উহাতে রুচি হইবে। তখন ভক্তিগদগদচিত্তে উহার কীর্ত্তন করিতে হইবে। যেখানে কীর্ত্তন—যেখানে সঙ্গীত সেইখানেই তাঁহার আবির্ভাব হয়। তাই তিনি বলিয়াছেন—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।"

আমরা মনে করি, ভগবা

নহে। যেখানেই ভক্তকণ্ঠে তাঁহার নাম কীর্ত্তন হয় তিনি সেইখানেই অধিষ্ঠান করেন।

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, কিংবা যোগীদের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নামকীর্ত্তন করে আমি সেই স্থানেই থাকি।

তাঁহার এই কীর্ত্তনের মহিমা বুঝিয়াছেন বলিয়াই দেবর্ষি নারদ তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া নাচিয়া নাচিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করেন, আর তাঁহার মোহিনী বীণা হইতে আনন্দ-কণা নিঃসৃত হয়—

"কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারি।
মাধব মনমোহন মোহনমুরলীধারি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার॥"

এই ভাবে বিভোর হইয়াই পাগল ভোলা শ্মশানে মশানে ডমরু-ধ্বনি করিয়া ফেরেন।

এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের মনে ভগবানের স্মরণ মনন

করিবার ইচ্ছা হইবে। তাঁহার কোটীশশীবিনিন্দিত চিদ্ঘনরূপের চিন্তা করিয়া—ঐ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ত ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ মত্ত হস্তীর পদতলে পড়িয়াও রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি যে ভক্তাধীন—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার ত কেহ দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই। যে তাঁহাকে ভক্তিভরে ভজনা করে তিনি তাহাতেই বিরাজ করেন—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

ভক্ত শুধু শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ মনন করিয়াই তৃপ্ত হন না; তিনি তাঁহার পাদসেবন করিতে চান। তাঁহার বিগ্রহাদির সেবা করা, তাঁহার মন্দিরাদি মার্জ্জনা করা, ভক্তিভাবে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা ও পাদপদ্মে প্রণাম করা—ইহাই তাঁহার পাদসেবন। পূতসলিলা কলনাদিনী জাহ্নবী যে চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মশাপদগ্ধ সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন—বলিরাজা যে চরণ লাভের আশায় অমরাবতী ত্যাগ করিয়া পাতালবাসী হইয়াছিলেন—সততচঞ্চলা কমলা যে পদের লোভে অচলা হইয়া তাঁহার চিরদাসী হইয়া আছেন, সেই যোগীন্দ্রবাঞ্ছিত চরণ-সরোজ হৃদিকমলাসনে ধরিতে পারিলেই ত অরুণোদয়ে তমোরাশির ন্যায় মনের আঁধার দূর হইবে। পাদসেবনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাঁহার অর্চনা করা চাই। পত্র, পুষ্প, ফল, নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার স্থূল রূপের পূজা করিতে হইবে। তাঁহাকে ভক্তিভরে যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহা যে তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

এই পূজায় রতি থাকাতেই পৃথুরাজা ঘোর বিপদ্‌সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তকালে সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। দয়াময় ভগবানের দ্বার ভক্তের জন্য চির অবারিত। যখনই ভক্ত তাঁহার শরণাগত হয়, তখনই তিনি তাহার সকল ভয় দূর করিয়া তাহাকে মুক্তির পথের

পথিক করেন। কৃষ্ণভক্ত অক্রুর বিপৎসঙ্কুল কংসপুরীতে থাকিয়াও কেবল কৃষ্ণাভিবন্দনপ্রভাবে সমুদয় বিপন্মুক্ত হইয়া অন্তে ভগবদ্ সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন।

আমরা এই বৈধী ভক্তির সোপানসমূহ ত্যাগ করিয়া একেবারেই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে চাই। প্রথম ভাগের বর্ণপরিচয় না হইতেই আমরা কালিদাস, ভবভূতির গ্রন্থাবলী পড়িবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাহাতে না হয় আমাদের বর্ণপরিচয়, না হয় আমাদের কালিদাসের কাব্যামৃতরসাস্বাদন। বস্তুতঃ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে গেলে সাধারণতঃ আগে তাঁহার শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দনা, অর্চ্চনা প্রভৃতি দ্বারা বৈধী ভক্তির সাধনা করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হইতে হয়।

এই রাগাত্মিকা ভক্তি কি সহজ? অগ্রে বৈধী ভক্তির "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্" প্রভৃতি সমাপনান্তে ভক্ত যখন এই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী হয় তখন তাঁহার কি আর মানাপমানের ভয় থাকে? সে উন্মত্তের ন্যায় নির্লজ্জ হইয়া কখন হাস্য করে—কখন উচ্চৈঃস্বরে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করে—কখন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে।

শুকদেব পথ দিয়া চলিতেছেন—বালকেরা পাগল বলিয়া তাঁহার গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছে। আত্মারাম শুকদেবের বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। কেন থাকিবে? তিনি যে রাগাত্মিকা ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন—তিনি যে পূর্ণকুম্ভ! এ অবস্থায় প্রাণ আর কিছু চাহে না—চাহে কেবল দিবানিশি তদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে। তখন ভক্তের প্রাণ বলে—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্॥

হে ভগবন্, আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু করি তাহা তোমারই পূজা।

এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে—সে বলে "আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি, তুমি আমার।—তুমি সুন্দর, আহা, তুমি অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য্য-স্বরূপ। মন, তুমি সুন্দর বস্তুর প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্ পরম সুন্দর, তুমি তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস।"

এই রাগাত্মিকা ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবন ভাবিতেন এবং সমুদ্র দেখিয়া যমুনা বোধে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়া রাধারাণী নেত্রে অঞ্জন লেপন করিতেন—কেননা জগৎ তাহা হইলে কৃষ্ণময় দেখাইবে। এ অবস্থায় উপস্থিত হইলে ভক্ত ভগবানের উপর এক অধিকার বিস্তার করিয়া ফেলে। সে তাঁহার উপর মান করে—রাগ করে—জোর করে—যেন ভয়ের লেশমাত্র নাই। এইরূপ ভক্তিজনিত হৃদয়ের বলেই যখন ভগবান্ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন তখন সুরদাস বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাদিতি কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

তুমি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আর পৌরুষ কি? যদি তুমি হৃদয় হইতে যাইতে পার—তবেই তোমার পৌরুষ বুঝি।

ভগবানকে যে যে ভাবেই পাইতে ইচ্ছা করে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। তুমি ভগবানের দাসানুদাস হও, তুমি তাঁহাকে পাইবে—আবার তুমি তাঁহাকে বন্ধু, সখা, সহচরভাবে চাও, তুমিও তাঁহাকে পাইবে।

দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র বনবাসী হইলে তাঁহার জটাবল্কল গুহকের আর সহ্য হইল না। তিনিও জটাবল্কল-ধারী হইয়া বনবাসী হইলেন। ভক্ত যে, সে কি ভগবানের দুঃখ সহ্য করিতে পারে? একবার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাইতেছেন, পথিমধ্যে একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার হস্তে শাণিত তরবারি। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই তরবারি লইয়া কোথায়

যাইতেছ? সে বলিল, আমি এই তরবারি দ্বারা তিন জনের প্রাণনাশ করিতে যাইতেছি। প্রথমে কাটিব অর্জ্জুনকে—সে আমার কৃষ্ণকে তার রথের সারথী করিয়া বড় কষ্ট দিয়াছে। দ্বিতীয় কাটিব প্রহ্লাদকে—সে আমার প্রভুকে বিষ খাওয়াইয়াছে। তৃতীয় কাটিব বলিকে—সে আমার প্রাণধনকে তাহার দ্বারের দ্বারী করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবানকে যে যে ভাবেই ডাকে—যে ভাবেই দেখে তাহাতেই তিনি খুসী। গুহক জাতিতে চণ্ডাল, তিনি তাঁহাকে "মিতে" বলিয়া ডাকিতেন—ভগবান্‌ তাহাতেই খুসী। যশোদা গোপনারী। যশোদা তাঁহাকে পুত্রভাবে দেখিতেন—বকিতেন—কত তিরস্কার করিতেন, ভগবান্‌ তাহাতেই সন্তুষ্ট। আবার ব্রজবালাগণ তাঁহাকে স্বামী, পতি, কান্তভাবে দেখিত; ভগবান্‌ তাহাদের সহিত সেই ভাবেই বিহার করিতেন। তাহারা ব্রজবাস চাহিত না—পীতবাস হরি যে তাহাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাহারা মানসম্ভ্রম, কুল, শীল বিসর্জ্জন দিয়াছিল—অকূলকাণ্ডারী যে তাহাদের হৃদয়ের রাজা। যে বাঁশীর মধুর তানে বৃন্দাবনে আনন্দ-লহরী ছুটিত—বন্যপশুগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ থাকিত—সেই বাঁশীর মধুর তান তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের কৃষ্ণানুরক্তি লৌকিক নায়ক নায়িকার প্রেমের ন্যায় ছিল না। এই কান্তাসক্তির পূর্ণত্ব আমরা শ্রীরাধিকায় দেখিতে পাই।

নদী-বক্ষে-ভাসমান লৌহযান যেমন অয়স্কান্তগিরি সমীপে আসিবা-মাত্র খণ্ড বিখণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ সাধনা দ্বারা ভগবানের দিকে মন আকৃষ্ট হইলে অবিদ্যা, অহঙ্কার প্রভৃতি দূরীভূত হয় এবং দেহ মন সেই ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়।

লীলাময় হরি ছল করিয়া বলির ত্রৈলোক্যাধিকার হরণ করিয়াছিলেন, কই তাহাতে ত বলিরাজের দুঃখ হয় নাই, তিনি সানন্দ-হৃদয়ে নিজের মন প্রাণ দেহ পর্য্যন্ত সেই বিশ্বরূপের চরণে সমর্পণ

করিয়া পাতালবাসী হইলেন। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যদি তাঁহার সেবায় ব্যয়িত না হইল তবে জীবনধারণে প্রয়োজন কি? কর্ম্মকারের ভস্ত্রাও ত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে।

বৈধী ভক্তি সাধনের দ্বারা যখন ভক্তের অবিদ্যা অহঙ্কারাদি তাঁহার ভাব-সাগরে ডুবিয়া যায় তখন সে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে সেই দিকেই দেখে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী নাম অনন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—রবিশশী তাঁহারই তেজোরশ্মি লাভে জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে—অভ্রভেদী হিমাচল তাঁহারই ধ্যানে সতত মগ্ন—জাহ্নবী যমুনা তাঁহারই করুণাকণা বহিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে—পিককুল কুহুরবে প্রাণ মাতাইয়া তাঁহারই আনন্দামৃত বর্ষণ করিতেছে,—অলিকুল গুণ গুণ স্বরে, তাঁহারই গুণ গাহিতেছে। সে দেখে তাঁহার মহিমার অন্ত নাই।

আবার এদিকে দেখ, যাঁহার অনন্তমহিমা বেদাগম প্রকাশ করিতে পারে না, সেই ভগবান্ ভক্তের নিকট অনুরাগশৃঙ্খলে বাঁধা। ভক্তের মহিমা বিস্তারের জন্য তিনি ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—দাস হইয়া গোপাঙ্গনাগণকে স্কন্ধে ধারণ করিয়াছেন।

আমরা যে যতই "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" বলিয়া ভগবানের নামরূপকে উড়াইয়া দিতে চাহি না কেন, যাঁহার মন তাঁহার প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে তিনি তাঁহাকে "সাকার" বলিয়া না মানিয়াই পারিবেন না। জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপে ভারত উদ্ভাসিত করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদ্য "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও মহাজ্ঞানী বেদব্যাসের অন্তরে শান্তি আসিল না। তাই তিনি গুণময়ের কীর্ত্তিকুসুমরাশি কবিতা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া ভক্তিচন্দন মাখাইয়া তচ্চরণে অর্পণ করিলেন।

যখন কীর্ত্তনাদি বিধি-সাধ্য নানা বৈধীভক্তির দ্বারা ক্রমে রাগাত্মিকা ভক্তিতে উপস্থিত হইয়া সাধক শান্ত, দাস্যাদি যে কোন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে করিতে সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন করে তখনই তাহার মন সেই ভাবময়ের ভুবনমোহন রূপ গুণ দেখিতে

দেখিতে তন্ময় হইয়া উঠে—তখন সে আর তাঁহাতে ও নিজেতে কোন প্রভেদ দেখে না। ইহাকেই তন্ময়াসক্তি বা ভাবসমাধি কহে। মহাভাগা গোপীদের ঐ অবস্থা হইয়াছিল। 'যতক্ষণ তাঁহাদের অহংজ্ঞান ছিল না, ততক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন তখনই পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

আর ভক্ত যদি ভগবানের নির্গুণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়া ঐ ভাবের চিন্তা করিতে করিতে 'অহংজ্ঞানশূন্য হয় তবে সমুদায়ই তাঁহার নিকট নামরূপে অবিভক্ত এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হয়'। ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি বা নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধি।'

হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন"

—সাধক কবির এই কথা যেমন স্মরণ হয়, দেখি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অখিল প্রপঞ্চ যেন চমকে সেই মায়ের রূপসাগরে বিন্দুপ্রায় মিশিয়া যায়—আর আত্মারাম আত্মহারা হইয়া আমি কৈ! আমি কৈ! করিয়া শেষে অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা আভাস মাত্র—ভ্রমরশিরোপরি গন্ধের ন্যায় সাধককে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এ বোধে-বোধ চিরকাল ব্যর্থ অনুসন্ধানের জন্য কে যেন রাখিয়া দিয়াছে। এ আভাস বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—স্মৃতিপটে থাকে শুধু জ্ঞান ও অজ্ঞানে মিশ্রিত কোন্ সুদূর জীবনের অপূর্ব্ব স্বপ্নবৎ বোধ। আব্রহ্মকীটাণু সকলেরই ভিতর সেই সান্দ্রানন্দের আভাস

বিদ্যমান, আর সেই আনন্দটা ঠিক ঠিক ধারণা—ঠিক ঠিক উপলব্ধি না করিতে পারায়, তাহাদের প্রাণের পিপাসা যেন কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই তাহারা কেবল এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিয়া সারা হইতেছে, আর কখন এটা কখন সেটাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাণের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানব নিশ্চয় করিয়া একবার একটী আদর্শকে ধরে কিন্তু পরক্ষণে যখন সে ঐ আদর্শের নিকট পৌঁছায় তখন দেখে, সে যাহা চাহিয়াছিল ইহা তাহা নহে—তাহার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী, আরও উচ্চ।

সচ্চিদানন্দের অস্ফুট স্মৃতির প্রেরণায় মানব কিছুতেই স্থির নয়, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। আনন্দময়ীর চিদানন্দময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইবার তাহারি আমরণ চেষ্টা। এই আমরণ চেষ্টার ফলে সৎ ও অসৎ কার্য্যের বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছে। যে প্রচেষ্টা মানবের অন্তর্নিহিত সচ্চিদানন্দের বিকাশক এবং যে প্রচেষ্টা সেই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় বা সেই শক্তির আবরক তাহাকেই আমরা সদসৎ কর্ম্ম বলি। সকলেই সেই পরমানন্দের চেষ্টায় ধাবিত সত্য—কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই বিপথ অবলম্বন করিয়া ক্ষণিক সুখে বিভোর। যিনি বুদ্ধিমান্ তিনি দেখেন যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা সুখ তাহাই অমৃত—অল্পে সুখ নাই, যাহা অল্প তাহা মর্ত্ত্য। তাই তাঁহারা বৃহতের অনুসন্ধান করেন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে 'প্রকৃতির আপূরণের' দ্বারা জীবের জাত্যন্তরপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা ভূমার অনুসন্ধান করেন তাঁহারা মানব হইতে দেবত্ব প্রভৃতি ক্রমোচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন, আর যাহারা তল্লাভ-চেষ্টায় অন্যপথগামী হইয়া ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য ক্ষুদ্র সুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তাহারাও প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ গতি নিম্ন হইতে নিম্নাভিমুখীই হইয়া থাকে; জীবাত্মার বাসনানুযায়ী এই দেহরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি। যাহার মনে পশুপ্রবৃত্তি প্রবল তাহার দেহও সেই প্রবৃত্ত্যনুযায়ী পশুবৎ হইয়া

থাকে, কারণ, উচ্চধ্যানপরায়ণ শুদ্ধসত্ত্ব শরীর দ্বারা কুক্কুরসুলভ পরিতৃপ্তি লাভ অসম্ভব।

ভিতরে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। উহার বিকাশ করিতে হইলে নানা অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে সেইগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। কারণ, যুগযুগব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা ঋষিগণ তাহাদের সত্যতায় নিঃসংশয় হইয়াছেন। ঋষি-আবিষ্কৃত সেই সত্যসকল যে জাতি যত পরিমাণে জীবনে পরিণত করিয়াছে সে জাতি জগৎসমক্ষে ততই গরীয়ান্। তবে দেশকালপাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিধি-নিষেধেরও সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন আবশ্যক,—তাই যুগপ্রয়োজন বুঝিয়া অবতারকল্প মানবগণ ঠিক্ সময়ে আবির্ভূত হইয়া বিধিনিষেধসমূহকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তোলেন। যাহারা এই সকল না মানিয়া সেই পুরাতনে আসক্ত থাকে তাহাদের বিনাশ অনিবার্য্য। এই জন্যই দেখা যায়, ক্ষুদ্র জাতি জগতে আধিপত্য বিস্তার করে আবার অতি প্রবল জাতিও কালের অতল জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

জাতীয়-জীবনে যাহা সত্য, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাই। আমরা দেখিতে পাই এই ব্যক্তিগত জীবনে কারণ কার্য্য প্রসব করে, পরে সেই কার্য্য কারণস্বরূপ হইয়া অপর কার্য্য প্রসব করে। এই কার্য্যকারণের আইনানুযায়ী ব্যক্তিগত-জীবনের কারণগুলি সমষ্টীভূত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনরূপ কার্য্যে পরিণত হইতে বাধ্য। সচেষ্টোপার্জ্জিত অর্থ এই জীবনে ভোগ হইল আর স্বোপার্জ্জিত অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ হইবে না, এ কিরূপ কথা? বলিতে পার, কাহারও কাহারও অসৎ কর্ম্মের ফল এই দেহেই ফলে কিন্তু কেহ কেহ সারাজীবন দুষ্কৃতি করিয়াও এই কার্য্যকারণাত্মক নিমিত্তবাদ হইতে অব্যাহতি পায় দেখা যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর জাতীয় জীবনেই হউক সকল ঘটনাবলীই যদৃচ্ছাপ্রসূত বলিলেই ত পরজন্মভীতি

হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভস্মীভূত দেহের আবার পুনরাবর্তন কিরূপে হইবে? মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কিনা তাহাও কেহ কখনও দেখে নাই। সুতরাং আমরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর কিছু বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বলিতে হয়, তুমি নিজ ভোগেচ্ছা পরিতৃপ্তির জন্য যেন তেন প্রকারেণ এ জগৎকে যথেচ্ছাচারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, কিন্তু তোমার এই পরলোকনিরাসবাদ যে জগতের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আরও অধিক ভীতিপ্রদ। ইহজন্মসার, ভোগসর্ব্বস্ব তুমি কি কখনও ব্যর্থপ্রেমিকের, ব্যর্থপরিশ্রমীর, চিররুগ্নের অবস্থা চিন্তা করিয়াছ? তাহাদের সে অবস্থার কারণ কি? এবং তাহাদের ইহজন্মের সকল প্রচেষ্টারূপ কারণ কি কখনও কোনও কার্য্য প্রসব করিবে না?—না তোমার মতানুযায়ী কার্য্য-কারণাত্মক নিমিত্তবাদকে পদাঘাতে দূরীভূত করিয়া একটা ভয়ানক গোঁজামিলের মধ্য দিয়া এ জগৎ-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে? সদ্যোজাত জীবের আহার চেষ্টা এবং নানা সহজাতগুণসম্পন্নতা বা ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি, যদি নিমিত্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত জন্মান্তর-বাদ না মান, তবে কি করিয়া সমাধান করিবে। 'সহজাত' বা 'প্রতিক্রিয়াজনিত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিলেই ত কোন প্রকার ব্যাখ্যা হয় না। যতক্ষণ না উহার কার্য্যকারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছ ততক্ষণ তোমার কথা কেহই গ্রহণ করিবে না।

কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ হয়ত বলিবেন, সহজাত জ্ঞান, প্রতিক্রিয়াজনিত জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ও দৈহিক ব্যাপার-গুলি অর্থশূন্য নহে। উহাদিগকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত বহুযুগব্যাপী সংঘর্ষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দেহান্তর্গত রক্তসঞ্চালন, পরিপাক, নিশ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহও এক সময়ে জীবকে জ্ঞাতসারে করিতে হইয়াছিল। বালক যেমন শব্দ পরিচয় কালে প্রত্যেক বর্ণটী জ্ঞাতসারে অধ্যয়ন করে, পরে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে প্রত্যেক বর্ণটী উচ্চারণ না করিয়াও

ছত্রের পর ছত্র দ্রুত পড়িয়া যাইতে পারে, অথবা বাদ্যনিপুণ কোন ব্যক্তি অপরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াও যথাযথভাবে যন্ত্রাদির চালনা করিতে পারে, সেইরূপ জীবের 'প্রত্যেক জ্ঞান' সহজাতই হউক বা প্রতিক্রিয়াজনিতই হউক, বাহ্য প্রকৃতির সংঘর্ষজাত অভিজ্ঞতা হইতেই লব্ধ হইয়াছে। তবে এই সকল জ্ঞান পুত্র পিতা হইতে লাভ করে। পিতাকে যে শক্তি অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, তাহা পুত্রে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতমাত্র জীবকে ক্ষুধা ও পরে ইন্দ্রিয়-তাড়নায় প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে উপস্থিত হইতে হয়। এই সংঘর্ষে যে যত জয়লাভ করে সে ততই তাহার শারীরিক পুষ্টিসাধন ও বংশবিস্তারে সমর্থ হয়। প্রকৃতির সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার্থ জীব নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজের নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছে। জীব যে কেবল জড়জগতের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত তাহা নহে, নিজ অস্তিত্ব, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতিকল্পে জীবজগতেও মহাসংঘর্ষ চলিতেছে। এই সংঘর্ষে যে যেরূপ উপযুক্ত তাহার অস্তিত্বের কালও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই উন্নতিকল্পে জীব যে শুধু বংশানুগত (hereditary) গুণাবলী লইয়া অগ্রসর হয় তাহা নহে; তাহার আবেষ্টনী (environment) ও ভাষা তাহার পূর্ব্বপুরুষদের বহুকল্পসঞ্চিত জ্ঞানরাশি স্বল্পকাল মধ্যে তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। পারিপার্শ্বিক সভ্যতা এবং উন্নত-ভাবার মধ্যে অবস্থান করিয়া জীব যেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে, দেহ ও মস্তিষ্কের পূর্ণতা লাভ করিয়াও অসভ্য সমাজে সে তাহা লাভ করিতে পারে না। এইরূপে জীবসমষ্টি প্রবাহাকারে ক্রমোন্নতি মার্গে অগ্রসর হইয়েছে। এ মার্গ অতি দুর্গম। ব্যষ্টি জীব আমরণ পরিশ্রম, হৃদয়ের রক্ত, দীর্ঘশ্বাস, ও অশ্রুপাতের দ্বারা যে একটু পথ পরিষ্কার করিল পরবর্ত্তী ব্যষ্টি জীব সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া ঠিক সেই প্রকার কঠোরতার মধ্য দিয়া আর একটু অগ্রসর হয়

মাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া কত সুখ, দুঃখ, কত উন্নতি অবনতি, কত নব নব সংগ্রামের মধ্য দিয়া কোন্ এক অজানা আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এ গতির 'বিরাম' নাই, শান্তি নাই।

কিন্তু ইহা ত কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি মাত্র। কি প্রকারে জড়াজড় জগতে পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে তাহা অতি পরিপাটিরূপে এই আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা জানা যায় বটে কিন্তু কি কারণে, কোন্ শক্তিবলে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে যে সকল সমস্যার উত্থাপিত হইয়াছিল সে সকলের কোন পূরণই হইল না। জাতি ও সমাজগত ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কার্য্যকারণাত্মক নিমিত্তবাদের ক্রমপরম্পরা কতকটা থাকে সত্য কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ব্ব কথিত সমস্যার কোন পূরণই হয় না। আর "বংশানুগত গুণাবলী" কথাটী কত দূর সত্য তাহারও কিছুই তথ্য নির্ণয় হয় না। পিতামাতা হইতে দৈহিক কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিছু লাভ হইয়া থাকে বলিয়া বোধ হয় না। পণ্ডিতের মূর্খ, মূর্খের পণ্ডিত, সবলের দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের সবল অপত্যের অভাব এ জগতে বিরল নহে। উৎকট ব্যাধিযুক্ত পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বালককেও সেই রোগযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, পিতা মাতার দারিদ্র্যে পুত্রকেও সেই দারিদ্র্যভার মস্তকে বহন করিতে হইবে প্রভৃতি যে অবিচারসমূহ জগতে প্রত্যক্ষ করা যায় এই নৈতিক সমস্যারই বা পূরণ কে করিবে? উপযুক্ত মস্তিষ্কাদিসম্পন্ন সুসভ্য সমাজে ও তাহার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও বহুলোক মহা অজ্ঞ ও দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় কেন তাহারই বা উত্তর কে দিবে? তাই আমরা পূর্ব্বজন্মবাদ মানি। আমরা পিতা মাতা হইতে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্তু আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, অবনতি—এমন কি, সহজাত এবং প্রতিক্রিয়াজনিত জ্ঞানও আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজনিত অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মপ্রসূত সংস্কারের দ্বারাই নিয়মিত। এক্ষণে, অতি প্রাচীন অলৌকিকদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু

দার্শনিকদের এ সম্বন্ধে অভিমত কি তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, লোকে যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতভাবে নব বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহীও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতভাবেই নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাবের সহিত হিন্দুধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ রহস্য যথেষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু গীতার ঐ শ্লোকটী হইতে ঐ কথার যাথার্থ্য খণ্ডন হয়। কেবল গীতা নয়, শ্রুতি হইতে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে মতামত উপস্থাপিত করিয়া ঐ মতের কোনও রূপ যাথার্থ্য নাই প্রমাণ করা যাইতে পারে। পরে যদি বৌদ্ধ ও হিন্দু দেহান্তরবাদ পরস্পর তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় ঐ উভয় মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বৌদ্ধমতে, একটী তরঙ্গ যেমন আর একটী তরঙ্গ প্রসব করে, কিন্তু প্রথম তরঙ্গমধ্যস্থ জলরাশি দ্বিতীয় তরঙ্গের মধ্যে নাই, সেইরূপ একটী জীবন আর একটী জীবন প্রসব করে, কিন্তু এক জীব কখনও বিভিন্ন দেহ ধারণ করে না। এইরূপে যতদিন না নির্ব্বাণ লাভ না হয় ততদিন এ জীবনপ্রবাহ হইতে নিষ্কৃতি নাই। কাহার?—ক্ষণিক 'আমি'র। সে কিরূপ?—অলাতচক্রবৎ। এই যে বৌদ্ধমত ইহা হিন্দুদর্শন বেদবেদান্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

গীতার "বাসাংসি জীর্ণানি" শ্লোকের ন্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও ঠিক ঐরূপ একটী উদাহরণ আছে। যেমন তৃণজলোকা একটী তৃণের অন্তভাগে গমনপূর্ব্বক অপর একটী তৃণ আশ্রয় করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগের অবয়বসকল সম্মুখে উপসংহৃত করে, তদ্রূপ এই সংসারী আত্মা এই স্থূল দেহটীকে অচেতন অবস্থায় পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তরে অভিনিবিষ্ট হইয়া আপনার সূক্ষ্ম শরীর উপসংহৃত করিয়া থাকেন। কিম্বা ভাগবৎকার যেমন বলিয়াছেন, পুরুষ একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেমন জলোকা তৃণান্তর গ্রহণ

করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ কর্ম্মপ্রভাবে বর্ত্তমান জীবও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা অবিনাশী, দেহের বিকার থাকিলেও দেহীর বিকার নাই। দেহীর ভাববিকারহেতু দেহের নাশ হইলে দেহাভিমানবশতঃ অন্য দেহ স্বীকার করিতে হয়, ইহাই দেহীর দেহসংযোগের কারণ। বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে সংসার-গতি নিরূপিত হইয়াছে। জীব যখন এতদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করেন। শ্রুতিতেও এই বিষয়ের প্রশ্নোত্তর আছে। সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারাই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন যে, যৎকালে এই পুরুষ দুর্ব্বল হইয়া সম্মোহ প্রাপ্ত হয়, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ তদভিমুখে ধাবিত হয়। তখন এই আত্মা এই তৈজস চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণপূর্ব্বক হৃৎপ্রদেশেই গমন করেন। তখন চাক্ষুষপুরুষ আদিত্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রহ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হন। সুতরাং আত্মা তখন রূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। পরে ইহার হৃদয়ের অগ্র অর্থাৎ নির্গমনদ্বারভূত নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলেই আত্মা সূত্র ও জীবন-স্বরূপ লিঙ্গ শরীরের সহিত স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। আত্মা আদিত্যলোক-প্রাপ্তি-নিমিত্তক জ্ঞানকর্ম্মের সঞ্চয়ে মস্তক দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হন। এইরূপ কর্ম্মানুসারে যথাযথ ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকেন। আত্মা যখন নিষ্ক্রান্ত হন, তখন জীবনস্বরূপ লিঙ্গ শরীরও তাহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও ঐ সঙ্গেই গমন করে। জীব সবিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষাশ্রিত বাসনারূপ সংস্কারবিশিষ্ট। মৃত্যুকালেও জীব উক্ত সংস্কার সঙ্গে লইয়াই গমন করিয়া থাকেন।

জীবের যে পূর্ব্বকর্ম্ম ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায় অর্থাৎ ভাবনাময় দেহবিশেষের উৎপত্তি করে তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিলে ইহাই

অবগত হওয়া যায় যে, মৃত্যুকালে এতদ্দেহের যন্ত্রণাবশতঃ উহার অভিমান বিস্মৃতি হয়, পরে, কর্ম্মসংস্কার জাগরিত হইয়া আমি দেব, মনুষ্য ইত্যাকার দর্শন ও তাহাতে অভিমানবশতঃ ভাবীদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে। তৎপরে দেহত্যাগ হয়। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে নূতন দেহপ্রাপ্তি হইলে প্রাণ সকলও পূর্ব্ব দেহ হইতে নূতন দেহে যায় (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২)। কিন্তু প্রাণের উৎক্রমণ আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভবে না। সুতরাং আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ভূতান্তর মিশ্রিত হইয়া প্রাণ আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গমন করে, এবং অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগের সাধন দধি, দুগ্ধ, সোমরস ইত্যাদি দ্রবময় পদার্থ। হোমকর্ম্মের দ্বারা সেই সকল পদার্থ পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয় এবং অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞকারীকে আশ্রয় করে। অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতেও প্রমাণ হয় যে জীব আহুতিময়ী 'আপঃ' পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে। ইষ্টাপূর্ত্তকারীরা পরে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে। কিরূপে অবরোহণ করে? প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়।

জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে লিঙ্গদেহাশ্রিত হন। লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া তবে স্থূলদেহ পরিত্যাগ করেন। এই লিঙ্গদেহেই তিনি ভূর্লোকে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে অন্তরীক্ষ লোকে গমন করেন। ইহাকেই প্রেতলোক বলা হইয়া থাকে। এইস্থানে যাইয়া পাপের ফলভোগ করিতে হয়। পরে পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত তাঁহাকে স্বর্গলোকে গমন করিতে হয়। তথায় পুণ্য কর্ম্মের ফলভোগের অবসান হইলে তাঁহার কর্ম্মক্ষয় হয়। কর্ম্মক্ষয় হইলেও সংস্কার থাকে। এই সংস্কারই অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। জীব সেই অদৃষ্ট লইয়া পুনরায় ঐ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ-

কটাহে প্রবেশপূর্ব্বক স্থূলদেহ ধারণ করে। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবিৎ সোমপায়ী সুতরাং পাপবিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তিগণ অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গগমনে অভিলাষ করিয়া থাকেন। তাঁহারাই পুণ্যফলে পবিত্র সুরেন্দ্রলোক অর্থাৎ ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। পরে তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করিয়া ক্ষীণপুণ্য হইলে পুনরায় এই মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীতের মুক্তিকামনা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

প্রায় সকল দেশেই সঙ্গীত আমোদের উপাদানরূপে গৃহীত হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এই ললিত-রসকলা সাধনার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর সঙ্গীত-সাধনার চরম লক্ষ্য—'রসো বৈ সঃ', যিনি সর্ব্ব রসের আকর তাঁহার উপলব্ধি।

'সাধনা বলিলেই তাহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম মনে উদয় হয়। কিন্তু ললিত-রসকলা আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধির ভিতর স্বকার্য্যসাধনে কতটা সক্ষম হয়, এবং তাহার উপর অতিরিক্ত মাত্রায় ভার চাপাইলে তাহার সতেজ পুষ্টি ও প্রসারবৃদ্ধির কোন ক্ষতি হয় কি না, কিছুকাল হইতে তৎসম্বন্ধে একটা আন্দোলন চলিতেছে। গত বৎসর 'সবুজ পত্রে'র ভাদ্র সংখ্যায় 'সঙ্গীতের মুক্তি' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতা কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ। কথাটা যদি ঐ খানেই শেষ হইত, কোন কথা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষদ্-বিদ্যালয়ের মুখপাত্রস্বরূপ

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তচিন্তামণি মহাশয়, তাহার একটী প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।* কথায় কথা উঠে। তাই আমরাও একটা কথা কহিতেছি, যদিও ইহা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। কেন না সঙ্গীতে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। তবে, একটা আন্দোলনে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার সকল ব্যক্তিরই আছে। উক্ত প্রবন্ধে রবিবাবু স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বিষয়টা গুরুতর এবং তাহা আলোচনা করিবার একটীমাত্র যোগ্যতা আমার আছে। তাহা এই যে, দিশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।" এই অযোগ্যতার অধিকারেই আমরা দুই চারিটী কথা বলিব। আমাদের কথা যদি ভুল হয়, তাহাতেও একটা উপকার হইবে। সত্যকে চিনিতে হইলে ভুলগুলিকে জানা দরকার।

মূল প্রবন্ধের বিষয় 'সঙ্গীতের মুক্তি'। বাঁধা না পড়িলে ত মুক্তির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের বন্ধন কোথায়? ব্রহ্ম নাম-রূপের ফাঁদে বদ্ধ; মানুষ বদ্ধ মায়ায়; কবিতা যেমন ছন্দ-মিলে বদ্ধ, সঙ্গীতও তেমনি বদ্ধ সুর-তালে। আধেয় এবং আধারে যে সম্বন্ধ, সুরতালে সেই সম্বন্ধ। কাল—গড়ে; স্থান—ধরে। নহিলে সৃষ্টি থাকে কোথায়? এই নিত্যসম্বন্ধ রদ্ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। রবিবাবু বলিয়াছেন—"য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেক বারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব নিকাশ করিয়া হাঁফ্ ছাড়িতে হয় না। কেন না সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝিয়া রচয়িতা নিজে তার সীমানা বাঁধিয়া দেন, কোনো মধ্যস্থ আসিয়া রাতারাতি তাহাকে বদলী করিতে পারে না।" সীমানা যিনিই বাঁধুন, একটা বন্ধনের প্রয়োজন। শৃঙ্খলা, সৌষ্ঠব, সমন্বয় না থাকিলে শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবিতায়

* 'হিন্দুসঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ'। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তচিন্তামণি প্রণীত। মূল্য ।৴০ আনা।

যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটাই লয়। * * * কাব্যেই কি আর গানেই কি এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।" এ কথার উত্তরে কৃষ্ণবাবু বলেন—"ছন্দে যদি দোষ না থাকে তবে, সুরে গান করিলে, কেন তাল-যোগে সঙ্গত করা যাইবে না—"

প্রত্যক্ষের উপর প্রমাণ নাই। তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের যে কয়টী গান উদাহরণ দিয়াছেন, কৃষ্ণবাবুর পুস্তকে প্রকাশ যে সে সবগুলি সঙ্গীত-পরিষদে বহুসংখ্যক শ্রোতার সমক্ষে কবির অভীপ্সিত ছন্দ যতি নিখুঁত রাখিয়া গীত হইয়াছিল। পুস্তকে এই সকল গানের স্বরলিপিও প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, গানের ছন্দ বা যতি, সুরের চাল বা গতি যেমনই হউক, তদনুরূপ ঠেকার বোলও ভিন্ন ভিন্ন, রকম রকম নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন কোন সুর যদি প্রয়োজন অনুসারে চাল পরিবর্ত্তন করে, তজ্জন্য 'তালফেরতা' সঙ্গতের ব্যবস্থা। এত সদুপায় সত্ত্বে যদি তালের সম্বন্ধে বন্ধনের পরিবর্ত্তে উদ্বন্ধনের বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সত্যই দুঃখের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হইয়া উঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

সে কথা সত্য! সঙ্গীতের আসরে গায়ক অনেক সময় আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া কেবল বাদককে অপ্রতিভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন। বাদকও এ সম্বন্ধে বড় কম যান না। অনেক সময় দেখিয়াছি, বাদক তালটা মৃদঙ্গের চর্ম্মের উপর না ফেলিয়া উহা রাখিয়া দেন; তাঁহার পক্ষে সেটা একেবারেই অশোভন। যে আসরে দুই 'বাঘা ভালুকো' শ্রোতৃবৃন্দকে রসদানের জন্য উপস্থিত হন সেখানে একপ্রকার প্রস্তুত হইয়াই যাওয়া উচিত যে, যেন আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। দুই এক জন মুরুব্বি ব্যতীত এরূপ দ্বন্দ্বের কেহই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। দ্বন্দ্বকে দূরে পরিহার কর।

নূতন সৃষ্টি করিতে হয়, করা হউক। কিন্তু তাল জিনিষটাকে একেবারে বর্জ্জন করা কি ভাল?

তাল সঙ্গীতের সঙ্গ, কিন্তু সুর তাহার অঙ্গ। সুর রসের ব্যঞ্জনা। ভাব যেখানে অনির্ব্বচনীয়, আপনাকে প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না, সুর সেখানে তাহার আত্মপ্রকাশের সহায়। মানবের ভাষা নিরতিশয় সীমাবদ্ধ। আমাদের চরম অনুভূতি যখন প্রাণস্পন্দন-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন তাহা একটী মাত্র স্বরে আপনাকে উজাড় করিয়া দিয়া নীরব হইয়া থাকে—আ, উ, ও, ইত্যাদি। সে স্বর সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, বিরক্তি বা বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস, তাহা বুঝা যায় উচ্চারণের সুরে। সপ্তকের যে পর্দ্দায় যে রস প্রকাশ করে, বহু অভিজ্ঞতায় তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সুরের সাহায্যে রসের যে আদান প্রদান হয়, তাহাতে দুইটী সর্ত্ত অপরিহার্য্য। নিখুঁত কণ্ঠ এবং কর্ণ, এরূপ দুইটী বস্তুই দুষ্প্রাপ্য। এই দুইটী জিনিষই প্রথমতঃ প্রকৃতিপ্রদত্ত মালমসলা, তাহার উপর শিক্ষা সাধনা চর্চ্চাসাপেক্ষ। খনির অন্ধকার গর্ভে হীরা জন্মিয়াই রাজমুকুটে শোভা পায় না। যখন বাঙ্গালায় সঙ্গীতচর্চ্চা অধিকতর ব্যাপক ছিল, তখন সাধারণ গৃহস্থ পর্য্যন্ত দিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া সেই নির্দ্দোষ আমোদ ও নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেন। পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক বসিত আর সে বৈঠকে আভিজাত্যের অভিমান থাকিত না। কেবল গুণের আদর আর কদর। সে দিন আর নাই, যখন প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বনাথ মতিলাল ফেরিওয়ালার 'চাঁপাকলা' ডাক্ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওরে কে আছিস, গান্ধার বলেছে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন্।' এখন চাঁপাকলা হাঁকিলে আমাদের শুষ্ক উদর ঘনদুগ্ধযোগে তাহার সুব্যবহারটাই মনে করে—জীবনযুদ্ধে আমরা জর্জ্জরীভূত। আমাদের মূল সপ্তক 'সা' এখন আফিসের বড় সাহেবের পরুষকণ্ঠ। 'রী' ঋণের তর্জ্জন। গান্ধার গলাবাজীতে। মধ্যম এবং পঞ্চম উভয়ই গৃহিণীর ঝঙ্কারে। ধৈবত শুধু 'ধা' 'ধা' করিয়া বেড়াইতেছে আর 'নি' উপবাসের চিঁ চিঁ স্বরে পর্য্যবসিত হইয়া কেবল 'পাইনি, খাইনি,

করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে! এখন উপায় থাকিতেও আমরা নাতোয়ান হইয়া পড়িয়াছি।”

এইখানেই রবিবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণবাবুর মতভেদ। রবিবাবু বলেন—“ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষভাবে বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। * * * কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নয়। আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতঃই বিলাতি ছাঁদের হইয়া পড়ে।” কৃষ্ণবাবু বলেন—“হাস্যরসাত্মক করিতে হইলে, স্বভাবতঃই বিলাতি ছাঁদের কেন হইবে, একথা আমরা বুঝিতে অক্ষম।”

‘কেন হইবে’ অথবা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় কি না এ কথার বিচার করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটা কথা ভাবিবার আছে—হইলে ক্ষতি কি? ভাব এবং রস বিশ্বব্যাপী। যদি এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায়, যদ্দ্বারা ভাবরসের আস্বাদনও সর্ব্বজনীন হইতে পারে, এরূপ আদান প্রদানের একটা সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কৃষ্ণবাবুর আশঙ্কা, ইহাতে আমরা (অর্থাৎ হিন্দুরা) আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলিব। এই আশঙ্কার পূর্ব্বাভাস রবিবাবুর প্রবন্ধে আছে “এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহাদের জাত যাইবে, কিন্তু জাতি যাইবে না।”

যাঁহাদের উপদেশ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন সঞ্চয় করিবে, সেই উদার হিন্দুজাতি এইরূপ আদান প্রদানের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে হয়। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পরিবর্ত্তন বা ভাঙচুর করিতে হিন্দু কখন কুণ্ঠিত হন নাই। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক, তৎপরে

তান্ত্রিক, অনন্তর শ্রীমহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে এইরূপ কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তবে, সঙ্গীত এই প্রশস্ত পথে চলিবে না কেন? কৃষ্ণবাবু বিলাতি-ঢপের আমদানী করিতে অনিচ্ছুক, কেননা তাঁহার ভয়, তাহাতে "হিন্দু রাগরাগিণীর বৈজাত্য সঙ্ঘটন হইতে থাকিবে।" কিন্তু বৈজাত্য সঙ্ঘটন ত পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সরফরদা, ইমন, কাফী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হিন্দুরাগিণী নহে। তারপর পরিবর্ত্তন, ভাঙচুর করিয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সখা, সখী, পুত্র, পুত্রবধূ প্রভৃতিতে বৃহৎ একান্ন-বর্ত্তী পরিবার। কাওয়ালী তাল না কি অনার্য্য কাওয়াল জাতির দান। তবে যদি এমন কথা হয়, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে কি? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা যাহাতে আমোদ বোধ করিতাম, এখন আর তাহাতে করি না। যাত্রার স্থল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছে। নূতন স্রোত আসিলে অনেক নূতন সামগ্রী ভাসিয়া আসে। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবে কীর্ত্তন আসিয়াছিল। তারপর বাউলের গান। নূতন ধারায় মনোভাব প্রবাহিত হইলেই তাহার অভিব্যক্তিরও নূতন ভাষা প্রয়োজন।

অন্যান্য ললিতশিল্পকলার ন্যায় সঙ্গীতেরও প্রধান লক্ষ্য শ্রোতার হৃদয়ে ভাবরসের সঞ্চার করা। পূর্ব্বে যাত্রার আসরে অনেক গান রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াই গীত হইত। ক্রমে নূতন ঢঙের প্রয়োজন হওয়ায় বদনের তুক্কো, গোবিন্দ দাশরথীর সুর, মধুকানের ঢপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। মানুষ পুরাতনের প্রতি যতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হউক, যতই তাহাকে ভক্তি সম্ভ্রম করুক, সে নূতনকে ভালবাসে—তাহা দ্বারা আকর্ষিত হয়, তাহাকে চায়। কালে শক্তির অপলাপে প্রচলিত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার ছাঁচে গীত রচনা হইতে লাগিল। তার পর বিলাতি ধরণের থিয়েটার যখন আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইল, নটগুরু গিরীশচন্দ্র দেখিলেন, রাগরাগিণীকে

আরও ভাঙচুর না করিলে কাজ চালানো যায় না। দেখা গেল, কোন সঙ্গীতের চপল পদ-বিন্যাসের সঙ্গে সুর হাঁফাইয়া বলিতেছে, দাঁড়াও, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অত ছুটিতে পারি না। কখন গানের কথা কলহাস্যের রোল তুলিয়াছে, সুর তাহাতে যোগ দিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে বলিতেছে, আমার কি এখন অত ছ্যাব্‌লামো সাজে! ভাবুক রচয়িতার অন্তরে এরূপস্থলে যে কি হয়, তাহা ভুক্তভোগী নহিলে বুঝিতে পারা যায় না। কালোয়াৎ ত কড়িমধ্যম লাগাইয়া দিব্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। কিন্তু সাধারণ শ্রোতা যে কড়ি-মধ্যমের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মর্ম্ম কিছুই বুঝে না, সে কি কেবল ওস্তাদের শিরঃ-সঞ্চালন, শ্মশ্রুআস্ফালন দেখিয়া আমোদ বোধ করিবে? এই শ্রেষ্ঠ রসকলা যদি শুধু দুই চারিজন সমজ্‌দার শ্রোতার জন্য হয়, তাহা হইলে কথা নাই। কিন্তু সঙ্গীতের একদিককার লক্ষ্য যেমন ভগবৎ সাধনা, তাহার অন্য দিকের লক্ষ্য সাধারণকে আমোদ দানে আকর্ষিত করিয়া তাহাকে ক্রমে উচ্চতর লক্ষ্যে প্রেরণ করা। তাহা করিতে হইলে সঙ্গীতকে সাধারণের উপযোগী ও উপভোগ্য করিতে হইবে।

যাত্রার গানে তবু একটা সুবিধা ছিল, এক একটা নির্দ্দিষ্ট রসের এক একটা সঙ্গীত রচিত হইত, সুতরাং সেই সেই রসের নির্দ্দিষ্ট সুর চলিত। তখন লোকের ধৈর্য্য ছিল শুনিত। যাত্রার লক্ষ্য রসের অবতারণা। রসাভাব না হইলে বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইত না। নাটকের ন্যায় নাটকীয় সঙ্গীতেও হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে ভাবের খেলা প্রদর্শিত হয়। কোথাও দুরন্ত ঈর্ষার মাঝে দুর্জ্জয় ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, কোনখানে উপেক্ষায় অভিমানে হৃদয় দোলায়মান, কোথাও বা শোকের সঙ্গে উন্মত্ততার অট্টহাস। এইরূপ বিভিন্ন ভাবরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস নির্দ্দিষ্ট রসের নির্দ্দিষ্ট সুরে প্রকটিত হয় না। গিরীশচন্দ্র যেমন নূতন ভাবে নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন, তেমনি নূতন নূতন সুরও সৃষ্ট হইতে লাগিল। এই অভিনব সৃষ্টির ইষ্টানিষ্ট, যুক্তি অযুক্তি লইয়া ওস্তাদ এবং কালোয়াৎগণ তর্ক বিচার করুন। কিন্তু নাটকীয় সঙ্গীতের প্রচলনে যে জনসাধারণ

একরূপ উচ্চ আমোদের অধিকারী হইয়াছেন তাহা রঙ্গালয়ের দর্শক মাত্রে একমুখে স্বীকার করিবেন। আমরা পূর্ব্বে যা ছিলাম, এখন আর তাহা নহি। সুতরাং কেবল পুরাতনে আমাদের সকল প্রয়োজন সাধিত হইবে কেন? ললিতরসকলায় হৃদয়ের উচ্চতম বিকাশ। তাহার পায় বেড়ী দিলে জাতীয় জীবন পঙ্গু হইবার ভয় নাই কি? সঙ্গীতের মুক্তিকামনা সঙ্গত কি না পাঠক বিচার করিবেন।

ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

(২৩)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

জ্ঞান।

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥

নব—প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ আকাশ-তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, ও পৃথ্বী তন্মাত্র।

একাদশ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও মন।

পঞ্চ—স্থূলভূত,—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী।

ত্রীন্—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ।

যে জ্ঞান দ্বারা এই আটাশটী তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই আটাশটীর মধ্যে "এক" পরমাত্মতত্ত্ব অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান। ইহাই আমার মত।

বিজ্ঞান।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ ॥

যে জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বগুলি পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ দেখা যায় না, কিন্তু সেই তত্ত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ব্রহ্মকে দেখা যায়, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে।

অতএব জ্ঞান সবিকল্প, বিজ্ঞান নির্ব্বিকল্প।

(২৪)

সাধন ভক্তি ও প্রেমাভক্তি।

সাধন ভক্তি।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥

আমার অমৃতকথাতে নিরন্তর শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাদর, মৎকথা শুনিয়া নিরন্তর ব্যাখ্যান, আমার পূজাতে পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পূজায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের শ্রেষ্ঠ পূজা, সর্ব্ববস্তুতে মদ্ভাবস্ফূর্ত্তি এইগুলি দ্বারা ভক্তি হয়।

প্রেমাভক্তি।

এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥

যে নিজেকে আমাতে নিবেদন করিয়াছে, তাহার এই সব সাধনা দ্বারা আমাতে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাভক্তি হইলে, সেই ভক্তের সাধন কি সাধ্য কিছু বাকি থাকে না, অর্থাৎ সব আপনা আপনি হইয়া যায়।

(২৫)

প্রশ্নোত্তরমালা।

দান কি?—কাহারও দ্রোহ না করাই দান, ধনার্পণ নহে।

তপঃ কি?—কাম ত্যাগই তপস্যা, কৃচ্ছ্রাদি নহে।

ধন কি ?—ধর্ম্মই ধন, অর্থ ধন নহে।

দক্ষিণা কি ?—জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা, হিরণ্য দান নহে।

সুখ কি ?—সুখ দুঃখের অনুসন্ধান না করাই সুখ, ভোগ নহে।

পণ্ডিত কে ?—বন্ধ হইতে মোক্ষের উপায় যিনি জানেন, তিনিই পণ্ডিত; কেবল যিনি বিদ্বান্ তিনি নহেন।

মূর্খ কে ?—দেহ ও গেহে যে অভিমানী সেই মূর্খ।

পন্থা কি ?—নিবৃত্তি মার্গই পন্থা, কণ্টকশূন্য পথ নহে।

স্বর্গ কি ?—সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, ইন্দ্রাদিলোক নহে।

নরক কি ?—তমোগুণের উদ্রেকই নরক, তামিস্রাদি নহে।

বন্ধু কে ?—গুরুই বন্ধু, ভ্রাতাদি বন্ধু নহে।

গৃহ কি ?—শরীরই গৃহ, হর্ম্ম্যাদি নহে।

দরিদ্র কে ?—যে অসন্তুষ্ট সেই দরিদ্র, নিঃস্ব নহে।

কৃপণ কে ?—যে অজিতেন্দ্রিয় সেই কৃপণ—দীন নহে।

গুণ কি ?—দোষই বা কি ?

গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ।

গুণ ও দোষ দর্শনই দোষ। গুণদোষদর্শনবর্জ্জিত স্বভাবই গুণ। অর্থাৎ ভাল মন্দ দেখাই দোষ; ভাল মন্দ না দেখাই গুণ।

(২৬)

মোক্ষের তিনটী উপায় কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ। যোগ অর্থাৎ উপায়।

জ্ঞানযোগে কার অধিকার ?

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।

ইহাদের মধ্যে দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্মফলে বিরক্ত ও তৎসাধনভূত কর্ম্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ।

কর্ম্মযোগে কার অধিকার ?

তেষনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্।

যার বৈরাগ্য নাই, যে সকাম, তার পক্ষে কর্ম্মযোগ।

ভক্তিযোগে কার অধিকার ?

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

কোন হেতুতে আমার কথাতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু বৈরাগ্য নাই, অথচ অত্যন্ত আসক্তও নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ।

(২৭)

কর্ম্মী ও জ্ঞানী।

কর্ম্মীর যজন।

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।

স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া যজ্ঞ দ্বারা আমার যজন করিবে। এইরূপে যজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল হয়।

জ্ঞানীর সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা।

সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।

ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ॥

বিবেক দ্বারা সর্ব্বপদার্থের অনুলোমক্রমে সৃষ্টি (উৎপত্তি), ও প্রতিলোমক্রমে প্রলয় (নাশ) চিন্তা করিবে, যতদিন না মন নিশ্চল হয়। সর্ব্বক্ষণ সৃষ্টিপ্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়।

(২৮)

ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের কামনাশ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি সে জন্য ভক্তের হৃদ্গত কাম নষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের প্রয়োজন নাই।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনাভ্যাস পর্য্যন্তও ভক্তের প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না? কারণ, উহাও শুদ্ধা ভক্তির অন্তরায়।

ভক্তিতে সব হয়ে যায়।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।

যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম, এবং তীর্থযাত্রা, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করেন।

মোক্ষ দিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

একমাত্র আমাতে নিষ্ঠাবান্ এরূপ সাধু, ধীর ভক্তকে আমি সংসারগতিনাশক কৈবল্য বা মোক্ষ দিতে চাহিলেও তিনি উহা গ্রহণ করেন না।

(২৯)

শুচি অশুচি আচার কাহাদের জন্য।

যাহারা ক্রিয়া, জ্ঞান, ভক্তি এই তিনের অধিকারী নহে, অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মীও নহে, জ্ঞানীও নহে, ভক্তও নহে, যাহারা সাধনাশূন্য মূঢ় তাহাদের জন্য "আচার" অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধি, ভাল মন্দ, শুভ অশুভ, এই সব বিধান করা হইয়াছে। ঐরূপ মূঢ় ব্যক্তিদের আচারে আঁট থাকা ভাল।

উদ্দেশ্য।

গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাং॥

কর্ম্মের নিয়মন জন্য গুণদোষের ব্যবস্থা করিয়াছি।

নিয়ম বিধির তাৎপর্য্য নিবৃত্তি।

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥

যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে। মানুষের এই ধর্ম্ম মঙ্গলকর ও শোক-মোহ-ভয়নাশক।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(৭)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, বি)

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি কোন প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি উহা অনুভব করিতে পারে এবং অনেকস্থলে উহাকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র স্বপ্ন সৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসোঁর (Bergson) মতে সকল প্রকার স্বপ্নই ঐরূপ অনুভূতিজাত।

বার্গসোঁ বলেন, স্বপ্নের বাস্তবসত্তা কিছুই নাই। স্বপ্নে আমি কত লোকজন দেখিতেছি, তাহাদের সহিত কত কথাবার্ত্তা কহিতেছি, তাহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সবটাই মিথ্যা। জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন শূন্যে মিলাইয়া যায়। ইহা কতকটা কবি ডি, এল, রায়ের নিম্নলিখিত গানটীর মত—

> বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিল নবরত্ন ন'ভাই।
> (আর) তানসেন ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁর সভায়।
> (অর্থাৎ) যেতেন নিশ্চয় তানসেন বিক্রমাদিত্যের কোর্টে।
> (কিন্তু) দুঃখের বিষয় তানসেন তখন জন্মান্নি কো মোটে। ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, এরূপ কেন হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদের নিদ্রিত ও জাগরণোন্মুখ অবস্থায় কি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ই অনুভূত হয় না?

কোন লোককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি একটু স্থির হইয়া দেখুন দেখি, কিছু দেখিতে পাইতেছেন কিনা, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই উত্তর দিবেন,

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ, নিজ মনকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইলে যতটুকু একাগ্রতা থাকা দরকার তাঁহাদের তাহা নাই। যাঁহাদের তাহা আছে তাঁহারা অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যথা—প্রথমে সাধারণতঃ একটা কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্র দেখা যায়, উহাতে উজ্জ্বল বিন্দুসকল দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে—ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতেছে, আবার যেন শান্তভাবে নামিয়া আসিতেছে। অনেক সময় অনেক বিভিন্ন বর্ণের দাগ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি এত অনুজ্জ্বল যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার কোন ব্যক্তির পক্ষে এই বর্ণগুলি এত উজ্জ্বল যে কোনও পার্থিব বর্ণের সহিত তাহার তুলনা হয় না। এই দাগগুলি কখনও বিস্তৃত হয় কখনও সরু হইয়া যায়, ইহাদের আকৃতি ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হয় এবং সর্ব্বদাই যেন নূতন একটা আসিয়া পূর্ব্বেরটীকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তন কখন অল্পে অল্পে ধীরভাবে হইয়া থাকে, আবার কখনও বা ঝড়ের মত তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে। এই বর্ণক্রীড়া কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? দেহবিজ্ঞানবিদ্ এবং মনোবিজ্ঞানবিদ্ উভয়েই ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; চক্ষুমধ্যস্থ আলোক, বর্ণময় দাগ, ফস্ফরাস্‌জাত আলোক (phosphine) প্রভৃতি বলিয়া নানা প্রকারে উহাদের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অপর কাহারও কাহারও মতে অক্ষিঝিল্লীতে (retina) যে রক্তপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তনের জন্য এইরূপ বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিম্বা চক্ষু বন্ধ করিলে চক্ষুগোলকের উপর যে চাপ পড়ে তাহাতে অক্ষিঝিল্লীতে কোন না কোনরূপ উত্তেজনা হয়, তাহা হইতেই ঐরূপ বর্ণের উৎপত্তি—ইত্যাদি নানাপ্রকার মতভেদ আছে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলি অনেকটা আনুমানিক বলিয়া মনে হয়। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার

উদ্ভাবিত কৃত্রিম চক্ষুর সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে আলোকরশ্মিপাতে চক্ষুর আণবিক বিকার (molecular change) উপস্থিত হয়, তাহাতে চক্ষুতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির ইহাই কারণ। কিন্তু আলোকপাত রোধ করিবামাত্রই অক্ষিঝিল্লী ও চক্ষুস্নায়ুর আণবিক সাম্যভাব ফিরিয়া আসে না। কাজেই একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ নিয়তই চক্ষুস্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিতে থাকে। আর তড়িৎ-প্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজ্ঞানও অবশ্যম্ভাবী। এইহেতু চক্ষুমুদ্রিত করিয়া থাকিবার সময়ও আমরা একপ্রকার বিক্ষিপ্ত ও সঞ্চারিত ক্ষীণালোকরশ্মি দেখিতে পাই। অধ্যাপক বসু মহাশয় বলেন, এই আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষুর নানা অংশের আণবিক বৈষম্যজাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক স্ফুরণের কার্য্য।

কিন্তু মুদ্রিত চক্ষুর এই বর্ণবৈচিত্র্যের অনুভূতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতভেদ থাকিলেও ঘটনাগুলি কিন্তু সত্য। কারণ, এইরূপ অনুভূতি সকলের পক্ষেই ঘটিয়া থাকে। দার্শনিক বার্গসোঁর মতে ইহাই স্বপ্নের প্রধান উপাদান এবং প্রধানতঃ ইহা হইয়াই স্বপ্ন সৃষ্ট হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে আলফ্রেড মরি (M. Alfred Maury) এবং হার্ভি (M. d'Hervey) নামক দুইজন মনস্তত্ত্ববিদ্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ঘুমাইয়া পড়িবার সময় এই বর্ণময় দাগগুলি এবং এই গতিশীল আকৃতি-গুলি যেন জমাট বাঁধিয়া স্থির হইয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ আকৃতি গ্রহণ করে। স্বপ্নাবস্থায় এইগুলিই স্বপ্নদৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাটী সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। কারণ, যখন তাঁহারা এই নির্দ্ধারণটী করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থা। আধুনিক কালে আমেরিকার জনৈক মনস্তত্ত্ববিদ্ *

* Professor Ladd of Yale University

একটী অধিকতর সঠিক উপায় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ উপায় মত কার্য্য করা একটু কঠিন। কারণ, উহা কতকটা অভ্যাস সাপেক্ষ। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের ঠিক পূর্ব্বে যে স্বপ্নটী দেখিতেছিলাম নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র মনে হয় যে, স্বপ্নটী যেন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে লোপ পাইয়া যাইতেছে এবং লক্ষ্য না করিলে শীঘ্রই উহা আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যাইবে। সেই লুপ্তপ্রায় স্বপ্নটীর প্রতি মনোযোগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যেন আমাদের স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তিগুলি অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া এই আলোকময় দাগে পরিণত হইতেছে। মনে করুন, স্বপ্নে আমরা সমুদ্রে বেড়াইতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে হরিদ্রাভাযুক্ত ধূসরবর্ণ ঢেউগুলি খেলা করিতেছে—উহাদের চূড়া শুভ্রফেণময়। জাগরণমাত্র এই ছবি একটী বিস্তৃত দাগে মিলাইয়া যাইবে, উহার বর্ণ ধূসর এবং হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার মধ্যে উজ্জ্বল বিন্দুসকল ছড়ান রহিয়াছে। স্বপ্নের মধ্যেও এইগুলি বর্ত্তমান ছিল এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই স্বপ্ন সৃষ্ট হইয়াছিল। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের এইরূপ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি ব্যতীত বাহ্য উত্তেজনাজাত অনুভূতিও যে স্বপ্নচিত্র সৃজনের কারণ হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

চক্ষুর আভ্যন্তরীণ অনুভূতিই স্বপ্ন সৃজনের প্রধান কারণ বটে। কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও এইরূপ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি হইয়া থাকে—তাহারও স্বপ্ন সৃজনের সাহায্য করে। ধ্যানস্থ হইলে অনেকে কর্ণের ভিতরে একটী শব্দ লক্ষ্য করিতে পারেন। কোন কোন সম্প্রদায় (যেমন রাধাস্বামী সম্প্রদায়) কর্ণের এই শব্দ শ্রবণ দ্বারা তাঁহাদের ধ্যান যে যথাযথভাবে হইতেছে তাহা মনে করিয়া থাকেন। কর্ণের আভ্যন্তরীণ অনুভূতিপ্রসূত এই শব্দ আমাদের জাগ্রদবস্থায় অনুভূত না হইলেও নিদ্রিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এই শব্দ এবং বাহিরের নানারূপ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শব্দ মিলিত হইয়া আমাদের স্বপ্নে শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু এই শব্দানুভূতি বর্ণানুভূতির ন্যায় স্বপ্নে প্রধান অংশ অভিনয় করে না।

স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক বলিবার আছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অনুভূত ছবির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করে।

মাক্সসিমন (M. Max Semon) তাঁহার নিজের একটী স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে পাশাপাশি দুই থাক স্বর্ণমুদ্রা সাজান রহিয়াছে, কিন্তু উহারা উচ্চতায় সমান নহে। তাঁহাকে যেন থাক দুইটীকে সমান করিতে হইতেছে, কিন্তু উহা তিনি কিছুতেই সমান করিতে পারিতেছেন না—এমন কি, তজ্জন্য তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অবশেষে এই কষ্টে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তিনি দেখিলেন যে, বিছানার কাপড়ে জড়াইয়া তাঁহার পা দুইটী উঁচু নীচু হইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। স্পর্শের দ্বারা অনুভূত এই অসমতার জ্ঞান দৃষ্ট চিত্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় স্পর্শেন্দ্রিয়ানুভূত ভাবটী স্বপ্নের মধ্যে দৃষ্ট-চিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের যেরূপ স্পর্শশক্তি আছে, আমাদের শরীরাভ্যন্তরীণ প্রত্যেক যন্ত্রটীরও সেইরূপ এক এক প্রকার অনুভব শক্তি আছে। জাগ্রদবস্থায়ও এইগুলি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উহা আমাদের জ্ঞানগোচর নহে। কারণ, জাগ্রদবস্থায় আমাদের জ্ঞান নানাপ্রকার বাহিরের কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকে—আমরা যেন নিজের দেহ ছাড়িয়া অনেকটা বাহিরে বাস করি। নিদ্রিতাবস্থায় যেন আমরা নিজের মধ্যে অধিকতরভাবে ফিরিয়া আসি। এইজন্য দেহসম্বন্ধীয় অনেক সূক্ষ্মানুভূতি আমরা স্বপ্নকালেই অনুভব করিয়া থাকি।

এইগুলি স্বপ্নের উপাদান। কিন্তু তাই বলিয়া, উহারাই যে স্বপ্নসৃষ্টি করে একথা বলা যায় না। এই কথাটী আরও কিছু বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

চক্ষু বুজিয়া আমরা যে বর্ণবৈচিত্র্য দেখি সেইটাই স্বপ্নের প্রধান

উপাদান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। মনে করুন, আমরা চক্ষু বুজিয়া সাদা জমীর উপর কাল দাগ রহিয়াছে এইরূপ একটী চিত্র দেখিলাম। এই চিত্র অবলম্বন করিয়া অসংখ্য প্রকারের স্বপ্ন সৃজিত হইতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যে আমরা যে বিশেষ ছবিটী দেখি তাহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়? আমাদের জাগ্রৎকালীন অনুভূতি সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ যে কৌতুহলজনক দুই একটী পরীক্ষা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যখন আমরা কোন পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ করি তখন কি আমরা সমস্ত অক্ষরগুলি একটী একটী করিয়া পাঠ করি? যদি তাহাই হইত তবে সমস্ত দিনে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করা হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেক বাক্যের সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখিয়া লই মাত্র। এমন কি ঐ অক্ষরগুলির সমস্ত আকৃতিটাও দেখি না—কতকগুলি দাগ দেখি মাত্র। যাহা দেখি তাহা হইতেই সমস্তটা একরূপ বুঝিয়া লই। যে সব অংশ আমরা দেখি না, আন্দাজে বুঝিয়া লই, আমরা মনে করি, সেগুলি ঠিক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাও স্বপ্ন দেখার মত কল্পিত দৃষ্টি (hallucination)। এ বিষয় লইয়া এত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে যে উহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছুই নাই। দুইজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ এই সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিয়াছেন আগামীবারে তাহার উল্লেখ করিব।

———

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,

২৩।৮।১৬

পরম স্নেহভাজনেষু—

যো— তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম, তুমি সুস্থ হয়েছ জেনে বিশেষ প্রীত। তুমি আমার ভালবাসা ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানবে। * * * মালা জপ ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম করে যাবে—আমাদের অত বিধি মানতে হবে না। যারা মানে মানুক্। আমাদের চাই রাগমার্গের ভজন সাধন, যেমন ছিল ব্রজগোপীদের। "সখি, তোদের হ'ল কথার কথা, আমার যে অন্তরের ব্যথা, আমার ত না গেলে নয়!" হতে হবে ব্যাকুল উন্মাদ - এরই নাম রাগ-মার্গের ভজন। এখন ভগবৎকৃপায় ভক্তি প্রেমের বান এসেছে—ঠাকুরের আবির্ভাবে। যাও ভেসে, যাও মেতে; ভয় নাই, ভয় নাই। দাও ঝাঁপ—অমর হবে। হে জীব, নবজীবন লাভ কর, নূতন রাস্তায় এগিয়ে চল, ভাই। জয় শ্রীপ্রভুর জয়, জয় শ্রীভক্তের জয়। ইতি—

তোমারই

প্রেমানন্দ।

(২)

রামকৃষ্ণ মঠ,

পোঃ বেলুড়, হাওড়া,

১৮।৯।১৬

স্নেহভাজনেষু—

প্র— তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু তার পর ৺পুরী যাত্রা করি, গত পরশু এসেছি।

ধ্যান কি কথার কথা? যার তার হবার নয়। জগৎশুদ্ধ লোকেরই ঐ কথা, কেউ ফুটে বলে ফেলে, কেউ বা চেপে রাখে মাত্র। ঠাকুরকে মনে মনে ডাক্‌বে, প্রার্থনা কর্‌বে ও আপনার ভেবে আব্দার কর্‌বে। সময়ে সব ঠিক হবে, ভাবনা নাই—তিনি পরম দয়াল। ঠাকুরের কথা "মন্ত্র নয়—মন তোর", যদি ভগবানে মন দিতে পার তাঁকে লাভ কর্‌বে।

দীক্ষা দরকার। একটা পথ ধরে গমন কর্‌তে হয়। দীক্ষা সেই পথ, গুরু ঐ পথপ্রদর্শক। গুরুকরণ আবশ্যক, ইহা শাস্ত্র বাক্য। শাস্ত্র মান্‌তে হয়, স্বাধীন চিন্তা করে সবাই ভুঁইফোড় হয় না। ব্যাকুলতাই এক মন্ত্র, ইহা মহা ভাগ্যের বিষয়, যার তার হয় না। ভারতে আছে, একলব্য নামে এক ভক্ত দ্রোণের মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ঐ একমাত্র একলব্যের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়। যাঁর নিকট হতে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা করেছ পুনঃ পুনঃ তাঁর কাছেই শিক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর। * * *

আমরা ভাল আছি, এখানকার আর আর সবই ভাল। দুর্ভিক্ষ প্রায় নাই। তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে এবং তোমার ভাইকে আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

(৩)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,

৩০।১০।১৬

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিঠি পড়লাম। ভগবানকে ডাক, তিনি তোমায় সত্যধারণায় ও সরল হবার শক্তি দেবেন। নিজেও চেষ্টা কর্‌তে হবে বাপধন। প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, তবেই ত সাড়া পাবে।

নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের দুষ্টামি ধর্‌তে চেষ্টা কর।

মন মুখ এক করা যদি ভালই বোধ হয়, তবে তার জন্য কি চেষ্টা করছ? আমি ঔষধ খেলে কি তোমার অসুখ সারবে? • • •

ব্যভিচার যদি মন্দ বলেই জান তবে উহা হতে রক্ষা হবার কি উপায় করেছ? দোষগুলো ধর আর প্রতিজ্ঞা কর, অনুতাপ কর যে ওপথে চলব না—ওদিকে কখনই যাব না। তবেই রক্ষা। কৃপা আকাশ থেকে আসে না। এই যে খেয়াল হচ্চে এরই নাম কৃপা। বিচার করে ধারণা কর। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

(৪)

বেলুড় মঠ,

১।১১।১৬

স্নেহাস্পদেষু

* * * সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে চেষ্টা করিও। তোমাদের জীবন যেন লোকের আদর্শ হয়। কেবল ভালবাসা আর কিছু নয়। তোমাদের দেখে জগৎ শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক। হীন স্বার্থপরতা যেন আমাদের দেহে প্রবেশ-পথ না পায়। * * ইতি—

তোমাদেরই

প্রেমানন্দ।

৺কাশীধাম।

৩।১।১৭

পরম স্নেহভাজনেষু

তোমার পত্র পেয়ে সকল অবগত হলাম। ঠাকুরের কথা পড়েছ ত?—"খানদানি চাষা" হতে হবে। এক বৎসর ধান ভাল হল না বলে যে হাল গরু বিক্রী করে বসে থাকতে হবে তার

মানে কি? লেগে থাক্‌তে হবে। ধ্যান জম্‌বে না বলে একেবারে হতাশ্বাস হওয়া ভক্তের লক্ষণ নয়। ভক্ত প্রভুকে সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, শান্তি অশান্তিতে সকল সময়েই ধরে থাকে।

"মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে" —একথা ঠাকুর বল্‌তেন। সেই জগদ্‌গুরুকে ধরে থাক্‌তে পার্‌লে তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দেন, তাঁহার পাদপদ্মে অনুরাগ, প্রেম প্রভৃতি দান করে থাকেন। অতএব যে সর্ব্বদা তাঁর স্মরণ মনন রাখে তার আর কিসের দরকার।

আশা করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। শ্রী হরি মহারাজ এখানে আলমোড়া থেকে এসেছেন। তাঁর শরীর এখন একটু অসুস্থ। একটু সার্‌লেই আমরা সকলে একত্রে মঠাভিমুখে রওনা হব। আমাদের শরীর এখন মন্দ নয়। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদাদি জান্‌বে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

প্রেমানন্দ।

(৬)

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।

৭।২।১৭

প্রিয়—

তোমার পত্র পড়্‌লাম। মানুষ সংসারের দাস সত্য, তবে 'শুদ্ধা বুদ্ধি দাও, প্রভু!' বলে প্রার্থনাও কর্‌তে হয়। যাই হক, কারু দোষ নেই। কে জানে তুমিই হয়ত একদিন ভাল হবে। খেল্‌চেন ভগবান্‌ মুখোস্‌ পরে। আমি তুমি সবাই সংস্কারের বশেই চলেছি। যাঁর সংসার তিনিই দেখ্‌বেন ও দেখ্‌ছেন।

'প্রভু! জগতে শান্তি দাও' এই আমাদের সর্ব্বদা প্রার্থনা।

"আমি জেনেছি শুনেছি আশয় পেয়েছি বুঝেছি তোমারই চাতুরী।
আমি ঐ খেদে খেদ করি, মা তারা, ঐ খেদে খেদ করি॥"

আমরা মঙ্গলময়ের হাতের খেলুড়ে মাত্র। গোবিন্দ ভরসা।

শুভানুধ্যায়ী
প্রেমানন্দ।

৭

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
২০।২।১৭

কল্যাণবরেষু—

দু— তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। তুমি এই মূর্খের লেখা পত্রখণ্ড মহাপণ্ডিত ভক্ত অ—বাবুকে দেখিয়েছ শুনে আমার সরম হচ্ছে। শ্রীযুক্ত হরি মহারাজের মুখে ভক্তবীর অ—বাবুর খুব সুখ্যাতি শুনলাম। জগতে ভক্তি বিশ্বাসই আসল ধন, আর সব ঐহিক ধন ঐশ্বর্য্য মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধাস্পদ অ—বাবুর দেহ কেমন আছে লিখো। ভগবান্ ভক্তদের সুস্থ রাখুন এই সতত প্রার্থনা।

তোমাদের হাইস্কুল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই হ—র মুখে শুনেছিলাম। বিদ্যালয়স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যা ও জ্ঞানদান যত পার করে যাও। ইহা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা ছিল। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ পুরুষ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন তাঁহারা মনুষ্যদেহধারী দেবতা। তাঁহারাই নিষ্কাম কর্ম্মী, তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক, তাঁহারাই ধন্য এ ধরায়।

একটা বিদ্যালয়, দু'চারটে সেবাশ্রমে হবে কি? ভগবৎকৃপায় ঠাকুরের নামে বিশ্বাস করে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা কর, সেবাশ্রম স্থাপন কর। প্রভুর কাজ প্রভুই করেন, এইটী সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। যেই 'আমি' 'আমার' উঁকি মারবে অমনি প্রভু পালাবেন। সব পণ্ড হয়ে যাবে। তাই বলি 'সাবধান, 'সাধু সাবধান। ঐ 'কাঁচা আমি' হতে সাবধান।

এই কাঁচা পচা 'আমি'টাকে যদি ঠাকুরের কৃপায় তাঁর উপর বিশ্বাস করে, প্রার্থনা করে একবার পাকিয়ে নিতে পার তবেই হবে কর্ম্মযোগী। তখন আর কর্ম্মে বন্ধন হবে না। দেখ্‌বে নিজে একটা যন্ত্রমাত্র—উপাধিরহিত। রোগ বড় শক্ত কিন্তু রোজাও খুব পোক্ত। রোজার নাম নিলেই রোগ পালায়। প্রাণ মন এক করে গাও' তাঁর গান—গাও প্রভুগুণগান। * * এই যে দেখ্‌চ বড় বড় লড়াই, ওর গোড়ায় 'আমি' 'আমার' বড়াই। "মৈ ভরোসে আপনে রামকো আউর কুচ নেহি কামকো"। রামের উপর ভরসা রেখে যা কর্‌বে তারই জয়। মানুষের উপর নির্ভর কর্‌লেই হয়ে যাবে ক্ষয়।

যদি বুঝে থাক, ঠাকুর কচ্ছেন ও করাচ্ছেন তবে আর কাহার ভয়। ভগবান্ ভক্তি দিন, শক্তি দিন তোমাদের, এই মাত্র প্রার্থনা। তোমরা সবাই আমার ভালবাসা জান্‌বে। * * * ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৬শে জানুয়ারী, ১২ই মাঘ, রবিবার বেলুড়স্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমদাচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামীর সপ্তপঞ্চাশং বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইবে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের বঙ্গে বস্ত্রবিতরণ কার্য্য চলিতেছে। মধ্যে বস্ত্রের মূল্য কথঞ্চিৎ সস্তা হওয়ায় আশা করা গিয়াছিল, হয় ত উক্ত বিতরণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। কিন্তু দুঃখের

বিষয় বস্ত্রের মূল্য পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মিশনের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন আসিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মিশন বস্ত্রবিতরণ কার্য্য স্থগিত না রাখা সঙ্গত স্থির করিয়াছেন। আমরা আশা করি, এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীর সেবায় সাধারণের সহানুভূতির অভাব হইবে না।

গত পৌষ সংখ্যায় যে বস্ত্রবিতরণবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিতরণের জন্য বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে ও তথায় বিতরণ কার্য্য চলিতেছে :—

গৌরনদী (বরিশাল) ২৯ জোড়া ; কলমা (ঢাকা) ২০ জোড়া ; পাংশা (ফরিদপুর) ২৫ জোড়া ; ইতনা (যশোহর) ৩১ জোড়া ; গড়বেতা (মেদিনীপুর) ১৫½ জোড়া ; শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মেদিনীপুর ৬২ জোড়া ; মালদহ ৩১ জোড়া ; বারুইপুর (২৪ পরগণা) ১১ জোড়া ; আঝাপুর (বর্দ্ধমান) ২০½ জোড়া ; দিঘীরপাড় (ঢাকা) ২০ জোড়া ; শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ) ৫০ জোড়া ; লোহজং (ঢাকা) ৩০ জোড়া ; চট্টগ্রাম ৩১ জোড়া ; মঠবাড়ী (খুলনা) ৩০ জোড়া ; সনপ (পাবনা) ৬০ জোড়া।

উল্লিখিত স্থানগুলিতে যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই বস্ত্রবিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই মিশন আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ভ্রম-সংশোধন।

গত পৌষ সংখ্যার উদ্বোধনে "স্বামী বিবেকানন্দের স্বাভিব্যক্তি" নামক প্রবন্ধে ৭১৭ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে "স্বামীজির অপর ভক্ত Miss Henrietta Muller এর অর্থে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়।" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইঁহার অর্থেই মঠস্থাপনা হয় নাই। স্বামীজির যে কয়েকজন পাশ্চাত্য ভক্ত উহাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম।

কর্ম্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য।

(জনৈক ব্রহ্মচারী।)

ন হি কশ্চিৎ, ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

আমরা প্রবল কর্ম্মপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মিয়াছি--আমাদিগকে কাজ করিতেই হইবে। কাজ না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্ম্মস্পৃহা বা কর্ম্মের বাসনা রহিয়াছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যায় ততদিন কাহারও বিশ্রাম নাই। আমাদের অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত বাসনাই আমাদিগকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, জন্মের পর জন্ম কাণে ধরিয়া ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, নাচাইতেছে—ইহাই আমাদের নিষেকাদিশ্মশানান্ত চেষ্টার প্রসূতি। ব্যষ্টি জীবনের ন্যায় সমষ্টি জীবনেও যাহা কিছু উদ্যম, যাহা কিছু আন্দোলন—Civilisation বল, Patriotism বল, Socialism বল, Militarism বল,—পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছে সকলের মূলে সেই বাসনা। তাই কবি গাহিয়াছেন—
"বাসনায় জগৎসৃজন।"

এই বাসনা কোথা হইতে আসিল? অভাববোধ—অপূর্ণতার বোধ হইতেই বাসনার সৃষ্টি। পূর্ণ যে সে আর কি প্রার্থনা করিবে? তাহার কোন অভাব বোধ নাই—কিছুই প্রার্থনীয় নাই সুতরাং কোন চেষ্টা বা কর্ম্মও নাই। অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্ম্মের সৃষ্টি, তখন যাহা কিছু আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা

কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি উদাসীন করে, তাহাই সৎকর্ম এবং তাহাই আমাদিগকে উদার করে। আর যাহা কিছু আমাদিগকে অপূর্ণতার দিকে লইয়া যায়—যাহা কিছু "আমি আমার" হইতে প্রসূত—যাহা কিছু অপরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদ্দেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ কর্ম্ম এবং তাহাই আমাদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" বাস্তবিক কর্ম্মরহস্য অতি জটিল। কিন্তু সদসৎ কর্ম্মের উপরোক্ত সংজ্ঞা মনে রাখিলে আমরা সহজেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি। আর আমরা উদার হইতেছি কি সঙ্কুচিত হইতেছি আমাদের নিজের মনই তাহার প্রধান সাক্ষী।

উপরে সদসৎভেদে কর্ম্মের দুইটী বিভাগ করা হইল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম জিনিসটা সৎও নহে অসৎও নহে—সদসৎ আমাদের মনে। একই কর্ম্ম উদ্দেশ্যভেদে প্রবৃত্তিভেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। হত্যা করা খারাপ কিন্তু ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিয়া অত বড় কুরুক্ষেত্র সমর করাইলেন, তাহা নিশ্চিতই খারাপ নহে। কারণ, অত্রি-শক্তির হস্ত হইতে সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষণরূপ তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান্ ছিল। সেইরূপ কর্ম্মের মধ্যে ছোট বড়ও নাই। যে জুতা সেলাই করিতেছে সে ছোট কাজ করিতেছে এবং যে চণ্ডীপাঠ করিতেছে সে বড় কাজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। উভয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। উহা যদি নিষ্কাম হয় তবে উভয়ই মহৎ। উভয়ই আমাদের ভববন্ধন ছেদন করিতে সহায়তা করিবে—উভয়ই আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। সকাম কর্ম্ম, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যতই বড় হউক না কেন, বন্ধন আনয়ন করে। অতএব কি কর্ম্ম করিতেছি—না করিতেছি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য না রাখিয়া কি ভাবে উহা করিতেছি তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি কার্য্যে, প্রতি কথাবার্ত্তায় আমাদের ভাবশুদ্ধ হওয়া চাই—আমাদের

আসক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—ইহাই কর্ম্মযোগ। এই ভাবশুদ্ধি-তেই মানুষে মানুষে প্রভেদ, মানুষে দেবতায় প্রভেদ, দেবতা ঈশ্বরে প্রভেদ। যাহার যত ভাবশুদ্ধ তিনি ততই ভগবানের নিকটবর্ত্তী, তাঁহার ভিতর দিয়া তিনি তত অধিকমাত্রায় প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহার ভাব পূর্ণমাত্রায় শুদ্ধ হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।

এই ভাবশুদ্ধি সাধন করিবার বিভিন্ন উপায় আছে। যাঁহাদের কর্ম্ম করিবার প্রবল উৎসাহ রহিয়াছে অথচ যাঁহারা ঈশ্বরে বা অপর বহিঃশক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারা নিজ মনকে অনাসক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। আর যাঁহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী, তাঁহারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাতে অর্পণ করিবেন, কারণ, সমস্তই ত তাঁহার। আপনাকে প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিশ্বাসে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতে হইবে। যাহা কিছু আমার বলিয়া মনে উঠিবে তখনই তাহা প্রিয়তমের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—

যৎ করোতি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

ইহ পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার—জীবন মরণের সাথী। আর যাহা কিছু,—সকলের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগকে 'আমার' ভাবিয়া দুঃখের সৃষ্টি করা নির্ব্বোধের কার্য্য। এইরূপে যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে আমরা সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, সকল অবস্থাতেই অচল অটল সুমেরুবৎ অবস্থান করিতে পারিব।

আর যাঁহারা জ্ঞানী—বিচারপথ অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নির্লেপ, সর্ব্বকার্য্যকারণাতীত আত্মার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই ভাবশুদ্ধির জন্য "বিপরীত দৃষ্টি" করিবেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন -

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যুক্ত ও সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। "দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিই কর্ম্মের আশ্রয় কিন্তু সেই দেহাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল আত্মাতে আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবিয়া থাকে যে 'আমি কর্ত্তা, আমার ইহা কর্ম্ম, আমি ইহার ফলভোগ করিব।' এই প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারনিবৃত্তি এবং সেই নিবৃত্তিজনিত সুখিত্বও আত্মাতে আরোপ করিয়া (ভ্রান্ত জীব) বোধ করিয়া থাকে যে, 'আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, এবং (নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রযুক্ত) আমি এক্ষণে সুখী' ইত্যাদি। সেই এই প্রকার স্বভাবাক্রান্ত সংসারের লোকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ 'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন।*"

পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামিজী এই কর্ম্মযোগ পথে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্ম্মী এবং প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভব করেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়াছেন—আত্মসংযম করিয়াছেন।" এই আত্মসংযম খুব কঠিন বলিয়া দুর্ব্বল মানব যাহাতে সহজে ঐ পথে চলিতে পারে, যাহাতে সহজেই কর্ম্মে আসক্ত হইয়া না পড়ে তজ্জন্য তাঁহার ঐশীজ্ঞানলব্ধ অমূল্য অভিজ্ঞতারাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের তুল্য আর ধর্ম্ম নাই। কিন্তু জগতের দুঃখ দূর করিব ইত্যাদি অভিমান থাকিলে কর্ম্মফলে

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কৃত অনুবাদ।

স্পৃহা আসিবেই আসিবে। তাই কর্ম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিবার সহজ উপায়, আমরা যে চক্ষে জগৎটা দেখি সেই দৃষ্টিটাই বদলাইয়া দেওয়া। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—এ জগৎটা একটী Moral gymnasium বা নৈতিক ব্যায়ামশালা। জগৎ জগৎই থাকিবে মধ্য হইতে আমরা ভাল হইয়া যাইব। ইহারও দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জগৎকে কুকুরের ল্যাজের সহিত তুলনা করিয়াছেন—উহা যেমন হাজার চেষ্টা করিলেও সোজা করিতে পারা যায় না, ছাড়িয়া দিলে যেমন বাঁকা তেমনই হইবে, সেইরূপ শত শত জন্ম ধরিয়া চেষ্টা করিলেও জগতের দুঃখ দারিদ্র্য, রোগ শোক, কিছুমাত্র দূর হইবে না—উহা বাতব্যাধির ন্যায় শরীরের একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র। তথাপি স্বামিজী বলিতেছেন, আমাদিগকে সর্ব্বদাই সৎকার্য্য করিতে হইবে—পরোপকার করিতে হইবে। কারণ, উহাতেই আমাদের পরম কল্যাণ।

এতদিন 'জীবে দয়া' কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল, কিন্তু স্বামিজী বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও দয়া করিতেছি" এ ভাবও ঠিক নহে, কারণ, দয়ার ভিতর ছোট বড় ভাব থাকে। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার কতটুকু শক্তি যে দয়া করিব! আমার দয়া করিবার অধিকার কি? যিনি এত বড় সংসার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি সৃষ্টি রক্ষার জন্য তোমার আমার মত লোকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। 'কোন দরিদ্রই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি। কারণ, সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে।' তোমার আমার জন্মিবার পূর্ব্বেও সৃষ্টি চলিয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিবে। সুতরাং আমাদের দয়া-করা-রূপ অভিমানের স্থান কোথায়? তাই তিনি বলিয়াছেন, "সেবা কর"। জীব তুচ্ছ দয়ার পাত্র নহে—জীব সাক্ষাৎ শিব। সেই বাক্যমনাতীত ভগবান্ তোমার সম্মুখে তোমার পূজা লইবার জন্য বহুরূপে বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাঁহার সেবা করিয়া—নরদেহে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হও। তাই তিনি

বলিয়াছেন, "তোমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব ইত্যাদি কিন্তু আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক।"

কর্ম জিনিসটী বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম হইতে বিরত হইলে চলিবে না। কর্মদ্বারাই আমাদিগকে কর্মের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। যেমন কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিতে হয়, সেইরূপ প্রথমে সৎকর্মরূপ কাঁটা দ্বারা অসৎ কর্মরূপ কাঁটা তুলিতে হইবে, পরে সৎকর্ম অসৎকর্মরূপ উভয় কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হইবে। কর্মের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কর্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্য অবস্থা লাভ হয় না। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে না, কিন্তু গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই থাকে।" তাঁহার মতে Struggle is life—চেষ্টাই জীবন। ভাল হইবার জন্য চেষ্টা কর, তাহাতে খারাপ হয় হউক—ভয় নাই—ফের চেষ্টা কর, ইহাই জীবন। তমঃ হইতে সত্ত্বে যাইবার ইহাই একমাত্র উপায়—আমাদিগকে রজোগুণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে। সংসারে তিন শ্রেণীর লোক আছে—তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। অধিকাংশ লোকই তামসিক ও রাজসিক। সাত্ত্বিক লোক নাই বলিলেই হয়। মুখের কথায় এই সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয় না—দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন। তবে ধীরে ধীরে তামসিক হইতে রাজসিক, রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। তাই স্বামিজী বলিতেছেন, "কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে—এ জগতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।"

কিন্তু আমরা এ অবস্থার মর্য্যাদা বুঝি না, আমাদের বুঝিবার শক্তিই বা কোথায়? আমরা অহঙ্কারবশতঃ মনে করি, আমাদের সাত্ত্বিক অবস্থা—আমাদের কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক এইরূপে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে—ভাবিতেছে—আমরা ভগবানের প্রিয়পাত্র, ভগবান্ ভক্তবৎসল, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবেন—আমাদের দেশের দুঃখদারিদ্র্য, রোগশোক দূর করিবেন। ভগবান্ ত আর ভক্ত চেনেন না—তাই আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে! নির্ব্বোধ আমরা নিজের চক্ষে ধূলি দিয়াছি, আবার ভগবানের চক্ষেও ধূলি দিতে চাহি! কিন্তু তিনি চক্ষুষ্মান্—তিনি উত্তম বৈদ্য। তিনি জানেন, কোন্ রোগের কি ঔষধ এবং তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতেছেন। কেন আজ সুজলা সুফলা ভারতভূমি করাল দুর্ভিক্ষ, রোগ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উজাড় হইতে চলিতেছে? কেন আজ গৃহে গৃহে হাহাকার, নিত্য নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে? ইউরোপ না হয় মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে—আমাদের দেশে ত মারামারি কাটাকাটি নাই—তবে আমাদের মৃত্যুর হার পৃথিবীর সমুদয় দেশ অপেক্ষা এত অধিক কেন? কেন এক দুর্ভিক্ষে, এক ম্যালেরিয়ায়, এক ইনফ্লুএনজায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ইউরোপীয় মহাসমর অভিনীত হইতেছে! কেন—তাহা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে! স্বামিজী বলিয়াছেন, আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দেশের কোটী কোটী দরিদ্র ও নারী জাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি— ইহাই আমাদের National sin (জাতীয় পাপ) এবং তাহারই প্রায়শ্চিত্ত সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপর দাসসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ও দুর্ব্বলতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে অন্ধ ও জড় করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি—নিজেরাই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছি। আমরা বুঝিয়াছি সংহতিই শক্তি—কোন একটা বড় কাজ, নূতন কাজ

করিতে গেলে দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা দরকার। ঐরূপ কাজও কয়েকটা আরম্ভ হইল—হাজার হাজার টাকাও সংগৃহীত হইল, কিন্তু দু'এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাহাদের সবগুলিই নষ্ট হইল! ইহার কারণ কি? পাশ্চাত্যের নিকট হইতেই আমরা এই Co-operation শিক্ষা করিয়াছি। কই, তাহাদের দেশে ত এরূপ হয় না। চুরি, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোর স্বার্থপরতা ইহার মূলে বিদ্যমান। দুই শতাব্দী বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত দোষেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এতদিনে আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু হায়, তাহাদের প্রত্যেক দোষটী আজও পূর্ণমাত্রায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে!

অতএব আমাদিগকে সযত্নে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে। আমাদিগকে আলস্য, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। সমস্ত দেশের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে সারা দেশ নিদ্রায় অচেতন। আমাদের স্বদেশহিতৈষণা, আমাদের কংগ্রেস, আমাদের হোমরুল এজিটেসন, সেই ঘুমের ঘোরে প্রলাপোক্তিমাত্র। বলিতেছি না আমাদের শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই—বলিতেছি না আমাদের সাহস নাই—আমাদের সবই আছে। কিন্তু আমরা সে শক্তি, সে বুদ্ধি, সে সাহসের ব্যবহার করিতেছি কই? বিনা ব্যবহারে উহাতে 'মর্চ্চে' পড়িয়া গিয়াছে, উহাদিগকে আবার ব্যবহার দ্বারা ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিতে হইবে। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই—সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্তসম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

আমাদের সম্মুখে যে অনন্ত কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের উপর যে গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের উপর কোনও কালে এরূপ গুরুভার ন্যস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রামকে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া যাইতেছে। গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিয়া দিলে, দুই চারিটা ড্রেণ কাটিয়া জল নিকাশের পথ

পরিষ্কার করিয়া দিলে এবং পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আট আনা কমিয়া যায়। আমরা অনেকেই ইহা বুঝি এবং এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেও প্রস্তুত আছি কিন্তু একটা গ্রামে গিয়া যথার্থ কাজ আরম্ভ করিতে রাজি নহি।—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

দেশের কোটী কোটী শ্রমজীবিসম্প্রদায় এক বিন্দু বৃষ্টির আশায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে—বৃষ্টি হইল না—শস্য শুকাইয়া গেল। ফলে কোটী কোটী নরনারী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। গোটাকতক খাল কাটিয়া দিলে হয়ত তাহাদের প্রাণরক্ষা হইত কিন্তু গ্রামবাসীর সে একতা, সে উদ্যম নাই। আমরা ইহার জন্য অপরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি—ইহাই কি আমাদের সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

গ্রামের মধ্যে যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা নিজের পুত্রকন্যাকে সহরে লইয়া গিয়া বিপুল অর্থব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছেন কিন্তু গ্রামের শত শত বালকবালিকা যে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে সে দিকে কাহারও খেয়াল নাই। পুত্রকন্যার অন্নপ্রাশনে, বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন করিলে যে পার্শ্ববর্ত্তী ১০।২০ খানি গ্রামের বালকবালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহা জানিয়াও কেহ তত‌টুকু স্বার্থত্যাগ করিতে রাজি নহেন। তাহাও অপরে করিবে তবে হইবে। নিজের ক্ষমতা থাকিতেও পরের মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সত্ত্বগুণের লক্ষণ?

তাই স্বামিজী বলিয়াছেন—"Feed the poor and educate the masses." ভারত অনাহারে মৃতপ্রায়, তাহাকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখ এবং শিক্ষা দাও। "Teach them through the ears and not through the eyes. If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must to the mountain" অর্থাৎ দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট আসিতে না পারে,

তুমি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাও এবং মুখে মুখে গল্প করিয়া, ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা ছবি দেখাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত কর। "Let these be your gods." হে দেশবাসি তোমরা কি কেহ সেই মহাপুরুষের কথায় কর্ণপাত করিবে না?

সন্ধ্যাবিধির দুইটি মন্ত্র।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ)

দেশ ও কালের যে ক্ষুদ্র অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমাদের মন সাধারণতঃ সেই ক্ষুদ্র অংশেই আবদ্ধ থাকে, আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাহিরে দেশ এবং কালের যে অসীম বিস্তার রহিয়াছে, তাহাও যে আমাদের অনুভূত দেশ এবং কালের ক্ষুদ্র অংশের ন্যায়ই সত্য, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যথেষ্ট নহে বলিয়া আমরা ঐ অসীম দেশ ও কালের ধারণা করিতে পারি না,—ইহা আমরা সচরাচর ভুলিয়া যাই। ইহার ফলে আমাদের অনুভূত দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ ঘটনাগুলিকে আমরা অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়া থাকি। যাহা ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর তাহাকে আমরা অতিশয় বৃহৎ বলিয়া কল্পনা করি, যাহা বিনশ্বর ও অত্যল্পকালস্থায়ী তাহাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া মনে করি। আমাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের হর্ষ বিষাদ,—বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জগৎব্যাপারের সহিত তুলনায় তাহারা কি ক্ষুদ্র! যাহা পরিমিত ও ক্ষণস্থায়ী আমরা সংসারে তাহার জন্যই ব্যাকুল হই, তাহা পাইলে মনে করি বিলক্ষণ সুখ হইল, তাহা না পাইলে মনে করি জীবন অসুখী হইয়া গেল, কিছুই পাইলাম না। কিন্তু সংসারের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমাদিগকে বেশী দিন সুখী করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাদের অভাবে আমাদের প্রকৃত দুঃখের কারণ নাই।

"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি",
—যাহা অসীম তাহাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

"যেহিসংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥"

সাংসারিক সুখ সকল "আদ্যন্তবান্", যে সুখ যখন ফুরাইয়া যায় তখন দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সকল তথাকথিত সুখের মোহে পড়িয়া আমরা যাহা প্রকৃত ও অনন্ত সুখলাভের হেতু তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকি।

এই সকল ক্ষুদ্র সুখের মোহ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় আমাদের মানসিক ক্ষেত্র (Mental horizon) উদারতর করা। আমাদের মানসিক ক্ষেত্র যত উদার হইবে—জগৎ ব্যাপারের যত অধিক অংশ আমাদের মনের গোচর হইবে, আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ততই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে, আমরা ততই সেই সকল সুখদুঃখের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক ক্ষেত্র উদারতর হয় এবং সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ ঘটে। আমরা ভূগোল পাঠ করিয়া জানিতে পারি আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে কত নদনদী সাগর পর্ব্বতসমম্বিত বিচিত্র দেশ রহিয়াছে, সেখানে কত কোটি কোটি লোক তাহাদের সুখদুঃখ লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতে পারি যুগে যুগে কত লোক পৃথিবীতে আসিতেছে এবং "দুদিনের হাসিকান্নার" পর পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যাবন্দনার দুইটি মন্ত্র আছে তাহারা আমাদের মানসিকক্ষেত্র বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করে। একটি মন্ত্রের দ্বারা কালের গণ্ডী এবং অপরটির দ্বারা দেশের গণ্ডী শিথিল হয়। দুইটি মন্ত্রই সন্ধ্যাবিধির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, কারণ তাহাদিগকে একাধিকবার আবৃত্তি করিতে হয়। প্রথম মন্ত্রটি এইরূপ—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্র্যজায়ত ততো সমুদ্রোঽর্ণবঃ

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত,
অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্যমিষতোঃ বশী
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং অথ স্বঃ॥

এই মন্ত্রে সৃষ্টি ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে কিছুই নাই—নিগুণ নিরাকার নিরুপাধি ব্রহ্ম রহিয়াছেন—তাঁহার প্রদীপ্ত ধ্যান হইতে সত্যের প্রকাশ হইল—রাত্রির সৃষ্টি হইল—সমুদ্রের সৃষ্টি হইল—সম্বৎসর হইল—সূর্য্য ও চন্দ্র হইল—স্বর্গ মর্ত্ত আকাশ সকলই আবির্ভূত হইল। এই মন্ত্রে অল্প কথায় বায়স্কোপের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায়—যুগযুগান্তব্যাপী ঘটনাবলির একটি চিত্র হৃদয়ে প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ,' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে এই সকল পদার্থ যেমন ছিল, বর্ত্তমান সৃষ্টিতেও সেইরূপ পদার্থসকল আবির্ভূত হইল। সুতরাং এই মন্ত্রে কালের যে পরিমাণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বর্ত্তমান সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে তাহার আরম্ভ। বাস্তবিক এখানে অনাদি কালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কালের স্রোত অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহমান, তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অনন্ত কালসাগরে আমাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য কোথায় হারাইয়া যায়!

দ্বিতীয় মন্ত্রটি এইরূপ—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহ ওঁ জন ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং
ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ
ওঁ আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।

বাস্তবিক ইহা সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরা এই তিনটি মন্ত্রের সমষ্টি। সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র। অতএব এই মন্ত্র দ্বারা আমাদের মন পৃথিবী লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বায়ুলোক, বরুণলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, প্রভৃতির মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বময় প্রসারিত হইবে। আমাদিগকে

ধ্যান করিতে হইবে—যিনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। এই ভাবে নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের যোগস্থাপন করিলে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সমগ্র জগৎব্যাপারের এক অংশ এবং অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ হইয়া পড়িবে।

এই দুইটি মন্ত্রদ্বারা আমরা অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব। অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিলে সংসারের পরিমিত ও "আদ্যন্তবান্" সুখদুঃখগুলি আমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাদের প্রতি আমাদের কোন আসক্তি থাকিবে না এবং সংসারের শোকদুঃখ ও তুচ্ছ ভোগাকাঙ্ক্ষার পরপারে যে অমৃতলোক অবস্থিত সেই অমৃতলোকের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার, বি, এল)

(৩০)

তত্ত্বসংখ্যা।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, তত্ত্বসংখ্যা নানাবিধ কেন ?

বিভিন্ন তত্ত্বসংখ্যার হেতু।

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥

ভগবান্ বুঝাইলেন, এক তত্ত্বে অপর তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কারণতত্ত্বে কার্য্যতত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট, কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্ব

অনুপ্রবিষ্ট। এজন্য তত্ত্বের বিভিন্ন সংখ্যা হয়। কেহ কারণতত্ত্ব বলিল। কারণে কার্য্য অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহা দ্বারা কার্য্যতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কার্য্যতত্ত্বগুলি বলিল। কার্য্যে কারণ অনুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহাদ্বারা কারণতত্ত্বও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভগবানের মতে তত্ত্ব আটাশটী।

তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

নয়টী কারণ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, পৃথ্বী তন্মাত্র।

এগারটী সূক্ষ্ম কার্য্য - শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, প্রাণ, জিহ্বা, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর উভয়াত্মক মন।

পাঁচটী স্থূল কার্য্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়।

(৩১)

পুরুষ প্রকৃতি।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, প্রকৃতি ছাড়া পুরুষের উপলব্ধি হয় না,—দেহ ছাড়া চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, চৈতন্য ছাড়া দেহের উপলব্ধি হয় না অতএব প্রকৃতি পুরুষ কি এক না ভিন্ন?

ভগবান্ বলিলেন,—প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু।

প্রকৃতি ত্রিবিধ।

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিদ্ধ্যতি।

চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, আর চক্ষুগোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের শরীরাংশে রূপ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অধিদৈব। প্রকাশকার্য্য এই তিনের সংযোগে সিদ্ধ হয়। অতএব প্রকৃতি অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব।

পুরুষ স্বপ্রকাশ।

স্বয়ানুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ।

পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশের দ্বারা নিখিল পরস্পরপ্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক।

(৩২)

জন্মমৃত্যু।

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন—জন্মমৃত্যু কি?

মৃত্যু।

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥

ভগবান্ বলিলেন, পূর্ব্বদেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু।

জন্ম।

জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন...বিষয়স্বীকৃতিম্॥

পুরুষের আপনার সহিত সম্পূর্ণ অভেদভাবে যে বিষয়স্বীকার বা দেহাভিমান তাহাই জন্ম।

জন্মমৃত্যু নাই।

যা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।

ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নিদারুসংস্থিতঃ॥

পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জন্মানও না বা মরেনও না কিন্তু ভ্রান্তি হেতু প্রতীতি হয় যেন জন্মান ও মরেন। মহাভূত রূপ অগ্নি আকাশে অবস্থিত হইলেও কাষ্ঠ সংযোগ ও বিয়োগে যেরূপ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় পুরুষের জন্মমৃত্যুও সেইরূপ।

আত্মার কর্ম্ম নাই।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।

চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ॥

......তথা সংসার আত্মনঃ॥

জল চঞ্চল হইলে তটস্থ প্রতিবিম্বিত বৃক্ষসকলও যেমন চঞ্চল বোধ হয়, চক্ষু ঘূর্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আত্মার সংসার বন্ধনও মনঃকল্পিত।

সংসার স্বপ্নে অনর্থাগম।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥

যেরূপ বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নে সর্পদংশনাদি নানা অনর্থ দর্শন হয় সেইরূপ বাস্তবিক বিষয় না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি হইতেছে না।

(৩৩)

তিরস্কার সহনের উপায়।

এক বৃদ্ধ ভিক্ষুককে লোকে অত্যন্ত পীড়া দিত। দুর্জ্জনেরা তাঁহাকে এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত করিত। কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কেবল মাঝে মাঝে একটী গান গাহিতেন—

জনস্ত হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

মানুষ যদি সুখ দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে কর্ত্তৃত্ব কি? সে কর্ত্তৃত্ব ভৌতিক দেহের—এক দেহ অপর এক দেহের সুখদুঃখ উৎপাদন করিতেছে। নিজ দন্ত দ্বারা যদি জিহ্বা দংশন করা যায়, তবে সেই বেদনার জন্য আবার কাহার উপর রাগ করিব?

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি সুখদুঃখের হেতু হয় তাহাতে আত্মার কি? কারণ, সুখদুঃখ উভয়ই দেবতার। মুখে হস্ত প্রদান করিলে মুখ যদি উহা দংশন করে, তাহা হইলে বাগাভিমানিনী দেবতা বহ্নি ও হস্তাভিমানিনী দেবতা ইন্দ্রই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু কে কাহার জন্য স্বদেহাভিমানী দেবতার উপর রাগ করিয়া থাকে

(৩৪)

দুঃখ সহ্য করিবার উপায় সাংখ্য।

সাংখ্য অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় চিন্তা করা।

সৃষ্টি।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ এক বিকল্পশূন্য ব্রহ্মে লীন ছিল।

তিনি মায়ার সহায়ে প্রকৃতি পুরুষ রূপে দ্বিধা হইলেন।

প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপিণী; পুরুষ জ্ঞানস্বরূপ।

প্রকৃতি হইতে তিন গুণ উৎপন্ন হইল।

তিন গুণ হইতে মহত্তত্ত্ব হইল।

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস, ও তামস।

সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্, বায়ু, অর্ক প্রভৃতি দেবগণ ও মনের সৃষ্টি হইল।

রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল।

তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইল।

তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূত হইল।

প্রলয়।

ভূমি জলে লয় হয়।	অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় হয়।
জল তেজে লয় হয়।	মহত্তত্ত্ব গুণে লয় হয়।
তেজ বায়ুতে লয় হয়।	গুণ প্রকৃতিতে লয় হয়।
বায়ু আকাশে লয় হয়।	প্রকৃতি কালে লয় হয়।
আকাশ তন্মাত্রে লয় হয়।	কাল জীবে লয় হয়।
তন্মাত্র অহঙ্কারে লয় হয়।	জীব আত্মায় লয় হয়।

সর্ব্বদা সৃষ্টি-প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য জন্মে ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে পারা যায়।

(৩৫)

গুণাতীত হইবার উপায়।

গুণোৎকর্ষ দ্বারা অবস্থা ভেদ।

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।

প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥

সত্ত্বগুণ দ্বারা জাগরণ অবস্থা, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণ দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থা হয়। তুরীয় অবস্থা এই তিন অবস্থাতেই বর্ত্তমান অথচ নির্ব্বিকার অর্থাৎ আত্মা-সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ।

কর্ম্ম।

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥

ভগবৎপ্রীতির জন্য দাসভাবে কৃত নিত্যকর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফল কামনা করিয়া কৃত কর্ম্ম রাজসিক এবং হিংসাবহুল কর্ম্ম তামসিক।

বাসস্থান।

বনন্তু সাত্ত্বিকং বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥

সাত্ত্বিক বাস বনে বাস। রাজসিক বাস গ্রামে বাস, তামসিক বাস যে স্থানে দ্যূতক্রীড়াদি হয় সেই স্থানে বাস কিন্তু ভগবৎনিকেতনে তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হেতু তথায় বাসই নির্গুণ বাস।

আহার।

পথ্যম্ পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

যে আহার্য্য হিতকর, শুদ্ধ ও অনায়াসলভ্য তাহাই সাত্ত্বিক আহার, যাহা ইন্দ্রিয়রোচক তাহা রাজসিক আহার, যাহা কষ্টদায়ক ও অশুদ্ধ তাহা তামসিক আহার, আর ভগবানকে নিবেদিত আহার্য্য মাত্রই নির্গুণ আহার।

রজঃ ও তমোনাশ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ।

মুনি সাত্ত্বিক পদার্থ সেবা দ্বারা রজঃ ও তমঃ নাশ করিবেন।

সত্ত্ব নাশ।

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।

শান্ত ও সংযত হইয়া নৈরপেক্ষ অর্থাৎ অনাসক্ত ভাব দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ সুখঃও জ্ঞানে আসক্তি নাশ করিবে। এইরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।

বৈদিক বিদুষী মৈত্রেয়ী।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।)

ভারতবর্ষ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এ দেশের জ্ঞানে, গুণে, শিল্পে ও সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া মহামতি মোক্ষমূলার বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে নৈসর্গিক শোভাসম্পদে, ধনরত্নে কোন্ দেশ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি বলিব ভারতবর্ষ।"

কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। পৃথিবীর কোন্ দেশে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী, ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল, সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-শৈব্যার ন্যায় সাধ্বী, ও পবননন্দন হনুমানের ন্যায় প্রভুভক্ত আছে? কোন্ মহাবীর কর্ণের ন্যায় স্বহস্তে স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া অভ্যাগত অতিথির সেবা করিতে পারিয়াছে? প্রজারঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের মত এ পৃথিবীর কে কবে পিতৃ-সত্যপালনার্থ রাজদণ্ড ত্যাগ করিয়া বল্কলবাসে বনবাসী হইয়াছেন? পৃথিবীর কোন্ দেশের রমণী দাহিরপত্নী ও রাজপুত রমণীর ন্যায় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীর কোন্ দেশের রমণী বৈধব্যাবস্থায় অশেষ কষ্ট ও উপেক্ষা সহ্য করিয়া আহারবিহার ও আচারঅনুষ্ঠানে কঠোর সংযম রক্ষা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করিতে পারে? বস্তুতঃ এদেশ জগতে অতুলনীয়।

এই ভারতেই মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ জন্মগ্রহণ করিয়া মধুর কাব্যসুধা-দানে দেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই দেশেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানালোকে ভারতগগন উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। এই দেশেই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,

চৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, কবীর, নানক, তুকারাম, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি অবতার ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। আবার এই দেশের গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, খনা, লীলাবতী, প্রভৃতি বিদুষী রমণীবৃন্দের পাণ্ডিত্যের ঝঙ্কারে একদিন শুধু এদেশ কেন সুদূর পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ও ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজর্ষি জনকের রাজধানী 'জনক-পুর' বিদ্বান্ ও বিদুষীদিগের সমাগমে মুখরিত ছিল। রাজর্ষি জনক বিদ্যানুশীলনের মহাপৃষ্ঠপোষক এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহচর ছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সমাদর জানিতেন এবং তৎকালীন প্রথা-মতে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব "মিত্র" তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য রমণী এই ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক মিত্রেরই দুহিতা।

যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেও অন্যান্য বেদদ্বয়েও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; তিনি এই তিন বেদেরই অধ্যাপনা করিতেন। ইহা ছাড়া ষড়বেদাঙ্গও তাঁহার টোলে অধীত হইত। কিন্তু প্রধানতঃ শুক্লযজুর্ব্বেদের অধ্যাপনাতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৈদিক গ্রন্থে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যাপনাগুণে নানা দিদেশ হইতে বহু ছাত্র বেদশিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার টোলে উপস্থিত হইত। তখন সমাগত ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়াই অধ্যাপকের রীতি ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাটীর অনতিদূরে মহর্ষি জনকের সাহায্য-প্রাপ্ত একটী প্রকাণ্ড ছাত্রাগার ছিল। ছাত্রেরা সেইখানে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের অভিভাবকত্বে বাস করিত। তিনি প্রতিদিন প্রত্যেক ছাত্রের কার্য্যকলাপ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নিরূপিত সময়ে তাহাদিগকে পড়াইতেন। বলা বাহুল্য, এখানে সকলেই ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র বংশোদ্ভবসকল প্রকার ছাত্রই থাকিত, তন্মধ্যে প্রাসাদবাসী রাজপুত্র হইতে সামান্য গৃহস্থের সন্তানও ছিল। ছাত্র হিসাবে

সকলকেই সমান ভাবে থাকিতে হইত—ধনী নির্ধন—রাজা প্রজা ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী সকলের পুত্রকেই সমানভাবে সুখদুঃখ সহ্য করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য করিতে হইত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একই প্রকার আহার করিতে হইত—একই প্রকার শয্যায় শয়ন করিতে হইত এবং একই প্রকার ব্যায়াম করিতে হইত। কেবল যাহারা যোদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা বেশী পরিমাণে শিখিত তাহাদের জন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রেরা জাতিভেদ কাহাকে বলে তাহা জানিত না। তাঁহারা একত্রে একপংক্তিতে পানভোজন করিত—বাগ্দেবীর মন্দিরে সকলেরই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান অধিকার ছিল।

মিত্র দুহিতা মৈত্রেয়ী জ্ঞানে, গুণে, সৌন্দর্য্যে গার্গী অপেক্ষা বিশেষ হীন ছিলেন না। অবশ্য গার্গী যেমন সহস্র সহস্র শ্রোতা ও দর্শকপরিবেষ্টিত সভাক্ষেত্রে যাইয়া বিদুষীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া অকুতোভয়ে গভীর জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে কূটতর্ক করিতেন মৈত্রেয়ী ততদুর পারিতেন না। তাহা হইলেও তিনি সমস্ত সভা-সমিতিতে গার্গীর অনুসরণ করিতেন। মৈত্রেয়ীর পিতা মিত্র, যাজ্ঞ-বল্ক্যের সহিত একযোগে একখানি নূতন যজুর্ব্বেদ প্রণয়নে প্রতিদিন একত্র সমবেত হইতেন। গার্গীর ন্যায় মৈত্রেয়ীও সেই স্থানে নিবিষ্ট মনে বসিয়া তাঁহাদের কূটতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিতেন।

একবার রাজর্ষি জনক একটী বিরাট সভার আয়োজন করিয়া তাহাতে দেশের সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সভার অনতিদূরে 'সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ' বিশিষ্ট এক সহস্র গো রাখা হইয়াছিল। রাজর্ষি সভায় উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি-লেন—"ভক্তিভাজন ব্রাহ্মণমণ্ডলি, আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞ) তিনি এই গোগুলি লইয়া যাউন।" সভায় অনেক বাণীর বরপুত্রের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু সকলেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া তাঁহার জনৈক শিষ্যকে গোগুলি তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তখন মাত্র ত্রিংশৎবর্ষীয় যুবা।

সেই সভায় অবশ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বৈশম্পায়নের প্রিয়শিষ্য তাহাতে বিন্দুমাত্র পরাজিত হন নাই। সভায় মৈত্রেয়ী ও তৎপিতা রাজসচিব মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্য দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

মৈত্রেয়ী অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। যৌবনের রূপ লাবণ্য মৈত্রেয়ীর অঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে, কিন্তু মৈত্রেয়ী জানেন না তিনি যুবতী কি বালিকা। মৈত্রেয়ী যথার্থ ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা জানেন, তাই তিনি পিপীলিকা হইতে বনের বৃক্ষটীকে পর্য্যন্ত ভালবাসেন। মৈত্রেয়ীর চক্ষু আছে, তিনি সেই চক্ষু দ্বারা সুন্দর কুৎসিত সমগ্র বস্তুই দর্শন করেন, কিন্তু সে দৃষ্টি কোন দিকেই আবদ্ধ হয় না। বহির্জগতের কোন বিষয়ই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মৈত্রেয়ী যেন ব্রহ্মচারিণী গার্গীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা।

মিত্র তাঁহার এই তত্ত্বজ্ঞানোন্মাদিনী কন্যাকে কাহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন সেই চিন্তাতেই অহর্নিশ ব্যাকুল। একবার জনকপুরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর যাজ্ঞবল্ক্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। একটা প্রকাণ্ডকায় শার্দ্দূল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ইহার কিছুই জানিতেন না। মিত্র তখন দুইজন ক্ষত্রিয় দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে রাজধানী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের আশু প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সশস্ত্র রক্ষীদ্বয়কে ব্যাঘ্রটীকে সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহাদের অব্যর্থ শরসন্ধানে ব্যাঘ্র নিহত হইল এবং যাজ্ঞবল্ক্যও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজর্ষি জনকের অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের অসামান্য জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাইয়া মৈত্রেয়ী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি হয় গার্গীর মত আমরণ ব্রহ্মচারিণী থাকিব, না হয় যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী হইব।"

কন্যার এই কথাতে পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ, যাজ্ঞবল্ক্য বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রাণরক্ষক, যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলে অবশ্য তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না—এ চিন্তাও মধ্যে মধ্যে মিত্রের মনে উপস্থিত হইত। কিন্তু মিত্র তত নীচপ্রকৃতির ছিলেন না—তিনি প্রত্যুপকারের আশা করিতেন না।

কাত্যের কন্যা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী। কাত্যায়নী গার্গী বা মৈত্রেয়ীর ন্যায় তত্বজ্ঞানপিপাসু না হইলেও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা ছিলেন। কি করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্বামীর চিত্তবিনোদন করিতে হয়—কিরূপে অতিথি অভ্যাগতকে কুশাসন, ভূমি, জল ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় কাত্যায়নী তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহার গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় এত গুণ থাকিলেও যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বদা একটা অভাব বোধ করিতেন—তিনি কাত্যায়নীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া সুখ পাইতেন না।

কাত্যায়নী প্রায়ই শিবিকারোহণে মৈত্রেয়ীর নিকট গমন করিতেন। এইরূপ আসা যাওয়ার ফলে দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বসূত্র আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। একদিন কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—তোমার বিবাহ যদি আমার বাড়ীর কাছে হয়, তাহা হইলে আমার জীবন বড় সুখে কাটিবে।

মৈত্রেয়ী—আমি যে বিবাহ করিব তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?

কাত্যায়নী—তুমিও অবিবাহিতা থাকিবে? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তুমি কি ব্রহ্মচারিণী থাকিতে ইচ্ছা কর? আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবনই ভাল বলিয়া মনে করি।

মৈত্রেয়ী—আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্য জীবন ছাড়া পৃথিবীতে আর কি কিছু করণীয় নাই?

কাত্যায়নী—যজ্ঞকার্য্যে সহায়তা, দেবতাদের পূজা, ব্রতপালন, উপবাস ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কি করণীয় আছে?

মৈত্রেয়ী—আমি তোমার কথায় মত দিতে পারিলাম না।

কেন, স্ত্রীলোকের কি আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করা একটা কর্ত্তব্য নহে?

কাত্যায়নী—হাঁ, আমি ইহা স্বীকার করি, কিন্তু গার্গী ভিন্ন কয়জন স্ত্রীলোক এরূপ আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন?. তাই বলিতেছি, আত্মজ্ঞান লাভ কেবল পুরুষদের সাজে।

মৈত্রেয়ী—আচ্ছা বল দেখি, আত্মা জিনিষটা কি শুধু পুরুষ মানুষেই আছে? আমরা কি আত্মা ছাড়া?

কাত্যায়নী এবার আর হাসি সংবরণ করিতে না পারিয়া সহাস্যে বলিলেন—"না—না—না। আত্মা মেয়েমানুষেও আছে। আত্মা না থাকিলে আমরা কিরূপে কথা বলি, চোখে দেখি, কানে শুনি এবং ভাল মন্দ বুঝিতে পারি?"

মৈত্রেয়ী—আচ্ছা বল দেখি, আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইহাদের উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে আছেন, না পুরুষে কিছু বেশী পরিমাণে আছেন?

হাসিতে হাসিতে কাত্যায়নী বলিলেন, আমি তোমার সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। আত্মা সকলের ভিতরেই সমান ভাবে আছেন। আত্মায় স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই।

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, এখন বুঝিলে ত আত্মা স্ত্রীপুরুষ সকলে সমানভাবে বিরাজিত। তবে কেন স্ত্রীজাতি পুরুষের ন্যায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে না? এই বলিয়া মৈত্রেয়ী দুঃখিতভাবে বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রীকে আমার নিকট আত্মজ্ঞান শিখিতে হয় ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

কাত্যায়নী—কি করিব, সংসার লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতে হয়, এ সব শিখিব কোন্ সময়ে?

মৈত্রেয়ী—শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সময় অবশ্য হয়। দেখ, পুরুষেরা সংসার পালনের জন্য দিবারাত্র অর্থচিন্তা করিয়াও মুক্তির কথা ভুলে না, আর আমরা স্ত্রীজাতি সাংসারিক কাজ শেষ হইলেই

আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করি। এর চেয়ে আত্ম-বিস্মৃতি আর কি হইতে পারে?

কাত্যায়নী—তোমার কথায় আজ আমার ধারণা হইল যে, আত্ম-জ্ঞান লাভ করা পুরুষ জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের যে কেবল গৃহকর্ম্মেই নিযুক্ত রাখে, এটা কি তাহাদের অন্যায় নহে?

মৈত্রেয়ী—অবশ্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার স্বামী তোমাকে এ সমস্ত বিষয়ও শিখাইয়াছেন।

কাত্যায়নী—হাঁ তাঁহার কোন দোষ নাই, আমিই তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহার কথা কাণে তুলি নাই।

মৈত্রেয়ী—তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। বহুজন্মের পুণ্যফলে এমন স্বামী পাইয়াছ।

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন পরিচারক শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মৈত্রেয়ীর শুভ-পরিণয় হইয়া গেল। সে সময়ে এইরূপ বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বপত্নী কাত্যায়নীর অনুমতি লইয়াছিলেন। কাত্যায়নী বলিয়াছিলেন,"মৈত্রেয়ীর ন্যায় সপত্নী পাইলে আমার সুখের অবধি থাকিবে না।" বিবাহের পর মৈত্রেয়ী স্বামীগৃহে যাইয়া পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মচিন্তা লইয়া কালাতিপাত করিতেন। কোন দিনও যুবতীজনসুলভ ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশে স্বামীর কায়িক সুখের অভিলাষিণী হন নাই। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নীদ্বয়কে লইয়া তপোগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার সহিত নানা প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইতেন। এইভাবে ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে যখন রাত্রি অধিক হইত, তখন যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নী শয়নাগারে চলিয়া যাইতেন, মৈত্রেয়ী

সেই তপোগৃহেই বসিয়া নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত ভগবৎধ্যানাদি করিতেন।

আমরা যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রকৃত স্বামী ও স্ত্রী-দ্বয়ের ধর্ম্মগুরুরূপে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি তিনি আপন সহধর্ম্মিণীদ্বয়কে ভোগের পথে না যাইয়া ত্যাগের পথে যাইতে শিক্ষা দিতেছেন। গৃহের বহির্ভাগে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র এবং গৃহাভ্যন্তরে মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী সহধর্ম্মিণী পাইয়া তিনি বড় সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাত্যায়নী সংসারধর্ম্মে দক্ষতা দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের গৃহস্থালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মালোচনার অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। মৈত্রেয়ী সেই অভাব পূরণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ীর কোন সন্তানসন্ততি হয় নাই। আর হইবেই বা কিরূপে? তিনি স্বামীর আত্মজ্ঞানের স্পৃহা আরও বলবতী করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন দিন তাঁহার ভোগাশা মিটাইবার ত সাধ করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য সংসারত্যাগকালে* মৈত্রেয়ীকে তাঁহার

[* অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ। তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহোঽহো। নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি। * * *

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

বৃহদারণ্যক, ৪, ৫।

সম্পত্তির অংশ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া নির্জ্জন বনে যাইয়া ভগবদারাধনা করিতে করিতে নিজের সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ও কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকর্ম্মনিপুণা ছিলেন। এই অবস্থায় যাজ্ঞবল্ক্য সংসরাশ্রম পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি এই স্থান (গার্হস্থ্যাশ্রম) হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া দিই।

তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, যদি আমার ধন দ্বারা পরিপূর্ণ এই সসাগরা পৃথিবী লাভ হয় তাহা হইলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না, না, খুব ধনী ব্যক্তির জীবন যেরূপ হয় তোমার জীবনও ঠিক সেইরূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের কোনই আশা নাই।"

এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্, যদ্দ্বারা কেবল অমৃতত্ব লাভ হয় এরূপ যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, কেহ কখনও পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না—পতির মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পতি এত প্রিয় বোধ হয়। কেহ কখনও পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না—পত্নীর মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই পত্নী এত প্রিয় বোধ হয়। এইরূপ যত কিছু দ্রব্য বল, তৎসমুদয়ের জন্য তাহারা প্রিয় বোধ হয় না—তাহাদের মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং সেই আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই সেই সমুদয় দ্রব্য এত প্রিয় বোধ হয়। প্রিয়ে, একমাত্র আত্মাই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান করিবার বস্তু। উঃ সঃ।]

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

বেলুড় মঠ।

১৩।৭।১৩

প্রিয়—,

সংসার স্বার্থপূর্ণ ইহা ধ্রুবসত্য, কিন্তু যখন সংসারেই থাকতে হবে তখন শুধু "সংসার স্বার্থপূর্ণ" ইত্যাদি বলে বৃথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। একবার ঐবাক্যের সত্যতা খুব ভাল করে চিন্তাযুক্তি সাহায্যে ধারণা করে নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। সংসার স্বার্থপূর্ণ থাকুক্ কিন্তু আমি যেন তাই বলে স্বার্থপর না হই, ইহাই উদ্দেশ্য। স্বার্থ না থাক্‌লে সংসার চল্‌বে কেন? সংসার যখন আছে তখন স্বার্থ থাকবেই, এটা যে একটা বেশী কিছু দোষের তা নয়; কারণ, ভগবান্‌ই সংসার সৃজন করেছেন এবং তাঁর মায়াতেই এই সমস্ত স্বার্থের সৃষ্টি। এখন কথা হচ্ছে যে, নিজেকে স্বার্থহীন হতে হবে। সংসারের দোষ না দেখে, নিজের কি দোষ তাই অগ্রে দেখ্‌তে হবে। পিতামাতার স্বার্থ থাক্‌বে না ত কি থাক্‌বে? তাঁরা তো আর অত নিঃস্বার্থ ভাব বুঝ্‌তে পারেন নাই; তাঁরা চিরকাল স্বার্থ চিন্তা করে এসেছেন, তাই এখনও স্বার্থ খুঁজ্‌ছেন—এতে তাঁদের যে বড় একটা দোষ আছে তা নয়। হোন্ তাঁরা স্বার্থপর—কিন্তু তাই বলে কি আমাদিগকেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ভক্তিহীন হতে হবে? তা যদি হই, তবে আমরা যে নিঃস্বার্থভাবের বড়াই কর্‌তে যাচ্ছি তার অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একজন স্বার্থপর বলে কি আমাকেও স্বার্থপর হয়ে উপযুক্ত সম্মান, ভক্তি, স্নেহ দেখাতে বিরত হতে হবে? এটা একেবারে ভুল। জগতে সমস্ত স্বার্থপরতা সহ্য করে আমাদিগকে স্বার্থগন্ধমাত্রহীন হতে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ। আদর্শ ঠিক থাকলে, মনে এই জোর থাক্‌লে, ধর্ম্মপথ হতে কেউ কাউকে বিচলিত কর্‌তে পারে না। ধর্ম্মের পথে মন প্রাণ দিয়ে অগ্রসর হন। পথে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আসে

মনে খুব জোর এনে সেগুলিকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করুন। আর দিনরাত প্রার্থনা করুন যে হৃদয়ে জোর—বল—তেজ পান। তেজ না থাক্‌লে কিছুই হবে না—এই তেজরূপ ব্রহ্ম হৃদয়ে না আস্‌লে সত্ত্বগুণ কখন আস্‌বে না। আর সত্ত্বগুণ না আস্‌লে ব্রহ্ম কখনও মনে প্রতি-ফলিত হবেন না। নিজেকে প্রথমে বিশ্বাস কর্ত্তে শিখ্‌তে হবে—এই মনে কর্‌তে হবে যে আমরা প্রভুর সন্তান, আমাদের মধ্যে দোষ, স্বার্থ কখনও আস্‌বে না; আস্‌বার চেষ্টা কর্‌লে তখনই মনে জোর এনে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। কর্ত্তব্য কার্য্য করে যান, আর ভগবানের দিকে মন প্রাণ ঢেলে দিন, ক্রমে ক্রমে তিনিই সব সুবিধা করে দেবেন। যদি আন্তরিক হয় তবে সব হয়ে যায়। ঠাকুরের এক একটা ভাব নিয়ে খুব চিন্তা করুন, তার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করে কার্য্যে পরিণত করুন। ঠাকুরের ভাবানুযায়ী কার্য্য করাই ঠাকুরকে মান্য করা, নতুবা শুধু দুটো ফুল ফেলে দিয়ে কিম্বা ভাবে দু মিনিট আহা-হা করে কেউ কখনও বড় হয় নি। ভক্তি খুব থাক্‌বে আর তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যেতে হবে, অথচ সমস্ত তন্ন তন্ন করে বিচার করে নিতে হবে। বুদ্ধিশক্তিকে পরিচালিত কর্‌তেই হবে নতুবা উপায় নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলেছিলেন, "ভক্ত হবি তো বোকা হ'ব কেন?" ইত্যাদি—ঠাকুরের কথাগুলিকে ধ্যান করে করে নিতে হবে। তবে ওর ভিতরের মানে জেগে উঠ্‌বে। অধিক কি, ভয় কিছুই নেই। হল না বলে হতাশ হতে নেই। অসীম ধৈর্য্য চাই, নতুবা এ পথের পথিক কেহই হতে পারে না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

(২)

মঠ, বেলুড়।

১৭।৫।১৪

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। কত লোক

কত দিকে চলিবে, সে সব দিকে কি দেখিতে আছে? "ঋজুকুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকোগম্য স্তমসি পয়সামর্ণব ইব।" কত লোককে কত প্রকারের পথ দিয়ে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন তিনিই জানেন, আমরা কি বুঝিব? আমরা এই World Theatre এ নানা লোকের acting দেখ্‌চি, এই আমাদের কার্য্য। তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে। তুমি অসঙ্কোচে এখানে আসিয়া যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পার। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

(৩)

বেলুড় মঠ।

৬।৭।১৫

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্র— গত কল্য রওনা হইয়াছে। সুধীর মহারাজের যাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিকট সবিশেষ শুনিবে। প্রাণ ভরিয়া ঠাকুরের পূজা সেবা কর। তাঁহার ধ্যানে, জপে ডুবিয়া যাও। তাহাতে যদি মন সমর্পণ না করিতে পার, তবে আর কাশী মক্কা গিয়া কি হইবে? মন দিয়া যদি ডাক তবে ঐখানে বসিয়াই পাইবে, মঠে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, Mission এর regular meeting কি হইতেছে? কাহারও সহিত বিবাদ বিরোধ না করিয়া সকলকেই ঠাকুরের সন্তান জানিয়া সকলকে পরম আত্মীয় ভাবিয়া ভালবাসিয়া চলিয়া যাও। সুখ্যাতি অখ্যাতির দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবে না। যদি কিছু থাকে তো দিয়া যাও, প্রতিদান চাহিও না—কাহারও নিকট কোন আশা করিও না। ভু বাবু অতি সুন্দর লোক। সবই সুন্দর, অতি সুন্দর। অসুন্দর কাহাকেও তো দেখি না।***প্রভুর লীলায় তোমাদের আদর্শ জীবন দেখাইবার জন্যই তোমাদের জন্ম এইটী মনে রাখিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৭।৭।১৫

কল্যাণবরেষু—

তোমার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। মনটাকে রেখে দাও শ্রীশ্রীগুরুর পাদপদ্মে। দেহটা যেখানেই থাকুক্ না কেন ভাবনা কি? "ধ্যান করবে মনে, বনে, কোণে"। লম্বা চওড়া কথা কণ্ঠস্থ করলেও কিছু হয় না, তীর্থে সাধু সঙ্গে পড়ে থাকলেও কিছু হয় না। চাই মন মুখ এক করা। ছি! ডুব্‌বে কেন? ওসব ভাব মনে আস্‌তে দিও না। কত জন্মের সুকৃতির বলে —র আশ্রয় পেয়েছ। তাঁর কৃপা পেলে কি মানুষ কখনও ডোবে? তুমি আবার কতজনকে তুল্‌বে, এই ধারণা দিবারাত্র হৃদয়ে পোষণ করবে। You are the chosen children of our Lord. নইলে—কৃপা করবেন কেন? Depression গুলো দূর করে দিবে। ভাব্‌বে—র কৃপায় আমরা নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ।

মিশনের regular meeting হচ্ছে শুনে আনন্দিত হলাম। পাঁচটা লোক যদি এক মন হয় তাহলে পৃথিবীর ভাবরাজ্য বদ্‌লে দিতে পারে। কতকগুলো লোক নিয়ে হৈ চৈ কল্লে হয় না। কিন্তু বিশ্বাসী, সৎসাহসী, নির্ভীক হৃদয়বান্ পাঁচ সাত জন থাক্‌লেই তোমাদের কাজ খুব উত্তমরূপে চল্‌বে। হও তোমরা সব একজন ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর। ভগবানের নামে খুব স্ফূর্ত্তি করবে। মনে কখনও হতাশ ভাব, অবিশ্বাস স্থান দিও না। লেগে যাও, লেগে যাও, খুব মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের কাজে লেগে যাও। অভিমান আস্‌বার সুযোগ দিও না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,

প্রেমানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৭।১১।১৫।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত বুধবার প্রয়াগ থেকে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছি। এখন মঠের সকলে ভাল আছে। তোমরা হৃষীকেশে অনেকগুলি জুটেছ—পাজন নষ্ট না হয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, এইটী বিশেষ নজর রাখ্‌বে। তোমরা সবাই সিদ্ধ হয়ে যাও, শ্রীশ্রীপ্রভুর ও পরম উদার স্বামিজীর নাম নেবার উপযুক্ত হও। তোমরা বঙ্গদেশের আদর্শত্যাগী এই ভাবে তোমাদের জীবন প্রস্তুত করতে হবেই হবে। কেবল পরের ঘাড়ে চড়ে তীর্থভ্রমণ, উত্তম ভোজন ও দুচারটী বচন ঝাড়্‌বার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। ঘোর তপস্যায় লেগে যাও, অভিমান ধ্বংস করে বস্তু লাভ করে তবে ফিরবে। ভারত—কেবল ভারত কেন, সারা ভুবন তোমাদের দেখে অবাক্ হবে, আচার্য্যের স্থানে বসাবে। তবেই তোমরা বেলুড় মঠের সাধুভক্ত। নতুবা পেটের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সাধু, হিন্দুস্থানে প্রচুর। হও পবিত্র, হও অকপট; আর প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর বলে। পরম দয়াল প্রভু বল দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অন্তর থেকে ডাক তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন। রা—প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে ও তুমি জান্‌বে। আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখ্‌তে—শেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎ মন বুদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা। হরি মহারাজের শরীর তত ভাল না থাকায় তারক দাদার সহিত ৺কাশীতে আছেন। তাঁহার সহিত অতি আনন্দে প্রভুর প্রসঙ্গে দিন কাট্‌তো। মহারাজ তাঁহাদের এখানে আন্‌বার জন্য চেষ্টা করবেন। শু—ঢাকায় এক অভিনব জাগরণ আনয়ন করেছে শুন্‌লাম। আহা! প্রভুর নামে লোক জাগুক,

নবজীবন-প্রাপ্ত হোক্, মোহ কেটে যাক্, আনন্দ লাভ করুক্—এই প্রেমানন্দের আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী,
প্রেমানন্দ।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

নারদ একসময়ে সত্য জানিবার নিমিত্ত সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এপর্য্যন্ত কি কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন ?" নারদ উত্তরে বলিলেন যে, তিনি সমুদয় বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তি হইতেছে না। পরে উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; ঐ প্রসঙ্গে সনৎকুমার বলিলেন—বেদ, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি যাহা কিছু বল, সমস্তই অপরা বিদ্যা,—সমুদয় বিজ্ঞান শাস্ত্রও অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যাহা দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান—তাহাই পরা বিদ্যা। এই ভাবটী সকল ধর্ম্মের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইহেতু ধর্ম্মই চিরকাল পরা বিদ্যার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞানের অধিকার আমাদের জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশেই সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা ধর্ম্ম দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা তৎপ্রচারিত সত্যের ন্যায় অনাদি অনন্ত—অসীম। এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতুই ধর্ম্ম অনেক সময়ে সমুদয় অপরা বিদ্যাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে; শুধুই তাহা নহে, অনেক সময়ে অপরা বিদ্যার সাহায্যে নিজ সত্যতা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, সারা পৃথিবী জুড়িয়া পরা বিদ্যা ও অপরা

বিদ্যার মধ্যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—পরা বিদ্যা অপরোক্ষানুভূতিরূপ অভ্রান্ত পথপ্রদর্শকের অধীনে চালিত বলিয়া অপরা বিদ্যার কথায় কর্ণপাত করিতে আদৌ রাজী নহে, আবার অপরা বিদ্যাও তীক্ষ্ণ যুক্তিবিচাররূপ ছুরিকা সহায়ে ধর্ম্ম যাহা কিছু উপস্থাপিত করিতেছে তাঁহাই কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতেছে। সকল দেশেই এই সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। ফলে, ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ বারম্বার পরাজিত ও উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে মানবীয় বিচার বুদ্ধিকে দেবতার আসনে বসাইয়া যে পূজা করা হইয়াছিল মানবেতিহাসে উহাই তাহার সর্ব্বপ্রথম পূজা নহে, ইহা অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র, তবে বর্ত্তমানে উহা বৃহত্তর আকার ধারণ করিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানসমূহ এক্ষণে শ্রেষ্ঠতর যুক্তি দ্বারা স্বীয় ভিত্তিকে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর করিয়াছে এবং ধর্ম্মসমূহ তদভাবে ক্রমশঃ ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে; আধুনিক লোকেরা প্রকাশ্যে যাহাই বলুন না কেন, অন্তরে অন্তরে জানেন যে 'বিশ্বাসের' যুগ চলিয়া গিয়াছে। কতকগুলি সংঘবদ্ধ পুরোহিত বলিতেছে বলিয়া অথবা অমুক পুস্তকে লেখা আছে বলিয়া কিম্বা লোকে পছন্দ করে বলিয়াই যে তাঁহাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে আধুনিক লোকের পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা তথাকথিত লৌকিক মতে বিশ্বাস করেন কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে তাঁহারা মোটেই চিন্তা করেন না। বিশ্বাস করা রূপ ব্যাপারটীকে "চিন্তাহীনতাপ্রসূত অনবধানতা" বলা যাইতে পারে। এইরূপ সংগ্রাম চলিতে থাকিলে অচিরেই যে সমস্ত ধর্ম্ম-মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় আছে কি? আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, অন্যান্য সমুদয় বিজ্ঞান যেরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মও সেইরূপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না? পদার্থবিজ্ঞান ও অন্যান্য বাহ্যজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে অনুসন্ধান প্রণালীর অনুসরণ করি, ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কি আমাদিগকে ঠিক

সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে? আমার মতে, ইহাই অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং যত শীঘ্র এরূপ করা হয় ততই মঙ্গল। যদি কোন ধর্ম্ম এরূপ অনুসন্ধানের ফলে বিনষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহা বরাবরই তুচ্ছ নিরর্থক কুসংস্কার মাত্র ছিল; আর এরূপ ধর্ম্ম যত শীঘ্র বিনষ্ট হয় ততই ভাল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার বিনাশই জগতের পক্ষে পরম কল্যাণকর। এরূপ অনুসন্ধানের ফলে, ধর্ম্মের যাহা কিছু হেয়, অকিঞ্চিৎকর তাহা অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে কিন্তু উহার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির সিদ্ধান্তগুলি যতটা বিজ্ঞানসম্মত উহা যে অন্ততঃ ততটা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, অধিকন্তু ইহা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইবে। কারণ, ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ আভ্যন্তরিক অনুভূতি—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতির সেরূপ কোন প্রমাণ নাই।

যাঁহারা ধর্ম্মের মধ্যে যুক্তি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, আমাদের মনে হয়, তাঁহারা নিজেরাই যেন নিজেদের মত খণ্ডন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খ্রীষ্টানগণ বলেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, কারণ, ইহা ভগবদ্বাণী এবং অমুকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দাবী করেন এবং ঠিক এই কথাই বলেন কিন্তু খ্রীষ্টান মুসলমানকে বলেন, তোমরা যে নীতি শিক্ষা দাও তাহা কোন কোন স্থলে ঠিক নহে; যেমন দেখ ভাই, তোমাদের কোরাণে বলে, বিধর্ম্মীকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা উচিত এবং সে যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে তবে তাহাকে হত্যা করা উচিত। আর যে মুসলমান এরূপ কাফেরের প্রাণবধ করিবে তাহার যতই পাপ বা দুষ্কৃতি থাকুক না কেন, নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে।" মুসলমান প্রত্যুত্তরে বলিবেন—"কোরাণে যখন ঐরূপ বলিতেছে তখন আমার পক্ষে ঐরূপ করাই ঠিক, উহা না করাই আমার পক্ষে পাপ।" খ্রীষ্টান বলেন—"কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ত এরূপ বলে না।" মুসলমান বলেন—"ওসব আমি—

জানি না। আমি তোমাদের শাস্ত্র মানি না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিতেছে—'সমুদয় বিধর্ম্মীকে বধ কর।' ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তুমি কি করিয়া জানিবে? নিশ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই সত্য—তোমাদের শাস্ত্র যে বলিতেছে 'হত্যা করিও না' তাহা ঠিক নহে। হে বন্ধুবর, তুমিও ঠিক এই কথাই বলিবে; তুমি বলিবে, জিহোবা ইহুদিদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছিলেন তাহাই কর্ত্তব্য এবং তিনি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাই অকর্ত্তব্য। আমিও সেইরূপ বলিতেছি, আল্লা কোরাণে বলিয়াছেন, এই এই কর্ম্ম করা উচিত, এই এই কর্ম্ম করা উচিত নহে এবং ইহাই সত্য মিথ্যার একমাত্র কষ্টিপাথর।" ইহাতেও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইয়া কোরাণের নীতির সহিত খ্রীষ্টের শৈলোপদেশের নীতির তুলনা করিবার জেদ করিয়া বসেন। ইহার মীমাংসা কিরূপে হইবে? শাস্ত্র দ্বারা কখনই হইতে পারে না—কারণ, শাস্ত্রসমূহই পরস্পর বিবদমান, তাহারা কি করিয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিবে? সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এমন একটা কিছু আছে যাহা এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অধিকতর সর্ব্বজনীন, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মনীতি হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যাহা বিভিন্ন জাতিসমূহের বোধিলব্ধ জ্ঞানের গভীরতার তুলনামূলক বিচার করিতে সমর্থ। আমরা ইহা নির্ভীকভাবে, স্পষ্টভাবে স্বীকার করি বা না করি, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এইখানে আমরা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, এই যুক্তিরূপ আলোক বোধিলব্ধ জ্ঞানসমূহের পরস্পর তুলনায় বিচার করিতে পারে কিনা; স্বীয় বিচারের মাপকাঠিতে ঈশ্বরাবতারগণেরও বিরোধের মীমাংসা করিতে সমর্থ কিনা, এবং ধর্ম্মের কোন রহস্য ইহার আদৌ বুঝিবার শক্তি আছে কিনা? যদি ইহার এই শক্তি না থাকে, তবে যুগ যুগ ধরিয়া শাস্ত্রসমূহের ও অবতারপ্রমুখ পুরুষগণের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা হইবার আর কোনই আশা নাই। কারণ, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা ও পরস্পর সম্পূর্ণ

বিরোধী,—তাহাদের মধ্যে নীতির কোন সুসমঞ্জস ধারণা নাই। ধর্ম্মের প্রমাণ মানুষের প্রাকৃতিক গঠনের সত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে —কোন পুস্তকের উপর নহে। এই পুস্তকসমূহ মানুষের মানসিক গঠন, স্বভাব চরিত্র ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ—ফলমাত্র। পুস্তকে মানুষ তৈয়ার করিয়াছে ইহা ত কেহ কখনও দেখে নাই। যুক্তিও সেইরূপ মানুষের প্রাকৃতিক গঠনরূপ সাধারণ কারণের একটী ফল এবং আমাদিগকে এই অন্তঃপ্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যুক্তি বলিতে কি বুঝি ? বর্ত্তমানকালে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে জিনিষটার অভাব আমি তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি অর্থাৎ লৌকিক বিদ্যার আবিষ্কৃত নিয়মাবলি ধর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা। যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ ঘটনা সামান্য ঘটনা দ্বারা এবং সামান্য ঘটনা অধিকতর সামান্য ঘটনা দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়, এইরূপে আমরা অবশেষে সর্ব্বজনীন ঘটনায় উপনীত হই। আমাদের নিয়মসম্বন্ধীয় ধারণার কথা ধরুন। কোন একটী ঘটনা ঘটিলে, যাই আমরা জানিতে পারি, ইহা অমুক নিয়মের ফল, অমনি আমরা সন্তুষ্ট হই ; এবং উহাকে ঐ ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া মনে করি। ঐ ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, যে একটী মাত্র ঘটনা দর্শনে আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম তাহা ঐ প্রকার বহু ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম এবং ইহাকেই আমরা নিয়ম বলি। একটী আপেল পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন চঞ্চল হইয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন, সমস্ত আপেলই পতিত হয় তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাকে মধ্যাকর্ষণ নাম দিলেন। মানবীয় জ্ঞানের ইহাই একমাত্র পন্থা। আমি পথে একটী প্রাণী, একটী মনুষ্যকে দেখিলাম এবং তাহাকে মনুষ্য সম্বন্ধীয় বৃহত্তর ধারণার সহিত তুলনা করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মানবজাতিরূপ সামান্য ভাবের সহিত তুলনা করিয়া আমি তাহাকে মনুষ্য বলিয়া ঠিক করিলাম। সুতরাং বিশেষ ঘটনা সামান্য ঘটনা দ্বারা, সামান্য ঘটনা বৃহত্তর সামান্য ঘটনা দ্বারা এবং অবশেষে সমস্তই আমাদের কল্পনার চরম সীমা 'সত্তা'রূপ সর্ব্বজনীন ভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে—

হইবে। সত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ভাব। আমরা সকলেই মনুষ্য অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই 'মানবজাতি' রূপ সামান্য ভাবের এক একটী অংশ বিশেষ। মনুষ্য, বিড়াল, কুক্কুর ইহারা সকলেই প্রাণী। এই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তগুলি 'প্রাণী'রূপ বৃহত্তর সামান্য ভাবের অংশ। মনুষ্য, বিড়াল, কুক্কুর, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ—সমস্তই ইহাপেক্ষা বৃহত্তর সামান্য ভাব 'প্রাণের' অন্তর্গত। আবার, জড় বল, চেতন বল সমস্তই 'সত্তা'রূপ সর্ব্বজনীন ভাবের অন্তর্গত; কারণ, আমরা সকলেই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ব্যাখ্যার অর্থ একমাত্র ইহাই যে, বিশেষ ঘটনাকে সামান্য ঘটনার অন্তর্ভুক্ত করা—তজ্জাতীয় আরও বহুসংখ্যক ঘটনা বাহির করা। আমাদের মনে যেন এইরূপ বহুবিধ সামান্যীকরণ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। উহা যেন অসংখ্য 'খোপে' পরিপূর্ণ, আর ঐ খোপগুলিতে এই সমস্ত ভাব 'থাক্' 'থাক্' করিয়া সাজান রহিয়াছে। যখনই আমরা কোন নূতন পদার্থ দর্শন করি, তখনই আমাদের মন ঐ খোপগুলির কোন একটার ভিতর হইতে উহার সমজাতীয় পদার্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যদি আমরা ঐ খোপটী বাহির করিতে পারি তবে ঐ নূতন পদার্থটীকে উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং বলি আমরা উহাকে জানিয়াছি। ইহাই 'জানা'র অর্থ—আর কিছুই নহে। আর ঐ খোপগুলিতে ঐরূপ কোন পদার্থ দেখিতে না পাইলেই আমরা অসন্তুষ্ট হই এবং যে পর্য্যন্ত না ঐ জাতীয় পদার্থের আর একটী খোপ খুঁজিয়া পাইতেছি সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। অবশ্য ঐ খোপ পূর্ব্ব হইতেই মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য আমি ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান জিনিষটা মোটামুটী এই শ্রেণীবিভাগ। শুধু ইহাই নহে, আরও কিছু আছে। জ্ঞানের আর একটী লক্ষণ এই যে, কোন পদার্থের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাইবে—বাহির হইতে নহে। এক সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত, একটা ঢিল ছুড়িলে উহা যে মাটিতে পড়ে তাহার কারণ ভূতে উহাকে টানিয়া নামাইয়া আনে। এইরূপ অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে লোকে ভূতুড়ে

কাণ্ড বলিয়া থাকে। ভূতে ঢিল টানিয়া নামায় এই প্রকার ব্যাখ্যা ঢিলের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না—উহা বাহির হইতে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণরূপ অপর ব্যাখ্যাটী ঢিলের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার—ঐ ব্যাখ্যা ঢিলের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই চেষ্টাটী আপনারা আধুনিক জড়জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন। এক কথায়, বিজ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝায় যে, পদার্থসমূহের ব্যাখ্যা তাহাদের নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে এবং জগৎব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য বহিঃস্থ কোন প্রাণী বা সত্তার প্রয়োজন নাই। রসায়নবিদ্ তাঁহার প্রক্রিয়া বুঝাইবার জন্য ভূত প্রেতাদি বা ঐরূপ কোন কিছুর দরকার বোধ করেন না। পদার্থবিদ্ তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ইহাদের কোনটীরই প্রয়োজন বোধ করেন না, অপর কোন বৈজ্ঞানিকও নহেন। আমি বিজ্ঞানের এই একটী লক্ষণ ধর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিতে চাই। সমুদয় ধর্ম্মগুলিতেই এই লক্ষণটীর অভাব দৃষ্ট হইতেছে এবং এই হেতুই তাহারা দ্রুত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই ভিতর হইতে—পদার্থসমূহের স্বস্বরূপ হইতে তাহাদের ব্যাখ্যা চাহিতেছে কিন্তু ধর্ম্মসকল তাহা দিতে পারিতেছে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক সগুণ ঈশ্বরের ধারণা চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনুকূল যুক্তিগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—কিরূপে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক ঈশ্বর—এক প্রপঞ্চাতীত দেবতার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন, যিনি স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং যাঁহাকে ধর্ম্ম ইহার শাসনকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এই সমস্ত যুক্তি সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে 'পরমকারুণিক' বলা হইয়াছে অথচ পৃথিবীতে এত বৈষম্য রহিয়াছে। দার্শনিক এই সমস্ত ব্যাপার আদৌ লক্ষ্য করেন না; তিনি বলেন, গোড়ায় গলদ হইয়াছে। এই জগতের কারণ কি? না, ইহার বাহিরের কোন কিছু—কোন প্রাণী, যিনি এই জগৎকে চালিত করিতেছেন! ঢিল পড়ার ব্যাখ্যাটীও যেমন অসম্পূর্ণ দেখা গিয়াছে, ইহাও সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার পক্ষে

অসম্পূর্ণ, এবং ধর্ম্মসমূহ ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা দিতে পারিতেছে না বলিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।

কোন পদার্থের ব্যাখ্যা তাহার নিজের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে, এই মতের সহিত আর একটী মত জড়িত রহিয়াছে এবং তাহা ইহারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—সেটী আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ। ক্রমবিকাশের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, কোন পদার্থের স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণের রূপান্তর মাত্র; কার্য্যের সমস্ত শক্তি কারণে বিদ্যমান ছিল; এই নিখিল প্রপঞ্চই অভিব্যক্ত- নূতন কিছু সৃষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের পুনঃপ্রকাশ—কেবল দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা পরিবর্ত্তিত মাত্র। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার চলিতেছে, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমাদিগকে সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইবে না, তাহারা ইহার মধ্যেই রহিয়াছে। বাহিরে কোন কারণানুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। ইহাও ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে. অর্থাঃ যে সকল ধর্ম্ম কেবল মাত্র সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী—ঈশ্বর একজন খুব বড় লোক, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে, এইরূপ বিশ্বাস করে—তাহারা আর টিকিতেছে না; তাহারা যেন সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃত মহাত্মা।

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র)

সন্ন্যাসিকুলতিলক ইয়েন-হোর খ্যাতি সুবিশাল চীন-সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য একখানি জীর্ণ পর্ণকুটিরে বল্কল পরিধান করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেন। গো-পরিচর্য্যাই তাঁহার প্রধান কর্ম্ম ছিল। লু প্রদেশের রাজা

তাঁহার সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছায় দূতহস্তে কতকগুলি উপ-ঢৌকন তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সকল অজ্ঞ ব্যক্তি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়াও তাঁহার আড়ম্বরশূন্য বেশভূষা দর্শনে তাঁহাকে অপর কোন ব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়! এই স্থানেই কি সন্ন্যাসী ইয়েন-হো বাস করেন?'

তিনি বলিলেন—'হাঁ, ইহা তাঁহারই বাসস্থান বটে—'

এই কথা শুনিবামাত্র উহারা উপহারগুলি তাঁহার নিকটেই প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ইয়েন-হো কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় আপনারা ভুল করিয়া আমাকে দিতেছেন। রাজা ইহা জানিতে পারিলে আপনাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনারা এগুলি লইয়া ফিরিয়া যান। পরে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ের সঠিক খবর লইয়া যথোচিত বিহিত করিবেন।" অনন্তর উহারা তাহাই করিল কিন্তু রাজার নিকট হইতে পুনরায় আজ্ঞা পাইয়া আবার যখন তাহারা সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন আর সাধুর দর্শন মিলিল না। এই সংবাদ শুনিয়া লু-রাজ বুঝিলেন, ইয়েন-হোর ন্যায় প্রকৃত ঋষি ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব সম্পদ্ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অনন্তর আপনার আচরণ স্মরণ করিয়া তিনি সন্তপ্তহৃদয়ে এই বলিয়া শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন—

"সেই জন্যই কথিত আছে, মোক্ষমার্গের পথিককে অধিকাংশ সময়ই আত্মোন্নতির চিন্তায় রত থাকিতে হয়, রাজ্যশাসন ও অন্যান্য কার্য্যপরিচালন পরের কথা। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, প্রথিতনামা নৃপতিমণ্ডলী ও সেনানায়কগণের অদ্ভুত সাহসিক কর্ম্মগুলি অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিগণের কর্ম্মের অতি নগণ্য অংশ মাত্র। মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকল্পে বা দেহরক্ষায় উহারা কোন কাজেই আসে না। কিন্তু অধুনা মূর্খ জননায়কগণ আপনাদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এই সকল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক যশের জন্য লোলুপ! ইহা বড়ই দুঃখের কথা বটে!

"কিন্তু ভাবিয়া দেখ, মহৎব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এরূপ বহু নির্ব্বোধ ব্যক্তি দেখিতে পাই যাহারা নামযশের আশায় সু-রাজের বহুমূল্য হীরকখণ্ড লাভের জন্য দূরস্থিত একটী ক্ষুদ্র পক্ষী গুলি করিয়া আপনাপন কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানের জন্য ব্যস্ত! জগৎ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসে। কেন?—কারণ তাহারা সার জিনিষের পরিবর্ত্তে অসার লইয়াই প্রমত্ত!"

বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—সাধুর কথা নৃপতি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই একবারমাত্র সাক্ষাৎকারের ফলেই তাঁহার জীবনে অদ্ভুত ভাবপরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনন্তর একদা ঋষিশ্রেষ্ঠ সু-উ-কি-উ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আহ্বান করা হয় নাই, তথাপি এই আকস্মিক আগমনের কারণ কি? রাজা বিস্মিত হইলেন—তবে কি কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার আবির্ভাব? আমার মদ্য ও মাংসের আশায় আসিয়াছেন কি?

"প্রভো! নির্জ্জন পর্ব্বত প্রদেশে বন্য ফলমূলে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনি এতদিন কালযাপন করিতেছিলেন—আমার ন্যায় হতভাগ্য অকিঞ্চনের চিন্তা কোন দিন আপনার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। এরূপ অবহেলার পর অকারণ এত কৃপার কারণ কি?

"রাজন্! অতি নীচ কুলে আমার জন্ম,—সুতরাং দেবভোগ্য মদ্যমাংস আহার করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি আপনার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্যই আসিয়াছি।"

"আপনার বাক্য সম্যক্ বুঝিতে দাস অসমর্থ—সমবেদনা করিবার কি আছে?"

"মহারাজের আত্মা ও দেহ উভয়ের অবস্থাই অতীব শোচনীয়।"

"অনুগ্রহ করিয়া খুলিয়া বলুন।"

তখন পরিব্রাজক বলিতে লাগিলেন—"জীবন ধারণের জন্য কি উচ্চ, কি নীচ সকল মনুষ্যেরই পুষ্টির প্রয়োজন। আপনি একটী বিশাল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, অসংখ্য প্রজার জীবনরক্ষার ভার ভগবান্ আপনার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনার সে দায়িত্ববোধ কোথায়? সামান্য ইন্দ্রিয়লালসার জন্য আপনি প্রজাকুলকে অমানুষিক নির্য্যাতন করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার অন্তরাত্মা কোন দিন এই গর্হিত কর্ম্মে সম্মতিদান করেন নাই। রাজন্! বিবেকবাণী অমান্য করিবেন না। উহা চিরদিন শান্তি ও সাম্যের জন্য উৎসুক—স্থির জানিবেন, চাঞ্চল্য ও কোলাহল ব্যাধিরই লক্ষণ। এতদ্দর্শনে আপনার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য আসিয়াছি—জগতে কেবল আপনিই কেন এত অযথা দুঃখ ভোগ করিবেন?"

"প্রভো! আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বহুদিবস হইতেই আমার বাসনা ছিল। আজ তাহা পূর্ণ হইল। আমি আমার প্রজাবর্গকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে চাই, উহাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি উৎপাদন করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয় আমি তাহারই একান্ত অভিলাষী। প্রভো! ইহা কিরূপে সম্ভব?"

"রাজন্! আপনার বর্ত্তমান কার্য্যাবলী ও ব্যবস্থার একান্ত অসন্তোষজনক। অধিককাল এইরূপ চলিলে ঈপ্সিতলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা আপাতমঙ্গলজনক ভাবিতেছেন, ভবিষ্যতে দেখিবেন উহাই বহুবিধ অমঙ্গল উৎপাদন করিবে। নানারূপ সৎকর্ম্ম ও প্রভূত দান অবশেষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে—কারণ জানিবেন, এই সকল সৎকর্ম্ম সত্বেও প্রজাদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অন্তর্নিহিত, হিংসা, দ্বেষ ও লালসা প্রভৃতি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুন কেবল অনর্থের সৃষ্টি করে। এইরূপে আন্তরিক বিদ্রোহ বাহ্যিক বিগ্রহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। মানবমনের সংস্কার আবশ্যক,—উহাদিগকে এমন শিক্ষা দান করিবেন যাহাতে উহারা পাশবিক প্রবৃত্তি দমন

করিয়া দেবভাবগুলির প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে। এই কঠিন কার্য্য সমাহিত না হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহের লোপ সম্ভবপর নহে। মানবমনকে প্রাচীনেরা প্রার্থনামন্দিররূপে বর্ণনা করিয়াছেন —সেই শান্তরসাস্পদ তপোবনকে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে পরিণত করিবেন না।

"মানবমনে ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক সকল ভাবগুলি নির্ম্মূল করা প্রয়োজন। অপরকে শঠতা, দুরভিসন্ধি বা যুদ্ধবিগ্রহের ফাঁদে ফেলা উচিত নহে। ধরুন,—আমি যুদ্ধনীতি অমান্য করিয়া একটী সমগ্র জাতির বিনাশ সাধন করিলাম এবং স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য সুবিশাল প্রদেশগুলি দখল করিয়া লইলাম তাহাতেই বা আমার জয়লাভের কি ফল হইল? ভগবানের কৃপায় যখন মানবজন্মলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তখন সমবেদনা করিতে শিখুন—নিজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দরিদ্রের দুঃখ-বার্ত্তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করুন—কখনও নিষ্ঠুর আচরণ করিবেন না। মহত্ত্ব আর কাহাকে বলে? আত্মসংযমই মহত্ত্ব। দেখিবেন, আপনার প্রজাবৃন্দ আর নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইবে না দেখিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে—তাহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ্য করিতে শিখিবে। তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ নিবৃত্তির বিলম্ব কোথায়?"

পরমাবস্থার কনফুশিয়স নৃপতি চু-কে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বদিক হইতে সমাগত নদীগুলিকে সমুদ্র কখনও পরিত্যাগ করে না, সেই কারণেই উহারা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদের বিশালতা আরও বাড়াইয়া তুলে। সেইরূপ প্রকৃত মহাপুরুষও জগতের সকলকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া লন। তাঁহার সৎপ্রভাব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর উপর পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। তিনি কোন বিশিষ্ট কুলজাত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন না, নিরুপাধিরূপেই জগৎ হইতে বিদায় লন। ইহাই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ। কুকুর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারিলেই আমরা তাহাকে ভাল কুকুর বলি না, সেইরূপ বেশী কথা বলিতে পারিলেই আমরা কাহাকেও সৎলোক বলি

না, মহৎ তো দূরের কথা। বড় কাজ করাই মহত্বের লক্ষণ নয়—উহা হইতে ধর্ম্মের সম্ভাবনা বড় কম।

"মহত্বে এই বিশ্বই অতুলনীয়। কিন্তু মহৎ হইবার জন্য উহা কি কিছু পাইবার আশা করে? মহৎ ব্যক্তি কখনও কোন লাভের আশা রাখেন না, তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, তিনি কাহাকেও অস্পৃশ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন না, বাহিরের দুঃখে তাঁহার মন কখনও বিচলিত হয় না। তাঁহার অফুরন্ত মানসিক শান্তি তিনি উপভোগ করেন,—স্বীয় উচ্চতম প্রকৃতিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, প্রকৃত মহত্বের ইহাই সার কথা।"

ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রহ্মশক্তি।

(শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

বেদান্তবেদ্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ব্রহ্মের শক্তিই জগদম্বিকা। ইঁহারা বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। অভিন্না প্রকৃতিই আদ্যা সনাতনী, তিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী—ত্রিগুণা। তাঁহার সত্তাতে জগতের সত্তা, তিনি অচিন্ত্যনীয়া; পরন্তু গুণাতীত ও দ্বন্দ্বাতীত বোধে তাঁহার উপলব্ধি হইতে পারে। এই ব্রহ্মময়ী সনাতনী শক্তি সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যতে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান যাবতীয় বস্তুরই শক্তি। যাবতীয় বস্তুর শক্তি বলিয়া তাঁহার নাম অখিলাত্মিকা। তিনি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা ও মহাস্মৃতি এবং বিদ্যারূপে জগত্তারিণী এবং অবিদ্যারূপে জগন্মোহিনী। তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অন্ত-

*আমেরিকার The Message of the East পত্রের 'The True Sage' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

নিহিত চৈতন্যময়ী শক্তি, বস্তুধর্ম্ম ও প্রকৃতি। বস্তুধর্ম্ম ও প্রকৃতি একার্থ-বাচক। পরব্রহ্ম আপনাতে গুণের আরোপ করিয়া সগুণে কল্পিত হইয়া স্বরূপে তুল্যশক্তি ও তুল্যগুণে এক হইয়াও বহুরূপে, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাসেশ্বরী রাধিকা, ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়া প্রকাশমান হয়েন। ইহাই প্রকৃতি। অগ্নির অন্তর্নিহিত (latent) শক্তি যেন অগ্নির বস্তুধর্ম্ম, অগ্নির দাহিকা শক্তি (manifested) যেন অগ্নির প্রকৃতি, সেইরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম এবং তাহাই ব্যক্তাকারে ব্রহ্মের প্রকৃতি। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রকৃতি অভেদ। প্রকৃতি দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা ব্রহ্মেরই কার্য্য—বিভিন্ন উপাধিতে, নাম ও রূপে প্রকাশমান্ মাত্র। এই প্রকৃতিই সগুণব্রহ্ম। পরব্রহ্ম সৃষ্টি বিস্তারের জন্য আপনাতে গুণের আরোপপূর্ব্বক সগুণে কল্পিত হইয়া বিভিন্ন নাম, রূপ ও উপাধিতে আবির্ভূত হয়েন। পরব্রহ্ম প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়া রজো-গুণাবলম্বনে ব্রহ্মা উপাধিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য্য, সত্ত্বগুণাবলম্বনে বিষ্ণু উপাধিতে জীবের পালনকার্য্য এবং তমোগুণাবলম্বনে শিব উপাধিতে অখিল ভূতের নাশ কার্য্য করেন। তিনি স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন, পালক হইয়া আপনাকে পালন এবং পরিশেষে সংহর্ত্তা হইয়া আপনাকেই সংহার করেন। অনন্ত সমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা,—ইহাই যেন ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব, আর সমুদ্রের যে বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই যেন ব্রহ্মের সগুণ ভাব। ব্রহ্মের প্রকৃতি পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টীকরণ দ্বারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। প্রলয়কালে পরমাণু-সমষ্টিরূপ-ব্রহ্মাণ্ড ব্যষ্টি-ভাব ধারণপূর্ব্বক সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া পুনরায় ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্মে বিলীন হয়। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম হইতে প্রকৃতির বিকাশ। পুং-বিকাশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পিতা এবং স্ত্রী-বিকাশ, হৈমবতী, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও রাসেশ্বরী রাধিকাকে মাতা বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রকৃতিই আপনার কার্য্য, আপনার লীলা আপনি করেন—আপনি দেখেন।

প্রকৃতি দ্বিবিধা,—জড়রূপা ও চিতিরূপা। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই দ্বিবিধা শক্তির সত্তা উপলব্ধি হয়। প্রকৃতি কুণ্ডলিনীরূপে জীবদেহে অবস্থান করেন। জীবদেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ড মধ্যে ৬টী যন্ত্র আছে। উহা ষট্‌পদ্ম বা ষট্‌চক্র নামে অভিহিত, (১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান—(৩) মণিপুর, (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধ ও (৬) আজ্ঞাচক্র। মূলাধারচক্র—পায়ু যন্ত্র—ক্ষিতিস্থান, যে স্থানে ক্ষয় হয় (ক্ষি ধাতু ক্ষয়ার্থ)। স্বাধিষ্ঠান চক্র—লিঙ্গমূলে, জলস্থান। মণিপুর চক্র – উদরে, তেজের স্থান, যেখানে অন্নাদি পরিপাক হয়। অনাহত চক্র—বক্ষে, বায়ুর স্থান। বিশুদ্ধ চক্র—কণ্ঠে, ব্যোমের স্থান। "ব্যোম্নি শব্দোঽভিব্যজ্যতে"—আকাশের গুণ শব্দ। সেইজন্য কণ্ঠ শব্দস্থান কণ্ঠে যাবতীয় বর্ণের উচ্চারণ হয়। পঞ্চচক্রের উপরে আজ্ঞাচক্র, নেত্রদ্বয়ের অন্তরালে তাঁহার অবস্থিতি—ইহা মনের স্থান।

"নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নং সুপ্তি হৃদম্বুজে চ"—পঞ্চদশী। জীবগণ যখন জাগরিত হয়, তখন নেত্র উন্মীলিত হয় এবং সংসারে ইচ্ছা জন্মে। ইচ্ছাশক্তি মনের। জীবগণ নিদ্রিত হইলে নেত্রদ্বয় মুদিত হইয়া যায়, কোনরূপ ইচ্ছাই থাকে না। এইরূপ নানা কারণে আজ্ঞাচক্র মনের স্থান অবধারিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্রের সর্ব্বোপরি মহাচক্র অবস্থান করে। মহাচক্র সহস্রার—ইহা ব্রহ্ম স্থান। এই স্থানে চিতিরূপা মহামায়া পরব্রহ্মের সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করেন। কেবল সহস্রারে নহে, মহামায়া কুলকুণ্ডলিনী আধারাদি সকল চক্রেই বিহার করেন। বিদ্যুদ্বর্ণা প্রসুপ্তভুজগাকারা কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা হইয়া আধারচক্রে অবস্থান করেন। যখন যে চক্রে বিহার করেন তখন সেই চক্রের ক্রিয়া হয়। আধার ও স্বাধিষ্ঠানে ত্যাগ ক্রিয়া। মণিপুরে ক্ষুৎপিপাসা। অনাহত চক্র বায়ুর স্থান বলিয়া ধারণ চালনাদি বায়ুক্রিয়া সকল সংসাধিত হয়।

"ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সংকোচঃ প্রসবস্তথা।
বায়োঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং ॥—জ্ঞানসঙ্কলিনী।

এই অনাহত পদ্মের অভ্যন্তরে একটী অবকাশ আছে, তাহাকে

দহরাকাশ বলে। তথায় পুরীতৎ নামক স্থানে জীবাত্মা বাস করেন। সুষুপ্তিকালে জীব বিবিধ চক্রে বিহার করিয়া যখন পরিক্লিষ্ট হন, তখন তথায় সুপ্ত হন। কুলকুণ্ডলিনীও স্বস্থান আধার পদ্মে প্রসুপ্ত ভুজগীর ন্যায় সুপ্ত থাকেন। সাধক হৃদিস্থ দীপকলিকাকার জীবকে কুলকুণ্ডলিনীর সাহায্যে ব্রহ্মস্থানে উপনীত করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ করেন। বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠপদ্মে কুণ্ডলিনী উপনীত হইলে ব্যোমের ক্রিয়া কেবল শব্দোচ্চারণাদি হয় তাহা নহে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জা ইহারাও পঞ্চ ব্যোমক্রিয়া।

"কামঃ ক্রোধস্তথা মোহো লজ্জা লোভশ্চপঞ্চমঃ।
নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষ্যতে ॥"—সঙ্কলিনী।

এখানে প্রকৃতি মাতৃকাসরস্বতীরূপে ষট্‌পদ্মে বর্ণাত্মিকা হইয়া বিরাজমানা। অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ তাহার কলেবর। আধার পদ্ম চতুর্দ্দল—তাহাতে ব, শ, ষ, স এই চারিবর্ণ। স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষড়্দল—তাহাতে ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টী বর্ণ। মণিপুর দশদল পদ্ম—তথায় ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটী বর্ণ ইত্যাদি। এই প্রবন্ধে ইহার সম্যক্ আলোচনা অনাবশ্যক।

এই চিন্ময়ী প্রকৃতি সর্ব্বজীবে বিষ্ণুমায়ারূপে, চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, নিদ্রারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে, ও ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন। তিনিই বাসনা—তিনিই আশা—তিনিই ভরসা। সৃষ্টিকালে তিনি তেজ, জল এবং অন্ন সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং গায়ত্রী হইয়া নির্ব্বিকারাংশ পরমব্যোমস্বরূপ পরমেশ্বর হন। সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট জলে তাঁহার শক্তিবীজ অর্পিত হইলে তন্মধ্য হইতে সর্ব্বপ্রথমে সহস্রসূর্য্যপ্রভাযুক্ত সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় একটী অণ্ডের উৎপত্তি হয়। পরে সেই অণ্ডের মধ্য হইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। পুনর্ব্বার ব্রহ্মা সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি-

পুরুষ দুই রূপ ধারণ করিলে তাহা হইতে বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই বিরাট্ পুরুষ হইতে এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার শরীরে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই রূপ কল্পিত হইবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের একত্র সংমিলন ব্যতীত জগতে জীবগণের উৎপত্তি নাই। ব্রহ্মশক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূল প্রকৃতি আপনাকে বিভাগ করিয়া বামাঙ্গে ভগবতী, দক্ষিণাঙ্গে শিবরূপে প্রকাশিত হন এবং পুনর্ব্বার সৎ চিৎ আনন্দে লয় প্রাপ্ত হন। ইহাই নিত্যা প্রকৃতি। এই নিত্যা প্রকৃতি এক রূপে সৃষ্টি স্থিতি লয় না করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী—ত্রিবিধ রূপ কল্পনাপূর্ব্বক এক এক রূপে এক এক কার্য্য সমাধা করেন।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, এম, বি)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন পুস্তক পাঠ কালে আমরা প্রত্যেক বাক্যের সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখি মাত্র এবং তাহা হইতেই সমস্তটা একরূপ বুঝিয়া লই। এই সম্বন্ধে দুই জন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ * যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে বলা যাইতেছে। ইঁহারা কতকগুলি সাধারণ কথা কাগজে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া বা ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন; যথা—"প্রবেশ নিষেধ", "চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা" ইত্যাদি। এই শব্দগুলি লিখিবার সময় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন কোন শব্দে কিছু বদলাইয়া, কোন কোন শব্দে মধ্যে মধ্যে অক্ষর

* Goldscheider and Muller.

বাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন। এই অশুদ্ধ পদগুলি একটী অন্ধকার ঘরে রাখা হইয়াছিল, এবং যাঁহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাঁহাদিগকে এই অশুদ্ধির কথা আদৌ জানান হয় নাই। অতঃপর এই পদগুলির উপরে বৈদ্যুতিক আলোক এত অল্প সময়ের জন্য ফেলা করা হইয়াছিল, যে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত অক্ষরগুলি কিছুতেই পাঠ করা যায় না। পরীক্ষকগণ একটী অক্ষর পাঠ করিবার জন্য কতক্ষণ আলোক ফেলা দরকার, দুইটী অক্ষরের জন্যই বা কত সময় আবশ্যক তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অক্ষরবিশিষ্ট পদসমূহ পাঠ করিতে কত সময় লাগিবে তাহার তালিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে যে পদটীতে ৩০।৪০টী অক্ষর আছে তাহার মাত্র ৮।১০টী অক্ষর পাঠ করিতে পারা যায় এরূপ সময়ের জন্য তাহাদের উপর আলোক ফেলা হইয়াছিল। ফলে দেখা গিয়াছিল যে, যাঁহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাঁহারা সাধারণতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে সমস্ত পদটী পড়িতে পারিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আর একটী শিক্ষাপ্রদ বিষয়ও লক্ষিত হইয়াছিল যে অক্ষরগুলি ইচ্ছা করিয়া অশুদ্ধভাবে লেখা হইয়াছিল পরীক্ষিত ব্যক্তিগণ সেইগুলির স্থানে শুদ্ধ অক্ষরগুলি দেখিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, যে অক্ষরগুলি ঐ বাক্য হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সেই অক্ষরগুলিও আলোকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছেন এরূপ কথাও বলিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরের যে সকল অনুভূতি গ্রহণ করিতেছি ঠিক তদনুরূপ জ্ঞানই যে আমাদের চিত্তে সর্ব্বদা বিকসিত হইতেছে তাহা নহে। আমাদের স্মৃতিশক্তি অতীতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। কোনরূপ অনুভূতি ইন্দ্রিয়সহায়ে আমাদের চিত্তে উপনীত হইলেই আমাদের স্মৃতিশক্তি উহাকে কোন কিছুর লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কোন্ অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই লক্ষণটী মিলে তাহা খুঁজিয়া

বাহির করিতে থাকে। এইরূপে আমাদের পূর্ব্বস্মৃতি যেন বাহিরের বস্তু হইয়া আমাদের নিকট চিত্ররূপে প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষিত ব্যক্তিগণ বাক্যস্থ পদগুলিকে দেখে নাই, এই স্মৃতিগুলিকেই দেখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি যখন কোন পুস্তক পড়া যায়, তখনও কতকটা এইরূপ হইয়া থাকে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে যে যথার্থ জিনিষটীকেই দেখি তাহা নহে; যথার্থ জিনিষের উপরে স্মৃতি দ্বারা সঞ্চিত কতকগুলি উপাদান বসাইয়া একরূপ নূতন মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাকেই দেখি। এই মূর্ত্তিগঠনকার্য্যে কতকগুলি কৌতূহলপ্রদ ব্যাপার লক্ষ্য করা হইয়াছে।

উল্লিখিত পরীক্ষকগণ আর এক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি অসাধারণ কথা শুদ্ধভাবে লিখিয়াছিলেন। এই কথাগুলি পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা এত অল্প সময়ের জন্য যে সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত কথাটা পড়া অসম্ভব। পরীক্ষার্থী যখন কথাটী বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন আর একটী লোক তাঁহার কাণে কাণে একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন কথা বলিল। ইহার পর যদি পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি দেখিলেন, তাহা হইলে তিনি এমন একটী কথা বলিবেন, যাহার সহিত লিখিত কথার মোটামুটি অনেকটা সাদৃশ্য আছে, এবং যে কথাটী তাঁহাকে কাণে কাণে বলা হইয়াছিল তাহার সহিত উহার অর্থের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বিষয়টী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। মনে করুন, লিখিত কথা ছিল 'Tumult' এবং তাঁহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল 'Railroad'। তাহাতে পরীক্ষার্থী বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'Tunnel' এই কথাটী পড়িয়াছিলেন। লিখিত কথা ছিল 'Trieste' (জার্ম্মান ঐতিহাসিকের নাম) এবং তাঁহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল 'Verzweiflung' (নৈরাশ্য-বাচক জার্ম্মান কথা)। তাহাতে পরীক্ষার্থী পড়িয়াছিলেন 'Trost',—এই জার্ম্মান কথাটীর অর্থ দুঃখে সহানুভূতি।

পরীক্ষার্থী Tumult কথাটীর যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই টুকুই ধরিয়া তাঁহার স্মৃতির মধ্যে ইহার সত্তা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কাণের নিকট Railroad এই কথাটী উচ্চারণ করাতে, তাঁহার মনে অজ্ঞাতসারে এই আশা জাগিয়া উঠিল যে, তাঁহার দৃষ্ট কথাটী এরূপ কোনও স্মৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে যাহার সহিত Railroad কথাটীর সাদৃশ্য আছে।

কাণে বলার ন্যায় নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারাও স্মৃতি বিচলিত হয় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজিকাল ল্যাবোরেটরীতে (Pathological Laboratory) একজন সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিরূপ পুস্তক লিখিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিতে পারেন কি?

যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি ডাক্তারী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চার অভ্যাস একেবারেই ছিল না। যাহা হউক তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ইঁহার 'ছিন্নমস্তা' বলিয়া বোধ হয় একখানি পুস্তক আছে।

সাহেব বলিলেন, উহার অর্থ কি?

ডাক্তার বলিলেন, "যাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হইয়াছে।"

সাহেব বলিলেন, "বুঝিয়াছি, মিষ্টার ঠাকুর লোমহর্ষণঘটনাপূর্ণ (Sensational) পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন।"

পরে জানা গিয়াছিল যে, বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু কোন হ্যাণ্ডবিলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র' পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলেন। প্যাথোলজিকাল ল্যাবরেটরীতে মৃত জীবজন্তুর শরীর ব্যবচ্ছেদকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় তথাকার ভাব (Association) সংস্পর্শে 'ছিন্নপত্র' সম্ভবতঃ 'ছিন্নমস্তা' হইয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য মতের ন্যায় হিন্দুদর্শন মতেও ইন্দ্রিয়বোধ তিন প্রকার মানসিক অবস্থার দ্বারা জ্ঞানভূমিতে উপনীত হয়। প্রথম মন—ইহা

ইন্দ্রিয়বোধের ছায়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বুদ্ধি—ইহাতে ঐ ছায়াটীকে নিশ্চয় করিয়া ধরিয়া লয়। তৃতীয় অহংকার—ইহাতে ঐ ছায়া অহং জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়। জীবের অতীত স্মৃতিগুলিই অহংজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া আমাদের স্মৃতিগুলিই আমাদের সকল জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যেই প্রধান অংশ অভিনয় করে। আমাদের সাধারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর স্মৃতির ছাপ পড়িয়া উৎপন্ন হয়। আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়া থাকে।

দার্শনিক বার্গসোঁ, যদিও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে স্মৃতির আরোপকে স্বপ্নরচনার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কেবল 'স্মৃতি' বলিলে ঠিক অর্থবোধ হয় না। বরং 'সংস্কার' বলিলে অনেকটা ঠিক বলা হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা যেমন সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে যন্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই সকল সঞ্চিত সংস্কার উহাদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সেই সংস্কার বশে আমরা দৃষ্টবস্তু সম্পূর্ণ না দেখিয়াই অথবা শ্রুত বিষয় সম্পূর্ণ না শুনিয়াই তাহার একটা ধারণা করিতে পারি। অবশ্য সাধারণ জাগ্রৎ জ্ঞান এবং স্বপ্নে অনেক প্রভেদ আছে। জাগ্রদবস্থায় যে সব স্মৃতি উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালীন অবস্থা, প্রয়োজন, ক্রিয়া ইত্যাদি আবেষ্টনী (environment) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নে বহির্জগতের কোন বন্ধনই নাই। তখন ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে কোন একটা স্মৃতি আপনার সহিত জুড়িয়া দিল, কিন্তু ঠিক মিল হইল না দেখিয়া আরও পাঁচটা স্মৃতি দৌড়াইয়া আসিল। এইরূপ অনেক স্মৃতি জুটিয়া ভূতের নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার উপর আমাদের মনের উন্নতি শক্তি, বিবেচনা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সজাগ হইয়া গোল থামাইবার চেষ্টা করিয়া আরও গোলমাল বাড়াইয়া দিতে লাগিল, কিম্বা নিজের সন্তোষের জন্য এই সব গোলমালের এক অপরূপ ব্যাখ্যা সৃষ্টি করিল। এই সকল কারণেই স্বপ্ন অসংলগ্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্বপ্নে যে সকল স্মৃতি

দৃশ্যের আকার ধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই সাধারণ স্মৃতি অপেক্ষা আমাদিগের অহংকারের সহিত একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধটী অনেক স্থলে এত নিগূঢ় যে আমরা উহাকে সাধারণ জ্ঞান দ্বারা ধরিতে পারি না। আবার এই নিগূঢ় সম্বন্ধযুক্ত স্মৃতিগুলি যখন স্বপ্নাবস্থায় আসে তখন তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়া আসে যে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের যে কোন গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। ইহা আমরা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনায় ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

স্বপ্নে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয়, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়প্রসূত। কথাটী সাধারণ ভাবে সত্য হইলেও যে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য তাহা বোধ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন,—"তুমি যে কোন জড় বিজ্ঞান লও না কেন, তাহাতে যতই অগ্রসর হইবে, দেখিবে ইহা ক্রমশঃ জড় হইতে অজড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।"* চক্ষুর সম্মুখে যে বর্ণচিত্র দেখার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে—যাহা অনেক পণ্ডিতের মতে স্বপ্নের উপাদান—তাহারই অনুরূপ চিত্র হইতে আবার ব্যক্তি বিশেষে স্ফটিক দৃষ্টি (crystal vision) উৎপন্ন হয়। স্ফটিক দৃষ্টি আমাদের দেশে নখদর্পণ প্রভৃতির দ্বারা প্রচলিত আছে। এই স্ফটিকদৃষ্টি পুরাকাল হইতে অনেক দেশে প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এতকাল ইহা একপ্রকার কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। জড়বাদের ভিতর দিয়া তাঁহারা ইহার কোনও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। ইহা দূরদৃষ্টির মতন অজড় রাজ্যের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্ফটিক দৃষ্টি কাহাকে বলে? একটা স্বচ্ছ স্ফটিক বা একগ্লাস জল, কিম্বা আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে এমন কোন উজ্জ্বল দ্রব্যের

* The Science and Philosophy of Religion.

দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, যাহাদের স্ফটিক দৃষ্টির ক্ষমতা আছে তাঁহারা নানারূপ স্বপ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পায়। এইগুলি স্বপ্নের ছবির মতন বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, আবার মিলাইয়া যায়। ইহাদের অনেক দৃশ্য কল্পনাপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। আবার কতকগুলি ঘটনার জাগতিক ঘটনার সহিত এরূপ আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে দর্শকের দূরদৃষ্টির ক্ষমতা সূচিত হয়।

মিসেস্ ডি— নামক এক পাদরী মহিলার এই স্ফটিক দৃষ্টি আছে জানিয়া প্রফেসর হিস্‌লপ মনস্তত্ত্ব সভার পক্ষ হইতে ইঁহাকে পরীক্ষা করেন। মিসেস্ ডি—স্ফটিক দৃষ্টির সময় বড়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিতেন। প্রফেসর হিস্‌লপ কিছুদিন ধরিয়া মিসেস্ ডি—স্ফটিক দৃষ্টিতে কি কি দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসেস্ ডি—র একদিনের স্ফটিক দৃষ্টির দৃশ্য উল্লেখ করা যাইতেছে।*

(১) একটী তুষার শৈল (Iceberg) জলে ভাসিতেছে।

(২) একটী পাহাড়ের উপর হইতে একজন লোক মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছে।

(৩) বালিসে মাথা রাখিয়া একজন হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছে, কেবল তাহার মাথাটী দেখা যাইতেছে।

(৪) মিসেস্ ডি—র মাতার মুখ।

(৫) একটী স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানের সহিত ঘুমাইতেছে। তাহাদের গলা পর্য্যন্ত চাদরে ঢাকা।

(৬) মিসেস্ ডি—র একজন বন্ধু যে বাড়ীতে ছিলেন, সেইরূপ একটী বাড়ী। কিন্তু বাড়ীর লোকদের চেহারা মিসেস্ ডি—র অপরিচিত।

(৭) একটী গোরস্থান। এই গোরস্থানের প্রবেশ দ্বারটী মিসেস্

* Enigmas of Psychical Research—by Professor James H Hyslop.

ডি—র পিত্রালয়ের নিকটস্থ একটী পরিচিত গোরস্থানের মত, কিন্তু ইহার ভিতরটী তাহা হইতে অনেক পৃথক। ইহাতে অনেক নূতন কবর ও মনুমেণ্ট রহিয়াছে, যাহা মিসেস্ ডি—র পরিচিত কবরে ছিল না। মিসেস্ ডি—র পিত্রালয় ওহিও (Ohio) নগরে অবস্থিত ছিল।

এই দৃশ্যটী দূরদৃষ্টিমূলক। মিসেস্ ডি— তাঁহার বাড়ীর নিকটস্থ যে কবর স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহাতে যথার্থ ই তিনি যেমন দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ নূতন কবর এবং নূতন মনুমেণ্টাদি স্থাপন করা হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনাদি মিসেস্ ডি— তাঁহার পিত্রালয় হইতে চলিয়া আসিবার পর হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ইহার বিষয় কিছুই জানিতেন না। সেই সময় তাঁহাদের বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতা পীড়িত ছিলেন। মিসেস ডি—র ভগিনী তাঁহাদের ভ্রাতা বাঁচিবেন না মনে করিয়া তাঁহাদের নিজের বংশগত কবরস্থান ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় ভ্রাতার মৃত্যুর পর এই কবরে সমাহিত করিবার কথা মনে করিতেছিলেন।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে স্ফটিক দৃষ্টির সম্বন্ধে কতকটা আভাস দেওয়া গেল। এই বিষয়টী বিশেষ কৌতূহলকর হইলেও ইহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে বলিয়া এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব।

গত ৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, সন ১৩২৫, বেলুড়স্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর জন্মতিথিপূজা ও ১২ই মাঘ, রবিবার তদুপলক্ষে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই দিবসই স্বামিজীর তৈলচিত্র লতাপুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া মঠপ্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তিটী ভক্তগণ কর্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া ভক্তগণের চিত্তাকর্ষণ করিতেছিল। তিথিপূজার দিন দিবাভাগে স্বামিজীর পূজা ও ভোগরাগ এবং রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ পূজাঅর্চ্চা, ভজন ও হোমাদির অনুষ্ঠান হয়। পূজা ও হোমান্তে শুভ-ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কয়েকজন যুবক আজীবনব্রহ্মচর্য্য পালনরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামিজী ইহার অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং বলিতেন, ভারতের উন্নতির জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাঁহার বার্ত্তা বহন করিয়া জড়ে জীবন সঞ্চার করুন, ইহাই ভগবৎ সমীপে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পরবর্ত্তী রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতে ভক্ত এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সমাগম হইতে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৭।৮ সহস্র ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমস্ত দিন ভজন ও ভগবানের নাম গানে মঠে আনন্দধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ ও ভক্তবৃন্দ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মাল্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স্বামিজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাতঃকাল ভক্তগণ কর্ত্তৃক ভজন ও পূজাদিতে অতিবাহিত হয়। মধ্যাহ্নে দুই সহস্রেরও অধিক দরিদ্র নারায়ণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। বৈকালে 'ব্রহ্ম শ্রীবশিষ্ঠ ভারতী মনোজ্ঞ এবং হৃদয়স্পর্শী ভাষায় 'ভক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আযার, বি, এ, বি, এল, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় স্বামিজীর উপদেশাবলীকে (১) আত্মবিশ্বাস, (২) সৎসাহস, (৩) কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং (৪) সেবাধর্ম্ম, এই চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া সরল কথায় উহাদের প্রত্যেকটী সকলকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। অতঃপর ধর্ম্মপুরীর সদাশয় ডেপুটী কলেক্টর মাণ্ডবর শ্রীযুক্ত এন্, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার "স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যগঠনকারী উপদেশ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত জনসমূহকে প্রসাদ বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। বেলা ৩টার সময় সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বৃহৎ হলটী শ্রোতৃবৃন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলীর' অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রনাথ নন্দী বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তৎসঙ্গে সোসাইটীর এবং আহূত সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলে মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর সোসাইটীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র

দত্ত মহাশয় সোসাইটীর গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর মাননীয় সভাপতি মহাশয় স্বামিজী-প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে প্রফেসর শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয় ইংরাজীতে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বামিজী সম্বন্ধে দুইটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধদ্বয়ে স্বামিজীর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হওয়ায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজ বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সভার ভার অর্পণপূর্ব্বক কার্য্যান্তরে গমন করেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহারাজ বাহাদুরকে সোসাইটীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, আলোয়ারের সর্দ্দার মুন্সী জগমোহনলাল (হিন্দীতে), শ্রীযুক্ত জলধর সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ রাজা মিয়া স্বামিজীর বহুমুখী প্রতিভার নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুই চারিটী কথা বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সভাভঙ্গ হয়। তখন রাত্রি ৭॥টা।

সভার কার্য্য দীর্ঘ চারি ঘণ্টা ব্যাপী হইলেও শ্রোতৃবৃন্দের ঔৎসুক্যের হ্রাস হয় নাই। ইহা তাঁহাদের স্বামিজীর প্রতি বিশেষ অনুরাগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

লাহোর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামিজীর জন্মতিথিপূজা ও উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জন্মতিথির দিবস দরিদ্রনারায়ণগণকে ভোজন করান হয়। ২৬শে জানুয়ারী উৎসব দিবসে ভাই নন্দগোপালের মন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের বাৎসরিক রিপোর্ট

পাঠ করা হইলে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ নেরাঙ্গ; শ্রীযুক্ত নানকচাঁদ, বার-এট্-ল, দয়াল সিংহ কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস, সি, রায়, এবং উপস্থিত অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীতাদিও উৎসবের একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল।

উক্ত সেবাশ্রমটী ইং ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে, স্বামী সেবানন্দের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে। মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় স্বামী বিবেকানন্দের উদার শিক্ষা এবং সেবাধর্ম্মের প্রচারই উহার উদ্দেশ্য। সেইজন্য সেবাশ্রম হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। নানাবিধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিত সেবানুষ্ঠানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা; দরিদ্র ব্যক্তিগণের বাড়ী যাইয়া রোগী দেখিয়া আসিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা; যাহাদের দেখিবার কেহ নাই এরূপ অসহায়, পথঘাটে পরিত্যক্ত রুগ্ন ব্যক্তিগণকে আশ্রমে লইয়া আসিয়া সেবা করা; দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত পরিবারগণকে সাধ্যমত সাহায্য করা ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজের বেতন, পাঠ্যপুস্তক ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাহায্য করা। এই সকল স্থায়ী কার্য্য ব্যতীত এই দুই বৎসরের মধ্যেই আশ্রমের সেবকগণ লাহোর মাণ্টিগোমেরি অবস্থিত আতুরাশ্রমে ৪ মাস কাল আতুরগণের সেবা ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় বহু ব্যক্তির সেবা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত কাশী, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, কন্‌খল, বাঙ্গালোর প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও অন্যান্য স্থানে স্বামিজীর জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ২৫শে ফাল্গুন, সন ১৩২৫, ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯১৯, রবিবার বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চতুরশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে। ঐ শুভানুষ্ঠানে জনসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

মানভূমে দুর্ভিক্ষ

মানভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; বিশেষতঃ পুঞ্চা ও হুড়া প্রভৃতি থানার লোক অন্নাভাবে কঙ্কালসার হইয়াছে। এই বৎসরের প্রারম্ভে আমরা সেবক পাঠাইয়া এই সব স্থানের অধিবাসীদের অবস্থা বিশেষরূপে যাহা জানিয়াছি তাহাই নিম্নে পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতেছি।—

গত বর্ষে অনাবৃষ্টি হেতু এ জেলায় চাষ আবাদ ভালরূপ হয় নাই। অপর দিকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে দেশে অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। আর যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেছে কিন্তু গৃহে পরিবার পরিজনের কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ক্ষুধার তাড়নায় বহুলোক ঝরিয়া কয়লার খনিতে কাজ করিতে যাইতেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ, তাহাদের খাটিয়া খাইবার উপায় নাই; আর কয়লার খনিতে কত লোকেরই বা জায়গা হইবে? জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা। আমাদের একজন সেবক পুঞ্চা থানায় সেবা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তবে মিশনের তহবিলে বেশী টাকা না থাকায় সেবকগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এদিকে বস্ত্রাভাবেও লোকের লজ্জা নিবারণ করা বিশেষ দায় হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জেলার অধিবাসীদের সাতিশয় দুরবস্থার

কথা জানাইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে বন্যা ও অনাবৃষ্টিতে রবি ও আমন শস্য নষ্ট হওয়ায় তথাকার লোকেরাও পুনঃ পুনঃ আবেদন করিতেছে। এই বিপদ্ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি অর্থ অথবা নূতন কিম্বা পুরাতন বস্ত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, বেলুড়মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া অথবা ম্যানেজার উদ্বোধন, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

গঙ্গাসাগর মেলা।

গত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানোপলক্ষে যাত্রিগণের সেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হইতে ৩৫ জন সেবক প্রেরিত হইয়াছিল। কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা শুশ্রূষা এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করাই মিশনের সেবকগণের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। অন্যান্যবারের ন্যায় এ বৎসরও কলেরা হাঁসপাতালে প্রথমে ৪টী রোগীর স্থান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত ব্যাধির প্রকোপ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে অবশেষে হাঁসপাতালে ১৬টী রোগী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল এবং মেলায় যাহাদের দেখিবার কেহই ছিল না এরূপ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহাকেও হাঁসপাতালে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই কারণে মিশনের সেবকগণকে দুভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এক দল হাঁসপাতালের রোগিগণের চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, অপর দল ঘরে ঘরে যাইয়া চিকিৎসা করিয়া আসিতেন এই শেষোক্ত রোগিগণের সেবার ভার তাঁহাদের আত্মীয়গণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। মেলাস্থল ব্যতীত ষ্টীমারে যাতায়াতের সময়ও অনেক কলেরা রোগীর সেবা করিতে হইয়াছিল।

মেলায় এবং ষ্টীমারে যে সকল রোগীর সেবা করা হইয়াছিল নিম্নে তাহার সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

তিন দিনে ৩৭ জন রোগীকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়, তন্মধ্যে ১১ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া যায়, ১০ জন মারা যায় এবং বাকী ১৬ জনকে নৌকায় করিয়া ডায়মণ্ড হারবার হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসা হয়।

৬৪ জন ব্যক্তিকে তাহাদের বাসায় যাইয়া চিকিৎসা করা হয়, তন্মধ্যে ২ জন মারা গিয়াছে, বাকী সকলে অনেকটা সুস্থ অবস্থায় তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত বাড়ী ফিরিয়াছে।

মেলা হইতে ফিরিবার সময় হোয়ারমিলার কোম্পানীর ষ্টীমার, 'ষোড়শী'তে ৩১ জনের কলেরা হয়। তাহাদের সকলকেই মিশনের সেবকগণকে সেবা শুশ্রূষা করিতে হইয়াছিল। ষ্টীমারখানি কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ৭ জন মারা পড়ে এবং বাকী সকলকে ষ্টীমার-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণ চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

মেলায় চিকিৎসা করিবার জন্য মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং মিশনকে সমুদয় এলোপ্যাথিক ঔষধপত্রাদি দান করেন। মেলাস্থলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, সবডিভিসনল অফিসর ও ওভারসিয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ মিশনের সেবকগণকে নানাবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শাসমল তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মেসার্স হোরমিলার এণ্ড কোং ১০ খানি এবং মেসার্স কিলবরণ এণ্ড কোং ২৫ খানি পাস দিয়া সেবকগণের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। আমরা ইঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

নিম্নে গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্যের হিসাব প্রদত্ত হইল। জমা—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ১১৭৶১৫, মেলায় সংগৃহীত ২॥৫ মোট—১১৯৸০।

খরচ—গাড়ী ভাড়া, নৌকা ভাড়া, মুটে প্রভৃতির জন্য ১৮৷৶৫; জিনিষপত্র লইয়া যাইবার ভাড়া ২৷৫, সেবকগণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ২৷৶১০, সেবকগণের ষ্টীমারে ও মেলায় খাই-খরচ ৭৮৷৴৫। ঔষধ, পথ্য এবং ডাক্তারী যন্ত্রাদি বাবদ ১৫৷১০, ডাক খরচ ৶০, কেরোসিন

তৈল ইত্যাদি ৮/৫, দুইজন বিপন্ন ব্যক্তিকে দান ১॥০, মোট—১১৯৵১০।

পূর্ব্বে যে বস্ত্রবিতরণের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে।

কুমিল্লা ৫৭ জোড়া; পালং (ফরিদপুর) ৫৮ জোড়া; মাহিলারা, বরিশাল ৩০ জোড়া; ধোপরাপাশা, ঢাকা ২৭ জোড়া; ইটনা, যশোর ৬৯ জোড়া; দ্বারহাটা, হুগলী, ৩৫ জোড়া; কুমিল্লা ৩৩ জোড়া; কলিকাতার একটী দুঃস্থ পরিবার, ২॥০ জোড়া; মঠবাটী, খুলনা ৩০ জোড়া; দাঁতন মেদিনীপুর ৩৭ জোড়া; দক্ষিণেশ্বরের জনৈক দুঃস্থ পরিবার ১খানি; বাঁশবেড়িয়ার জনৈক দুঃস্থ পরিবার, ১খানি; তমলুক, মেদিনীপুর ৩০ জোড়া; বাইশাআড়ি, বরিশাল ২৫ জোড়া; মানভূম দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১৫৫ জোড়া; সামন্তখণ্ড, মেদিনীপুর ২৫॥০; বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে, ১৫৫ জোড়া।

নেওয়াখালী জেলার রামগঞ্জ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী ৬ খানি গ্রামের ৫৭ জন ইনফ্লুএন্‌জা রোগীকে মিশনের দুইজন সেবক ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা করিয়াছেন। একজন ব্যতীত অপর সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্রও প্রদান করা হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে ইনফ্লুএন্‌জা ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে ঔষধ দেওয়া হইতেছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৪৯৭ জন ঔষধ লইয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিবেকানন্দ।*

পূজ্যপাদ সাধু এবং মাননীয় মহোদয়গণ,

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বহুসভায় নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ মহাপুরুষের নাম সংস্পৃষ্ট এই মহতী সভায় আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে সম্মান দান করিয়াছেন, মুখের একটা কথায় ধন্যবাদ দিয়া তাহার প্রতিদান হয় না। এই জন্য আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহি না, কেবল বলিতে চাহি যে, আপনাদের এই উদার অনুগ্রহে আমিই ধন্য হইয়াছি। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগলাভ আমাদিগের মত কামকাঞ্চন লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে সাগরসঙ্গমে গঙ্গাবগাহনের ন্যায় পাপহর এবং পবিত্রকর। এইজন্য পূর্ব্ব হইতে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি। আমি এখানে কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুনিতে এবং পারি যদি কিছু শিখিতে। অতএব যাঁহারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ আলোচনা প্রত্যাশা করিবেন, তাঁহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা।

আজ যে পুণ্যপ্রসঙ্গ আলোচনায় আমরা ব্যাপৃত, তাহার উচ্চতা গগনভেদী, প্রসার অনন্ত, গভীরতা অতলস্পর্শী।

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব সভার সভাপতি কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ।

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

সুগভীর সাগরের আধারে হিমাচলের স্থায় পুঞ্জীকৃত কজ্জল ভরিয়া পৃথ্বীর স্থায় বিশালায়ত পত্রে কল্পতরুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সারদা যাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, কোথায় সেই অপারগুণসিন্ধু শঙ্করপ্রতিম ত্যাগীশ্বর, বাগ্মী যতিপ্রবর শ্রীবিবেকানন্দ আর কোথায় আমার মত বিষয়-বিষ-কীট, অধম অজ্ঞ জন? আজ যে নামের গৌরব-সৌরভ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিলে জিহ্বা পবিত্র হয়, যাহার উচ্চারণে শত হৃদয় মাতিয়া উঠে, সেই নামধেয় মহাপ্রাণ, প্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা আমি কি বলিব? যিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ—এই আমার ধর্ম্ম" তাঁহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, তাঁহার এই পবিত্রবাণী কথঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিলে মানব ধন্য হয়। সন্ন্যাসীর মুখে ভক্তি মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ বিসদৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝা যায় যে, শ্রীবিবেকানন্দের উক্ত লোকহিতকর অনুষ্ঠান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ জ্ঞানে নর-সেবাধর্ম্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত সাধনার বিভিন্ন পথ মাত্র।

কালের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাজন জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূতচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে অহৈতুকী প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণা তাঁহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে অম্লান পারিজাতের স্থায় চির পরিস্ফুট—প্রেম এবং লোকহিতৈষণা ইঁহাদের সকল কার্য্যের প্রেরণা। পরের জন্য জীবন ধারণ—ইঁহাদের প্রতি শ্বাসবায়ু পরার্থে উৎসর্গীকৃত। প্রেমের শক্তি ত্রিলোকে অপরাজেয় এই ক্ষুদ্র জীবন, ক্ষণভঙ্গুর কলেবর—নিশ্বাস পবনের উপর যার জীবন নির্ভর,

সে দেবত্বের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়—প্রেমে। কেননা, স্বর্গবাসী দেবতা স্বর্গসুখাভিলাষী, আর ঐশী বিভূতিমণ্ডিত প্রেমিক কেবল আত্মদান প্রয়াসী। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্র—যার বলে তিনি ত্রিলোকবিজয়ী—সেই অশনি, নরমুনি দধীচির লোকহিতায় অস্থিদানে নির্ম্মিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাত্র। মাতা, পিতা, সতী, স্বদেশপ্রেমিক, ভক্ত—যাঁহাদের জন্য ধূলিধূসরা বসুন্ধরা রত্নময়ী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই প্রেম, স্বার্থত্যাগ বা আত্মবলিদানের জীবন্ত বিগ্রহ। প্রেমের বন্ধনে সংসার স্থাপিত, নশ্বর মানবজীবনে প্রেম পরম ঐশ্বর্য্য—কেননা এই প্রেমই সাম্য, সৌখ্য, সৌভ্রাতৃত্বের মূল এবং অদ্বৈতজ্ঞানপদ্ম বিকাশের তপনস্বরূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য-বিভূষিত বিবেকানন্দের এই প্রেমই ছিল শ্রেষ্ঠসম্পদ্‌। প্রেমিক নরবর নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে বিচরণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে এই বিপুল মানবসমাজ স্বার্থপর নরপশুর মৃগয়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কণ্ঠনালী ছেদন করিয়া উষ্ণশোণিত পান করিতেছে! কে বলে ইহা তাঁহার প্রাণারাম প্রেমময়ের প্রেমের সংসার? না—না—কখন না! ইহা নরমেধযজ্ঞস্থল! প্রেমিকহৃদয় সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী যে প্রেম তাঁহার পরম প্রেমাস্পদের পূজার জন্য প্রাণের নিভৃত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দান করিলেন নরসেবায়। প্রেম তাঁহার ধর্ম্ম, লোকহিত—সাধনা, মোক্ষ—নরসেবা।

কিন্তু এই সেবাধর্ম্ম কি প্রকৃতপক্ষে মোক্ষধর্ম্মের বিরোধী? যে ভারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, মুমুক্ষু মানব যেখানে শরীর পরিগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত, যাহার জল, স্থল, আকাশ, বাতাস, মোক্ষমূলক অদ্বৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অদ্বৈতসাধনা যাহার সনাতন ধর্ম্ম, সেখানে এ নূতন পন্থা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন কালের। এ দেশে যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন নূতন নহে। যুগে যুগে অবতারপ্রমুখ যুগাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক তাহাই সাধিত হইয়াছে।

এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে তপ, জপ, যোগ-সাধনা, বিবেক-বিচার দ্বারা, বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অতীব দুঃসাধ্য। সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেবা বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বপ্রেম অদ্বৈতপ্রেমেরই রূপান্তর। মানব মাত্রেই সচ্চিদানন্দের একটি বিগ্রহ। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুব্রহ্মের পূজা শাস্ত্রবচনে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতন বিগ্রহ মানবসেবায় তাহা না হইবে কেন?

ইউরোপে বহুস্থানে নরসেবা ধর্ম্ম আচরিত হয় কিন্তু তাহা নারায়ণ জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্ম্মের আচরণে সেব্য সেবকের মধ্যে গুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিয়া অদ্বৈতজ্ঞান বাধিত হয়। যাহা ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধন করে,—
"সা চাতুরী চাতুরী।"

বাস্তবিক—পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র ঐহিক মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষে পরম হিতকর। ইউরোপীয় মনস্বিগণের মত সংসারের দুঃখ দৈন্য পাপ দূর করিয়া ভূতলে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের স্থাপনা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে সুসভ্য মানব যে দানবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল জলধারার ন্যায় নররক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল সে করুণ কাহিনী ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত।

যতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠায় মানব প্রকৃতি হইতে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি হিংস্রবৃত্তিনিচয় নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হইবে ততদিন ভূতলে ভূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশকুসুমের মত সুদূরপরাহত। স্বার্থ বিসর্জ্জনে, একতাবন্ধনে পৃথিবীর দুঃখ তাপ দৈন্য মোচন করা যদি কখন সম্ভবপর হয়, সমগ্র মানব-

জাতি এক পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যদি কখন কল্পনা করিতে পারা যায়, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বপ্রেম বা অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বভূতে নারায়ণ জ্ঞানই একতার মূলমন্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, মোক্ষ সাধনের এই তিন সনাতন মার্গ। ভক্তি দুর্ল্লভ, জ্ঞান দুঃসাধ্য। প্রায় যষ্টিবর্ষ এই ঘোর রহস্যময় সংসারে বিচরণ করিয়া, প্রতিপদে প্রতিহত হইয়া বুঝিয়াছি, যে, ঈশ্বর, আত্মা, মায়া প্রভৃতি ত অনেক দূরের কথা—এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ জগতে কিছুই জানিবার বুঝিবার উপায় নাই। আমি কিছুই জানি না, কিছু বুঝি না। এমন কি অন্যাপেক্ষা যাহাকে আমার জানা বুঝা অধিকতর সম্ভব, সেই আমাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম জানি, কম বুঝি। যে আবাল্য দীর্ঘসাধনায় শাস্ত্র উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা অতীব দুঃসাধ্য। এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিষ্কাম কর্ম্মমার্গ, বিশেষতঃ শ্রীবিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নরেন্দ্রনাথ যে কেবল কর্ম্ম মার্গানুগত নরনারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী এবং জ্ঞানকর্ম্ম আবরণে মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার উপদিষ্ট সেবাধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহার অভিপ্রায় ছিল দুর্ব্বলকে বল, নিরন্নকে অন্ন, পীড়িতকে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা দাও, খঞ্জকে চলিতে শিখাও, অন্ধকে দৃষ্টি দান কর, আত্মা যার মোহতিমিরাবৃত তার অন্ধকার ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দাও, আর ভয়ার্ত্তকে বল—অভীঃ! আমি সেবার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, আমার মনে হয়, এই নিষ্কাম কর্ম্মই আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই চির দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ, ইহার জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল নরনারী, আর সর্ব্বোপরি,

জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যময়ী এই ভূমির বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্য দেখিলে কার না মনে হয় যে, এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা দ্বেষ-জর্জ্জরিত, স্বার্থৈকলক্ষ্যবিড়ম্বিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! যেখানে করাল অত্যাচার আপনার তাণ্ডবনর্ত্তনশ্রান্তিতে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! যেখানে শোকের আতিশয্যে হাহাকার স্তব্ধ, বিয়োগ বিধুরার উষ্ণশ্বাস বহনে সমীর শ্রান্ত—মহাকাশ অশ্রুভারাক্রান্ত! যেখানে অস্থিমালিনী মেদিনীর রক্তকলেবর অশ্রুধারায় ধৌত হইতেছে। সেই শ্মশানভূমে আর্ত্ত শোকার্ত্ত এখনও যারা জীবিত আছে সেই হতভাগ্যগণ প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রেমবাণীর জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে—তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। বলিতে হইবে যে—"হিংসায় হিংসা জয় করা যায় না, ঘৃণায় ঘৃণা জয় করা যায় না, বিদ্বেষে বিদ্বেষ জয় করা যায় না! ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ জয় হয় কেবল প্রেমে।" জলধির গর্জ্জন লঙ্ঘিয়া গম্ভীর মেঘমন্দ্রে অমর সন্ন্যাসীর এই অবিনশ্বর বাণী হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হউক। সকল স্বার্থ বলি দিয়া সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রেমের বিজয় নিশান করে নির্ভীক অন্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবনসংগ্রামে যে ভীত তাহাকে বলিতে হইবে—অভীঃ—ভয়? কিসের ভয়? পূজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন—"ভয়ই মৃত্যু!" বীরের মৃত্যু একবার, কাপুরুষ শতবার মরে!

আজ কোথায় তুমি মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী! তোমার সেই গৈরিক-বসনাবৃত গৌরবপুঃ পরিগ্রহ করিয়া, যে নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় জগৎ জয় করিয়াছলে, সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয়া তোমার আজানুলম্বিত বরবাহু তুলিয়া দিঙ্মুখ মুখরিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষে আর একবার বল—অভীঃ!—

বল—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ সবার পায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এস সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক নরবর! ভারতের এই ঘোর আধ্যাত্মিক নিশায় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আর একবার উদিত হও, আমরা তোমাকে অভিবাদন করিয়া জীবন ধন্য করি

নীরব প্রচার।

(প্রফেসার শ্রীনলিনীকান্ত সেন গুপ্ত, এম, এ)

হিংসাদ্বেষপরিপূর্ণ এই নশ্বর জগৎকে মায়াপহৃতজ্ঞান মানব চির-আবাসভূমি জ্ঞান করিয়া স্ব স্ব সুখশান্তি বিধানে সতত চেষ্টা করিতেছে। সংসারসুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের নিজ নিজ উন্নতি সাধনের জন্য স্বার্থপর হওয়াই সম্ভব কিন্তু যাঁহারা এই ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চিরশান্তির আশায় সর্ব্ব অনর্থের মূল সংসার-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিবিড় বিজন অরণ্যে, পর্ব্বতগুহায় অথবা গোপনে লোকালয়ে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কি সাধারণ মানবের ন্যায় স্বার্থপরতা বিদ্যমান আছে? এই জগৎ আজ নূতন সৃষ্ট হয় নাই অথবা ইহার প্রহেলিকা আজ প্রথম মানব নয়নে পতিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অনেক চক্ষুষ্মান্ লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক লোক মায়াময় সংসারের লোককোলাহল হইতে দূরে গোপনে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় দেহপাত করিয়া অমর-ধামে গমন করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে এই সব মহাপুরুষের নাম লিখিয়া রাখে নাই। আমরা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রমুখ কতিপয় অবতারপুরুষের কথা শুনিতে পাই, কারণ, তাঁহারা জীবের দুর্গতি দেখিতে না পারিয়া ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে জ্ঞান বিতরণ কার্য্যে নিজ জীবন

উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থতা ও পরদুঃখকাতরতা হেতু জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জীবের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। আর যাঁহারা নীরবে ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন কিন্তু প্রকাশ্যে জীবের দুঃখমোচন করেন নাই তাঁহারা কি স্বার্থপর নামে অভিহিত হইবেন? ঈশ্বরকল্প অবতারপুরুষগণের কথা ছাড়িয়া দিলে যে সব মহাপুরুষ জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন. তাঁহারা নিঃস্বার্থ বলিয়া ধর্ম্মজগতে উচ্চাসন পাইবার অধিকারী সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা কেবল নিজ নিজ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া নীরবে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহারা কি স্বার্থপর বলিয়া গণ্য হইবেন?

সাধারণ জাগতিক ব্যাপার আমরা যে বুদ্ধিতে বিচার করি, এই সকল অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীল মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপও কি আমরা সেই বুদ্ধিতে বিচার করিব? যাঁহারা সংসারকে ত্রিতাপের আলয় দেখিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় যে ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য ব্যথিত হয় না এ কথা কেমন করিয়া বলিব? তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে যে জগতের শুভকামনা করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে হইলে এই সব মহাপুরুষগণের সঙ্গ করিতে হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের যে কি অলৌকিক প্রভাব তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইঁহারা নির্জ্জনে নীরবে বসিয়া যে শুভচিন্তা করেন তাহার প্রভাব কখনও ব্যর্থ হয় না—তাহা অলক্ষিতভাবে জীবের মঙ্গল সাধন করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও অপরিচিত। তাঁহারা চিন্তার শক্তি কতদূর, তাহা জানেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, যদি তাঁহারা কোন গুহায় গমন করিয়া গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া পাঁচটী বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পাঁচটী

চিন্তা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। সেই চিন্তাগুলি পর্ব্বত ভেদ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদয় জগৎ ভ্রমণ করিয়া আসিবে, তৎপরে কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন কোন লোক উৎপন্ন করিবে, যে ব্যক্তি অবশেষে ঐ চিন্তাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবে।" শুনা যায়, ঋষিগণের তপোভূমিতে হিংস্রক জন্তুগণ হিংসা ভুলিয়া পরস্পর মিত্রভাবে বিচরণ করে; এরূপ স্থলে অতি পাষণ্ড সমাগত হইলেও তাহার মনে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে এবং অশান্ত হৃদয়ে শান্তি অনুভব করে। গাজীপুরের পওহারী বাবার কথা বোধ হয়, সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি কখনও প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন নাই, এমন কি, কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন নাই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারা নিজ জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, এরূপ মহাপুরুষ যদি জীবকে শিক্ষা দিতেন, দেশ বিদেশে যাইয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন, তাহা হইলে জগতের অধিক উপকার হইত। আমাদের মনে এইরূপ হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা আমাদের বুঝিবার সাধ্য নাই—তিনি সকলকে প্রকাশ্য প্রচার করিতে পাঠান না এবং তাঁহার বিশেষ আদেশ ব্যতীতও প্রচার কার্য্য চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "চাপরাস না পাইলে লোকশিক্ষা দেওয়া চলে না"।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনে এই বাণী পুনরায় সফল হইয়াছে, ইহা আজকাল অনেকেই মনে করেন। অবতার যতদিন নরদেহে বিচরণ করেন, ততদিন স্বয়ং ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন এবং স্বধামে প্রস্থান করিলে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের উপর ধর্ম্মপ্রচারভার ন্যস্ত হয়। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গ অবতারের লীলাসহায়ক—ইঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে খ্যাত। পুরাকালের ঋষিগণ অবতারের লীলা প্রচারের জন্য ধরাধামে তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হন। ইঁহারা নিত্যমুক্তের থাক্। ভগবান্

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিয়া উদার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন-পূর্ব্বক তৎপ্রচারের ভার তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উপর দায়স্বরূপে অর্পণ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই সব মহাপুরুষ যদি প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার ধর্ম্মপ্রচার না করিয়া স্বধামে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, যাঁহারা আদর্শ মহাপুরুষ, জীবের দুর্গতি মোচনের জন্য যাঁহাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আগমন, তাঁহারা যদি নীরবে প্রস্থান করেন, তবে তাঁহাদিগের ধরাধামে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? স্বামী যোগানন্দ প্রমুখ দুই এক জন মহাপুরুষ—যাঁহারা অল্প বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে ঐরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। স্বার্থান্ধ মানব আমরা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির অণুমাত্র বিঘ্ন দেখিলে বিচলিত হইয়া উঠি এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভগবানের কার্য্যের উপরও দোষারোপ করিতে ছাড়ি না! প্রকৃতপক্ষে, আমাদের অজ্ঞানতাই ঐরূপ সিদ্ধান্তের কারণ। আমরা যদি সুবুদ্ধি ও বিবেক সহায়ে ইঁহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করি তাহা হইলে অন্য মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে পাই। স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়াও প্রকাশ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য যে জ্বলন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যদি আমরা বারেক আলোচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি নীরবে আমাদিগকে কি সুন্দর শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা এখানে বিবৃত করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

স্বামী যোগানন্দ এঁড়িয়াদহ নিবাসী এক সদ্ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধি বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। পৃথিবীতে আসিয়া, যেন কোন এক অপরিচিত রাজ্যে আসিয়াছেন, এরূপ মনে হইত। এজন্য লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মে নাই। কৈশোরে পদার্পণ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের পুণ্য

ত্যাগ, ঈশ্বরানুরাগ ও ভক্তিপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে আদর্শ, মহাপুরুষজ্ঞানে তদনুসারে নিজ জীবন গঠিত করিবার বাসনা তাঁহার মনে বলবতী হয়। তিনি সদাসর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান ভজন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে পিতামাতা মনে করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ দিলে সম্ভবতঃ তাহার সংসারে মন বসিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। স্বামী যোগানন্দ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। যাহা হউক, অবশেষে মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতৃভক্ত সন্তান বিবাহ করিয়া পিতামাতার মান রক্ষা করিলেন। কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে ইহজীবনে অধ্যাত্ম-জীবন-লাভের সমুদয় আশা-ভরসা বিসর্জ্জন দিলেন এবং লজ্জায় কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাইতে বিষম সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার ভক্তের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরম স্নেহসহকারে বলিলেন, "হাঁরে, তুই বিবাহ করিয়াছিস্ তা কি হইয়াছে, আমিও বিবাহ করিয়াছি। যদি তোর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস্, আমি ঠিক করিয়া দিব। আর যদি তোর সংসার ভাল না লাগে ত বল্ আমি তোর মায়া খাইয়া ফেলি।" স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের শেষ কথায় সায় দিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মায়ার বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহিতা পত্নীর সহিত একদিনের জন্যও কায়িক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই কিম্বা কখন স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করেন নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন স্বামী যোগানন্দকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলেন যে, স্বামী যোগানন্দ একবার শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছিলেন। রাত্রিতে আহারাদির পর স্ত্রীর নিকট শয়ন না করিয়া সমস্ত রাত্রি ছাদে পাদচারণা করিয়া বেড়াইয়া

ছিলেন এবং প্রত্যুষে সকলে উঠিবার অগ্রে তথা হইতে প্রস্থান করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমাদের ভিতর যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।"

স্বামী যোগানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, যদি আপাতমধুর পরিণামবিষ সংসার সুখে মন একবার বদ্ধ হয়, তাহা হইলে চিরশান্তিলাভ সুদূরপরাহত হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অমৃতত্বের অধিকারী হইতে হইলে অনিত্য সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা ভগবৎলাভের অন্তরায় বীরের ন্যায় মমতাবিহীন হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার জীবন স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছে—"হে মানবগণ, তোমরা বিষয়ভোগে সুখ পাও বটে কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক। যদি তোমরা সেই আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতে চাও, তবে আর ব্রহ্মানন্দের সন্ধান পাইবে না। সেই সামান্য আনন্দের লোভে পড়িয়া শারীরিক ও মানসিক মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিও না। যদি অমৃতত্ব লাভ করিতে চাও, বীরের ন্যায় অচল অটলভাবে থাকিয়া মায়ার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাও।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধানের পর শ্রীযুত যোগীন সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক স্বামী যোগানন্দ নামে খ্যাত হন। তিনি সার্থক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—যে মন দ্বারা ভগবান্ লাভ করিতে হইবে সে মনকে তিনি কখনও সাংসারিক বিষয়ে মগ্ন হইতে দেন নাই—সদা আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিতেন। ব্রহ্মানন্দ উপভোগই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বামী যোগানন্দ স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝিলেন যে পঞ্চভূতসমষ্টি এই দেহ কিছুই নহে—আত্মাই আসল বস্তু, কিন্তু দেহ ধারণ করিলে ক্লেশভোগ অনিবার্য্য। এইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলিলেন, তাঁহাকে এবার একেবারে মুক্তি দিতে হইবে। সাধারণ জীব হইতে এই নিত্যমুক্ত শ্রেণীর প্রভেদ বিস্তর। জীব জ্ঞানলাভে মুক্তির অধিকারী হয় কিন্তু যাঁহারা অবতারের সহচর, তাঁহাদের মুক্তি নাই—

অবতারের সঙ্গে বারে বারে তাঁহাদের আগমন করিতে হয়। স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরকে বলিলেন, "আমি আর আসিতে পারিব না—এইবারকার শিক্ষাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমায় একেবারে মুক্তি দিতে হইবে।" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন—"ওরে, আর একবার আস্‌তে হবে।" পিতার উপর পুত্র যেমন অভিমান করে ঠাকুরের উপর সেইরূপ অভিমান করিয়া স্বামী যোগানন্দ বলিলেন, "না আমি আর আসিতে পারিব না, আমায় মুক্তি দিতেই হবে।" শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের মানবদেহের অন্তর্ধানের পর হইয়াছিল।

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। দেহের যন্ত্রণা হইতে লাগিল, তথাপি একদিনের জন্যও ঠাকুরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন না; তিনি জানিয়াছেন দেহটা কিছু নয় সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের ন্যায় দেহের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন নাই। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তিনি অচল অটল ধীর স্থির রহিলেন। স্থির করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট মুক্তিবর লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সংকল্প জানিতে পারিয়া শয্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"তুমি জান কি, ছয়মাস ধরিয়া ক্লেশ পাইতেছ? কেন ভাই আর কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে দুঃখ দাও—শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় সম্মত হও, ঠাকুরের সঙ্গে আবার আসিতে অমত করিও না। তাঁর পাঁঠা যদি তিনি লেজের দিকে কাটেন ত কার কি?" স্বামী যোগানন্দ শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি, আমি ছয়মাস ধরিয়া শয্যাগত রহিয়াছি? আচ্ছা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; তিনি এ দাসকে যাহা বলিবেন, এ দাস তাহাই করিতে প্রস্তুত।" এই বলিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আত্মনিবেদন করিয়া মহাসমাধিগত হইলেন এবং তাঁহার নিকট প্রস্থান করিলেন।

গেলিলিও।

(প্রফেসার শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ)

সে প্রায় তিন শত বৎসরের কথা। যখন সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দু ও মুসলমান এক করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন ভারতবর্ষেও নানাস্থানে জ্যোতিষশাস্ত্রের বেশ চর্চ্চা ছিল, স্থানে স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির গতি দেখিবার জন্য মানমন্দির ছিল। এখনও এই সব মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে এই সময়ে ইতালি দেশে পাইসা নগরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গেলিলিও জন্মগ্রহণ করেন (১৫৬৪-১৬৪২)। গেলিলিওর পিতা বড়ই অঙ্কশাস্ত্র ও গান বাজনা ভাল বাসিতেন; সেইজন্যই বোধ হয় অঙ্কশাস্ত্র ও কলকব্জায় তাঁহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ অনুরাগ ছিল। অবশ্য সে সময়ে অঙ্কশাস্ত্রের এত উন্নতি হয় নাই এবং তখন রেলগাড়ী, কলের জাহাজ, চটের কল, হাওয়াগাড়ী এ সব কিছুই ছিল না। কিন্তু যাহা ছিল তাহা লইয়াই তিনি কাল কাটাইতেন। গেলিলিওর পিতা ছেলেকে বেশ লেখাপড়া শিখাইবার পর ব্যবসা বাণিজ্য করিবার পরামর্শ দিলেন এবং লেখাপড়া শিখিয়া কাপড়ের কারবার করিবে এইরূপই ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। গেলিলিও লেখাপড়া শিখিতে স্কুলে যাইলেন। এই সময়ের সকল স্কুলই পাদরীগণের হাতে। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া গেলিলিও চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। গেলিলিওর পিতা অঙ্কশাস্ত্র অথবা জ্যোতিষশাস্ত্রকে বড়ই ভয় করিতেন, কারণ অঙ্কশাস্ত্র শিখিয়া কি হইবে? পেটের অন্ন জুটিবে না! এ সময়ে যাঁহারা অঙ্কশাস্ত্র পড়াইতেন তাঁহারা দিনে আট আনার অধিক রোজগার করিতে পারিতেন না। কিন্তু চিকিৎসা করিয়া দিনে অন্ততঃ দুইটা টাকাও ত পাইবে। কিন্তু পিতার মতলব সব ভাসিয়া গেল। চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িতে যাইয়া গেলিলিও ঘড়ির পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ডাক্তারেরা রোগীর নাড়ী

টিপিয়া পরীক্ষা করে কিন্তু মিনিটে ঠিক কতবার নাড়ী নড়িতেছে তাহা কেমন করিয়া হিসাব করিবে? এখন সকল ডাক্তারই ঘড়ি দেখেন কিন্তু গেলিলিওর আগে ঘড়ি ছিল না; তিনি পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করিয়া নাড়ী দেখার কল আবিষ্কার করিলেন (আমরা পেণ্ডুলামের কথা পরে বলিব)। গেলিলিওর পিতা যখন দেখিলেন যে তাঁহার ছেলে চিকিৎসা শিখিতে গিয়া অঙ্কশাস্ত্র পড়িতেছে এবং নাড়ী পরীক্ষা করিতে গিয়া নাড়ী দেখার কল বাহির করিতেছে, তিনি তখন বাধ্য হইয়াই গেলিলিওকে অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়িতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়াই গেলিলিও সেই সময়কার মধ্যে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি পাইশা নগরে অধ্যাপকের পদ পাইলেন, কিন্তু এ কাজ লইয়া তাঁহার বড়ই মুস্কিল হইল। তাঁহার আগেকার পণ্ডিতগণের মতামত যাহা তিনি ছাত্রদিগকে বুঝাইতেন তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে ভুল বলিয়া ধারণা হইত। গেলিলিও তাঁহার নিজের ধারণাই ছাত্রদিগকে শিখাইতেন। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বড় বড় পণ্ডিতগণের কথা তিনি মানেন না, একথাটা আর চাপা রহিল না, সহরময় প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সময় ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যেই লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল, তাঁহারাই দেশের মধ্যে গণ্যমান্য পণ্ডিত। গেলিলিও তখন যুবাপুরুষ, তাঁহার কথা কেহই স্বীকার করিল না, বরং অন্য পণ্ডিতগণের কথা উড়াইয়া দিতেছেন বলিয়া তাঁহার অনেক শত্রু হইল। কিন্তু গেলিলিও কি করিবেন, তিনি নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিত সমাজে বিচার প্রার্থনা করিলেন। কি বিষয় লইয়া বিচার হইবে তাহার একটু আভাস এইখানে দিয়া রাখি।

গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত এরিস্টটলের সময় হইতে গেলিলিওর সময় অবধি এই দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন যে, কোনও দ্রব্য যতই ভারী হইবে, তাহা শূন্য হইতে ততই শীঘ্র শীঘ্র পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ তুমি যদি তোমার

বাটীর ছাদ হইতে একটি এক সের দ্রব্য ও আর একটি পাঁচ সের দ্রব্য এক সময়ে শূন্যে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে পাঁচ সের দ্রব্যটি এক সের দ্রব্য অপেক্ষা, পাঁচগুণ শীঘ্র জমিতে পড়িবে। পদার্থ যতগুণ বেশী ভারী হইবে সে ততই শীঘ্র শীঘ্র মাটিতে পড়িবে। কিন্তু গেলিলিও দেখিলেন যে এমতটি একেবারেই ভুল। মানুষ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ভুল শিখিয়া আসিতেছে। তাই তিনি তাঁহার নিজের ছাত্রদিগকে সত্য মত শিখাইতে লাগিলেন। গেলিলিও শিখাইলেন যে, যদি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ শূন্যে এক স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে কোনটি বা হাল্কা, কোনটি বা ভারী, কোনটি বা খুব ভারি, তাহা হইলে তাহারা কেহই আগু পেছু আসিবে না—সকলেই এক সময়ে মাটিতে আসিয়া পড়িবে। পদার্থ দশগুণ ভারী বলিয়া যে উহা দশগুণ শীঘ্র আসিবে তাহা নয়; পাঁচ সের ভারী পদার্থ যে সময়ে মাটিতে পড়িবে, দশ সের ভারী পদার্থও যদি এক সময়ে ও একই স্থান হইতে শূন্যে ছাড়া হয়, ঠিক সেই সময়ে মাটিতে আসিয়া পৌঁছিবে। এই চমৎকার কথা শুনিয়া পণ্ডিতগণ বড়ই রাগিয়া গেল। ২০০০ বৎসরের সত্য গেলিলিও অমান্য করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা করিল ও ঐ সত্যের প্রমাণ চাহিল। গেলিলিও তখনই সম্মত হইলেন এবং পাইসা নগরের একটি খুব উচ্চ বাটীর চূড়া হইতে এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। গেলিলিওর প্রাণে কোন ভয় নাই—তিনি দেশশুদ্ধ শত্রু দেখিয়াও অটল রহিলেন, কারণ, তিনি জানেন তিনি নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন এবং চিরকালের জন্য সেই পুরাতন মতটিকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

বিচারের দিন স্থির হইল। এক দিকে কেবল গেলিলিও একাকী আর অপর দিকে দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকগণ। গেলিলিও দুইটি ভারি গোলক অর্থাৎ বল লইয়া গেলেন। এই বল দুইটি তিনি বিচারকদিগের হাতে দিলেন। তাঁহারা অতি সাবধানে ওজন করিয়া দেখিলেন যে, একটির ওজন আর একটির ঠিক দ্বিগুণ

এবং বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হইয়াছে, ভারী বলটি মাটিতে দ্বিগুণ আগে পড়িবে এবং দ্বিতীয়টি অনেক পরে পড়িবে—কোন্ মত সত্য এখনই তাহা দেখা যাউক।" বল দুইটি সেই মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় লইয়া যাওয়া হইল, এবং জনসাধারণ মন্দিরের নীচে জমা হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে যেই সঙ্কেত করা হইল অমনি দুইটি বল একই সময়ে একই স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। প্যাইসার সেই মন্দিরের চূড়া খুব উচ্চ, কাজেই বল মাটিতে পড়িতে কিছু সময় লাগিল এবং সকল লোকই বেশ দেখিতে পাইল যে, বল দুইটি একই সঙ্গে নামিতেছে, এবং একই সময়ে মাটিতে ধুপ্ করিয়া পড়িয়া গেল। আগু পেছু কোনটিই পড়িল না। বল দুইটি আবার চূড়ার উপরে পাঠান হইল এবং বার বার ফেলিয়া দেওয়া হইল কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহারা একই সময়ে মাটিতে পৌঁছিল। গেলিলিওর জয় হইল বটে কিন্তু কেহই তাঁহার সুখ্যাতি করিল না—অন্তরে অন্তরে সকলেই তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং সুবিধা পাইলেই যাহাতে তাঁহাকে জব্দ করিতে পারে এমত চেষ্টা করিতে লাগিল। গেলিলিও পদার্থের গতির নিয়ম প্রমাণ করিলেন বটে কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সে সত্য মতটি কেহই স্বীকার করিল না।

এইবার গেলিলিও পুরাণ জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া পড়িলেন এবং বহু পুরাণ মতটি* খণ্ডন করিয়া দিলেন। যে মত এতকাল চলিয়া আসিতেছিল সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। কারণ, তাহা না বলিলে আমরা গেলিলিওর অসাধারণ বুদ্ধি ও ধৈর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারিব না।

আজকাল অনেকেই জানেন যে, সূর্য্য আকাশের একস্থানে আছে আর তাহার চারিধারে পৃথিবী আর পৃথিবীর মত বড় বড় গ্রহ এবং ইহাপেক্ষাও অনেক বড় বড় গ্রহ সূর্য্যের চারিধারে অবিরত ঘুরিতেছে। যাহারা সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহাদের 'গ্রহ' বলে

* Ptolemaic and Copernican system

আর যাহারা গ্রহকে বেড়িয়া ঘুরে তাহাদের 'উপগ্রহ' বলে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। সূর্য্য যে সৌরজগতের মাঝখানে আছে, আর গ্রহগণ যে তাঁহাকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে একথা আগে কেহই স্বীকার করিত না। মিশর দেশের মহারাণী ক্লিয়োপেট্রার পিতৃপিতামহের সময় হইতে গেলিলিওর সময় পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করিত যে, পৃথিবীই মাঝখানে আছে আর সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহগণ পৃথিবীকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। যদি কেহ বলিত যে একথা সত্য নয়, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত এবং নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিত। আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনিয়া আসিতেছি যে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাই ততটা আশ্চর্য্য বোধ করি না। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এটা অবাক্ হইবার কথা কিনা? এই ভয়ানক বড় পৃথিবীটা, গাছ পালা, পাহাড়, মানুষ ইত্যাদি লইয়া দেশ বিদেশ, বড় বড় সমুদ্র ঘাড়ে করিয়া বোঁ বোঁ করিয়া লাটুর মত ঘুরিতেছে আর আমরা তাহার উপরেই বাস করিতেছি, অথচ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; এটা কি আশ্চর্য্যের কথা নহে? মানুষ কি হঠাৎ একথা বিশ্বাস করিতে পারে? তাহারা বলিয়া থাকে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে ত আমাদের মাথা নীচের দিকে চলিয়া যায়—আমরা পড়িয়া যাই না কেন? লোকে এখনই বিশ্বাস করিতে পারে না সুতরাং আগে যে একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত তাহাতে আশ্চর্য্য কি। গেলিলিও জন্মাইবার প্রায় ৫০ বৎসর আগে প্রুশিয়া দেশের এক মহাপণ্ডিত কুপার্ণিকাস্ এই মত উল্টাইয়া দেন। ইঁহার শিষ্য কেপ্লারও এই মত স্বীকার করেন এবং যে নিয়মে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা আবিষ্কার করেন। আগেকার পণ্ডিতেরা বলিত যে পৃথিবী ঠিক কেন্দ্রে আছে এবং আর আর গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্য গোলাকার পথে পৃথিবীকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। কেপ্লার তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, পৃথিবী ত মাঝখানেই নাই, সূর্য্যই মাঝখানে আছে, আর গ্রহগণ গোলাকার পথেও ঘুরিতেছে না। তাহারা সূর্য্যের

চারিধারে ডিম্বাকার পথে ঘুরিতেছে। গোলাকার পথের একটি কেন্দ্র ঠিক মাঝখানে আছে, ডিম্বাকার পথের তেমনি দুইটি কেন্দ্র আছে কিন্তু মাঝখানে কোন কেন্দ্রই নাই। সূর্য্য ইহার ভিতর এক কেন্দ্রে আছে। কেপ্লার এই মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বুধগ্রহের গতি দেখিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার নূতন সত্য মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কেহই তাহা স্বীকার করিল না। কেবল গেলিলিওই তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহা আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কেপ্লার এমনি শুধু চোখে বুধগ্রহকে দেখিতেন কিন্তু গেলিলিওর আর এক সুবিধা হইয়াছিল, শুধু চোখে তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই। তিনিই নিজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। সাধারণ 'অপেরা গ্লাস' যাহাকে বলে ইহাই গেলিলিওর আবিষ্কার। যদি কোন দূরের পদার্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যেন সেই দূরের পদার্থটি তোমার অনেকটা নিকটে এগাইয়া আসিয়াছে। কোন পদার্থ কাছে আসিলে তাহাতে কি আছে তাহা অনেকটা বুঝা যায়। মনে কর, তুমি মাঠের এক কোণে দাঁড়াইয়া আধ মাইল দূরের একটি বট গাছ দেখিতেছ। উহাকে হয়ত কেবল বটগাছ বলিয়া চিনিতে পারিবে। কিন্তু তাহার ডালপালা আলাদা করিয়া চিনিতে পারিবে না। সেই বট গাছ যদি অর্দ্ধেক পথ এগাইয়া আসে তাহা হইলে তাহার ডালপালা আলাদা আলাদা দেখিতে পাইবে। এমন কি হয়ত ডালে যে পাখীটি বসিয়া আছে তাহাও দেখিতে পাইবে। এই দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া দেখিলে পদার্থকে কাছে বলিয়া মনে হয়। এক্ষণে, কেমন করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের হঠাৎ আবিষ্কার হইল তাহা বলিতেছি।

হলাণ্ড দেশে জানসেন নামে (কেহ কেহ বলেন উহার নাম হান্স লিপার্সে) এক চসমাওয়ালা বাস করিত। একদিন তাহার বালিকা কন্যা দুই রকমের দুইখানি চশমার কাচ (একখানির মাঝটা মোটা ধার পাতলা আর একখানির ধার মোটা মাঝটা

পাতলা ঐ লইয়া খেলা করিতেছিল—এটা ওটা সেটা কত জিনিষই তাহার ভিতর দিয়া দেখিতেছিল। একবার দুই হাতে দুইখানি কাচ ধরিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বাবা, দেখ, দেখ, কি মজা হইয়াছে—আমাদের দোকানের সামনে দিয়া কত মানুষ, ঘোড়া চলিয়া যাইতেছে, দূরের রাস্তা কত এগাইয়া আসিয়াছে!" চশমাওয়ালা সেই কথা শুনিয়া উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য একটি নলের দুই দিকে দুই রকমের দুইখানি কাচ আঁটিয়া লইল ও উহার ভিতর দিয়া দূরের জিনিষ দেখিতে লাগিল—এই যন্ত্রটিই দূরবীক্ষণ হইল। চশমাওয়ালা যাহা দেখিল তাহাতে সে অবাক্ হইয়া যাইল। তাহার মনে হইল যেন দূরের একটা গাছ তাহার জানালার বাহিরেই রহিয়াছে, দূরের মানুষ যেন তাহার দোকানের সামনে দিয়াই চলিয়া যাইতেছে। এই কথা ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং মিডলবার্গ সহরের একজন প্রসিদ্ধ চশমাওয়ালা ঐ রকম তিনটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া হলাণ্ড দেশের রাজাকে উপহার দেন (১৬০৮)।

এই বৎসর গেলিলিও ভিনিস নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ঐ দূরবীক্ষণের কথা শুনিলেন। দুই রকমের কাচ উহাতে ব্যবহার করা হইয়াছে শুনিয়াই তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং নিজের হাতেই তাঁহার মনোমত একটি দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া লইলেন। গেলিলিওর পূর্ব্বে আর কেহই দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি দেখে নাই; দূরবীক্ষণ সাহায্যে যে জ্যোতিষশাস্ত্র কত উন্নতি করিতে পারে তাহা গেলিলিওই প্রথমে বুঝাইয়াছেন।

নিজের হাতে প্রথম দূরবীক্ষণ তৈয়ারী করিয়াই গেলিলিও চাঁদ দেখিতে লাগিলেন। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু কলঙ্ক যে কি কেহই জানিত না। আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছি যে, চাঁদে এক বুড়ী কুলগাছ নাড়া দিতেছে এবং দিনরাত কুলগাছ তলায় বসিয়া আছে। গেলিলিওই প্রথম বুঝিলেন যে, যেটা বুড়ী ও কুলগাছ বলিয়া মনে

হয় সেটা পাহাড় ও পাহাড়ের ছায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। চাঁদে কেবল বড় বড় পাহাড় ও বড় বড় গহ্বর। চাঁদের নিজের কোন আলো নাই, সূর্য্যের আলো যেমন পৃথিবীতে আসিতেছে, সেই রকম চাঁদেও পড়িতেছে। সূর্য্য উঠিলে যেমন মাটিতে গাছের ছায়া পড়ে, এবং যত বেলা হয় ততই সে ছায়া আস্তে আস্তে সরিয়া যায়, সেই রকম চাঁদেও বড় বড় পাহাড়ের ছায়া সরিয়া যায় এবং সেই ছায়ার মাপ হইতে গেলিলিও পাহাড় কত উচ্চ তাহা ঠিক করিলেন। ইহার পর গেলিলিও দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহ ও উপগ্রহ দেখিতে লাগিলেন। খালি চোখে শুধু শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহগণকে আমরা নক্ষত্রের মতন মিট্ মিট্ করিতেছে দেখিয়া থাকি। রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইলে গ্রহগণের আকার ঠিক নক্ষত্রের আকারের মতই মনে হয়, সাধারণ লোকে তফাৎ বুঝিতে পারে না। গেলিলিও দূরবীক্ষণ লাগাইয়া বৃহস্পতি (Jupiter) গ্রহকে দেখিতে লাগিলে (8th Jan, 1610) তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে আর মিট্‌মিটে নক্ষত্র নাই। বেশ বড় গোল যেন একখানি জলজলে রূপার থালা রহিয়াছে, এই রূপার থালার মাঝে আবার কাল কাল দাগ। এই বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা অনেকগুণ বড়! পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, গেলিলিও দেখিলেন যে বৃহস্পতির তেমনি চারিটি চন্দ্র আছে। আমাদের কেবলমাত্র একটি চাঁদ, কখন পূর্ণিমা, কখনও অমাবস্যা হয় কিন্তু বৃহস্পতির কি মজা, কখনও অমাবস্যা নাই—কখনও একসঙ্গে দুই চাঁদ, কখনও তিন চাঁদ, কখনও চারিটি চাঁদ উদিত হইতেছে।

গেলিলিও যখন এই সকল আবিষ্কার প্রকাশ করিলেন, তখন লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কুপার্ণিকাসের শিষ্যগণ বড়ই আহ্লাদিত হইল বটে কিন্তু পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ বড়ই রাগিয়া যাইল। এই সময়ে প্যাদরীরাই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাদের মতই মত—অন্য মত সব মিথ্যা ও কুফলপ্রদ বলিয়া জানিতে হইবে।

একে গেলিলিও প্রচার করিয়াছেন যে সূর্য্য ঘুরিতেছে না, পৃথিবী ও গ্রহগণই ঘুরিতেছে, তাহার পর আবার তিনি দূরবীক্ষণ দিয়া বৃহস্পতিকে স্বচক্ষে দেখিলেন, আবার তাহার চারিটি চাঁদও দেখিলেন—একথা পাদরীগণ সহ্য করিতে পারিল না। একথা ত তাহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে লেখা নাই। তবে কেমন করিয়া তাহা সত্য হইতে পারে? গেলিলিওর স্পর্দ্ধা দেখিয়া পাদরীগণ তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা বলিল, "কি! এতদূর তোমার আস্পর্দ্ধা; প্রত্যেক মানুষের ও অন্তর সাতটি জানালা আছে, যেমন দুই চোখ, দুই কাণ, দুই নাক ও এক মুখ, স্বর্গেরও তেমনি সাত জানালা থাকিবে—তাহার বেশী কখনই হইতে পারে না। এই দেখ, বৃহস্পতি আর শুক্র ইহারা আদরের নক্ষত্র, বুধ আর শনির কুদৃষ্টি আছে সূর্য্য আর চন্দ্র ইহারা আলোক দেয়, এবং মঙ্গল কোন কাজেই লাগে না। ইহা ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখা যায় না, সুতরাং তাহারা নাই। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা তোমার চোখের ও যন্ত্রের দোষ—শয়তান তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে, এবং সেই শয়তানকে তোমার ঘাড় হইতে নামাইয়া দিতে হইবে।" এবার গেলিলিওর আর রক্ষা নাই। অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার দ্বারা তিনি কতই নূতন জ্ঞান প্রকাশ করিলেন, হাজার বৎসরের পুরাতন মত উল্টাইয়া দিলেন, সূর্য্যের ভিতর দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন, তাহাতে কাল কাল দাগ আছে, আবার সেই দাগ প্রতি বৎসরে বদলাইয়া যাইতেছে কিন্তু পাদরীরা তাঁহাকে ছাড়িল না। শয়তান ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। পাদরীরা কাল কাল পোষাক পরিয়া মুখে মুখোস পরিয়া মাটির নীচে অন্ধকার ঘরের ভিতর বিচার করিত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মযাজকদের 'পবিত্র বিচারালয়ে' তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই বিচার নামমাত্র, এ বিচার কাজীর বিচার অপেক্ষাও ভয়ানক। ইহাদের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। ইহাদের হাতে পড়িয়া কেহ আজীবন অন্ধ হইয়া গিয়াছে, কেহ অন্ধকূপে

মরিয়া গিয়াছে, কেহ বা আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। ইহারা গেলিলিওকে কারাগারে রাখিয়া দিল। তিনি যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে বলা হইল, এমন কি, নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার দেহের উপর অত্যাচার করিবার ভয় দেখান হইল কিন্তু গেলিলিও অসীম ধৈর্য্যধারণ করিয়া সকলই সহ্য করিলেন, কিছুই অস্বীকার করিলেন না। এই রকম মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিচার হইত। কখনও তাঁহাকে দুই তিন মাস ধরিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে রাখিয়া দেওয়া হইত। এই রকম ১৬১৬ খ্রীঃ অবধি চলিয়াছিল। অবশেষে পাদরী বিচারকেরা বিচার করিলেন যে, গেলিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা যে কেবল মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, একেবারেই অসম্ভব এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। ঐ মত স্বীকার করিলে মানুষ নাস্তিক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের নামে এ মত একেবারেই চলিতে পারে না। অনেক অপমান সহ্য করিয়া গেলিলিও নিষ্কৃতি পাইলেন বটে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে সহর হইতে দূরে আপন আবাসেই থাকিতে বলা হইল এবং পুনরায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন পুস্তক লিখিতে নিষেধ করা হইল। এইখানেই তাঁহার কষ্টের শেষ হইল না। এক চক্ষে দূর-বীক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে সেই চোখটি হারাইলেন, পরে অপর চোখটিও দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। জীবনের শেষভাগ তাঁহাকে কাজে কাজেই অন্ধ অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল। গেলিলিও বিবাহ করেন নাই, তিনি ৭৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গেলিলিওর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে আরও দুই একটি আবিষ্কারের কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঘড়ির 'পেণ্ডুলাম' গেলিলিওর ছেলেবেলাকার আবিষ্কার। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি একদিন পাইসার মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে একটি কাঁসার আলোক শৃঙ্খলে ঝুলান ছিল— উহা এখনও পাইসার মন্দিরে বর্ত্তমান আছে। গেলিলিও

দেখিলেন যে, ঝুলান আলোকটি আস্তে আস্তে এদিক্ ওদিক্ করিয়া ছুলিতেছে, কখন অল্প দুলিতেছে, কখন বা বেশী দুলিতেছে। অনেকক্ষণ দেখিবার পর তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, অল্পই দুলুক অথবা বেশীই দুলুক একবার এদিক্ হইতে ওদিক্ অবধি দুলিতে যেটুকু সময় লাগিতেছে তাহা বরাবরই সমান। একবার পুরা দুলিতে যে সময় লাগিতেছে, আর একবার তাহার কমবেশ হইতেছে না। এইটি লক্ষ্য করিয়া গেলিলিও বাটী ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এইত বেশ একটা সময় হিসাব করিবার নির্ভুল উপায় পাওয়া গেল। এখন ইহা কেমন করিয়া কাজে লাগান যাইতে পারে তাহাই দেখা যাউক। গেলিলিও বাটী আসিয়া লম্বা লম্বা সূতার একদিকে ভারী ভারী ভাঁটা বাঁধিয়া পেরেকে ঝুলাইয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন যে সূতা যদি এক সমান লম্বা থাকে তাহা হইলে ভাঁটা কম বেশী ভারী হইলে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাহারা সকলেই একবার দুলিতে একই সময় লয়। একবার দুলিতে যে সময় লইবে ১০০ বার দুলিতে তাহার ১০০ গুণ সময় লইবে। আর সূতা ছোট করিয়া দিলে একবার দুলিবার সময়ও কম হইয়া যায়। ইহাই গেলিলিওর আবিষ্কৃত 'পেণ্ডুলাম'। একটি পেণ্ডুলামের দুলিবার সময় ঠিক ধরা বাঁধা আছে, তাহার কম বা বেশী হইবে না। এখন গেলিলিওর ঘড়ির কথা বলিব।

আমরা যাহাকে ঘড়ি বলি, এরকম ঘড়ি গেলিলিওর সময়ে ছিল না। খানিক সময়, যেমন ১০ মিনিট কি ১৫ মিনিট সময়ের মাপ ছিল। বালির অথবা জলের ঘড়ি ব্যবহার হইত। দুইটি পাত্র উপর নীচে করিয়া জোড়া থাকিত, এবং মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকিত। খানিক বালি অথবা জল উপরের পাত্রে রাখিলে চুর চুর করিয়া নীচের পাত্রে পড়িতে থাকিত এবং সব বালি বা জল পড়িতে একটা সময় লইত। আবার উল্টাইয়া দিলে আবার পড়িত। এই রকমে একটা সময়ের মাপ হইত। এই বালির ঘড়িতে একটা মোটামুটি সময়ের আন্দাজ হইত মাত্র।—খুব সঠিকভাবে অল্প সময় মাপিবার

উপায় ছিল না। কিন্তু পেণ্ডুলামে তাহা হইতে পারে। গেলিলিওর পরে ঘড়িতে এই পেণ্ডুলাম লাগান হয়।

শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী ও তাহাদের উৎপত্তি।

(শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)

এই রাজ্য সমষ্টির সংখ্যা ২৮। ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন্ কোন্ দেশীয় রাজ্য আছে এবং এই পার্ব্বতীয় রাজ্যগুলি তাহাদের মধ্যে কোন্ অংশ অধিকার করে এবং তাহারা পঞ্জাব ছোট লাটের কোন্ কোন্ প্রতিনিধির অধীনে বর্ত্তমান আছে সে বিষয় প্রথমে জানা আবশ্যক।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে ৫টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা—

(১) পাতিয়ালা, ভাওয়ালপুর, ঝিন্দ; নাভা—ইহারা ফুল্‌কিয়ান ষ্টেটের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের অধীন।

(২) কপুর্থলা, মালেরকোটলা, মণ্ডি, সুকেত্ ও ফরিদকোট, জালন্ধর বিভাগের কমিশনারের অধীন।

(৩) শিরমুর, কালসিয়াহ, লোহারু, দুজানা ও পাতৌদি, দিল্লীর কমিশনরের অধীন।

(৪) চম্বা লাহোর বিভাগের কমিশনারের অধীন।

(৫) শিমলার অধীন পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি শিমলার ডেপুটী কমিশনরের অধীন।

ইহা ব্যতীত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মুলতান ও ডেরা-গাজী খাঁর কমিশনারদ্বয়ের অধীন আছে।

এই স্বাধীন ও অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে শিমলার অধীন পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি এযাবৎকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। যদিচ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নরপতিগণ সামান্য ভূম্যধিকারী কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলেই কয়েক সহস্র রাজস্ব-সম্বলিত ক্ষুদ্র-ভূম্যধিকারীও রাজ্যেশ্বর রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশে এরূপ ভূম্যধিকারী অসংখ্য আছেন কিন্তু তাঁহাদিগকে গণনার মধ্যেই আনা হয় না, কারণ পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল রাজ্যেশ্বর ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হইলেও প্রায় সকলেই রাজবংশীয়। বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস থাকিলে বাঙ্গলারও অনেক জমিদার প্রাচীন রাজবংশ হইতে আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিতে পারিতেন।

যাহা হউক এই রাজ্যগুলি সংখ্যায় ২৮টি যথা—বিলাসপুর, বসাহর বা বাসহর, নলাগড় (হিন্দোর), কেঁওথাল, বাঘহাল, বাঘহাট, যুব্বল, কুমারসেন, ভজ্জি, মৈলোগ বাল্‌সান, ধামি, কুটহর, কুনিহর, মঙ্গল, বিজা, ঘারকুটি, তরোচ, সঙ্গরি, কানি, দান্তি, কোটী, থিওগ, মাধান, ঘোন্দী, রতেশ, রইন, এবং ধাদি।

এই রাজ্যসমষ্টি ইংরাজ রাজের অধীনে Hill States নামে পরিচিত। ইহাদিগের অধ্যক্ষ (Superintendent) শিমলার ডেপুটী কমিশনরের অধীন। শিরমুর বর্ত্তমান সময়ে শিমলার ডিপুটী কমিশনরের অধীন না হইলেও ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী পার্ব্বত্য স্বাধীন রাজ্য এবং এক সময়ে ইহা Hill Statesর অন্তর্গত হওয়ায় আমাদের বক্তব্য স্থানীয় হইতে পারে।

এই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও বহু পুরাতন, কিন্তু হিমালয়ের হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ কবে লোকবসতির উপযুক্ত হইয়া উপনিবেশ স্থাপনের উপযোগী হইয়াছে তাহার সম্যক্ ইতিহাস পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, মনোহারিত্বে এবং নির্জ্জনতায় তপোবনবিহারী তাপসদিগের আশ্রমস্থানীয় হইয়া আসি-

য়াছে। ক্রমশঃ লোকে সভ্যতার প্রসারণের সহিত এই স্থানের খনিজ বিভবের আকর্ষণেই হউক বা রাজনৈতিক অন্যান্য কারণেই হউক এই সকল স্থান ক্রমে জনসমাজে সুপরিচিত হওয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছে। আমাদের দেশের একটা প্রধান দোষ, এ দেশের লোকেরা কোন যুগেই আপনাদের সম্যক্ ইতিহাস রাখিয়া যান নাই। আমাদের ইতিহাস অপর দেশের নিঃস্বার্থপর মহাত্মাগণের প্রাণান্তপণ চেষ্টায় জানিতে পারি। জেনারেল কানিংহ্যাম তাঁহার Ancient Geography of India এবং Archeological Survey Reports এ এই সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের কতক কতক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে সকল বিবরণ অসম্পূর্ণ হইলেও অনেক বিষয় জানা যায়। রামায়ণের কৌলুট, বিষ্ণুপুরাণের কুলুট এবং হিয়ংসিয়াঙ্গের Kui-lu-to তাঁহার মতে কাংগ্রা প্রদেশের কুলু নামক স্থানকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। বহু পুরাকাল হইতে এমন কি বৌদ্ধযুগের মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্ব হইতেও এ সকল প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের বিদ্যমানতা স্থির করিতে পারা যায়। রাজস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় রাজপুত জাতি মহাভারতের সময়ের পূর্ব্বে চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ হইতে আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিয়া থাকে। ঐ রাজপুত জাতিই পরে এই সকল প্রদেশ বন্যার মত প্লাবিত করিয়াছিল। আজও পর্য্যন্ত অত্রস্থ রাজবংশগুলি আপনাদের উৎপত্তি সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ এবং মহাভারতোক্ত জাতিবিশেষ হইতে অনুসরণ করিয়া থাকে। কানিংহাম যে Katoch জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে কোন ক্ষত্র জাতি বলিয়া ধরিতে পারা যায়। বহু পুরাকাল হইতে কাংগ্রা এই সকল রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া আসিতেছে। মহাভারতের 'ত্রিগর্ত্ত' প্রদেশকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইদানীং কাংগ্রা * ও তাহার অধীন রাজ্যগুলি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

* দুঃখের বিষয় এতদিন পরে কাংগ্রার প্রাচীন দুর্গ ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।—লেখক।

কাল্পনিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক যুগেও প্রামাণিক সংবাদ পাওয়া যায়। গ্রীস রাজ্যের দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও পঞ্চনদের উত্তরস্থিত পার্ব্বত্যরাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দিগ্বিজয়ী শিলাদিত্য উত্তরে সমস্ত পার্ব্বত্য রাজ্য এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা তাঁহার ইতিহাসে বলেন কান্যকুব্জের সমৃদ্ধির সময় কোন কান্যকুব্জাধিপতি কুমায়ুন হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত রাজ্যগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। হিয়ংসিয়াঙের সময় পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি স্বাধীনতা হারাইয়া জালন্ধরাধিপতির সামন্ত রাজ্যরূপে বিরাজমান ছিল। হিয়ংসিয়ঙ্গ কিউলুটু নামক যে প্রধান রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ঐতিহাসিকেরা তাহাকে বর্ত্তমান কুলু, বাঙ্গাল, বসাহর, মণ্ডি, সুকেত ইত্যাদি রাজ্যের সমষ্টিরূপে স্থির করিয়া থাকেন।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার নির্ণয় সম্বন্ধে ইদানীন্তন কালে প্রবল চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Civilisation in Ancient India নামক পুস্তকে বলিয়াছেন ৮০০ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ উজ্জয়িনীর গৌরব হতমান হওয়ার পর হইতে মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত ভারতের বিশেষ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি তাহাকে অন্ধকার যুগ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের সময় উত্তর ভারত প্রায় সমস্তই রাজপুত জাতির অধীন ছিল এবং ইহাও আশ্চর্য্য নয় যে সেই সময় হইতেই এই সকল প্রদেশে রাজপুত জাতির প্রভাব সমধিক ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। Hill State গুলির প্রায় প্রত্যেক রাজবংশের আদিপুরুষকে এই সময় হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমান অধিকারে এই সকল রাজ্য অধিকাংশ স্থলে দেওয়ানী বা জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল। শাহজাহান ও আরঙ্গজেবের বহু পত্রাদি এখনও ঐ সকল প্রদেশে পাওয়া যায় যাহাতে পার্ব্বত্য নৃপতিবৃন্দকে দেওয়ান বা জমিদার রূপে সম্ভাষণ করা হইয়াছে।

আবার অনেক সময়ে তাহারা সম্রাটের অধীনে রাজকার্য্যেরও অংশবহন করিয়াছেন। মহম্মদ গজনবীর প্রথম ভারতাক্রমণ হইতে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পর পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে দিল্লীশ্বরের রাজশক্তি সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভাগ্যনেমীর আঘাতে বহুবার তাঁহাদের অদৃষ্টপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সময়ে জালন্ধরের রাজশক্তি অন্তর্হিত হইয়া কাংগ্রা পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির কেন্দ্রস্থলরূপে বরিত হইয়াছিল। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গজনবী কাংগ্রার বিখ্যাত নগরকোট মন্দিরের ধনৈশ্বর্য্যের সংবাদ পাইয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে তোগলকবংশীয় সম্রাট্ ফিরোজউদ্দিন একবার পার্ব্বত্য প্রদেশ জয় করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সম্রাট্ আকবরের মিলন ও সাম্যনীতি পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিকে একেবারে রাজশক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফেরিস্তা তাহার কিছু সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তদবধি এই সকল প্রদেশ মোগল সম্রাটের সামন্ত-রাজ্যরূপেই অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। অধীনতা কাহারও প্রিয় হয় না। সম্রাট্ জাঁহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পার্ব্বত্য নৃপতিগণ একবার অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের সামরিক শক্তির নিকট পরাভূত হন। এই সময় হইতেই এই সকল স্থান সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। রাজপুতনার উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমি ও নিদাঘে রাজধানী আগ্রার জ্বালাময়ী উত্তপ্ত বায়ুর সহিত হিমালয়ের ফলপুষ্পশোভান্বিত শীতল ও শ্রান্তিনিবারক সমীরণস্নিগ্ধ উপত্যকাভূমিগুলির তুলনায় সম্রাট বড়ই প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেন। এমনকি চম্বা, কাংগ্রা, মণ্ডি এই সকল স্থানের কোন একটি স্থানে তাঁহার গ্রীষ্মরাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীর চিরকালই আপনার গৌরব মস্তকে বহন করিয়া সম্রাটকে আকর্ষণ করিয়া লয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে পার্ব্বত্য নরপতিগণ বিশেষ ক্ষমতালাভ করিয়া অৰ্দ্ধস্বাধীনরূপে

আপনাদের রাজত্বে বাস করিতেন। নূরপুরের * রাজা জগৎসিংহ এই সময়ে পার্ব্বত্য নৃপতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ক্ষমতা, শৌর্য্য ও মহৎগুণে সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। রাজা জগৎসিংহের পৌত্র রাজা মানসিংহ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁহার একজন প্রধান মনসবদার হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাংগ্রার রাজা ঘেমন্ত সিংহ আহমদ্ শাহ দুরানী কর্ত্তৃক শতদ্রু হইতে ইরাবতী (রাবি) পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস সকলেই বিদিত আছেন। রাজশক্তির পতনের সহিত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ স্বীয় স্বীয় প্রদেশেই সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইতে লাগিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ইহলীলা সম্বরণ করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজের শনৈঃ শনৈঃ ভারত-সিংহাসন অধিকার করা পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের ইহাও একটি অন্ধকার পর্য্যায়। এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশবাসী আক্রমণ-কারীর অত্যাচারে মোগলের সঞ্চিত ধনরত্ন বার বার লুণ্ঠিত হইয়াছে। সুশাসনের অভাবে ও রাজ্যের এই অব্যবস্থিত অবস্থার সময় অনে-কেই দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সুযোগ ও সুবিধা পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই ও এই অবসরে তাহারাও আপনাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আহমদ্ শাহ দুরানীর দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণের সময়—নবাব সৈয়ফ আলি

* নূরপুর বর্ত্তমান কাংগ্রা জিলার অন্তর্গত নূরপুর মৌজার প্রধান নগর। কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের নামানুসারে ইহার নূরপুর নাম-করণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাট্ নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীরের নামেই প্রসিদ্ধ।

খাঁ পার্ব্বত্য প্রদেশগুলির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজ্যের হস্তান্তরের সহিত তাঁহারও ক্ষমতার হস্তান্তর হয় এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে * তাঁহার মৃত্যুর সময় সংসার চন্দ্র কাংড়ার অধিপতি ছিলেন। এই সংসার চন্দ্রই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রধানস্থানীয়, কারণ, তাঁহার সময় হইতেই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে।

নবাব সাহেবের মৃত্যু হইলে সংসার চন্দ্র কাংড়া দুর্গ অবরোধ স্থাপনে বিলম্ব করেন নাই, কিন্তু দুর্গের ধ্বংস সাধনে তাঁহার ক্ষমতায় সঙ্কুলান না হওয়ায়—সর্ব্বত্র সকল সময়ে যেমন হইয়া থাকে এখানেও সেইরূপ স্বার্থবলিদান অপেক্ষা স্বার্থসাধনই তাঁহার নিকট কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। সংসার চন্দ্র মন্দ লোক ছিলেন না। তাৎকালীন পার্ব্বত্য নৃপতিগণমধ্যে গুণে ও ক্ষমতায় উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার সহিত যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে উহা অনেক সময় নিজের ও আশ্রিতবর্গের বিপদের কারণ হইয়া উঠে। বহুকাল হইতে পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ কাংড়ার করদ রাজ্যরূপেই অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। কাংড়াদুর্গ জয়পূর্ব্বক, সম্পূর্ণরূপ কাংড়া সিংহাসন অধিকার করিতে পারিলে পরম্পরাগত প্রথানুযায়ী ঐ সকল রাজ্যের অধিপতি হইবার বাসনা সংসার চন্দ্রের মনে বলবতী হইতে থাকে। সংসার চন্দ্র কাংড়াদুর্গ স্বয়ং জয় করিতে না পারায় তাৎকালীন সমৃদ্ধিশালী শিখদের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সে সময়ে একবারও তাঁহার মনে হয় নাই যে, গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য বিজাতি বা বিদেশীকে গৃহ মধ্যে আনিলে কোন পক্ষেরই গৃহমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সে বিশেষ বাধ্য থাকে না। সংসার চন্দ্র রণজিৎসিংহের

* Barnes' Settlement Report. Sir L. Griffin তাঁহার Punjab Chiefs নামক পুস্তকে নবাবের মৃত্যুকাল ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ধরিয়াছেন, এস্থলে Barnes সহিত তাঁহার ঐক্য হইতেছে না।

অধীনে পঞ্জাবের শাসনকর্তা সরদার জয়সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে তিনি এবম্বিধ সুযোগ ত্যাগ না করিয়া সরদার গুরুবক্স সিংহকে সংসার চন্দ্রের সাহায্যার্থে পাঠান। গুরুবক্স সিংহ তাঁহার জাতীয় প্রকৃত্যানুযায়ী ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সংসার চন্দ্রের জন্য নহে, স্বীয় প্রভুর জন্য এবং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজ তত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর কাংগ্রা তাহার ন্যায্য অধিপতির অধীনে আসে।

সংসার চন্দ্র এতদিন পরে তাঁহার কল্পনার পরিণতি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ তিনি মোগল রাজসভার অনুকরণে তাঁহার রাজসভায় করদ রাজগণের বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজাধিরাজকে সম্মান প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইবার নিয়ম প্রচলিত করেন। যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে স্বীয় অবস্থানুযায়ী সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে হইত। ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে তিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর প্রায় সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াও তাঁহার ক্ষোভ নিবৃত্তি না হওয়ায় মহারাজ রণজিৎসিংহের রাজ্য সীমান্তে তাঁহার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হোসিয়ারপুর আক্রমণের চেষ্টা করেন; সেখানেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বত্য রাজ্য বিলাসপুর বা বর্ত্তমান কৈহলুরের উপর আপতিত হন। কৈহলুরের তাৎকালীন অধিপতি রাণা মহাচন্দ্রসিংহ সে অপমানের প্রতিফল প্রদানে সক্ষম না হওয়ায় গুর্খাদিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিয়া পাঠান। এই নিদারুণ ঘটনা পার্ব্বত্যরাজ্যের ইতিহাসে অতীত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে বিভাগরেখার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই অবসরে এতৎ প্রদেশে গুর্খাদিগের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাসমর ভারত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। কিরূপে হিমালয়ের স্বাধীন নেপালরাজ ও

অসাধারণ বিক্রমশালী নেপালীকে ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাও জানিবার বিষয়। স্বাভাবিক নিয়মে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে একদিন উন্নতি বা সৌভাগ্যের শুভ মুহূর্ত্ত সমাগত হইয়া থাকে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" এই প্রাচীন ভারতে কত জাতি কত রাজ্য ও রাজরাজেন্দ্রগণ একদিন অভ্যুদয়ের শিখরদেশে অবস্থিত ছিলেন—আজ তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জানিতে হয়। নেপালের জীবনেও ঐরূপ একদিন আসিয়াছিল। পূর্ব্বে নেপাল কয়েকজন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৯ খ্রীঃ পৃথ্বীনারায়ণসিংহ গুর্খা জাতির অধিপতি ছিলেন। ইঁহারই সময় হইতে নেপালের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির সময়। এই সময় তিনি রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং তাঁহার জীবিতকাল মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি নেপালকে উন্নতির উচ্চ সোপানে রাখিয়া যান। ১৭৭১ খ্রীঃ তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার দুই পুত্র প্রতাপসিংহ ও বাহাদুর সিংহ। প্রতাপসিংহ অধিক দিন পিতৃসিংহাসন ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৭৭৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রতাপসিংহের পুত্র রণবাহাদুর সিংহ ১৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করেন। এই সময়ে গুর্খাগণ বিশেষ পরাক্রান্ত ও ক্ষমতাদৃপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ গুর্খাগণ নেপাল হইতে বহির্গত হইয়া একদিকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্য্যন্ত অপর দিকে তিব্বত পর্য্যন্ত একাধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল। পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি সে সময়ে একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। নেপাল পক্ষে বীরাগ্রগণ্য অমরসিংহের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। পার্ব্বত্যরাজ্যের অধিকাংশ তাঁহারই বাহুবলে জিত। নেপালযুদ্ধের সময় তিনিই ইংরাজদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক কাংগ্রাধিপতি সংসারচন্দ্র যখন বিলাসপুর আক্রমণ করেন সে সময়ে বিলাসপুরাধিপতি অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী ক্ষমতাশালী গুর্খাদিগকেই আহ্বান করিয়া পাঠান। গুর্খাগণ এ

সুযোগ ত্যাগ করে নাই। সংসারচন্দ্র যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীঃ বৈশাখ মাসে মহলমোরীর নিকট প্রথম যুদ্ধেই সংসারচন্দ্র পরাজিত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিন বৎসরকাল গুর্খাগণ এতদ্প্রদেশে যৎপরোনাস্তি লুণ্ঠন করিতে থাকে। সংসারচন্দ্র কিছুতেই ইহাদের দমন করিতে না পারায় অবশেষে আবার রণজিৎসিংহের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন। শিখরাজ এবারও এ সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। ১৮০৯ খ্রীঃ শ্রাবণ মাসে কাংগ্রার সমতলভূমিতে শিখরাজের ভুবনবিখ্যাত খাল্‌সা সৈন্যের সহিত গুর্খাদিগের লোকধ্বংসকারী এক যুদ্ধ হয়। বহু আয়াস ও কৌশলের পর শিখসৈন্য গুর্খাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধ শেষের সহিত সংসারচন্দ্রের স্বাধীনতারও শেষ হয় এবং তাঁহার অধঃপতনের সহিত তাঁহার রাজ্যের ও সামন্ত রাজন্যবর্গেরও অধঃপতন সাধিত হইতে থাকে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সমস্ত পার্ব্বত্য রাজ্যেই আপন প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে বিলম্ব করেন নাই।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বৈষ্ণব-দর্শন।

(শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, এম.এ)

পূর্ব্বভাষ।

(১)

বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কিন্তু এই ধর্ম্ম কোন্ সময় হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার যথাযথ ক্রম জানিবার কোন বিশেষ উপায় নাই। বৈদিক যুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার কোনরূপ বিবরণ অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। ইহার পরযুগে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল একথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালীন

বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। প্রত্যুত বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিলে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া বাতুলতার কার্য্য। এই যুগের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম-পদ্ধতি অথবা বৈষ্ণব-দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই। তবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সে সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের দিক্ দিয়াই দেখ আর ভক্তির দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে নিবদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান জ্ঞানেরও যেমন চরম, ভক্তিরও তেমনই চরম। কিন্তু সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভেদে এই বাক্যের অনুভবের পার্থক্য আছে, আর সেই অনুভব লইয়া চিত্ত-বৃত্তির প্রবাহেরও পার্থক্য আছে। উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয়ে ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মনিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমেই সবিশেষ ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উক্ত দার্শনিক হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপথেই শ্রুতিবাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

'সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সবিশেষ ব্রহ্মকেই ভক্তিমার্গের ভিত্তি করিয়াছেন।...জীব ও জগৎ লইয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। জীব ও জগৎ লইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব ও জগৎ লইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সাধনা ও অনন্তলীলা। সেই সাধনা ও সেই লীলার সাধারণ নাম বৈষ্ণব-দর্শন বা ভক্তি।'

ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ। যাস্কের নিরুক্তের উপর দেবরাজ যজ্বের নির্ব্বচন টীকায় দেবতাদিগের সংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে—"দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ" অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারাই দেব।

আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনা-কাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বলদেবপ্রমুখ বেদান্তদর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষৎকেই তাঁহাদের মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ ও চতুর্ব্বেদশিক্ষায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। নীলকণ্ঠ মহাভারত-ভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তা নয়। বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভক্তিশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ "এই যে সমস্ত সত্যের কথা বলা হইল এগুলি যদি এরূপ মহাত্মার নিকট কীর্ত্তিত হয় যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি আছে—এবং ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে,—তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইবে।" এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলা হইয়াছে। অধুনা আমরা যাঁহাকে ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া থাকি শ্বেতাশ্বতরের 'দেব' বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই উপনিষৎখানি অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের পরবর্ত্তী কালের—কিন্তু ভগবদ্গীতার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। আমার মনে হয়, এই শ্লোকের ভক্তি শব্দ হইতেই পারিভাষিক ভক্তিশব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আর এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নূতন ধর্ম্মমত বুঝাইবার জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে অনেক সময় তৎকালপ্রচলিত শব্দ হইতেই পরিভাষা প্রণয়নের রীতি দেখা যায়। তখন সেই পরিভাষার অর্থ পুরাতন অর্থকে একেবারে ছাটিয়া ফেলিয়া না দিলেও ইহা নূতনত্বের একটা বিশিষ্ট বিশেষত্বই বজায় রাখিয়া দেয়।

এমন কি পাশ্চাত্য গ্রীক ধর্ম্ম বা রোমানক্যাথলিক ধর্ম্ম অথবা English Evangelical Schoolএও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে ভক্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষতঃ নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে মুমূর্ষু ভীষ্মের উক্তিতে, সংজ্ঞাত্মক ভক্তি শব্দের উল্লেখ আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র ভক্তিরই উপদেশ আছে তা নয়, তবে সংস্কৃত সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে, বলিতে হয় গীতার পূর্ব্বে স্পষ্টতঃ ভক্তিতত্ত্ব কোথাও উপদেশ করা হয় নাই। ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে ভক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট ভক্তিশব্দ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেরূপে বিকসিত হইয়াছিল এবং তাহা যেরূপে প্রচলিত ছিল ভগবদ্‌গীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হইলেও ইহাই তাহার বিশেষত্ব। উপনিষদ্‌নিচয়ে মন, সূর্য্য, চন্দ্র বা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, অন্ন প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাসনার কথা আছে। অনুরাগের সহিত এইরূপ উপাসনা দ্বারা উপাসিতব্য পদার্থকে এত বড় করিয়া এমনই গৌরবান্বিত করিয়া তোলে যে তাহাতে উপাসকের হৃদয়ে তদ্‌বস্তুর প্রতি একান্ত প্রশংসা—ভালবাসার উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" (১।৪।৮)

এই অন্তরতম আত্মা পুত্র, ধন এবং অন্য সমস্ত যাহা কিছু তদপেক্ষা প্রিয়।

এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে—

"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।

স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"—"ইনি সেই মহান্ অজ আত্মা যিনি প্রাণাদির মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অন্তরাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সকলের বশী, সকলের শাসক, সকলের অধিপতি। সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করিয়া তিনি সাধু বা অসাধু হন না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি লোক-সমুদয়ের পরস্পর সংযোজক সেতু এবং তিনিই ইহাদের সম্ভেদ নিবারণ করিয়া ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বেদবচন দ্বারা যজ্ঞ, দান ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন তিনি মুক্ত হইয়া যান। প্রব্রাজিগণ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এই নিমিত্তই পূর্ব্বে জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না—তাঁহারা বলিতেন—যখন আমরা এই আত্মাকে পাইয়াছি, এই লোক বাসের জন্য পাইয়াছি তখন প্রজা লইয়া আমরা কি করিব? এই জন্যই তাঁহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।" এখন বলুন দেখি, যখন এই প্রাচীন জ্ঞানিগণ সেই ভূমা ব্রহ্মে অবস্থিতি করিবার জন্য, তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য, পৃথিবীর সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্জ্জন করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা কিসের প্রেরণায় এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন? ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রণোদিত না হইয়া কি ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? 'ভক্তি' শব্দ স্পষ্ট না থাকিলেও ভক্তিভাব যে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে ও মানব হৃদয়ে পরমাত্মা-দর্শনজনিত আনন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত

ওজস্বিনী উক্তির মূলে কি এমন কোন ভাব নাই যাহা ভক্তিপদ-বাচ্য? আর ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি যখন উদাত্তস্বরে উদ্গীত হইয়াছিল তখন ঋগ্‌-রচয়িতা ঋষিদিগের হৃদয়ে ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি একটা ভক্তির ভাব, ভালবাসার ভাব সর্ব্বদা জাগরূক ছিল ইহা কে অস্বীকার করিবে? "দ্যৌ তুমি আমার মন্দ ঘুচাইয়া দাও"—"পিতা যেমন পুত্রের সুলভ তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ সুগম হও।" সেই অদিতি—অসীমই আমার দ্যৌ, অন্তরীক্ষ—অদিতি আমার পিতা, মাতা, পুত্র:—"অদিতি র্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা পিতা পুত্রঃ" (ঋক্ ১।৮৯।১০)। দ্যৌ আমার জনিতা পিতা—"দ্যৌর্মে জনিতা পিতা" (ঋক্ ১।১৬৪।৩৩)।

এই যে প্রার্থনা এগুলি কি প্রতিপন্ন করিতেছে? যদিও পরবর্ত্তী যুগের যজ্ঞীয় কর্ম্মকাণ্ড এই সমস্ত ঋষিবচনের ভাবগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া শুধু মুখস্থ সূত্রে পরিণত করিয়াছিল, তথাপি এই ঋগ্‌রচনগুলি প্রথমে ঈরিত হইবার সময় ঋষিদিগের হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছিল তাহার ক্রম ভঙ্গ হয় নাই—তাহা বরাবরই চলিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য থমকাইয়া থাকিলেও সেই ভাব পুনরায় আশ্চর্য্যভাবের সহিত মিলিত হইয়া উপনিষদের সময় দেখা দিয়াছিল। তবে এই ভাবের অস্তিত্ব যে উপনিষদের পূর্ব্বে ছিল না একথা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মুণ্ডক উপনিষদ্ ঋক্‌সংহিতার ১।১৬৪।২০ ঋকের পুনরুক্তি করিয়া রূপকের ভাষায় বলিয়াছে—"দুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপর ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায় তখন সে তাহার মহিমা অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।"

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ॥
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্যমহিমানমিতিবীতশোকঃ॥'

মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে এবং কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ শ্লোকে উপদেশ করিতেছে—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাম্।"

'এই আত্মাকে প্রবচন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই বরণ বা পাইবার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসনা তাহা দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার নিকটে আপনার স্বরূপ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।'

বৃহদারণ্যক (৩।৭) ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদেও (৩।৮) এইরূপ ভক্তিভাবদ্যোতক শ্লোক আছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপনিষদের সময় এইরূপ একটী মত প্রচলিত ছিল যে জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন এবং জীবাত্মা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য লালায়িত। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবদ্গীতায় ঐকান্তিকধর্ম্মের সমস্ত উপকরণই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দার্শনিক সাহিত্যে নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য ভালবাসা অর্থে ভক্তিশব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। গীতা যে সর্ব্বদর্শনসমন্বয় গ্রন্থ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গীতাতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত হইয়া সপ্রমাণ করিতেছে যেন এই দুইটী মত পূর্ব্বে সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ ছিল।—

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।"

'তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা সাংখ্যের অন্তর্গত, এক্ষণে যোগশাস্ত্রে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর।' গীতা যে পদ্ধতিতে লিখিত তাহাতে ইহাকে দর্শন-সমন্বয়-গ্রন্থ বলা অন্যায় নয়। তবে ইহাতে সর্ব্বোপরি একটী নূতন তত্ত্বের বীজ উপ্ত আছে—তাহা মাত্র

অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই তত্ত্বটী ভগবদ্বিগ্রহে ভক্তি। এ ভক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি নয়—ইহা সবিশেষ ভগবানের প্রতি। গীতা ব্রহ্মের সগুণ ও নিগুর্ণ উভয় ভাবেরই কথা অন্যত্র বিবৃতি করিয়াছে। কিন্তু ভক্তি সম্পর্কে সগুণ ব্রহ্মকেই বিশেষ করিয়াছেন। বাস্তবিক "অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্কম্প, প্রশান্ত নিথর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নিগুর্ণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচিবিক্ষুব্ধ সফেন তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ। একই ব্রহ্ম কখনও নিগুর্ণ—কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম-মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ-সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নিগুর্ণ—নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা, পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাগ। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।' (ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ, ১৪ পৃঃ) পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতায় ভক্তিবাদের অঙ্কুর মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে পরযুগের বিবৃতি বা উচ্ছ্বাস আদৌ নাই সত্য তথাপি ইহা যে ধর্ম্ম ও দর্শনের চিন্তাধারায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে গীতাই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়েই ভক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর এই অধ্যায়ই বিরাট্রূপ দর্শনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়। বিরাট্রূপদর্শনের পর ভক্তি ব্যতীত বোধ হয় আর কোন বিষয়ের অবতারণা যুক্তিযুক্তও হয় না। যাহা হউক এই অধ্যায়ে "ভক্তি" শব্দের মাত্র দুইবার উল্লেখ আছে, আর সমগ্র গীতায় এই শব্দের উল্লেখ ১৪ বার মাত্র (৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোকে, ৮ম—১০, ২২; ৯ম,—১৪, ২৬, ২৯; ১১শ—৫৪; ১২শ—১৭, ১৯; ১৩শ—১০; ১৪শ—২৬; ১৮শ—৫৪, ৫৫, ৬৮)। অবশ্য ভজ্ ধাতু-নিষ্পন্ন 'ভক্ত' ও 'ভজামি' পদের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া

যায়। দাগ্রহ পূজার্থেই ভজ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভক্তি শব্দের দুইটী অর্থ হইতে পারে। একটী অর্থ (১) পূজনীয় বিষয়ে অনুরাগ, পূজা, সেবা। এটী সামান্য অর্থ। আর একটী অর্থ পারিভাষিক—(২) ভগবানে বিশেষরূপ অনুরক্তি। গীতায় উল্লিখিত ১৪টী উদাহরণে ভক্তি এই পারিভাষিক অর্থে সকল স্থানে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয় না। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে সম্ভবতঃ পারিভাষিক অর্থে ভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই। ৯ম অধ্যায়ের ২৬ ও ২৯ শ্লোকে ভক্তি বিশেষরূপ পূজানুরক্তি অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। এই শ্লোকের সমস্তটুকু উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ। ২৬
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি। ২৮
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥" ২৯

পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ; আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

এই শ্লোকে ভক্তির অর্থ অন্যরূপ। ইহার যদি পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এখানে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। গীতার এই শ্লোকটী পড়িলেই যে, মদ্যি প্রভৃতি পদের প্রতিই প্রথম লক্ষ্য হয়। ভক্তিযোগাধ্যায়ে ভক্তির ব্যাখ্যা আমাদের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই। এইখানে এবং অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে; অমুক ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়; কিন্তু কোথাও এরূপ উক্তি নাই যে ভগবান্ মানুষের প্রিয়, আর মানুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আত্মাকে ভগবানে অর্পণ এবং আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তু ভগবানে সমর্পণ—ইহাই গীতার ভক্তি। পরস্পরের প্রীতির আদান প্রদানের ব্যাপারও গীতাতে অভিব্যক্ত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ, আর গীতার ভক্তিই ভক্তির প্রথম তরঙ্গ। ইহার পর সহস্র বৎসরের মধ্যে ভক্তির অভিব্যক্তির আব কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। গীতার সময় বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর। গীতা-রচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কৃষ্ণতত্ত্বে আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। গোপাল-কৃষ্ণের পূজার নিদর্শন কবি ভাসের কাব্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছি। গোপালকৃষ্ণের পূজা অবলম্বন করিয়াই ভক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে সাহিত্যে সেই অভিব্যক্তির লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। গোপালকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই দ্বিতীয় তরঙ্গের ভক্তির অভিব্যক্তি। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের প্রবৃত্তি। দ্বিতীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে বলিবার মত বিশেষ কিছু উপাদান, উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই—সুতরাং সে সম্বন্ধে অধুনা নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির নানারূপ ব্যাখ্যা, বিবৃতি, বিস্তৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই

সময় হইতেই ধর্ম্মে আবেগ—উচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি। দক্ষিণ ভারতে "শ্রীরামচন্দ্র" ভক্তদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—উত্তর, মধ্যভারত ও বঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণ—দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম কর্ণাটে "বিঠ্‌ঠল" সাধক ভক্তদিগের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের বিবৃতিব্যঞ্জক যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে নারদপঞ্চরাত্র ও স্বপ্নেশ্বর টীকাসম্বলিত শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তিসূত্র বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নারদপঞ্চরাত্র মহাকাব্যের ধরণে একখানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে যে নারদকে সাধ্য সাধনা করিয়া কৈলাসে পাঠান হইল; উদ্দেশ্য, তিনি স্বয়ং শিবের সহিত কৃষ্ণপূজার প্রয়োজন সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আসিবেন। কৈলাসে একটী বেশ দৃশ্যের অবতারণা। পৌরাণিক সমস্ত দেবতাকে লইয়া কৃষ্ণের স্তুতিগান। এখানি ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবশ্য পাঠ্য পুস্তক—ইহাতে বহু কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রার্থনার একটা প্রকাণ্ড বিবরণ আছে। এইগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থখানিকে নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের রচনাভঙ্গী একেবারে হীন ও অধম। নারদ যখন বনভূমির মধ্য দিয়া যাত্রা করিতেছেন, তখন ৮৪ প্রকার বৃক্ষের বিবরণ ইহাতে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ, প্রত্যেক শ্লোকে এত পুনরুক্তি এরূপ বিকট রকমের অলঙ্কার যে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিয়াও নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া থাকা যায় না।

তারপর ভক্তিসূত্রের কথা। সূত্রকার বা টীকাকারের সময় জানিতে পারি নাই। এই সূত্রগ্রন্থ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেই রচিত হইয়াছিল। সূত্রকার ভক্তির ভাব সম্পূর্ণ ভাবে কীর্ত্তিত করিয়াছেন। সূত্রগুলি যদিও প্রাচীন সূত্রের আকারে রচিত তথাপি ইহা যে ১১শ খ্রীষ্ট শতকের পূর্ব্বের গ্রন্থ নয় তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার বিশ্বাস সূত্রকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি। প্রথম সূত্রেই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। "অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা"- কোন কোন সংস্করণে আছে— অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

ইহার টীকা হইতেছে, "অথেত্যধিকারার্থো নানন্তর্য্যার্থঃ। আনন্তর্য্যং হি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নস্য আনিন্দ্যযোন্যধিক্রিয়তে ক্ষমাণত্বাৎ।"—ভক্তি লাভের জন্য প্রারম্ভে বেদপাঠ বা যোগাভ্যাস প্রভৃতির আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে—"ঈশ্বর ইতি প্রকৃতাভিপ্রায়ং। 'আরাধ্যবিষয়ক-রাগত্বমেব সা" আরাধ্য বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। ঈশ্বরে পরানুরক্তির নামই ভক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই দুই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর-বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই পরানুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরম প্রেম। "নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ"—ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বিকা চিত্তবৃত্তির নাম, ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন। বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ২০শ অধ্যায়ে ১৯, ২০ ও ২১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "হে ভগবান্, আমি যে কোনও প্রকার জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে, অবিবেকীদের বিষয়ে যেমন প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী প্রীতিই অবিচলিত হয়।"

এখানে যে প্রীতি পদের উল্লেখ আছে, ঐ প্রীতি-অর্থে বৈষ্ণবগণ "সুখনিরত রাগ" বুঝিয়া থাকেন। ভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব; সুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না।

ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় নূতন আকারে নিরক্ষর ও নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল এই সময় সমস্তই বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৈষ্ণব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান করিলেন। বৈষ্ণব এই সময় বৃন্দাবনের 'শ্রী' ভাল করিয়া উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদের নিকট তীর্থের সার এবং আশ্রমের

শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙ্গালার বাহিরে ইতঃপূর্ব্বেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম নূতনশ্রেণীর স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক্ষণে বাঙ্গালার সীমার মধ্যে এক বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করিল।—বাঙ্গালা ভাষার উপাদান দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এই শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার মাটিতেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণ ও গোপীকথাকে কেন্দ্র করিয়া গৌরনিতাই প্রেম ও ভক্তির চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভক্তিতরঙ্গ ছুটিয়াছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্যনামে পূজা সেই সময় হইতে চলিতে লাগিল। উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র ও গুর্জর প্রদেশে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ,—হরিদ্বার ও কেদার নাথ হইতে যে পথ গিয়াছে তথায় শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্য্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণভারত মাদ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ একক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তির প্রচার দক্ষিণভারত হইতেই উত্তরভারতে প্রথমে হইয়াছিল। দক্ষিণভারতের পূর্ব্বে পুরুষমূর্ত্তির সহিত স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও ছিল না। এখানকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্ম্ম গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বৈষ্ণবধর্ম্মই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যানবস্তুগুলিকেও বেশ রসান দিয়া লইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণ মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণ মূর্ত্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারিলাটের উপরে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন ইহা সেই নারায়ণ মূর্ত্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও পুনর্বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ নারায়ণ মূর্ত্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবিম্ব।

("বনফুল")

জলহীন পাত্র ছিল—ছিলনাক' কিছু
জলভরা কিন্তু তাহা হ'ল যেইক্ষণে
আকাশের শশীলেখা অমনি সেথায়
হাসিয়া উঠিল যেন আপনার মনে!

হৃদয় নীরস ছিল মরুভূমি সম
প্রেমের মধুরধারা নামিল যেমনি
নিমেষে হৃদয় মাঝে শত সুষমায়
পরমেশমুখশশী ভাসিল অমনি!

ছুটী।

("বনফুল")

'দুদিনের ছুটী যায় দুদিনে ফুরায়ে
কারো দ্রুত—কারো অতি ধীরে।
শত বাধা শত দুখ দলিয়া হেলায়
যায় তাহা আসেনা ত' ফিরে।

জগতের স্বার্থবন্ধ কামনার মাঝে
মানবের নাহি অবকাশ
পরলোক কামনার বাসনার আলা
সেখানেও আশ ও নিরাশ।

জগতের কাছে যবে মরণের কাছে
হৃদয়ের কাছে যবে ছুটী
পূর্ণ অবকাশ তবে মানবের কাছে
সব বাধা সব ভয় টুটি'।

জগত চাহে না যবে—আসেনা মরণ
মায়াহীন হৃদয় যখন
সেই ত' রে অবকাশ মহামুক্তিময়
সুখময় শান্তিময় ক্ষণ।

ধৰ্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমন কি কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে যাহাতে এই দুইটী নিয়মের ব্যভিচার হয় না? আমার মতে, হইতে পারে। আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, আমাদিগকে সামান্যীকরণবাদ (Principle of Generalisation) ও অভিব্যক্তিবাদ (Principle of Evolution) এই দুইটীর সহিত, উহার সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে। আমাদিগকে এমন এক চরম সাধারণ-তত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে, যাহা শুদ্ধ যে নিখিল সামান্যীকরণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকতম তত্ত্ব হইবে তাহা নহে, পরন্তু আর যাহা কিছু সমস্তই তাহা হইতে উদ্ভূত দেখাইতে হইবে - উহা তাহারি সর্ব্বনিম্ন পরিণামের সহিত একপ্রকৃতিক হওয়া চাই। সর্ব্বোচ্চ, চরম, মূলকারণের সহিত সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী কার্য্যের কোন পার্থক্য থাকিবে না - তাহারা একই পদার্থের পরস্পরসম্বদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তের ব্রহ্মে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই। কারণ, ব্রহ্মই চরম ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব— মানবমন আর ইহার উপরে উঠিতে পারে না। ইহা সর্ব্বগুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিরপেক্ষ সত্তা। আমরা দেখিয়াছি, সত্তাই মানবীয় সাধারণতত্ত্ব-কল্পনার চরম সীমা। 'চিৎ' শব্দে আমাদের লৌকিক জ্ঞানকে বুঝায় না—উহা তাহার সারস্বরূপ - যাহা মানবজাতি বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর নানাবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানসমূহের সারকে লক্ষ্য করিয়াই 'চিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাই সেই জগদতীত চরম সত্তা—উহাকে বিজ্ঞান বা সম্বিদ্ বলা যাইতে পারে। চিৎশব্দে উহাই বুঝাইতেছে এবং এইখানেই আমরা বিভিন্ন জাগতিক পদার্থসমূহের স্বরূপতঃ একত্ব

উপলব্ধি করি। আধুনিক বিজ্ঞান পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষাই দিতেছে বলিয়া মনে হয় যে, আমরা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে এক। আমরা শারীরিক ভাবে পৃথক্, একথা বলা ভুল। তর্কের খাতিরে যদিই বা আমরা জড়বাদী হই, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমুদয় জগৎ এক জড়সমুদ্র—তুমি আমি সেই সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত সদৃশ। প্রত্যেক আবর্ত্তে রাশি রাশি জড়পরমাণু প্রবেশ করিয়া আবর্ত্তের আকার ধারণ করিতেছে, আবার জড়পরমাণুরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। আজ আমার শরীরে যে জড়পরমাণু রহিয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হয়ত তাহা তোমাতে, সূর্য্যে, অথবা কোন উদ্ভিদ্‌শরীরে বিদ্যমান ছিল—এইরূপে তাহারা ক্রমাগত স্থানপরিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং তোমার শরীর আমার শরীর বলিয়া আর কি রহিল?—শরীর হিসাবে আমরা এক। চিন্তা সম্বন্ধেও এইরূপ। এক অনন্তবিস্তার চিন্তাসমুদ্র রহিয়াছে—তোমার মন, আমার মন উহার বিভিন্ন আবর্ত্ত সদৃশ। আপনারা কি এখনই দেখিতে পাইতেছেন না, কিরূপে আমার চিন্তা আপনাদের ভিতর এবং আপনাদের চিন্তা আমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে? আমাদের সকলের জীবন এক অখণ্ড বস্তুমাত্র—চিন্তাজগতেও আমরা এক। আরও ব্যাপকতর সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হইলে দেখা যায় যে, জড় ও চিন্তার পশ্চাতে তাহাদের প্রাণবস্তুস্বরূপ সুপ্ত চৈতন্যসত্তা রহিয়াছে। এই একত্ব হইতেই সমুদয় বহুত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহা স্বরূপতঃ এক ছাড়া কখনও দুই হইতে পারে না। আমরা সর্ব্বতোভাবে এক—শারীরিক হিসাবে এক, মানসিক হিসাবে এক এবং যদি আমরা চৈতন্য-সত্তায় আদৌ বিশ্বাস করি, তাহা হইলে চৈতন্য হিসাবেও যে আমরা এক তাহা বলাই বাহুল্য। এই একত্বরূপ একমাত্র সত্যই আধুনিক বিজ্ঞান দিন দিন প্রমাণ করিতেছে। উহা গর্ব্বিত লোককে বলিতেছে, ঐ ক্ষুদ্র কীটটীও যাহা তুমিও তাহাই,—ভাবিও না যে, তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটা কিছু—তোমরা উভয়েই এক। কোন এক পূর্ব্ব জন্মে তুমিই ঐ কীট ছিলে এবং তুমি যে মানবজীবনের গর্ব্ব

করিতেছ ঐ কীটই ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া সেই মানবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রের এই মহান্ সিদ্ধান্ত—সমগ্র জগতের এই অখণ্ডত্ব, যাহাতে আমাদিগকে সমুদয় সত্তার সহিত এক বলিয়া শিক্ষা দেয়—ইহাই আমাদের জীবনে বিশেষ শিক্ষা করিবার বিষয়। কারণ, আমরা অনেকেই উচ্চতর প্রাণিগণের সহিত এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে অতিশয় আনন্দ বোধ করি কিন্তু কেহই নিম্নতর প্রাণিগণের সহিত এক হইতে চাহে না। মানুষ এরূপ নির্ব্বোধ যে, যদি কাহারও পূর্ব্বপুরুষ পশুপ্রকৃতিক, দস্যু, এমন কি, পরস্বাপহারী ভূস্বামীও হয় অথচ সমাজে তাহাদের খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদিগকে নিজ নিজ বংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি দরিদ্র সচ্চরিত্র লোক হন তবে তাহারা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সুখের বিষয়, দিন দিন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে, দিন দিন সত্যের অধিকতর প্রকাশ হইতেছে এবং ইহাই ধর্ম্মের বিশেষ লাভ। আমি আজ আপনাদিগকে যে অদ্বৈত-তত্ত্বের কথা বলিতেছি, তাহাও ঠিক এই শিক্ষা দিতেছে। আত্মাই সমুদয় জীবজগতের সারস্বরূপ; তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, শুধু তাহাই নহে, তত্ত্বমসি—তুমিই তিনি, তুমি ও জগৎ অভিন্ন। যে আপনাকে অপর হইতে এক চুলও পৃথক মনে করে সে তৎক্ষণাৎ দুঃখ ভোগ করে। যাঁহার এই একত্ব বোধ আছে—যিনি জগতের সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম চরম সামান্যীকরণ ও অভিব্যক্তিবাদ দ্বয়ের সহিত স্বীয় সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের সকল প্রকার দাবী পূরণ করিতে পারে। কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাইবে—এই তত্ত্বটী জগতের অন্যান্য দার্শনিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা বেদান্তেই অধিকতর পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের ঈশ্বর অর্থাৎ

ব্রহ্মের বাহিরে আর কিছু নাই—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সমস্তই যে তিনি। তিনি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—তিনি নিজেই এই জগৎব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি…"

তিনি এইখানে রহিয়াছেন। তাঁহাকেই আমরা দেখিতেছি ও অনুভব করিতেছি। তাঁহাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি, বিচরণ করিতেছি—তাঁহার সত্তাতেই আমরা সত্তাবান্। নিউটেষ্টামেণ্টে এই ভাবের কথা আছে। ঈশ্বর ওতপ্রোতভাবে জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—তিনিই নিখিল পদার্থের সার, প্রাণ, আত্মস্বরূপ। তিনি যেন এই জগতে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। তুমি আমি সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের ক্ষুদ্র কণিকা, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রবাহ, ক্ষুদ্র প্রকাশ এবং তাঁহারই ভিতর থাকিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। মানুষে মানুষে, দেবতায় মানুষে, মানুষে প্রাণীতে প্রাণী ও উদ্ভিদে, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তরে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই, কারণ, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের প্রকাশ মাত্র—প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমার মধ্যে অল্প প্রকাশ, তোমার মধ্যে হয়ত বেশী প্রকাশ কিন্তু উভয়ের মধ্যে একই জিনিষ প্রকাশিত হইতেছে। তুমি ও আমি একই প্রবাহের বিভিন্ন বহির্নির্গমন দ্বারস্বরূপ, আর এই প্রবাহই ঈশ্বর। সুতরাং তুমিও স্বরূপতঃ ঈশ্বর, আমিও তাহাই। তোমারও ইহা জন্মগত প্রাপ্ত অধিকার, আমারও তাহাই। তুমি হয়ত মহা পবিত্র দেবতা, আর আমি হয়ত অতি ঘৃণিত পিশাচ কিন্তু তথাপি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আমার জন্মগত প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং তোমারও তাহাই। তুমি আজ আপনাকে অধিক অভিব্যক্ত করিয়াছ; দুদিন অপেক্ষা কর, আমিও আপনাকে আরও অধিক অভিব্যক্ত করিব, কারণ, সবই যে আমার ভিতরে রহিয়াছে। দেখুন, জগতের এই বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় কার্য্য হইতে বাহিরে অবস্থিত কারণান্তরের কল্পনা করা

হইতেছে না—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসমষ্টিকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তবে কি ঈশ্বর জড়? না, কখনই নহে, কারণ, ঈশ্বরকে যখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া অনুভব করি তখন তাঁহাকে জড় বলি; যখন বুদ্ধির ভিতর দিয়া অনুভব করি তখন তাঁহাকে মন বলি এবং যখন তাঁহাকে আত্মার মধ্য দিয়া দর্শন করি তখন তিনি চেতন বলিয়া দৃষ্ট হন। তিনি জড় নহেন পরন্তু জড়ের মধ্যে যাহা সত্য তাহাই তিনি। এই চেয়ারখানির মধ্যে যাহা সত্য তাহাই তিনি, কারণ, দুইটী জিনিষ লইয়া চেয়ারখানি গঠিত হইয়াছে। প্রথম, বাহিরের কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, দ্বিতীয়, আমার মন ইহাতে আর কিছু অর্পণ করিয়াছে এবং এই দুইটী জিনিষ মিলিত হইয়া চেয়ার উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়নিচয় ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র যে সত্তা অনন্ত কাল ধরিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার উপরেই ইন্দ্রিয়সমূহ চেয়ার, টেবিল, ঘর, বাড়ী, জগৎ, চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র এবং অন্যান্য বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। আচ্ছা, তবে আমরা সকলেই যে এই একই চেয়ারখানিকে দেখিতেছি, আমরা সকলেই যে সেই সচ্চিদানন্দ প্রভুর উপরে একইরূপ ছবি অঙ্কিত করিতেছি ইহার কারণ কি? সকলেই যে একই চিত্র অঙ্কিত করিবে তাহার কোন কারণ নাই—তবে যাহারা একই প্রকার চিত্র অঙ্কিত করে তাহারা সকলে একই স্তরে অবস্থিত এবং সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ও পরস্পরের অঙ্কিত চিত্রসমূহকে দর্শন করিতেছে। তোমার ও আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে পারে যাহারা ভগবানকে আমাদের মত দেখে না, তাই আমরা তাহাদিগকে বা তাহাদের অঙ্কিত চিত্রসমূহকে দেখিতে পাইতেছি না। আবার, আপনারা সকলেই জানেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ দিন দিন ইহাই প্রমাণিত করিতেছে যে, যাহা সূক্ষ্ম তাহাই সত্য, যাহা স্থূল তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র। যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যে যদি কোন ধর্ম্মমত আধুনিক যুক্তি বিচারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে তবে তাহা একমাত্র অদ্বৈতবাদ। কারণ, ইহাতে যুক্তির পূর্ব্বোক্ত

নিয়মদ্বয়ের কোনরূপ ব্যভিচার নাই। ইহা নিখিল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান নামরূপাতীত সত্তারূপ চরম সামান্যীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সামান্যীকরণ সগুণ ঈশ্বরে পৌঁছিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা কখনই চরম সামান্যীকরণ হইতে পারে না, কারণ, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলেই বলিতে হয়, তিনি পরম কারুণিক ও পরম মঙ্গলময়। কিন্তু এই জগৎটা একটা মিশ্রিত ব্যাপার—ইহার কতকটা ভাল কতকটা মন্দ। আমরা মনের মতন বাদছাঁদ দিয়া অবশিষ্টাংশের মধ্যে ব্যাপকতম সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়া তাহাকেই সগুণ ঈশ্বর বলি। তোমরা যেমন বল সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই বুঝায়, সেইরূপ তোমাদিগকে ইহাও বলিতে হইবে যে সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই বুঝায় না; তুমি আরও দেখিবে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানের ধারণাও করিতে হইবে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা যথার্থ চরম সামান্যীকরণ নহে। আমাদিগকে ইহারও পারে—নির্গুণে যাইতে হইবে। সেখানে এই জগৎ তাহার সমস্ত সুখদুঃখ লইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; কারণ, জগতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই সেই নির্গুণ হইতে আসিয়াছে। যাহাতে অশেষবিধ অশুভ বর্ত্তমান তাহা আবার কিরূপ ঈশ্বর? ইহার অর্থ এই যে, ভাল মন্দ একই পদার্থের বিভিন্ন ভাব—বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। গোড়া হইতেই এই ভয়ানক ভুল ধারণাটী চলিয়া আসিতেছে যে, ভাল মন্দ দুইটী পৃথক বস্তু—আলো ও অন্ধকারের ন্যায় ভিন্ন, পরস্পর স্বাধীন—তাহারা চিরকালই পৃথক্ আছে ও থাকিবে। আমি এমন একটী লোক দেখিলে বিশেষ খুসী হইব যিনি আমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারেন যাহা চিরকালই ভাল অথবা চিরকালই মন্দ। তিনি সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া বলুন দেখি যে, আমাদের জীবনের অমুক ঘটনাগুলি কেবলই ভাল, এবং অমুক ঘটনাগুলি কেবলই মন্দ। আজ যাহা ভাল কাল তাহা মন্দ হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ কাল তাহা ভাল হইতে পারে। আমার পক্ষে যাহা ভাল তোমার পক্ষে তাহা

মন্দ হইতে পারে। ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য সকল জিনিষের ন্যায় ভালমন্দেরও একটা ক্রমাভিব্যক্তি আছে। এমন একটা কিছু আছে যাহাকে আমরা তাহার অভিব্যক্তির কোন এক অবস্থায় ভাল এবং অন্য কোন এক অবস্থায় মন্দ বলি। একটী ঝড়ে আমার কোন বন্ধুর প্রাণনাশ হইল—আমি উহাকে মন্দ বলিলাম কিন্তু হয়ত উহা বায়ুমণ্ডলস্থ জীবাণু বিনাশ করিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণরক্ষার কারণ হইল। তাহাদের কাছে উহা ভাল—আমার কাছে উহা মন্দ। সুতরাং ভালমন্দ উভয়ই আপেক্ষিক—প্রাতিভাসিক জগতের ব্যাপার। আমরা যে নির্গুণ ঈশ্বরের কথা বলিলাম তাহা আপেক্ষিক ঈশ্বর নহে—সুতরাং ভাল কি মন্দ কিছুই বলা যায় না। ইহা প্রপঞ্চাতীত পদার্থ, কারণ, ইহা ভালও নহে, মন্দও নহে। তবে ভাল জিনিষটা মন্দ অপেক্ষা ইহার নিকটতর অভিব্যক্তি।

(ক্রমশঃ)

"অনন্তং ব্রহ্ম"

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বিএল)

উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত, এ সকল ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে, ব্রহ্মের স্বরূপ। যাহা সত্য তাহাই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা, যাহা জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম ছাড়া সবই অজ্ঞান, অবিদ্যা। যাহা অনন্ত তাহাই ব্রহ্ম—একমাত্র ব্রহ্মই অনন্ত, আর সব সান্ত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মের অনন্ত ভাব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনন্ত বা Infinite সম্বন্ধে ধারণা করা অতি দুরূহ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণা করাও যেমন দুরূহ, অনন্ত সম্বন্ধে ধারণা করাও সেইরূপ

কঠিন *। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে অনন্তের ধারণা করা যায় না; যাহার ধারণা হয় তাহা খুব বৃহৎ একটা বস্তু হইতে পারে কিন্তু তাহা অনন্ত নহে, তাহার একটা সীমা থাকিবেই। অনন্ত কাল এবং অনন্ত আকাশের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

অনন্ত নির্ব্বিকার,—অনন্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, হইতে পারে না। অনন্ত হইতে যদি কিয়দংশ পৃথক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অনন্ত। কারণ, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা যদি সান্ত হয়, তাহা হইলে এই অবশিষ্ট সান্ত এবং উদ্ধৃত সান্তের সমষ্টি সান্তই হইত, অনন্ত হইতে পারিত না। অনন্তের সহিত আরও কিয়ৎপরিমাণ পদার্থ যোগ করিলে যোগফল অনন্তই থাকে। অনন্তের অর্দ্ধেক অনন্ত। অনন্তের দ্বিগুণও অনন্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে যোগ, বিয়োগ, ভাগ, গুণ প্রভৃতি ব্যাপার অনন্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না, অর্থাৎ অনন্ত নির্ব্বিকার। সেইরূপ ব্রহ্মও নির্ব্বিকার। ব্রহ্ম হইতে যদিও সমুদয় জীব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম যেরূপ ছিলেন, সৃষ্টির পরও ব্রহ্ম ঠিক সেইরূপ থাকেন, কোনও বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না। ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

ভগবানেরই এক অংশ জীবসমষ্টি হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাতে কিন্তু ভগবানের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ, তিনি অনন্ত। যিনি অনন্ত তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। কেবল পরিমিত অংশ গ্রহণ করিলেই যে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা

* বেদান্ত মতে কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা করার অর্থ ঐ বস্তুর আকারে মনকে আকারিত করা। সান্ত মনকে অনন্ত ব্রহ্মের সমান আকার প্রাপ্ত করান যায় না। এ জন্য সান্ত মনকে ধ্বংশ না করিলে (যাহাকে বলা হইয়াছে 'মনসোঽপ্যগোচরভাবে") অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে না।

নহে, ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ (অনন্ত পরিমাণ) অংশ গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। ইহা উপনিষদে স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

সেই পূর্ণ (অনন্ত) ব্রহ্ম হইতে, পূর্ণ (অনন্ত) গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা দুর্ব্বোধ্য হইলেও গণিততত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে অনন্ত হইতে অনন্তের বাদফল অনন্তই হইতে পারে (Infinity minus Infinity may be equal to Infinity.) অবতারবাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহা এই তত্ত্ব দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ বলা হয়, ব্রহ্ম যখন নিরংশ তখন তিনি অবতাররূপ গ্রহণ করিলে সমগ্র ব্রহ্মকেই অবতাররূপ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অবতারের বাহিরে ব্রহ্ম থাকিতে পারেন না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও ব্রহ্ম সমগ্র ভাবেই অবতীর্ণ হন তথাপি অবতারের শরীরের বাহিরে তিনি, পূর্ব্বের ন্যায় অনন্তরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"।

ইহা ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব নহে।

আমরা শুনিয়াছি যে ভগবান্ সকল পদার্থের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন। যিনি অনন্ত তিনি কি করিয়া সান্ত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে বিরাজ করিবেন? কেমন করিয়া যে বিরাজ করেন তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু যত ক্ষুদ্রই পদার্থ হউক তাহার মধ্যে যে "অনন্ত" বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। একটি বস্তুকে যদি আমরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিতে থাকি তাহা হইলে বস্তুটি যতই বেশী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবে অংশগুলির সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইবে; অবশেষে অংশগুলি যখন নিরতিশয় ক্ষুদ্র হইবে, তখন অংশগুলির সংখ্যা নিরতিশয় বৃহৎ (অর্থাৎ

Infinity) হইবে *। অতএব দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থের মধ্যেও অনন্ত নিহিত রহিয়াছে।

সান্ত পদার্থের মধ্যে যে অনন্ত নিহিত থাকে তাহা গণিতের একটি সহজ সিদ্ধান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যায়। $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$ এই ভাবে যে সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইতেছে সে সংখ্যাগুলি যখন অসীম হইবে (Infinite Series), তখন তাহার যোগফল হইবে '১'। অতএব দেখা যাইতেছে যে, '১' এই সান্ত সংখ্যার মধ্যে অসীম ক্ষুদ্র সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সান্ত পদার্থের মধ্যেই অসীম বা অনন্ত নিহিত রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অসীম বা অনন্তই ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন পদার্থের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম বা অনন্তের স্বভাব অতি আশ্চর্য্য। সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ একান্ত বিভিন্ন। সচরাচর দৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের স্বভাব এরূপ যে, কোন পদার্থ হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলেই তাহার পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে কিয়দংশ (জীবসমষ্টি) এবং এমন কি পূর্ণ অংশ (অবতার) গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্বের ন্যায়ই তিনি অনন্ত ও নির্ব্বিকার থাকেন। উপনিষদ্ তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।

নিষ্কল অর্থাৎ নিরংশ, অখণ্ড। কিন্তু অখণ্ড হইয়াও তিনি নানা অংশে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

---

* নিরতিশয় ক্ষুদ্র অর্থাৎ Infinitely small অর্থাৎ Zero.

$$\frac{\text{A finite quantity}}{\text{Zero.}} = \text{Infinity}$$

পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিতেন যে, পদার্থকে ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে হয় যাহাকে atom বা পরমাণু বলে—যাহাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা স্থির হইয়াছে এ কল্পনা যথার্থ নহে। অর্থাৎ atomকেও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যায়।

অবিভক্তমপি ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

অনন্ত হইয়াও তিনি ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের মন সম্পূর্ণ ধারণা করিতে অক্ষম। অরূপ হইয়াও তিনি অনন্তরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, নির্গুণ হইয়াও তিনি অনন্ত কল্যাণগুণ-সংযুক্ত হইয়াছেন। তাই কবি গাহিয়াছেন, *

তুমি অরূপ সরূপ সগুণ নির্গুণ
দয়াল ভয়াল হরি হে।
আমি কিবা বুঝি আমি কিবা জানি
আমি কেন ভেবে মরি হে॥

সংবাদ ও মন্তব্য।

গত ২০শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চতুরশীতিতম জন্মতিথিপূজা মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস ঠাকুরঘর ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি নানাবিধ পত্রপুষ্পমাল্যে এরূপ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে যিনি দেখিতেছিলেন তিনিই মুগ্ধ হইতেছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীযীশু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি সমুদয় অবতারগণের বিশেষ পূজা, স্তোত্রাদি পাঠ ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ ও কালী-কীর্ত্তন চলিয়াছিল। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতি হইবার পর ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালী পূজা আরম্ভ হয় ও শেষরাত্রে হোমান্তে পূজা সমাপ্ত হয়। অনন্তর শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথাবিধি হোম করিয়া মঠের ৭ জন যুবক ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও ১৮ জন যুবক পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যখন "নারায়ণ হরি" ধ্বনিতে মঠগগন মুখরিত করিতেছিলেন তখন পূর্ব্বাকাশ নবারুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

* কবি রজনীকান্ত সেন।

পরবর্ত্তী রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মঠের দক্ষিণ-দিকস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র অতি মনোজ্ঞরূপে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইয়াছিল এবং আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায়, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কনসার্ট বাদক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুর কনসার্ট পার্টি, সুবিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক সঙ্গীত সম্প্রদায় ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে মঠবাড়ী মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও মেসার্স হোরমিলার এবং কোং স্টীমারের সুবন্দোবস্ত করায় মঠে বহুসহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় দশ সহস্র লোক জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। এবারে স্ত্রী পুরুষের জন্য প্রসাদ বিতরণের পৃথক্ বন্দোবস্ত করায় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আহিরীটোলা নিবাসী যুবকবৃন্দ উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে সরবৎ বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

উৎসব দিবসে মঠের সর্ব্বত্রই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যে মহাপুরুষের নামে এই বিপুল জনসংঘ সমবেত হইয়াছিল তাঁহার তিরোধানের এই স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শক্তির এইরূপ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব দর্শনে সকলেই যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছিলেন।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ও মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু ভদ্রমণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত, গোষ্ঠলীলা, কীর্ত্তন, ভজন ইত্যাদিতে সমস্ত দিনব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। একভাবে ভাবিত হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলকেই সমভাবে উৎসবে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব

সম্মিলন দেখিয়া সকলেরই প্রাণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় এমন একদিন আসিতে পারে যখন সকল প্রকার ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক উদার সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিবে।

প্রায় চারি পাঁচ শত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় দুই তিন সহস্র সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনও উক্ত দিবস অপরাহ্নে হইয়াছিল। ঢাকা ডিভিসনের কমিশনার মিঃ জে, এন, গুপ্ত মহোদয় উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুত নীরদরঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগে মিশনের স্থানীয় সেবকবৃন্দ কর্তৃক কালীকীর্ত্তন গীত হয় ও পরে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রাভিনয় হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, কনখল, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রাঁচি, শিতাবলদ, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা বেলুড়স্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য ঔষধালয়ের ১৯১৮ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা নবাগত ও পুনরাগত রোগী সমেত সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৪৪৩ জন; তন্মধ্যে ৩৪৬০ জন নূতন রোগী। ইহাদের মধ্যে বেলুড় হইতে ১৪৭৯ জন, বালি ও বারাকপুর—৮২৮, ঘুসুরি—৬৯, লিলুয়া—১৫২, শালিখা—৩৫, হাবড়া—১৯, শ্রীরামপুর—৩৪, উত্তরপাড়া—৫৩ এবং অন্যান্য স্থান হইতে ২১ জন আসিয়াছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা এ বৎসর রোগীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকেরা এখানে যেরূপ আগ্রহের সহিত চিকিৎসার্থ আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, উক্ত ঔষধালয়ের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে ঔষধালয়ের মোট আয় ৩২২৷৷৵০ টাকা ও মোট ব্যয় ৬২৷৷১০ টাকা।

বালি মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ গত বৎসর ঔষধালয়ে ২২০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড সন্স সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ঔষধের অধিকাংশ বিনামূল্যে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত যাঁহারা এই ঔষধালয়ে ঔষধ, ডাক্তারী যন্ত্র প্রভৃতি নানারূপ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিয়াছেন এবং যে সকল ডাক্তারগণ অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া চিকিৎসাদি বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিয়াছেন মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

ঔষধালয়ের আয় অতি সামান্য। অথচ দিন দিন রোগীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আয় অধিক না হইলে উহার কার্য্য সুচারুরূপে চলা অসম্ভব। দরিদ্র, নারায়ণগণের সেবারূপ এই মহদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(মানভূম)

আমরা গতবারে মানভূম জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। সম্প্রতি আমাদের জনৈক সেবক উক্ত-স্থান পরিদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। উহা পাঠ করিলে তাঁহারা উহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—

"আজ গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। পাঁচখানা গ্রাম দেখিলাম তন্মধ্যে দুইখানা সাঁওতাল পল্লী। না খাইতে পাইয়া

সকলেই কঙ্কালসার হইয়াছে। মানুষ কত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারে তাহা যদি স্বচক্ষে দেখিতে হয় তবে এ দেশে একবার আসা উচিত। গৃহে ধান নাই, চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। সুতরাং অন্ন ও জল, যে দুইটী প্রাণধারণের প্রধান সম্বল, তাহারই অভাব। তবে এরা খায় কি? খায় কুল আর তুষ ভেজে একরকম হালুয়ার মত করে। দেখিলাম তাহাই পাতায় করিয়া বালকগণ খাইতেছে। যুবক যুবতীরা কেহ বাড়ীতে নাই, তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে কাজে গিয়াছে। গ্রামে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর নাবালক ছেলেমেয়েগুলি। সকল গ্রামেই একই প্রকারের দৃশ্য। প্রত্যেক বাড়ীতেই দুচারটা কুল গাছ আছে। শুনিলাম এবার কুলও খুবই হইয়াছিল, এখন কিন্তু তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই প্রত্যেক গ্রামে লোকের মুখে ঐ এক কথাই শুনিলাম—"এই দুইমাস কুল খাইয়া কাটাইলাম এখন কি খাইব?" সত্যই বটে আমিও ভাবিয়া পাইলাম না যে, কুল ফুরাইলে ইহারা খাইবে কি?

বৃষ্টির একান্ত অভাবে ধানগাছ বাঁচাইবার জন্য পুষ্করিণীর জল ছেঁচিয়া প্রায় জলশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কাজে কাজেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কিরূপ ভীষণ জলকষ্ট হইবে তাহা কল্পনাতীত।

এদেশে সকলকে বিনাপরিশ্রমে খাদ্যাদি না দিয়া যাহারা কাজের উপযুক্ত তাহাদের দ্বারা পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি খনন করাইয়া লইয়া চাউল সাহায্য করিলে উভয় পক্ষেরই লাভ। অভাবগ্রস্ত লোক কাজ করিয়া মজুরী পাইবে এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাবও দূর হইবে।

যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে তাহাদের কাজ মিলুক আর না মিলুক লোকেরা সুধু বলিয়া দেয়, "খেটে খাওগে" কিন্তু তাহারা যে কোথায় যাইয়া কি কাজ করিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। পুষ্করিণী খননাদি কার্য্য আরম্ভ করিলে খরচ অনেক বেশী পড়িলেও ভবিষ্যতে গ্রামে জলের অভাব হইবে না, এ বিষয়ে কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে।

শীতের অবসান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শীতেও ইহাদের বস্ত্র ছিল না এখনও নাই। বড় মেয়েরা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছে, ছোট ছেলে মেয়ে এবং পুরুষেরা কৌপীনধারী হইয়াছে, ইহারও অভাব হইলে মানভূমের বন ভিন্ন লোকালয়ে থাকা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।

আমি যাহা দেখিতে আসিয়াছিলাম অর্থাৎ কত কষ্ট ও অভাব সহ্য করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা দেখা হইয়াছে। যাহা দেখিয়াছি ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

বাঁকুড়া জিলার ইন্দপুর থানার কয়েকখানা গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলাম—বাউরি, ভূমিজ এবং অন্যান্য নিম্ন জাতের মধ্যেই ভয়ানক কষ্ট দেখিলাম, তাহা ছাড়া শুঁড়ি, তাম্‌লি, তেলি প্রভৃতি জাতের মধ্যেও অন্নাভাব আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দপুরে যেমন দেখিলাম মানভূমেও সেইরূপ—পার্থক্যের মধ্যে সেখানে সরকার বাহাদুর প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এখানে সে বিষয়ে কোন কথাই শুনিলাম না। মিশনের বাগদা কেন্দ্র হইতে মাত্র ১৮ খানা গ্রামে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। নিত্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কঙ্কালসার দেহাবশিষ্ট মানুষ "দে কিছু" "দে কিছু" বলিয়া উপস্থিত হইতেছে আর সেবকগণ অক্ষমতা জানাইয়া যাইতে বলিলে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে। * * * *"

আমরা আশা করি, উল্লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া সহৃদয় দেশবাসিগণ কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ইহার আশু প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন। তাঁহাদের উপরেই এই কার্য্য সম্পাদনের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত যিনি যাহা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক—অর্থ বা বস্ত্র হউক—তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে :—

(১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণমিশন, মঠ, বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

স্বাঃ) সারদানন্দ।

মানবজীবন ও জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয়।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ)

মনুষ্যজীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু নিদ্রাবস্থায় গত হয়—বাল্য ও বার্দ্ধক্য অজ্ঞতা এবং জরাব্যাধিতে আচ্ছন্ন থাকে—ভোগলালসায় যৌবন ক্ষয় হইয়া যায়। এই অবস্থাগুলির সমষ্টিনাম "মানবজীবন।" সিদ্ধ বৈষ্ণব কবি তাই বলিয়াছেন:—

আধ জনম হাম নিঁদে গোঁয়ায়নু,—
জরা শিশু কতদিন গেল।
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতনু,
তোঁহে ভজব কোন বেলা॥

অর্থাৎ জীবনের অর্দ্ধকাল নিদ্রায় গত হইল—বার্দ্ধক্য ও শিশুকাল জরা ও অজ্ঞতায় কাটিয়া গেল—যৌবন ভোগলালসায় অতিবাহিত হইল। হে প্রভো! তোমাকে ভজন করিবার অবসর কোথায়?

বস্তুতঃ, মানবজীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় সাধারণ মানবজীবনই এইরূপ গতিশীল। কদাচিৎ কোন মহামনস্বীর জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় মাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়াই মানবজীবন বহিয়া যাইতেছে। এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানবজীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যাহাকে আমরা জাগ্রৎ অবস্থা বলি, তাহাতেও আবার বহু অজ্ঞতার আবর্ত্তই দৃষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাদ, আলস্য, জাড্য, সংশয়,

বিকল্প ও বিপরীত-ভাবনা জাগ্রৎ ভূমির নিত্য সহচর। এগুলি যেন জাগ্রৎ সাগরের নিত্য ঘূর্ণীপাকস্বরূপ। এই জাগ্রৎ অবস্থাই (Conscious state) স্থূল ভোগভূমি—ব্যবহারিক "আমি আমার-রাজ্য"। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ এই অবস্থায় পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও আয়ত্বে অবস্থান করে। যাহাকে শাস্ত্রে স্বপ্নাবস্থা বলে, তাহা ত প্রায় অজ্ঞতারই অনুরূপ। এই স্বপ্নাবস্থা (Semi-conscious state) খানিক জাগ্রৎ—খানিক সুষুপ্তির ছায়াময় ভূমিতে অবস্থিত। যেন জাগ্রৎরূপ দিবা ও সুষুপ্তিরূপ রাত্রির সন্ধিস্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন জীবনের সন্ধিক্ষণ সূচনা করে। নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থা (Unconscious state) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই অবস্থাত্রয়ভূমিতে প্রবাহিত মানবজীবন প্রায় যেন অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য দিয়াই গতাগতি করিতেছে।

জাগ্রৎভূমে অবস্থান কালে আমরা জড়জগতের কতকগুলি রহস্য ভেদ করিয়া আপনাদিগকে ইদানীং কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। কতকগুলি কলকৌশল, কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য, কতকগুলি নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দেহের, দেশের, সংঘের ও সমাজের কথঞ্চিৎ শৃঙ্খলা বিধান করিয়া মানবজীবন সুখী করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সকল জাগ্রদাবিষ্করণে সাময়িক কথঞ্চিৎ সুখসুবিধা লাভ হইলেও ইহা জীবকে শাশ্বত সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি তর্কে ইহা বুঝাইতে হয় না। প্রতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করে। বহির্জগৎ—যাহা রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর কিছুই নহে—তাহার পশ্চাতেই মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। অন্তর্জগতের কোন সন্ধান না পাইয়া "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" পথে চিরকাল গতাগতি করিতেছে।

চিন্তাশীল আর্য্যঋষিগণ অন্তর্জগৎরহস্য ভেদ করিতে বহির্জগৎ যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন মানবজীবনের রহস্য ভেদ কল্পে প্রাচীন ঋষিগণ "আবৃত্তচক্ষুঃ"

হইয়াই যেন অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তরের নিয়মগুলি অন্তশ্চক্ষু না হইলে দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য অধুনাআবিষ্কৃত বাহ্য বিজ্ঞান রহস্য—যাহার বিশ্লেষণে ভূতপঞ্চক যেন ক্রীড়াপুত্তলিবৎ ঐহিক জীবনের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে—সেইগুলি আর্য্যঋষিগণ দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। তাঁহারা এই জীবনরহস্যভেদেই জীবনের সমগ্র শক্তি প্রযোগ করিয়াছিলেন। যেমন একখণ্ড মৃদ্-জ্ঞানে সমগ্র মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মে, তেমনি একটী মানবজীবন বিশ্লেষণে, সমগ্র মানবজীবনরহস্য ভেদ হইয়া যায়। অন্তর্মুখে অবস্থিত আর্য্যঋষিগণ এই জন্য মানবজীবনের অন্তর্নিহিত নিয়মগুলি বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মপ্রাণ জনগণের তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। ভারতের বিচার প্রণালী অন্তর্মুখ—আধুনিক জগতের বহির্মুখ। স্বামিজী একদিন লেখককে বলিয়াছিলেন, "তোরা যাকে কালী কালী ব'লে উপাসনা করিস্—ওদেশে দেখে এলুম, সেই কালীই কামানের মুখে গোলা হইয়া বসে রয়েছেন্।"

আমাদের শরীরটা যেমন নিকটে, আর কোন বস্তুই তেমন নয়। এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয়, মন, ও চৈতন্য বিরাজ করিতেছে। শরীরের চেয়ে সেগুলি আরো কাছে বা অন্তরে। সকলের চেয়ে কাছে বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্য—যাহা জীবের যথার্থ স্বরূপ। কাজেই সেই চৈতন্য সত্তার অন্বেষণে অন্তর্মুখী হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। তাই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—"আবৃত্তচক্ষুর-মৃতত্বমিচ্ছন্"। আবৃত্তচক্ষুর মানে হচ্ছে মনকে রূপরসাদি থেকে তুলে অন্তর্মুখ করা অর্থাৎ বহির্জগতের বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মতত্ত্বাভিমুখ করা। রূপরসাদির প্রলোভন ত্যাগ না হইলে—মনের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন স্পন্দনের ত্যাগ না হইলে—"আবৃত্তচক্ষুঃ" হওয়া যায় না। সুতরাং জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

আত্মদর্শী আর্য্যঋষিগণ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট মানবজীবনের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, জগতের মূল কারণ বা ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই অবস্থা-

ত্রয় ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা এই অবস্থাত্রয়াতীত এক তুরীয় বা অতিজাগ্রদ্ ভূমির (Super-conscious state) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বয়ং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঁকার-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে "ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলি এই ওঁকার; এই ওঁকারই আবার ত্রিকালাতীত ও সর্ব্বজ্ঞ"। "ইহা চতুষ্পাৎ—ওঁকারের অকার জাগরিত স্থান—বহিঃপ্রজ্ঞ—বিশ্ব; উকার স্বপ্নস্থান—অন্তঃপ্রজ্ঞ—তৈজস্। মকার সুষুপ্তিস্থান—প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময়—প্রাজ্ঞ। তদতীত তুরীয় স্থান শান্ত—শিব—অদ্বৈত। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে সহজে ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্য লইতেছি।

তুরীয় ব্রহ্ম।
|
(প্রপঞ্চাতীতং শান্তং শিবমদ্বয়ং)
(Super-conscious state)
|
প্রকৃতি, মায়া বা অব্যক্ত
(ত্রিগুণাত্মিকা)

	(সত্ত্বপ্রধান)		(তমঃপ্রধান)
সুষুপ্তিস্থান বা মকার	সমষ্টি কারণশরীর বা ঈশ্বর	প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন	ব্যষ্টি কারণশরীর বা প্রাজ্ঞ
স্বপ্নস্থান বা উকার	সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর বা হিরণ্যগর্ভ	অন্তঃপ্রজ্ঞ	ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর বা তৈজস্
জাগ্রৎস্থান বা অকার	সমষ্টি স্থূলশরীর বা বিরাট্	বহিঃপ্রজ্ঞ	ব্যষ্টি স্থূলশরীর বা বিশ্ব

চিত্রের সমষ্টির দিক্ দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় ব্রহ্মই প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টি কারণশরীর বা ঈশ্বরতত্বে পরিণত হইয়াছেন। ইহা সুষুপ্তিস্থান হইলেও সত্বগুণপ্রধান বলিয়া জীব-সুষুপ্তির ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, পরন্তু প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। সত্বপ্রধান ঈশ্বর, মায়াধীশ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিয়ন্তা। এই ঈশ্বরতত্বই বেদে লয়স্থান ও "অধ্যাত্ম্য" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সেই সমষ্টিকারণতত্বই রজোগুণপ্রাধান্যে যেন সূক্ষ্মশরীরী হিরণ্যগর্ভ রূপে পরিণত হইয়াছেন; হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ, ভাবী প্রকটিত জগৎ যাঁহার গর্ভে অবস্থান করে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী দেবতাকে স্বপ্নস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, সূক্ষ্মভাবে যেন সকলি ভোগ করেন। অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থে অন্তরেই সংকল্পসম্পন্ন—বহিরালম্বনশূন্য। এই হিরণ্যগর্ভই গুণবিপাকে সমষ্টি স্থূলশরীরাভিমানী বিরাট্ বা বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন। স্থূলজগৎ ভোগ্যরূপে অবস্থান করাতে ইনি বহির্বিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন—তাই বহিঃপ্রজ্ঞ।

ব্যষ্টি বা জীবপক্ষে (দক্ষিণের চিত্র দেখুন) বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জীব তমঃপ্রধান বলিয়া তাহার সুষুপ্তিভূমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন। সত্বপ্রধান সমষ্টি কারণশরীর ঈশ্বরের ন্যায় প্রবুদ্ধ নহে। অতিজাগ্রৎভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাতে প্রায় তন্ময় হইয়াও জীব আপন স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বেদ তাই বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই ঘোর সুষুপ্তিতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতেছে কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া, তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে না। এই সুষুপ্তি অবস্থাই জীবের কারণশরীর। শাস্ত্রে ইনি 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত হন। রজস্তমঃপ্রধান প্রাজ্ঞই সূক্ষ্ম বা মনোময় শরীরে প্রকটিত হইয়া সংকল্পবান্ হন—তখন ইঁহাকে 'তৈজস্' নামে অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্ আবার অধিকতর তমঃপ্রধান হইয়া স্থূলশরীর ধারণ করিয়া থাকে ও স্থূলশরীরাভিমানী জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে 'বিশ্ব' বলা হয়। এই ত্রিবিধাকারে

অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক আত্মাই এই তিন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। গৌড়পাদীয় কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বোহ্যন্তঃপ্রজ্ঞশ্চ তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্থিতঃ॥"

জীব ও ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ ভূমিতে অবরোহণ ও আরোহণ চিন্তা করিয়াই গুণত্রয়বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ঈশ্বরেরও ত্রিমূর্ত্তি সিদ্ধ হইয়াছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ কালত্রয় বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকের ত্রিত্ব কথিত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকরূপ ত্রিলিঙ্গ বিভাগ,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নারূপ ত্রিধা নাড়ীচিন্তা—নাভি, হৃদয়, ও মস্তকরূপ ত্রিধা ধ্যানস্থান নির্দ্দেশ,—জন্ম, প্রেতত্ব ও মৃত্যুরূপ অবস্থার ত্রিধা ভেদ নির্ণয় এই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রতিবিম্ব কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

জীব বলিতে শাস্ত্রমতে উপাধিভূত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন তখন সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে তাঁহার বিরাট্ ও জীব (বিশ্ব) সংজ্ঞা হয়। উপাধির অপগমে উভয়েই এক অখণ্ড সত্তায় বা তুরীয় ভূমিতে এক হইয়া যায়। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব এক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। সুষুপ্তি কালে জীব ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলেও মধ্যে অজ্ঞানের পর্দ্দা ব্যবধান থাকে, যাহা জীবাত্মার দৃশ্যরূপ প্রকাশ পায়। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন হইলেই জীবাত্মা শিবত্বে, বা তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়া যায়। সুতরাং জীব ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়।

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নভূমে গমন করে, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ও ঘুমাইয়া পড়ে অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য হয়—কিন্তু প্রাণ, মন, বুদ্ধি সবৃত্তিক থাকে। এই অবস্থায় জীব বাসনাময় শরীরে

অবস্থান করে ও জাগ্রৎকালীন ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত বাসনা বশে মনোময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া বিচরণ করে। মন যেন তখন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করে। ইহা ভাবী জাগ্রৎ ভূমির সূক্ষ্ম বীজস্বরূপ। এই মনোময় বাসনাঙ্কিত শক্তি হইতে স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ বিজৃম্ভিত হয়। স্থূলদেহনিষ্ক্রান্ত মৃত জীবও এই সূক্ষ্ম শরীরেই স্বর্গ নরকাদিরূপ স্বপ্ন ভোগ করে এবং তৎপর স্থূল দেহ লাভ করিয়া জাগ্রৎভূমে আগমন করে। যেমন নিদ্রা হইতে স্বপ্নভূমি, স্বপ্নভূমি হইতে জাগ্রৎভূমিতে জীবের আগতি হয়, তেমনি সূক্ষ্ম বাসনাসম্পন্ন মৃত্যুরূপ স্বপ্নভূমি হইতে জীব জনন-প্রণালী নিয়মে জাগ্রৎরূপ স্থূলভোগ্য জগতে জন্মলাভ করে। স্বপ্নময় দেহই আতিবাহিক বা সূক্ষ্ম দেহ।

স্বপ্নভূমি হইতে জীব যখন সুষুপ্তিতে গমন করে তখন মন ও বুদ্ধির বৃত্তি (স্পন্দন) নিবৃত্ত হইয়া যায়; তখন জীবাত্মা একমাত্র অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে স্থির হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার 'কারণদেহ'। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া নিজের যথার্থস্বরূপ বা মহা-কারণ ব্রহ্মকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। বোধ হয় শাস্ত্রে এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরত্রয়কেই 'ত্রিপুরাসুর' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ত্রিপুরাসুর জয় করিলেই জীবের শিবত্বে অবস্থান ঘটে। এই জন্যই কি শিব বা তুরীয়ভূমি ত্রিপুরনাশন বলিয়া কথিত হইয়াছেন? সে যাহা হউক, মোট কথা এই যে, এই তিন অবস্থা বা ত্রিতয় দেহের অধ্যাস নিরাকৃত না হইলে জীব আপনার পরমার্থস্বরূপ (তুরীয় পদ) অবগত হইতে পারে না। তুরীয়ই জীবের যথার্থস্বরূপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভূমিত্রয়ের মধ্য দিয়া গতাগতি বশতঃ জীব যেন আপন স্বরূপ একবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের উপাধি লইয়া জীব দৈন্যদুঃখ-জন্মমৃত্যুরূপ অজস্র স্পন্দনে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন।

সুষুপ্তিকালে মরণমূর্চ্ছার ন্যায় জীব হৃদয়স্থিত "পুরীতৎ" নাড়ীতে গমন করে। জাগ্রতের অভিব্যক্তি স্থান যেমন চক্ষু, স্বপ্নের অভি-

ব্যক্তি স্থান যেমন কণ্ঠ, সুষুপ্তির স্থান তেমনি হৃদয় ও তৎস্থানস্থিত পুরীতৎ নাম্নী নাড়ী। এই সুষুপ্তিভূমি পরানন্দ তুরীয় ভূমির অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া জীব মনবুদ্ধির বৃত্তিশূন্যতা বশতঃ আপেক্ষিক জগতের সুখদুঃখ কিছুই জনিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে এই সুষুপ্তি অবস্থাকে 'আনন্দময় শরীর' বলা হয়। জীব নিদ্রোত্থিত হইয়া বলে "বেশ সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোন কিছুই জানিতে পারি নাই"। এই আনন্দ ও অজ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমানতা প্রতিজীবই প্রত্যহ অনুভব করে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপার্শ্বচর ছায়ারূপী অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই জন্যই কি শাস্ত্রে বলা হয় "অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হইতেছে"?

অবস্থাত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে উপাধিমণ্ডিত জীব প্রত্যহ এই অবস্থাত্রয় মধ্যে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই অবস্থাত্রয়ের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রৎকালে স্বপ্নদর্শন অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। আবার অতিজাগ্রৎভূমে অধিরোহণ করিলে এই গৌরবান্বিত জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, অতিজাগ্রদবস্থার তুলনায় জাগ্রদবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সেইজন্য সর্ব্বোচ্চ স্তর তুরীয় ভূমি হইতে দৃষ্টি করিলে জীবজগৎ ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "জগন্মিথ্যা"। অথবা গীতায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

যাহারা জ্ঞানের চরম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহাদের চক্ষে ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্য স্থূল জগতের রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহারা উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে। আর বলে "আহা! আমার ভোগের জন্য ঈশ্বর কি সুন্দর সৃষ্টিই প্রকটন করিয়াছেন!"

মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও অবরোহণ জানিতে ও

বুঝিতে হইলে মনের স্বরূপ কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। শাস্ত্র বলে, অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের মিলিত সত্ত্বাংশে "অন্তঃকরণের" সৃষ্টি হয়। ইহাও জড় ভূতসমষ্টি মাত্র। বৃত্তিভেদে এই অন্তঃকরণই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তরূপে কথিত হয়। সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও ধারণা ইহাদের ক্রমিক বৃত্তি। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু ইহাদের অনুগ্রাহক (চালক) দেবতা বলিয়া উক্ত হন। স্থূল জগতের রূপরসাভিঘাত ইন্দ্রিয়গোলকে পতিত হয়, তথা হইতে স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে অবস্থিত ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠে। সেই স্পন্দন আবার সূক্ষ্ম বিকল্পবৃত্তিক মনে আঘাত করে; মন আবার তাহা স্থিরসঙ্কল্প বুদ্ধিতে (determinative faculty) অর্পণ করে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলি জড়; তাহারা কেবল স্পন্দন-চালনের যন্ত্রবিশেষ মাত্র। বুদ্ধি সে স্পন্দন জীবাত্মার নিকট উপস্থিত করা মাত্র স্পন্দনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গতি ক্রমে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়কেন্দ্র, ইন্দ্রিয় গোলকাদি পথে বাহ্যবস্তুর স্বরূপে গমন করিয়া জীবাত্মার বস্তুবোধ জন্মায়। যাঁহারা তারের খবরের রহস্য জানেন তাঁহারা বিষয়টী সহজে বুঝিতে পারিবেন।

সংবাদ প্রেরক যন্ত্রটী যেন ইন্দ্রিয়গোলক, তড়িৎবাহক তার যেন স্নায়ুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি সেই সংবাদ-গ্রাহক, আর যাহার উদ্দেশ্যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে তিনিই জীবাত্মা স্থানীয়,—তিনি সংবাদ পড়িয়া তাহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। অভিমানাত্মক জীবাত্মার বহির্জগতের জ্ঞান হইবামাত্র ভোগের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা একটা স্থির হয়। ভোগের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়; ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হইয়া ক্রিয়াশক্তির সূচনা করে। সুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা ও অবশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। এখন দেখা যাক্, এই মন পূর্ব্বকথিত জাগ্রদাদি ভূমিত্রয়ে কিরূপে অবস্থান করে। তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই পারে না; কারণ, তন্নিম্ন প্রাজ্ঞভূমিতেই মন বৃত্তিশূন্য বা নিস্পন্দ, তদূর্দ্ধ ভূমিতে

যাইবার শক্তি নাই। এই জন্যই চতুর্থ ভূমির বর্ণনায় বলা হয়—"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত ভূমিতে মন বৃত্তিশূন্য হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপতা প্রমাণিত হয়; এই জন্য মনের বুদ্ধিস্বরূপত্ব বা জ্ঞানস্বরূপত্বই (যাহা হইতে অহমিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়) সুষুপ্ত বা প্রাজ্ঞ ভূমির উপাধি। স্বপ্ন ভূমিতে সেই মনই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন আর জাগ্রৎ ভূমে সেই মনই ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন। সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া উপাধি লইয়া মন ক্রমে সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান করে—ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি বলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

মন বৃত্তিশূন্য বা স্থির হইলেই (একাগ্র হইলেই) তাহা আত্মার উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হয়। ইহাই বুদ্ধি—যাহা অবিবেকিগণের দৃষ্টিতে চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। "চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা" বলিয়া পঞ্চদশীকারও উল্লেখ করিয়াছেন। সুষুপ্তি ভূমিতে এই মন বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপে অবস্থান করিলেও অহমিকা বৃত্তির উচ্ছেদ হয় না। সমষ্টি পক্ষে সত্ত্বপ্রবল অহমকারবৃত্তিই সৃষ্টির আদি কারণ। ব্যষ্টি পক্ষে এই অহমিকা বৃত্তিমান্ জীবাত্মা অজ্ঞানের সাক্ষী হইয়া দ্বৈতমুখেই অবস্থান করে, গাঢ় সুষুপ্তিতে জীবাত্মার ধ্বংশ হয় না। কারণ, ব্যুত্থানকালে এই প্রসুপ্ত জীবকে বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পথে ফিরিয়া পূর্ব্বসংস্কার বশে সংসারভোগ করিতে দেখা যায়। এই জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহংজ্ঞানে উপলক্ষিত জীবাত্মা তাহার আভিমানিক সত্ত্বা সুষুপ্তি বা মৃত্যুকালেও ত্যাগ করে না। সুষুপ্তি বা মৃত্যুর পর স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়া জাগ্রদ্ভূমিতে আগমন করে। এই যুক্তিতে জন্মান্তরবাদও সমর্থিত হয়।

ইদানীং অতিজাগ্রৎ বা তুরীয়ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, সুষুপ্ত প্রাজ্ঞজীব বা পরমাত্মা ঐ অবস্থায় কেবল অহংপ্রত্যয়গম্য "আমিত্ব" জ্ঞানে ভাসমান থাকেন, তখন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন অজ্ঞানমাত্র দ্বৈতদৃষ্টির কারণরূপে অবস্থান করে। সমষ্টিপক্ষেও

সত্বপ্রবল মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। ঈশ্বরের মায়াউপাধি ও জীবের অজ্ঞান-উপাধি বিলয় হইয়া গেলে উভয়ই চিরন্তন চৈতন্য সত্তায় এক হইয়া যায়। জীবের এই অজ্ঞান দূর করিতে শাস্ত্র নানা সাধনার উপদেশ করেন। জ্ঞান পথের উপদেশ এই যে তুমি সদাসর্ব্বদা তোমার নির্ব্বিকার তুরীয় স্বরূপের চিন্তা কর। তোমার জীবত্ব তুরীয় স্বরূপেরই প্রতিবিম্বমাত্র। 'দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে এই তত্বই অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। অহংপ্রত্যয়গম্য জীবাত্মা তুরীয় ব্রহ্মই বটেন কিন্তু মায়ায় আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি জীবকে ব্রহ্ম হইতে যেন বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। সদাসর্ব্বদা "অহংব্রহ্মাস্মি" এইরূপ ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত করিতে পারিলে এই জীবাভাসরূপ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ভক্তি পথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সাধন সহায়ে অনিত্য বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়া জীব, যখন ইষ্টে তন্ময় হইয়া আসে জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়া পড়ে। তখন "জ্যোতি-জোতিষি সংযুতঃ" হইয়া জীব একত্বের চরমভূমিতে আরোহণ করে। যোগীও ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধ চক্রে আরোহণ জনিত উপাধিবিগত হইয়া সহস্রাররূপী তুরীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাভ করে। নিষ্কামকর্ম্মীও পরার্থে কর্ম্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ক্রমশঃ বর্জ্জন করে। সমস্ত উপাধিবিগমে যে তাহার অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে তাহা বিচিত্র কি? এই জন্য যে কোন পথে দৃঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবের শাশ্বত শান্তিভূমি তুরীয়পদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটে। কোন পথই এই জন্য হেয় হইতে পারে না।

এখন কথা হইতেছে এই অতিজাগ্রদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ করিয়া তাহার খবর দিতে পারে কি না? শাস্ত্রাদি কি সে অবস্থার আভাস, না সম্পূর্ণ সত্য উক্তি? উপাধি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইলে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবার "আমি আমার রাজ্যে" আগমন করিবে? শঙ্করপ্রমুখ আত্মজ্ঞপুরুষগণ কেনই বা শাস্ত্রাদিকে

"অবিজ্ঞাবিষয়বৎ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ? এই সকল সন্দেহনিরাকরণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে।

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের অসাধারণ অনুভূতিই এই সংশয় অপনোদনে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। চরমানুভূতিদ্যোতক শ্রুতিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হইবার অযোগ্য। সাধারণ জীব চরমজ্ঞান ভূমি হইতে ফিরিবার শক্তি রাখেন না। 'নুনের পুতুলের' মত সমুদ্র জলে লীন হইয়া যান। কিন্তু পরমার্থদ্রষ্টা ঋষিগণ ও দেবমানব মহাপুরুষগণ এই অতীত জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াও ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবহিতকল্পে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের বাক্যই বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "অবিজ্ঞাবিষয়বৎ" হইলেও জ্ঞানাতীত ভূমির আভাস তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে।

আর যাঁহারা সেই জ্ঞানাতীত ভূমির অনুভূতিসম্পন্ন হইয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া জীবনধারণ করেন তাঁহারা যে বেদবেদান্ত কথিত তত্ত্বজ্ঞান হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত ও তত্ত্বজ্ঞানের জলন্তজাগ্রৎ বিগ্রহ একথা সহজেই বোধগম্য হয়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, চৈতন্যাদি অমানব মহাপুরুষগণ এইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত ও পূজিত হন। পুনরাবর্ত্তন সংসারের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। ইদানীন্তন জগতেও এইরূপ এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল—যিনি সর্ব্বদা জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থান করিয়াও জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিবলে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের নির্ম্মলাকাশে নবোদিত ভাস্করতুল্য তাঁহার উজ্জ্বল কিরণে দিক্ দেশ আলোকিত হইয়াছে। চক্ষু থাকে ত পাঠক তাঁহার অমলধবল মূর্ত্তি অনুধ্যান করিয়া জন্মজরামৃত্যুসংকুল অবস্থাত্রয় অতিক্রম করতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা কর। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে সেই জ্ঞানাতীত ভূমি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে প্রদর্শন করাইয়া সংসারের ঘোর অন্ধকারে তুঙ্গ আলোকস্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী ও তাঁহাদের উৎপত্তি।

শ্রীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাংগ্রা যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে গোরক্ষপুর সীমান্ত লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত নেপালরাজের মনোমালিন্য হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহা যুদ্ধে পরিণত হয়। ইংরাজ সৈন্যের চারিটি বাহিনী চারিদিক হইতে নৈপাল রাজ্য আক্রমণ করে। তন্মধ্যে General Ochterlony লুধিয়ানা হইতে এবং General Gillespie মিরাট হইতে। শিরমুরে অক্টারলোনী-বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার পথে অমরসিংহের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় জেনারল জিলেস্পির বাহিনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,এবং তিনি স্বয়ং ধরাশায়ী হন। এই সংবাদ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করিয়া পার্ব্বত্যরাজগণের সহায়তা যাচ্ঞা করিতে পরামর্শ দেন এবং তাঁহাদিগকে সসৈন্যে মিলিত হইতে অনুজ্ঞা* প্রদান করেন এবং আশ্বাস দেন যে, যদি তাঁহারা বিশ্বস্ততার সহিত ইংরাজের সহায়তা করিতে সম্মত হন তাহা হইলে, যুদ্ধ শেষে তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং যে কোন ভবিষ্য শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রস্থানীয় হইবেন। দুই বৎসর লোমহর্ষণকারী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খ্রীঃ সেগোলীর সন্ধিসূত্রে শান্তি স্থাপিত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কতক কতক স্থান আপনাদের ব্যবহারার্থে রাখিয়া সকলকেই সনন্দ দ্বারা স্বীয় স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান শিমলা ও শিমলা Hill Statesগুলির ইতিহাস এই

* Proclamation, dated the 17th October, 1814.

সময় হইতেই আরম্ভ। এযাবৎকাল এ সকল প্রদেশে শাসন-সুশৃঙ্খলার অভাব ও পরস্পর দ্বন্দ্ব-মালিন্যে বিচ্ছিন্নতাই ইঁহাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের বিঘ্নস্বরূপ ছিল। অর্থগৃধ্নুতার বশে অনেকেই এই সকল স্থানে পদক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্রিটিশরাজের আদর্শ শাসন-পদ্ধতির ছায়াতলে এই সকল প্রদেশ এখন শান্তি ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আমরা এক্ষণে এই পার্ব্বত্যরাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ* সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এ সকল প্রদেশে দেশীয়গণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শিরমুর বা নাহান গুর্খা সমরের সময় জেশলমীর মহারাওল বংশীয় কর্ম্মপ্রকাশ সিংহ শিরমুর অধিপতি ছিলেন। সমরাবসানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ব্ববিধ অক্ষমতা নিবন্ধন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেপ্রকাশ সিংহকে ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফতেপ্রকাশ ১৮৫০ খৃঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পৌত্র সমশেরপ্রকাশ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজরাজের যথেষ্ট সহায়তা করায় পুরস্কারস্বরূপ ৭টী ও পরে ১৩টী তোপধ্বনির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং G.C.S.I উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারই পৌত্র H. H. Maharaja Lt. Col. Sir Amar Prakash Singh, K.C.S.I. এক্ষণে বর্ত্তমান শিরমুরাধিপতি। ইহার পিতা রাজা সৌরীন্দ্রবিক্রম সিংহ ও খুল্লতাত লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল বীরবিক্রম সিংহের সময় হইতেই শিরমুরের বিশেষ যশোলাভ ও

* এই বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রামাণ্য পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। (1) Massy's Chiefs and Families of note in the Punjab. (2) Sir L Griffin's Punjab chiefs (3) Aitchison's Treaties and Sanads. (4) Punjab Government Records, 1807 to 1857. (5) Punjab Gazetteer.

উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে আমরা এ বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছি। শিরমুর উত্তর দক্ষিণে ৪৫ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত। লোক সংখ্যা ১৩৫৬২৬ এবং রাজস্ব ৬ লক্ষ। মার্কণ্ড, গিরিগঙ্গা, টনস্ ও যমুনা নদী শিরমুরকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন নদী স্বর্ণরেণুবহুল। কাষ্ঠের মধ্যে শাল ও দেবদারুই উল্লেখযোগ্য। খনিজবিভবের মধ্যে লৌহ, তাম্র ও সীসক ধাতুর কথাই শুনা যায়। কৃষিউৎপন্ন গম ও ছোলা ইত্যাদির অধিকাংশই শিমলা ও ডেরাডুনে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার শ্লেট পাথর পার্ব্বত্যদেশে গৃহের আচ্ছাদনস্বরূপ টালির কার্য্য করিয়া থাকে।

বিলাসপুর বা কৈহলিয়র—৬ মার্চ, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে রাজা মহাচন্দ্র সিংহ নিজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনিও রাজবারার রাজপুত বংশীয়। ইঁহার পিতৃপুরুষগণ কবে এবং কি হেতু এখানে আগমন করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। এই বংশের স্থাপয়িতা হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন হরিহর চন্দ্রের দুই পুত্র, একজন চম্বা জয় ও অপর বীরচন্দ্র বিলাসপুর প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি বীরচন্দ্রের বংশধরগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিলাসপুর অধিকার করিয়া আছেন। বর্ত্তমান রাজা H. H. Capt. Sir Bije Chand K.C.I.E., C.S.I. ১৮৮৯ খ্রীঃ জুন মাসে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন। বিলাসপুর অহিফেন, আর্দ্রক ও তাম্রকূটের জন্য বিখ্যাত। লোক-সংখ্যা ৯০৮৭৩ এবং রাজস্ব ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মাত্র। বিলাসপুর-বক্ষপ্রবাহিনী শতদ্রু তরঙ্গভঙ্গে দুকূল প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্রী ও সম্পদ্‌সমন্বিত করিয়া রাখিয়াছে। শিরমুর ও বিলাসপুরাধিপতি ইংরাজ অধীনে নিষ্কর সামন্ত শ্রেণীভুক্ত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সামন্তিক নিয়মানুযায়ী ইঁহাদিগকে সৈন্য সাহায্য করিতে হয়।

হিন্দোর বা নলাগড়—পূর্ব্বে নলাগড় বিলাসপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরচন্দ্রের দ্বাদশ অধস্তন অজিতচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা অজয় চন্দ্রকে নলাগড় প্রদান করেন। তদবধি বিলাসপুর রাজবংশের এই

শাখা হিন্দোর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ২০শে অক্টোবর, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে রাজা রামশরণ সিংহ করদ রাজারূপে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গুর্খাসমরবিশ্রুত মালনদুর্গ এই রাজ্যের অন্তর্ভূত হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহা নিজ তত্ত্বাবধানে সেনানিবাসরূপে রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে উহা প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান রাজা ঈশ্বরী সিংহ। লোকসংখ্যা ৫২৫৫১ ও রাজস্ব ১ লক্ষ ৩০ হাজার, তন্মধ্যে ৫ সহস্র মুদ্রা করস্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। এখানেও অহিফেনের চাসই অধিক।

রামপুর বা বসাহির—৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮১৫খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে বর্ত্তমান রাজা সমশের সিংহের (১৯০৮) পিতা রাজা মহেন্দ্রসিংহ বসাহর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সনন্দের মুচলেখা অনুসারে বসাহর-রাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বে বাৎসরিক ১৫ হাজার ও এখন প্রায় চারি হাজার মুদ্রা কর দিয়া থাকেন এবং সামরিক নিয়মানুযায়ী যুদ্ধের সময় স্বশরীরে স্বীয় সৈন্যবল সহিত ইংরাজরাজের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত। উত্তর পূর্ব্ব দিকে রামপুর রাজ্য তিব্বত সীমান্ত বর্ত্তী হওয়ায় কয়েকটি গিরিসঙ্কট উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে সিপ্‌কি পাস্ হিন্দস্থান-তিব্বত পথের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহারই এক দিকের শৈলশীর্ষ হইতে শত দ্রুত গতি শতদ্রু চঞ্চল পথে নামিয়া আসিয়া পুণ্যভূমি ভারত স্পর্শ করিয়াছে। শতদ্রু বসাহর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া রাজধানী রামপুর বেষ্টনপূর্ব্বক ভজ্জি, বিলাসপুর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চনদে মিলিতা হইয়াছে। এখানকার দেবদার, কেলু, কায়েল, আখরোট ও অন্যান্য জাতীয় বৃক্ষের বন প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত অরণ্যভূমি দশ সহস্র মুদ্রা বনকরের পরিবর্ত্তে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট ইজারা দেওয়া আছে। শতদ্রুবাহিত কাষ্ঠ সকল শিমলা ও পঞ্জাবের সকল স্থানে আনীত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। রামপুরে তিব্বত হইতে আনীত মেষলোমের এক বাজার বসে এবং তাহা হইতে প্রস্তুত রামপুরি চাদরের জন্য ইহা বহুকাল হইতে সভ্যসমাজে

পরিচিত। এখানকার চিনি পর্ব্বত এক সময়ে লর্ড ড্যাল-হৌসির ও পরে অন্যান্য রাজপুরুষগণের প্রিয় গম্যস্থান ছিল ও নিদাঘের তাপহরণ করিত। লোকসংখ্যা ৮০৫৮৩ এবং রাজস্ব ৮৫০০০ টাকা।

পূর্ব্বোল্লিখিত রাজ্যচতুষ্টয় সর্ব্ববিষয়েই প্রধান। অবশিষ্ট রাজ্যগুলি দুইভাগে বিভক্ত—বড় ঠাকুরাই ও আধারা বা অর্দ্ধ ঠাকুরাই। ইহাদের অধিপতিগণ রাণা বা ঠাকুর নামে পরিচিত। কেঁওথাল, বাঘহাল, বাঘহাট, কুমারসে, ভজ্জি, মৈল্যোগ, ধামী, কুটহর, কুনিহর, মঙ্গল, কোটি ও মাধান বড় ঠাকুরাই ও বাকিগুলি অর্দ্ধ ঠাকুরাই। ইঁহারা সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্যপালন করিয়া থাকেন, কেবল প্রাণদণ্ড শিমলার ডেপুটী কমিশনরের দ্বারা সমর্থিত করিয়া লইতে হয়। রাজ্যভার অধিকাংশ স্থলে বংশপরম্পরাগত উজীরগণের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। অহিফেন এখানকার একটী প্রধান ব্যবসায় এবং অহিফেন সেবন সম্বন্ধে এখানকার অধিবাসী ও রাণাগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজস্থানের রাণাগণকেও কখন কখনও অতিক্রম করিয়া থাকেন। আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—"ব্যাগার" পদ্ধতি (forced labour)। প্রত্যেক প্রজা রাজ্যের নিয়মানুযায়ী বৎসরের যে কোনও সময়ে আবশ্যক হইলে বিনা পারিশ্রমিকে রাণার আহ্বানে মজুরের কার্য্য করিতে বাধ্য। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। শিমলার কয়েক মাইল উত্তরে ভজ্জির রাজধানী সিওনীর উষ্ণ প্রস্রবণ (Hot Sulphur Spring) জগৎবিখ্যাত। রক্তদুষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত পীড়িতগণ এখানকার উৎসে কয়েকদিন স্নান করিলে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইংরাজশাসনের হিতজনক ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থার গুণে ও কোন কোন স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের সাহচর্য্যে ইহাদের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধোপলক্ষে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজপুতগণ এখানে উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে বংশপরম্পরাগত প্রথাসকল আনিতে ভুলেন নাই।

সতীদাহ তাহাদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট প্রথা। স্বামীর চিতানলে সাধ্বীর এবং নরপতির সহিত প্রধান সর্দ্দারগণের সহমরণ পূর্ব্বে বহুস্থানে প্রচলিত ছিল।* ক্রমে রাজপুরুষগণের আদেশ ও আদর্শে ইহা ক্রম-পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত হইয়াছে। ভারতে যবনাধিকারের সময় এবং ইংরাজ শাসন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও স্ত্রীবিক্রয় প্রথা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত ছিল। ওমরাহ ও আমীরগণের অন্তঃপুর ও ধনশালিগণের বিলাসোপকরণ পরিপূর্ণ করিবার জন্য এতদ্দেশ হইতে সুন্দরী যুবতীর ক্রয়বিক্রয়ের কথা বিশেষভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্রীতদাসীরূপেই গৃহীত এবং সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। কৈফিয়ৎস্বরূপ ইহারা বলেন, এতদ্দেশে দারিদ্র্যই এরূপ প্রথার একমাত্র কারণ। আত্মীয়-বর্গ এরূপ প্রথার সমর্থন কল্পে দারিদ্র্যেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। বংশমর্য্যাদাও এইরূপে ক্রয়বিক্রয়ের হাটে বলি দিতে ইঁহারা পশ্চাদ্‌পদ হয়েন না। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ কিন্তু ইহার অন্যবিধ কারণ ও উপায়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এতদ্দেশে বিবাহ পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া যদি দেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের চির-কল্যাণময়ী জ্ঞান ও ধর্ম্মের পুণ্যকাহিনীসম্বলিত উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচারপূর্ব্বক ইহাদের মনে স্থায়ী বিশ্বাস উপচিত করিতে পারেন তাহা হইলে নীতি ও ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া সাধুব্যক্তিগণের ক্ষোভ বিদূরিত হইতে পারে। প্রবন্ধান্তরে এখানকার বিবাহ পদ্ধতির কিছু উল্লেখ করিয়াছি। অষ্টপ্রকার পরিণয় পদ্ধতির মধ্যে আসুর বিবাহই প্রধানতঃ এখানে প্রচলিত। বিবাহার্থী যুবক পত্নী লাভাশায় কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে বা কন্যাকে মূল্যস্বরূপ অধিক অর্থ অর্পণ করিতে না পারিলে পত্নীলাভে সমর্থ হয় না। বিবাহ এইরূপে একটী ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি কেহ কেহ যৌবনের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া নয়শত

* Captain Kennedy's Report, dated the 6th July, 1824.

হইতে বারশত পর্য্যন্ত বা আরও অধিক অর্থ দিয়া পত্নীলাভ করিয়াছেন। তাহাও হয়ত অপর কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী। কাজেই, সময় মত যৌবনোদ্গমে পুত্রকন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত না হওয়ায় পরিণাম ফল যাহা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার এখানকার বিশ্বাস ও নিয়ম এই যে, কন্যা যতদিন পিতৃগৃহে বাস করে ততদিন সে স্বাধীনা এবং তাহার কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার কাহারও বিশেষ অধিকার ও আবশ্যকতা নাই। বিবাহপ্রথার যেরূপ স্বৈরগতি বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভও সেইরূপ সুলভ ও অনায়াসসাধ্য। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আর একটি কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কন্যাবিসর্জ্জন বা সূতিকাগারে সদ্যোজাতা কন্যাহত্যা (Female infanticide) বা দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থে কন্যারূপা আহুতি। ইদানীন্তন কালে এসকল কুপ্রথার পরিচয় প্রকাশ্যে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবাহপ্রথার এবং নীতি ও ধর্ম্মের ক্ষীণতা এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। অবশ্য ইহা সাধারণের মধ্যে। উচ্চবংশীয় রাজপুত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক নিয়মের আচার প্রতিপালনে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন। যাহা হউক, যৌনসম্মিলনের এরূপ নিয়মতারল্য বর্ত্তমান থাকিলেও এখানকার অধিবাসিগণের গুণের সংখ্যা এত অধিক যাহা সকলেরই অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য। সাহস, বীর্য্য, সত্যভাষণ, পরিশ্রম ও শান্তিপ্রিয়তা ইহাদের মৌলিক গুণাবলী। সাধারণতঃ অপরাধের সংখ্যা এত কম যে, Captain Kennedy এই গুণে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার রিপোর্টের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, "In no part of the protected dominions, and I may give a wider scope and say the world, is there less crime known." চুরি, হত্যা, বিষয়বিবাদ বা দলাদলি এত কম যে তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

নিউটন।

(অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ)

অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিউটন যে প্রকার আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়াছেন তাহা এক কথায় বলা যায় না। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, যদি নিউটন না জন্মিতেন তাহা হইলে আমাদের জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান শতাংশের একাংশও হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিউটন বাল্যকালে একরকম বোকা ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইংরাজ এবং নিউটন ইংলণ্ডে ১৬৪২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরই গেলিলিওর মৃত্যু হয়। তাঁহার পিতার অনেকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি নিজে চাষের কাজ করিতেন। বাল্যকালে নিউটন একটি সামান্যরকম স্কুলে পড়িতে যাইতেন বটে কিন্তু স্কুলে যাইয়া লেখাপড়া বড় কিছুই করিতেন না। বাটী আসিয়া হয়ত পাতলা কাগজ লইয়া বাতাসের ঘূর্ণি চাকা, জল তোলা চাকা, জলের ঘড়ি, রকমারী ঘুড়ী—এই সব তৈয়ারী করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া কাজে পাঠান হইল। বাজারে তরকারী বিক্রয় করিতে যাইয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বই পড়িতেন। লেখাপড়ায় ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া এই আত্মীয় তাঁহার লেখাপড়ার সুবিধা করিয়া দিলেন এবং এই প্রকারে নিউটন ইংলণ্ডের বড় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

আমরা নিউটনের সংসারের কথা বেশী কিছু বলিব না—কারণ, তিনি বিবাহ করেন নাই। আজীবন অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান চর্চ্চাতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কি কি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই কতকটা অল্প কথায় বুঝাইব। প্রবাদ আছে যে, নিউটন গাছ হইতে আপেল ফল পড়িতে দেখিয়াই পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটা শুধু গল্পকথা নহে। ইহাতে অনেকটা সত্য আছে। এই সময়ে ফরাসী দেশে ভল্টেয়ার নামে এক মহা পণ্ডিত ও লেখক বাস করিতেন। তিনি এই আপেলের কথাটি প্রকাশ করেন। ভল্টেয়ার আবার নিউটনের ভাগিনেয়ীর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন; কাজে কাজেই কথাটি সত্য হওয়াই সম্ভব। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই আপেল গাছটি ঝড়ে পড়িয়া যায় এবং ইহার খানিকটা শুক্‌না কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।* হয়ত, ছেলেবেলায় তাঁহার সাম্‌নে একটি আপেল গাছ হইতে টুপ্‌ করিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে নিউটন ভাবিয়া-ছিলেন যে, সব পদার্থই যখন, ছাড়িয়া দিলে মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা পৃথিবী সকল দ্রব্যকেই মাটির দিকে টানিয়া লয়। ইহাতে নিউটনের গুণপনা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেই শক্তিটি কি প্রকার, কি রকমে কাজ করে, তাহার মাপ কি, তাহা দ্বারা জগতে কি উপকার হইতেছে—এই সব নিউটনের আবিষ্কার বলিয়া তিনি জগৎপূজ্য হইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ জিনিষটা কি এবং নিউটন তাহার কি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আগে দেখা যাক্; পরে কি প্রকারে তিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দ্বারা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলিব। নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যে কোন দুইটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে টানিতেছে। তোমার ঘরে তোমার কলম দোয়াতকে টানিতেছে—আবার দোয়াত কলমকে টানিতেছে, তোমার আলমারি প্রদীপকে টানিতেছে, আবার প্রদীপ আলমারিকে টানি-তেছে ইত্যাদি। সকলেই যখন টানাটানি করিতেছে তখন ঘরের ভিতরের ও বাহিরের সকল দ্রব্যই একস্থানে জড়সড় হইয়া তালগোল পাকাইয়া যায় না কেন? নিউটন বলিলেন, পদার্থ যত ভারী হইবে

* O. Lodge. Pioneers of Science—p. p. 180-181.

তাহার টানও তত বেশী হইবে। আমরা পৃথিবীর উপরে আছি। পৃথিবী একটি খুব বড় পদার্থ, এবং খুব ভারী—কাজেই পৃথিবীর উপরে যতকিছু পদার্থ আছে—মানুষ, গাছ, পাথর, বাড়ী, ইট, আলমারী, কেদারা ইত্যাদি—তাহাদের চেয়ে পৃথিবী লক্ষ লক্ষ গুণ ভারী। সেই জন্যই সকল পদার্থের উপরে পৃথিবীরই টানের কাজ দেখা যায়—আর আর সব পদার্থের পরস্পরের টান দেখা যায় না। এই দেখ, চন্দ্রও একটি পদার্থ, পৃথিবী নিশ্চয়ই চন্দ্রকে টানিতেছে। পদার্থকে টানিলেই তাহা এগাইয়া আসে। তোমার হাতে একটি আম আছে। যতক্ষণ উহাকে হাতে ধরিয়া রাখিতেছ, ততক্ষণ উহা আসিতে পারিতেছে না। পৃথিবী টানিতেছে বটে কিন্তু উহা স্বাধীন নহে। হাত ছাড়িয়া দাও, দেখিবে উহা পৃথিবী অর্থাৎ মাটির দিকে পড়িয়া যাইবে। এখন, চন্দ্রকে যদি পৃথিবী টানিতে থাকে, তবে চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর দিকে ত পড়িতেছে না। এইবার নিউটনের আবিষ্কার সত্য কিনা তাহা প্রমাণ করিবার বড়ই সুবিধা হইল। কিন্তু এইটি বুঝাইবার আগে এই আকর্ষণ সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলা আবশ্যক।

আমরা বলিয়াছি যে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন পদার্থের উপরে জোর কমবেশী হয়—পদার্থটি যত দূরে থাকিবে জোরও ততই কম হইবে। কিন্তু কি হিসাবে কম হইবে? নিউটন সেই হিসাবটিও পরিষ্কার করিয়া নিরূপণ করিলেন।

মনে কর, পৃথিবী আর চন্দ্র পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। চন্দ্র যদি এগাইয়া পৃথিবীর ঠিক অর্দ্ধেক দূরে থাকে, তাহা হইলে ঐ জোর ২ গুণ হইবে না—২ × ২ = ৪ গুণ হইয়া যাইবে। চন্দ্র ও পৃথিবীর দূরত্ব যদি তিন ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে ঐ জোর ৩ গুণ বাড়িবে না—৩ × ৩ = ৯ গুণ বাড়িবে। ঐ দূরত্ব যদি চারি ভাগের একভাগ হয়, জোর ৪ × ৪ = ১৬ গুণ বাড়িবে। এখন এই হিসাব ঠিক কিনা তাহার প্রমাণ কোথায়? চন্দ্রই তাহার

প্রমাণ। কিন্তু চন্দ্র কি পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে? নিউটন বলিলেন, চন্দ্র পৃথিবীর দিকে প্রতি মিনিটে ১৩ ফুট করিয়া পড়িতেছে। তোমরা বলিবে, সে কি রকম—চন্দ্র আবার পড়িতেছে কি রকম? চন্দ্র ত পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতেছে। নিউটন বলিলেন, এই ঘোরাটা কোথা হইতে আসিল? বল দেখি, চন্দ্র কেন ঘুরিতেছে? চন্দ্রকে কে ঘুরাই-তেছে? যদি পৃথিবী চন্দ্রকে আপনার দিকে না টানিয়া আনিত তাহা হইলে চন্দ্র ঘুরিতে পারিত না। চন্দ্রের আপনার সোজাসুজি একটা গতি আছে। তুমি যদি জোর করিয়া একটা ইট ছুড়িয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে ইটটা খানিক দূর অনেকটা সোজাসুজি যাইবে বটে কিন্তু অবশেষে উহা বাঁকিয়া মাটির দিকেই আসিবে। এখানে ইটটিকে জোর করিয়া ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইটের নিজের সামনের দিকে একটা গতি আছে, সেই গতিতে সে সোজাসুজি চলিয়া যায়। মনে কর, চন্দ্র নিজের গতিতে এক মিনিটে সোজাসুজি ক হইতে খ অবধি চলিয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর যদি চন্দ্রের উপর নিউটনের হিসাব মত আকর্ষণ থাকে, তাহা হইলে চন্দ্র নিশ্চয়ই পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে। নিউটন তাঁহার হিসাব মত বলিলেন, চন্দ্র প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট করিয়া পড়িবে। চন্দ্র নিজের গতিতে সোজাসুজি খ স্থানে আসিত, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ ১৩ ফুট নিচের দিকে গ স্থানে নামিয়া আসিবে। অর্থাৎ খ হইতে গ অবধি প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট হওয়া আবশ্যক। এখন নিউটন দূরবীণ দ্বারা চন্দ্রের গতি মাপ করিয়া দেখিলেন যে, যাহা চক্ষে দেখা যাইতেছে তাহার সহিত আগেকার হিসাব মিলিতেছে না। হিসাব ১৩ ফুট হইতেছে কিন্তু মাপে ১৫ ফুট হয়। তাহলে কোন্‌টা ভুল?

এই রকমে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন নিউটন লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পিকার্ড নামে এক পণ্ডিত পৃথিবীর ব্যাস হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন। নিউটন পৃথিবীর যত ব্যাস ধরিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা এই নূতন ব্যাসের মাপ কিছু কম। নিউটন তখনই এই পিকার্ডের মাপ লইয়া নূতন

করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন। হিসাব যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল ততই তিনি অবাক্ হইয়া যাইতে লাগিলেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি এইবার ঠিক ১৩ ফুটই হইবে, ১৫ ফুট আর হইবে না। তিনি আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া যাইলেন, আর নিজের হাতে হিসাব শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা হিসাব করাইয়া লইয়া দেখিলেন, যে তাঁহার হিসাব ঠিকই হইয়াছে। কারণ, মাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চন্দ্র প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট করিয়াই পড়িতেছে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম নিউটন যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম সৌরজগতে লাগাইয়া আমরা পৃথিবীর ওজন, বৃহস্পতির ওজন, চন্দ্রের ওজন ইত্যাদি জানিতে পারিয়াছি। পৃথিবীর উপরে বসিয়া লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে যে গ্রহটি ঘুরিতেছে, তাহার আকার, গতি, ওজন ইত্যাদি আমরা বলিয়া দিতে পারি। নিউটন যদি তাঁহার হিসাব বাহির না করিতেন তাহা হইলে আমরা এ সব কিছুই জানিতে পারিতাম না।

নিউটন অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তবে তিনি কেবল শক্ত শক্ত অঙ্ক লইয়াই সময় কাটাইতেন না। আলোক শাস্ত্রেও তাঁহার অনেক আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই বৃষ্টির পর আকাশে রামধনু দেখিয়াছে। এই রামধনুকে লাল হইতে নীল অবধি যে কত রকম রং আছে তাহার ঠিকানা নাই। মোটামুটি অনেকেই বলেন যে সাত রকম রং আছে তাহা বাস্তবিক সত্য নহে। সাত রকম না বলিয়া সাত শত রকম বলিলে বরং ভাল হইত। তবে মনে রাখিবার জন্য অনেকে সাত রকম রংয়েরই নাম করেন। এই রামধনুর রং কেমন করিয়া হইল এবং আকাশের মাঝখানে একেবারে এত রকম রংয়ের পর রং আসিলই বা কোথা হইতে, ইহার উত্তর নিউটনই সর্ব্বপ্রথমে দিয়াছেন। তিনি যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন তাহাই সোজা কথায় আমরা একটু বলিব।

সূর্য্যের আলোকে আমরা সাদা আলো বলি। আলোক অনেক

রংয়ের হয়—লাল, নীল ইত্যাদি। দেওয়ালীর রাত্রে অনেক রকম বাজী পোড়ান হইয়া থাকে। আকাশে হাউই ছোড়া হয় এবং তোমরা দেখিয়া থাকিবে, সেই হাউই আকাশে ফাটিয়া নানা রংয়ের তারা বাহির হইতেছে। তোমরা অনেকেই দীপক বাজি দেখিয়াছ। ইহা জ্বালিয়া দিলেই চমৎকার আলো হয়—লাল, নীল, সবুজ ইত্যাদি। আবার রংমশাল জ্বালিলে পরিষ্কার সাদা আলো হইবে। নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, এই যে রংমশালের সাদা আলো অথবা সূর্য্যের সাদা আলো, ইহার মধ্যেই সব আলো আছে। নিউটন সর্ব্বপ্রথমে লোককে জানাইলেন যে, সূর্য্যের আলোক একটি মাত্র রংয়ের আলোক নহে; ইহাতে ঘোর লাল, ফিকে লাল, গাঢ় কমলা-নেবুর রং, হলুদের মত রং, ফিকে হলদে, সবুজ, আকাশের মত নীল রং, বেগুনের গায়ের রং, এবং নীল ইত্যাদি রংয়ের আলো আছে। যদি তুমি এই সব রংয়ের আলোক পৃথক্ করিয়া প্রস্তুত কর এবং সব আলোক এক জায়গায় একত্র কর; তাহা হইলে দেখিবে যে, তোমার চক্ষে সাদা আলোক দেখাইতেছে। সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক, অনেক নক্ষত্রের আলোক এই রকমে সাদা দেখায়।

নিউটন কেমন করিয়া সাদা আলোর এই আশ্চর্য্য গুণ জানিতে পারিলেন তাহা বলিতেছি। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক দিয়া যে সূর্য্যরশ্মি আসিতেছে সেই রশ্মিতে একটি তেশিরা কাচ ধরিলে দেওয়ালে রামধনুর মত কত রং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছে। নিউটন ঠিক এই উপায় অবলম্বন করিয়াই এই আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা এত সোজায় হয় নাই; এক কথায় বুঝান গেল বটে, কিন্তু নিউটন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক রাত্রি জাগিয়া, অনেক পরিশ্রম করিয়া তবে এই আবিষ্কারটি করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া বিজ্ঞান জগতে একটি সত্য হইতে আর একটি চমৎকার সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই নিউটনের সকল কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্য একথাটি আমরা আরও একটু বিশদভাবে বলিব।

গেলিলিও কি প্রকারে দুরকমের দুখানি চশমার কাচের মত কাচ লইয়া দূরবীণ গড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। নিউটনও আপন হাতে ঐ রকম দূরবীণ যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন কিন্তু একটু পৃথক্ রকমের। দূরবীণের ভিতরে বাহিরের পদার্থের যে ছবি পড়িল, তাহা দেখিয়া নিউটন সন্তুষ্ট হইলেন না। এই ছবি নিউটনের মনোমত না হওয়ায় তিনি সেই কাচ বদলাইয়া ফেলিলেন এবং গোল গোল কাচ কিনিয়া স্বহস্তে বসিয়া মাজিয়া পালিশ করিলেন, অপরকে দিয়া করাইলেন না। কারণ, ইহা বড় সূক্ষ্ম কাজ। ইহার সূক্ষ্ম মাপ আছে এবং সেই হিসাবে করা চাই। তাহা না করিলে দূরবীণের ভিতর ঠিক ছবি পড়িবে না। নিউটন এই প্রকারে নূতন দূরবীণ তৈয়ার করিলেন বটে কিন্তু ইহার ভিতরের ছবিও স্পষ্ট হইল না। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কাচের দোষ নহে, সাদা আলো ঐরূপ কাচের ভিতর দিয়া যাইলেই কিছু না কিছু অস্পষ্ট হইয়া যাইবেই। ইহা আলো ও কাচের সম্পর্ক। এই ধারণা করিয়াই তিনি তেশিরা কাচ লইয়া সূর্য্যের আলোক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং এই পরীক্ষার ফল কি হইল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখ, দূরবীণের ভিতরে ছবি ভাল হইতেছে না দেখিয়া নিউটন কি কি নূতন সত্য প্রকাশ করিলেন। প্রথমে তিনি এক নূতন ধরণের দূরবীণ তৈয়ার করিলেন। এই দূরবীণটি ছোট বটে কিন্তু উহার দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছিল এবং উহা এখনও বিলাতে আলমারীর ভিতর মণিমাণিক্যের মত মূল্যবান্ মনে করিয়া সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়, দূরবীণ ভাল করিতে গিয়া সাদা আলোর গুণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনিই বলিলেন যে, সাদা আলোর ভিতরেই সব রকম আলো আছে। লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী, যে কোন রকম আলো হউক না কেন, সবই এই সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরেই পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নতত্ত্ব।

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান কালের সুবিখ্যাত দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তিনি জড়বাদগ্রস্ত পাশ্চাত্যদেশে একটি নূতন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত বার্গসোঁর দর্শনের তুলনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উহা যে প্রধান ভিত্তিগুলির উপর স্থাপিত সেগুলি হিন্দুদর্শনের নিকট অবিদিত নহে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুদর্শন তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর ভাবে সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে।

বার্গসোঁর স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতগুলি যে একেবারে সত্য নহে এরূপ কথা বলা যায় না কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যাহা ঐ মত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বার্গসোঁর ব্যাখ্যার বাহিরেও স্বপ্নতত্ত্বের অনেক বিষয় আছে। বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

মনের মধ্যে মানসিক চিত্র সংগঠন আমাদের মানসিক ক্রিয়াবলীর মূল উপাদান। এই মানসিক চিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া আমাদের চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি সকল প্রকার মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়।

কোনও মনস্তত্ত্ববিদ্ এই মানসিক চিত্রাবলীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) কোনরূপ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া সৃজিত মানসিক চিত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Presentative বলা যায়।

(২) ইন্দ্রিয়ানুভূতি ব্যতিরেকে সৃজিত মানসিক চিত্র। এই

সব চিত্র যেন আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়—কোনও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া সৃজিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Representative বলা যায়।

প্রথম শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমাদের মনের অধিকাংশ মানসিক চিত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বার্গসোঁর মতে,—স্বপ্নচিত্রও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি বলিয়াছেন, চক্ষু বুজিলে আমাদের মনশ্চক্ষে যেরূপ বর্ণবৈচিত্র্য দেখি, তদনুরূপ অনুভূতি লইয়াই স্বপ্নচিত্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ যাহা আমাদিগের মনের মধ্যে স্বতঃ উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যাইতে পারে—

মনে করুন, আমরা বাহিরের অবস্থা ভুলিয়া, বাহ্য জগতের অনুভূতি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি। বাহিরের বা ভিতরের কোনওরূপ উত্তেজনা আমাদের মনকে উত্তেজিত করিতেছে না, কিম্বা মানসিক গতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে না। কিন্তু তথাপি সেই সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বস্তু, বিবিধ স্থান, কাল ও জীবনের অবস্থা, নানাপত্র ও ভাব ও চিন্তা, বহু অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা—এই সকলের বিচিত্র দৃশ্যাবলী আমাদের মনের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র ছায়াদৃশ্য আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনে আবির্ভূত হয় ও আপনা হইতেই মিলাইয়া যায়। এই সব মানসিক চিত্রগুলিকে Representative বা স্বতঃপ্রসূত মানসিক চিত্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রিয়বোধপ্রসূত ও স্বতঃপ্রসূত এই উভয়বিধ অনুভূতির মধ্যে যে কোনরূপ প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে, ইউরোপীয় মনীষিগণ এ কথা স্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়বোধ অবলম্বন করিয়া যেরূপে মানসিক অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণার

দ্বারা একরূপ স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, আমাদের দেহে ইন্দ্রিয়বোধ উৎপন্ন হইবার জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়জ্ঞানবাহী স্নায়ুর (Special sensory nerves) প্রান্তভাগে বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক যন্ত্র (End organs) রহিয়াছে। যেমন, দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve) প্রান্তভাগ আমাদের চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বিস্তৃত হইয়া অক্ষিপর্দ্দা (Retena) সৃজন করিয়াছে। এই প্রান্তভাগে এমন যন্ত্র রহিয়াছে, যাহাতে আলোকরশ্মি পড়িলেই একরূপ আণবিক পরিবর্ত্তন হয়; ঐ আণবিক পরিবর্ত্তনের ফল দর্শন-স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্ককেন্দ্রের (Visual centre) উপর ক্রিয়া করে। এই মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়ার ফলে আমাদের দর্শন ঘটিত মানসিক অনুভূতি হয়। ঐরূপ শ্রবণ স্নায়ুর (Auditory nerve) প্রান্তভাগ আমাদের কর্ণপটহের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রান্তভাগে শ্রবণ যন্ত্র রহিয়াছে, যাহার উপরে বায়ুকম্পনের আঘাত হইলে একরূপ পরিবর্ত্তন হয়, যাহা শ্রবণ স্নায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ মস্তিষ্ক কেন্দ্রে (Auditory centre) উপনীত হয় এবং এই মস্তিষ্ক কোষের উপর এমন ক্রিয়া করে যাহাতে আমাদের শ্রবণ বিষয়ক মানসিক অনুভূতি হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার ইন্দ্রিয়বোধঘটিত মানসিক অনুভূতি এইরূপেই ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু মনে করুন, আমরা চক্ষু বুজিয়া আছি, কিম্বা অন্ধকার ঘরে আছি আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কোনও কার্য্য করিতেছে না, কিন্তু তথাপি আমাদের মনের মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় ঘটিত মানসিক চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছে কিম্বা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে যেরূপ স্ফটিকদৃষ্টির বর্ণনা করিয়াছি সেইরূপ স্ফটিকদৃষ্টি হইতেছে। অর্থাৎ এই সময় আমার মনোমধ্যে এরূপ মানসিক ছায়াচিত্র দেখিতেছি যাহার সহিত বাস্তব জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা কিরূপে সম্ভব ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিবেন যে, এরূপ স্থলেও মানসিক অনুভূতি

মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই সব মানসিক চিত্র, যাহা আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হয় বলিয়া মনে হয়, আমাদের লুপ্তস্মৃতির পুনর্জাগরণ মাত্র, এবং স্মৃতির এই পুনর্জাগরণ মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হয়।

কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে দুই একটি আপত্তি করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়বোধ প্রভৃত মানসিক অনুভূতির সঙ্গে যে মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার যোগ আছে, ইহা দেহবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পরীক্ষার দ্বারা অনেক পরিমাণে সমর্থিত হওয়ায় অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ব্যতিরেকে যে মানসিক অনুভূতি—যেমন, লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধার—এইরূপ কার্য্যের সহিত মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার সম্বন্ধ এপর্য্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারা যায় নাই।

পাশ্চাত্য দর্শনের স্মৃতি বা memory, হিন্দুদর্শনের অন্তরেন্দ্রিয়ের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুদর্শন-মতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংজ্ঞানরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের চারি বিভাগের চারি প্রকার বৃত্তি বা কার্য্য আছে এবং এই অন্তরেন্দ্রিয় মৃত্যুর পরও জীবাত্মার সঙ্গে থাকে। সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে হিন্দুদর্শনমতে এই অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সহিত এক নহে।

নিদ্রাবস্থা, হিপ্‌নটাইজ্‌ড্ অবস্থা, ধ্যানাবস্থা, স্ফটিকদৃষ্টির অবস্থা—এই সব অবস্থায় আমাদের মস্তিষ্ককেন্দ্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমিয়া (inhibited) যায়, কিন্তু তখন আমাদের স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক প্রখরতা লাভ করে। এমন সব বিস্মৃত ঘটনা, যাহা আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় স্মরণ করা একরূপ অসম্ভব, তাহা এই অবস্থায় স্মরণ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়বোধাবলম্বী মানসিক অনুভূতি

যেরূপ ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কোষের (Brain cells) ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, ইন্দ্রিয়বোধ-নিরালম্বী মানসিক অনুভূতি সেইরূপ মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। হিন্দুদর্শনও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর অনুভূতিগুলি বহিরিন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিগুলি অন্তরেন্দ্রিয়ের চিত্তরূপ বিভাগের উত্তেজনাপ্রসূত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কল্পিত দর্শন (Hallucination) সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই পার্থক্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

কল্পিত-দর্শন অনেকেরই জীবনে কখন কখন ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা দেখিয়া থাকেন, যেন একটি মূর্ত্তি কখন স্পষ্টভাবে, কখনও অস্পষ্টভাবে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া মিলাইয়া গেল। মনে হয় যেন ইহা চক্ষুর ভ্রম কিম্বা মনের কল্পনামাত্র। কারণ, জড়জগতে উহার কোন বাস্তব সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কল্পিত-দর্শন অনেক সময় ভ্রান্ত দৃষ্টি দ্বারা হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott) কবি বায়রণের (Byron) মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যখন বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া যখন আর একটি ঘরে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার মৃত বন্ধু বায়রণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তিটি অতি স্পষ্ট ও নিখুঁত। এমন কি, বায়রণ যেরূপ ভাবে দাঁড়াইতেন, যেরূপ পরিচ্ছদাদি পরিতেন তাহা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইলেন। তিনি ভয় না পাইয়া মূর্ত্তিটির দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে উহা দৃষ্টির ভ্রমমাত্র—ঐ ঘরে একটি পর্দ্দার উপর বড় কোট, শাল প্রভৃতি সাজান ছিল, তাহারই উপর অস্পষ্ট আলো পড়িয়া বায়রণের মূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি প্রথমে যে স্থানে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন, পুনরায় সেইস্থানে গিয়া মূর্ত্তিটি দেখি-

বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এবার আর কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। *

মহিলা কবি জেমস্ বিটি একদিন রাত্রে জানালার কাছে একটি Coffin অর্থাৎ শবাধারের আকৃতি দেখিয়া কিছু ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন যে, উহা চক্ষের ভ্রম মাত্র—জানালার উপরে যে পর্দা রহিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া এরূপ ভাবে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে যে উহাকে সহসা দেখিয়া coffin বলিয়া মনে হইয়াছিল।

বহু লোকের দৃষ্টিবিভ্রমের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। একবার বিলাতের একটি চিড়িয়াখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে ঐস্থানে রক্ষিত অনেকগুলি প্রাণী পুড়িয়া মরে। ঐখানে একটি বড় বানর ছিল। উপস্থিত লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সেটি খাঁচা হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছে। বানরটিকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য তাঁহারা একটি ঘরের ছাদের দিকে তাকাইলেন, ঐ ঘরেও তখন আগুন ধরিয়া গিয়াছে; তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই বানরটি ঐ ছাদের একস্থানে লোহার শিকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, এই ঘটনা সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরদিন দেখা গেল যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় যেটিকে বানর বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেটি বানর নহে। ঐস্থানে একটি পর্দা ছিল, তাহা কতক পুড়িয়া গিয়া বাতাসে নড়িতেছিল, তাহাতেই বানরের হস্তপদ সঞ্চালনের ন্যায় বোধ হইতেছিল। †

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় একটি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আর একটি বস্তুর ভ্রমজ্ঞান উদিত হওয়া সূচিত

* Sir Walter Scott's Demnology and witchcraft.

† Enigmas of Psychical Research—by Professor James H. Hyslop. Page 188.

করিতেছে। কিন্তু দৃষ্টিভ্রম দ্বারা না হইয়া শুধু মানসিক ভ্রম দ্বারাও এইরূপ ভ্রমাত্মক দর্শন হইতে পারে। 'কল্পিত-দর্শনের তালিকা' (Census of Hallucination) নামধেয় একখানি পুস্তক মনস্তত্ত্বসভা (Psychical Research Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুসংখ্যক মানসিক ভ্রম জনিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি তাহাদেরই অন্যতম—

মিসেস্ ই—র বয়স ৪০ বৎসর। তিনি নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামীর আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বারাণ্ডার পার্শ্বস্থ সিঁড়ির দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইতেছিলেন। হঠাৎ একবার তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার স্বামী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মোড় ফিরিয়া তাঁহার ঘরের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার স্বামীর মুখখানি যেমন হাস্য-প্রফুল্ল, এই মূর্ত্তির মুখখানিও ঠিক সেইরূপ। মিসেস্ ই— অগ্রসর হইয়া মূর্ত্তির সন্মুখীন হইতেই উহা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই মিলাইয়া গেল। এই সময় মিসেস্ ই—র শরীর বেশ সুস্থ ছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন একটি বিশেষ কার্য্যে আটক পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে বাড়ী আসিবার কথা কিছুই চিন্তা করেন নাই।

এস্থলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মিসেস্ ই— তাঁহার স্বামীকে চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার মানসিক ভ্রম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বামীর ছায়ামূর্ত্তি দেখাইয়াছিল।

বৈষ্ণব-দর্শন।

পূর্ব্বভাষ।

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(২০)

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন এই ভাগবতধর্ম্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কিরূপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীন সাত্বতধর্ম্ম ভাগবতধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ভাগবতধর্ম্মের অপর নাম 'পরধর্ম্ম'। কালে ভাগবতধর্ম্ম পাঞ্চরাত্রমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনন্তানন্দ-রচিত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনন্তানন্দ বলেন—

> "ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
> বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
> ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্।
> তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে॥"

ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ও কর্ম্মহীন—এই ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। অনন্তানন্দ ইঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক

বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র দুইটী পৃথক্ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।২।৪৩-৪,৪-৪৫) পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করের এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা উভয় মতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাভারতযুগে যে পঞ্চরাত্রমত ছিল তাহার প্রমাণ মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে (৩৫০ অধ্যায়) পাওয়া যায়। উহাতে সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বের ৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, যিনি সমগ্র জগৎকে আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি জীবের আশ্রয় তিনি বাসুদেব। মহাভারতকার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কি তাহা বলিয়া গিয়া বাসুদেব-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুতঃ, বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য।

মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে তাহার উদ্দেশ্য পঞ্চরাত্রের অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন। কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ নানা কারণে তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে চতুর্থ ব্রহ্মার বিবরণে পূর্ব্ববিবৃত ধর্ম্মকে দুই বার 'সাত্বত' বলা হইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম সাত্বতধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "ততোহি সাত্বতো ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ"। বসু উপরিচর এই সাত্বতবিধি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে—

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥" (১২।৩৩৫।১৯)

আবার মহাভারতেই কথিত হইয়াছে যে, রণস্থলে অর্জ্জুনকে বিমনা দেখিয়া বাসুদেব এই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানুজ "সাত্বত-

সংহিতা" নামে একখানি পঞ্চরাত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ 'সাত্বতর্ষভ' (১১।২১।১) ও 'সাত্বতপুঙ্গব' (১।৯।৩২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে, সাত্বতগণ যাদবগণেরই এক শাখা (১।১৪।১৩), তাঁহারা বাসুদেবকে পরব্রহ্মবোধে অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতে সাত্বতগণ কর্ত্তৃক যে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অনুমোদিত। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত সাত্বতগণই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে ইহা সাত্বতধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন' বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ 'ভাগবত' নামে খ্যাত ছিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রগণ বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র' নারায়ণোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বাসুদেব বৃষ্ণিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—পার্থ সাত্বতদিগকে আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ মনে করেন না। আদিপর্ব্বে (২১৮।১২) বাসুদেবকে সাত্বত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উদ্যোগপর্ব্বে (৭০।৭) তিনি 'জনার্দ্দন' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন। দ্বাপরশেষে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক সাত্বতাবিধি অনুসারে গীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে যাদব ও বৃষ্ণিদিগের তালিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অংশের পুত্র সত্বত এবং তাঁহার বংশাবলি সাত্বত নামে পরিজ্ঞাত। ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাত্বতেরা পরব্রহ্মকে ভগবান্ ও বাসুদেব বলিয়া থাকেন (৯।১।৪৯), এবং তাঁহারা কোন বিশেষভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত্বতেরা অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন; ইঁহারা যাদব নামেও অভিহিত ছিলেন (১।১৪।২৫ ; ৩।১।২৯)। এইখানে বাসুদেবকে সাত্বতর্ষভ বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি বাসুদেব ও বলদেবের ব্যুৎপত্তি দিবার সময় বলিয়াছেন তাঁহারা ক্রমান্বয়ে

বসুদেব ও বলদেবের পুত্র। ঐ সূত্রের কাশিকায় বাসুদেব ও আনিরুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে আনিরুদ্ধকে অনিরুদ্ধের পুত্র বুঝিতে হইবে; কিন্তু বাসুদেবের অর্থ করা হইয়াছে বাসুদেবের পুত্র, বসুদেবের পুত্র নহে। কাশিকায় (৬।২।৩৪) বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বন্দ্বসমাসে 'শিনিবাসুদেবা' পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। এস্থলে উভয় শব্দই বহুবচনে ব্যবহৃত। আবার 'সঙ্কর্ষণবাসুদেবৌ'—উক্ত বংশীয়গণের নামের এইরূপ দ্বন্দ্বও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ও পতঞ্জলির ছত্র সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃষ্ণিবংশের অপর এক নাম সাত্বত এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই বংশভুক্ত ছিলেন। আর এই সাত্বতদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাতে বাসুদেবকে পরাৎপর পরমপুরুষরূপে উপাসনা করা হইত।

Megasthenes চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন মাসিডনীয় রাজদূত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই Megasthenes একটী বিবরণ দিয়াছেন যে, Sourasenoi গণ Heraklesএর উপাসনা করেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের একটী জাতি; ইঁহাদের দেশে Methora ও Kleisobora নামে দুইটী প্রধান নগর আছে। পোতপরিচালনোপযোগী Jobares নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে Sourasenoiগণ শূরসেন নামক এক ক্ষত্রিয় বংশ। ইঁহারা মথুরা অবস্থিত প্রদেশে বাস করিতেন; যমুনা নদীও তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বলা বাহুল্য যে, Megasthenesএর Methora মথুরা, Jobares যমুনা, এবং Herakles হরির প্রকারভেদ। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনা প্রথম মৌর্য্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও ধারণা যে, উপনিষদের সময় যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই পরিশেষে পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈনমতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাসুদেব-কৃষ্ণ-উপাসনায় পরিণত হয়।

এই ত গেল এক দিক্ দিয়া বিচার। অপর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিতে হয় যে, পূর্ব্বখ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের পরে কতদিন

পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ-রাত্র কখন্ কোন্ ভাবে ছিল, তাহাও আলোচ্য।

পূর্ব্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডির শিলালিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১ম শতক পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। ইহার পর চারিশত বৎসর ভাগবতধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ-দ্যোতক কোন চিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন গুপ্তরাজাদিগের প্রবল প্রতাপ, তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত "পরমভাগবত" ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। এই কয়জন রাজার সময় ৪০০ হইতে ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

গাজিপুর জেলায় ভিটারি-স্তম্ভে একটী শিলালেখ আছে, তাহাতে শার্ঙ্গী অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথা আছে। ইহাতে স্কন্দগুপ্তকর্তৃক এই দেবতার পূজার জন্য একটী গ্রামের দানপত্রও আছে।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্তের রাজ্যকালের একটী লিপি আছে। এই লিপিখানি ৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দের। ইহাতে জনার্দ্দনের ধ্বজস্তম্ভনির্ম্মাণের কথা আছে এবং মাতৃবিষ্ণুকে "অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর বাঘেলখণ্ড ও দিল্লী-কুতবমিনারের সন্নিকটে লৌহস্তম্ভে ভাগবতধর্ম্মের কিঞ্চিৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৬০।১৯) পুরোহিতবিচারপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগবতগণ বিষ্ণুপূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য করিবেন। বরাহমিহিরের সময় ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষচরিতে বাণ দিবাকর মিত্র নামে একজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন,

পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহার বাসস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বতে ছিল। তাঁহার বাস-ভূমির চতুর্দ্দিকে বহু উপাসকসম্প্রদায় ছিল—এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দুইটী সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র।

ধর্ম্মপরীক্ষা-অমিতগতি নামক ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দের একখানি জৈন গ্রন্থে ভাগবতসম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতধর্ম্মের ক্রম কোন দিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্নভাবে এই ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে এই ধর্ম্মাবলম্বীরা কখনও বা প্রতাপান্বিত ছিল, কখনও বা ইহাদের শক্তি নিতান্ত হ্রস্ব ছিল।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি বৈষ্ণব-আগমের প্রচলন আছে। এই আগমগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বৈখানস-আগমই প্রাচীনতম। ইহা গদ্যে লিখিত। পদ্যেও এইরূপ একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা প্রাচীন নয়। উৎসবের সময় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্রাবিড়বেদ নামক প্রবন্ধ গীত হইয়া থাকে। অনন্তানন্দের সময়ে বৈখানস সম্প্রদায় ছিল; তখনই ঐ পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীবৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়। এই বৈখানস-আগমে ভাগবত সম্প্রদায়ের একটী বিবরণ আছে। ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চরাত্রাগমেরও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সংহিতা-সমাহার পঞ্চরাত্রাগম নামে পরিচিত। ইহাদের সংখ্যা ১০৮। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে অথবা অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সংহিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহিতাই একেবারে আধুনিক। আমি সকলগুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। তবে যে কয়খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য ও অর্ব্বাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দুএকখানির নাম করা যাইতে পারে। ঈশ্বরসংহিতায় সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য্য রামানুজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের সময় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ এবং রামানুজের সময় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতায়ও রামানুজের

নাম আছে। সুতরাং এগুলি যে একাদশ খ্রীষ্টশতকের পরে রচিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীসংহিতা, জ্ঞানামৃতসার, পরমসংহিতা, পৌষ্কর সংহিতা, পদ্মসংহিতা ও ব্রহ্মসংহিতা—এই ছয়খানি সংহিতা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। পৌষ্কর ও পরমসংহিতা হইতে আচার্য্য রামানুজ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এগুলি তাঁহার সময়েও প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। জ্ঞানামৃতসার যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতকের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় তাহা মান্দোরস্থ মূর্ত্তি সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। মতের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নারদসূত্রকে ঔপনিষদ্-মতবাদী বলিতে পারা যায়। ছান্দোগ্য উপদেশ করিতেছেন—

—'অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ ইতি। তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।' এই সনৎকুমারকে চারিজন অধ্যাত্মতত্ত্ব-স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সকল শাস্ত্রই স্বীকার করেন।—ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠকে বলিতেছেন—

'তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে'—শঙ্কর গীতাভাষ্যভূমিকায় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্ম্মের বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে নিবৃত্তিমার্গ—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃ সন' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহারা নারদের সহিত আবেশাবতার বলিয়া উক্ত। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

"সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা"

অন্যত্র—

নারদায় চ যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা
সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মনা (৪।৪।২)।

নারদসূত্র স্বীয়পরিচয়ে বলিয়াছেন—"নারায়ণপ্রোক্তং শিবানুশাসনং"—এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্, ও বিভীষণকে ভক্তি-শাস্তা বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক "ঈশ্বরে" ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও

বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির কথা বলেন নাই। এক স্থলে ভগবানের অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন মাত্র। যথা "ব্রজগোপিগনাং" প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়। এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেতদ্বীপের নামগন্ধ নাই। ইহাতে ভক্তদিগের মধ্যে "ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" বলিয়া একান্তিগণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। ভক্তিকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিসূত্র অঙ্গীকার করিয়াছে। ইহার মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও মহৎকৃপাই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপায়। ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই নয়। নিরোধ অর্থাৎ লোকবেদব্যাপার-সন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরায়। এই গ্রন্থে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তিসংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্রের বর্ত্তমান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আকারের নারদপঞ্চরাত্র অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন।

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নারদ তাঁহার ধর্ম্মমত শিবের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।

"গুরুর্মে ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগীন্দ্রো নারদমুনিঃ।
গুরোর্গুরুর্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ॥"

বিষ্ণু যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চালটী চালিয়াছেন। যাহা হউক, নারদপঞ্চরাত্র পূর্ব্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত।

নারদপঞ্চরাত্রে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ের কোন স্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্তু নারায়ণীয় ও পঞ্চরাত্র দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে ইহা যে মহাভারত আখ্যায়িকা হইতে রচিত তাহা বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয়ের আখ্যানবস্তু বিভিন্ন হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণীয় নারায়ণে একান্তিভাব উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্র পরানুরক্তি এবং নারদসূত্র ঈশ্বর বা ভগবানে প্রেম শিক্ষা দিয়াছে। অতি প্রাচীন সময় হইতে যে বৈষ্ণবদিগের

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্মমত উপনিষদের বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। শঙ্কর ও রামানুজের চতুর্ব্যূহপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাত্রের মত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামানুজ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। চতুর্ব্যূহতত্ত্ব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকেও বিদ্যমান ছিল। নারদপঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহের মধ্যে কেবল সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নেরই কথা বলিয়াছেন। ব্যাসবিবরণে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামের মধ্যে সকলগুলির নাম করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথায় আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহতত্ত্বই বিবৃত করিয়াছে। তবে নারায়ণীয় মত পঞ্চরাত্র মত হইতে স্বতন্ত্র। ইহাই রূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণাং অপ্যেষা প্রক্রিয়ামতাঃ।"

নারদপঞ্চরাত্রের আর একটী বিশিষ্ট অংশ হইতেছে, রাধিকা-সমাবেশ। মহাভারতে মাত্র এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের কথা বহুধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধা নাম এ দুইগ্রন্থে কোথাও নাই। গোপালতাপনী উপনিষদ্ রাধার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই উপনিষদ্ বর্ত্তমান আকারে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না।

আমার বোধ হয়, পঞ্চরাত্রেই রাধাতত্ত্ব প্রথম বিবৃত হয়। নারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন—

"রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তদ্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা" ॥ (১।১২)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন যে, কপিলপঞ্চরাত্রে রাধার পূর্ণ বিবরণ আছে—

"সংক্ষেপেনৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং
কাপিলয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরম্
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।" (২।৬)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতত্ত্ব যে রাধাতত্ত্ব, যাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়াছেন, সে রাধাতত্ত্ব এখানকার বর্ত্তমান বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রাণ, যাহা কৃষ্ণতত্ত্ব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহার আকরস্থানের অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কপিলপঞ্চরাত্রই এই তত্ত্বের জনক। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব; সুতরাং এখানে আর কিছু বলিব না।

আমরা দেখিলাম যে, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত অনেক স্থলেই এক পর্য্যায়বাচী। পূর্ব্বে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মত স্বতন্ত্র থাকিলেও পরে ইহারা অধিকাংশ ব্যাপারে একমত।

এক্ষণে আমরা ভাগবততত্ত্ব কিরূপ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে ভাগবত-ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবত কাহাকে বলে, ধর্ম্মই বা কি, ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ আছে, যাহা ভগবানকে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিবৃত, তাহাই ভাগবত-বাচী। আর যাহা ধারণ করে, মানুষকে যাহা তাহার স্বরূপে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে যে মানুষ স্বীয় স্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। একমাত্র ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব আপনার স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্যদিকে ধর্ম্মই আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়া দেয়। কাজেই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচলিত থাকিতে পারে। ভগবৎ-প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম্ম আচরিত হয়—যাহার আচরণে, অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রীতিই একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চাই না, স্বাচ্ছন্দ্য চাই নাই, আমি চাই ভগবৎ-প্রীতি, তাহাতেই আমার আত্মতৃপ্তি—এই ভাবে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়

তাহাই পরধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম। তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা তাঁহাকে পাইবার জন্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্য লইয়া আচরণ কর তাহা হইলে বাধা বিঘ্ন তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পারিবে না, স্বরূপ হইতে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে। সকাম লৌকিক কর্ম্ম অথবা সকাম বৈদিক কর্ম্ম প্রভৃতি নীতির আচরণ করিলে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে, এমন কোন শাসন নাই সত্য; নীতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অধর্ম্ম নয়, তাহাও সত্য—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি নীতি গৌণ ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য—অপরধর্ম্ম নামে অভিহিত, কিন্তু নীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে—নীতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নয়; তদ্দ্বারা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। যে নীতির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নাই, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই নীতির যাহা কিছু প্রসার তাহা পার্থিব—দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধ লইয়াই। এই নীতি পার্থিব স্থূলদেহে আমিত্ব আরোপ করিয়া থাকে; কাজেই স্থূলদেহের বাহিরে ইহার অধিকার নাই। স্থূলদেহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহার অধিকার—ইহার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ।

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও না কেন, যদি তুমি স্বার্থান্ধ হও, জন্মান্তরে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস না কর, তবে দেহদৈহিক সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্যের মধ্যে থাকিলে তোমার কার্য্যে পদে পদেই ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিবে। তুমি তোমার কর্ত্তব্যের গণ্ডীকে ক্ষুদ্র পরিবার অতিক্রম করিয়া সমাজে প্রসারিত করিতে পার, আবার সমাজকে অতিক্রম করিয়া দেশে, এইরূপে দেশকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে প্রসারিত করিতে পার, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক সুখদুঃখকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি কখনও সকাম কর্ম্ম দ্বারা বিষয়াকর্ষণকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহা দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। যদি তুমি সকাম কর্ম্মের হস্ত হইতে

অব্যাহতি পাইতে চাও-তাহা হইলে তোমার একমাত্র উপায় ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। ভগবদুদ্দেশ্যশূন্য জ্ঞানও তোমার কোনও কাজে আসিবে না। 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞানে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে অপরাধ হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই পরধর্ম্ম হইতে পারে না। এই ভাগবতধর্ম্মের দুইটী দিক্—একটী "সাধ্য" অপরটী 'সাধনা'। সাধ্য—জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংস্থিত ; সাধনা—অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা ধারণ করে তাহা 'সাধ্য'—ইহার নাম "প্রেমভক্তি" ; যাহা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় তাহা সাধনা—ইহা সাধনভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে এরূপভাবে নিহিত যে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। যদিও ইহা স্বরূপেরই বৃত্তিবিশেষ তথাপি ইহা সাধনভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং ইহার নাম "সাধ্য"।

যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে, তাহাই পরধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারা যায়। মানবের চরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন। ভাগবতধর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের সাধক। ইহা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পরধর্ম্ম।

ভাগবতধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্তি নিজেই সম্পূর্ণ সুখস্বরূপ। যিনি ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর অন্য কিছুর অনুসন্ধান করিতে হয় না, কারণ, যাঁহার ভক্তি লাভ হইযাছে তিনি পরিপূর্ণ সুখে ভরপুর একেবারে মশগুল, তাঁহার আর অন্য সুখের অবসর নাই—প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদিত হইলে তার ত্রিসীমায় দুঃখ থাকিতে পারে না। ভক্তি স্বয়ংই সুখস্বরূপ—ইহা অপেক্ষা সুখদায়ী পদার্থ নাই ; ইহার এমনই স্বভাব যে ইহার সম্মুখে কোন বাধাবিঘ্ন আসিতেই পারে না। আত্মাকে প্রসন্ন করিতে ভক্তি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রসাদজননী এই ভক্তিকে কোন কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তি দ্বারা শ্রবণাদি

লক্ষণ সাধনভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পৃথক্ চেষ্টাপরিশূন্য হইয়াও মানুষ অনায়াসে বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য সকলেই ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তির উন্মেষ হইলে ইহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া ভক্তকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকে। ভক্তি কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখে না। যে ধর্ম্মদ্বারা এই ভক্তি সূচিত হয় তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। সুতরাং ভাগবতধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তুমি আমি যে বাঁচিয়া আছি এ কিসের জন্য? সবিশেষ অনু-সন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হইবে যে আমি জীবিত আছি শুধু তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। দর্শনে যাহাকে অদ্বয়জ্ঞান বলে তাহাই তত্ত্ব। শাস্ত্রে তত্ত্বের নামান্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্। তত্ত্ব একই, কেবল প্রকাশাদির পার্থক্যবশতঃ নামে ভেদমাত্র।

যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি তাঁহারা সতত ভগবানের অনুধ্যান করিয়া অহঙ্কারজন্য কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মননাভি-নিবেশ সহকারে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎকথায় রুচি জন্মে। ইহা হইতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ভক্তি জন্মিলে ভগবান্ অন্য সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। এইরূপে ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ করিতেছে যে এই সমস্ত কারণেই ভক্তগণ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ভগবান্ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজমুখে ধর্ম্মোপ-দেশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ যে সকল নিজ মুখে উপদেশ করেন তাহার সকলগুলিই ধর্ম্মপদবাচ্য। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধারণ, এমন কি, মূঢ় লোকসকলও অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। ইহাতে অধিকার

অনধিকারীর কথা নাই। সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। তাই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ৩৪

এই ভাগবতধর্ম্মে সকলেরই অধিকার। ইহা আশ্রয় করিয়া মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না। ইহা এমনি সুষ্ঠু ধর্ম্ম যে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। তবে এ ধর্ম্মে একটী জিনিষের সম্পূর্ণ আবশ্যক—তাহা পূর্ণ নির্ভরতা। বিধিতে হউক বা স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করিবে সমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণে কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ভাগবত-ধর্ম্ম কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অতি উদার ও মহান্। ইহা সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত। সর্ব্বদেশে এই ধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত।

এইবার আমরা ভাগবত হইতে কয়েকটী উপদেশের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

১। সর্ব্বভূতে যাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎস্ফূর্ত্তি হয় এবং যিনি পক্ষান্তরে আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতসত্তা উপলব্ধি করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় দ্বারা সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হন না, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ,

মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান।

"যাঁহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবনিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

"যাঁহার জন্ম কর্ম্ম দ্বারা অথবা বর্ণ, আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহংভাব জন্মে না, তিনি হরির প্রিয়।

"যাঁহার বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পর এই ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম।

"যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্য স্মৃতিভ্রষ্ট হন না, যিনি বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ হইতে লবার্দ্ধও—মুহূর্ত্তার্দ্ধও বিচালিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।"

যাঁহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাগবতধর্ম্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, যাঁহার কর্ম্মে ও আচরণে ভাগবতধর্ম্ম জলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খেলিতেছে, যাঁহার পবিত্র দর্শনে ও সঙ্গগুণে জগৎ ভাগবতধর্ম্মে উন্মুখ হইতেছে—তাঁহাকেই বৈষ্ণব-প্রধান বলিয়া জানিবে। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সেইজন্যই দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বসু রামানন্দকে বলিতেছেন -

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

জীবনের উদ্দেশ্য।

(ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য)

কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—"আচ্ছা, বল দেখি, এই যে কত কষ্টের মনুষ্যজন্ম—যাহা ভগবানের কত অনুগ্রহে ও কত জন্মের সুকৃতির ফলে লাভ হইয়াছে—সেই দুর্লভ মনুষ্যজীবনে আমাদের কি করা উচিত? কিরূপে ইহা কাটান উচিত?" সে বোধ হয় চট্ করিয়া উত্তর দিবে, "কেন, এই কয়টা দিন যাহাতে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান যায়, যাহাতে অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে না হয়, যাহাতে সমাজে গণ্য, মান্য ও যশস্বী হইতে পারা যায়, তাহাই সকল মানবের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে? বাস্তবিক, এই পৃথিবীর প্রায় সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্য ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহাদের এত কঠোর পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাশিক্ষা, এত কষ্ট যন্ত্রণার সহিত অর্থোপার্জ্জন, এক হাত জমীর জন্য এত মারামারি কাটাকাটি, অথবা দেবদেবীর নিকট এত কঠোর তপস্যা ও স্তবস্তুতি।

বিশ্বমানব সুখের সন্ধানে তৎপর, যোগপরায়ণ সাধু তপস্বী হইতে সাধারণ মানব পর্য্যন্ত সকলেই সেই এক সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত। তুমি, আমি, বা গিরিগুহাবাসী তপঃপরায়ণ ভগবৎপ্রেমিক কেহই দুঃখ চাহে না। যদি সকলেই সেই এক সুখ চায়, তবে বলত, সাধুব্যক্তিই বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আনন্দের অধিকারী হন কেন, আর তুমি আমি সদা অশান্তি, শোক, তাপ ও সহস্র প্রকারের জ্বালা যন্ত্রণাদিতে ভুগিয়া মরি কেন? আমরা জগতের সকল জিনিষ গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে চাই, আর তাঁহারা ঐ সকল জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া সুখী হইতে চান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকলের মূলে সেই একই উদ্দেশ্য, একই সুখশান্তিলাভেচ্ছা

থাকিলেও উভয়ের পথ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একজন প্রভূত অর্থ, মনোরমা স্ত্রী, প্রাণাধিক সন্তানসন্ততি প্রভৃতি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির মধ্যে সুখের সন্ধান করিতেছে—আর অন্য জন ঐ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া এক অতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইতে সুখ শান্তি আহরণে যত্নপরায়ণ। স্মরণাতীত কাল হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে—এবং সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই আমরা দেখিতেছি যে, বরাবর তাঁহারাই জিতিতেছেন ও আমরাই হারিয়া আসিতেছি। কারণ, তাঁহারা সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মধ্যেই অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি, অপার আনন্দ ও অনন্ত শান্তির সন্ধান করিতেছে আর অন্যে ভগবানকে ছাড়িয়া এই সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে অনন্ত সুখ, অনন্ত সমৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শান্তির অনুসন্ধানে ফিরিতেছে।

আচ্ছা, যদি বিষয়েই সুখ থাকিত তবে আমরা এত দুঃখ পাই কেন? জীব ত সেই অনাদি অনন্তকাল হইতেই বিষয় সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, তবে তাহাদের আর দুঃখের অন্ত হয় না কেন? যদি অর্থের মধ্যেই সুখ থাকিত, তবে দেখিতে পাই অপরিমিত ধনশালীরও যে দুঃখ আর শতছিদ্রকুটীরবাসীরও সেই দুঃখ। যদি সুন্দরী ভার্য্যা ও সন্তানসন্ততির মধ্যেই সুখ থাকিত তবে জীব তাহা লাভ করিলেও তাহার দুঃখের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না কেন? যদি সুখাদ্যের মধ্যেই তৃপ্তি থাকিত, তাহা হইলে শুধু এ জন্মে কেন, শত শত জন্ম ধরিয়া ত উহা ভোগ করিয়া আসিতেছি কিন্তু তৃপ্তিলাভ ত দূরের কথা, লালসা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না কেন? বিষয়ের মধ্যে নিত্যসুখ কোথায়? যদি তাহাই হইত, তবে আমি যে বিষয় ভোগে আপনাকে সুখী মনে করিতেছি অন্যে তাহাতে সুখ পায় না কেন? এমন কি, আমিই অদ্য যাহা পাইলে আনন্দিত হই, কল্য আর তাহা পছন্দ করি না কেন? ইহার একমাত্র কারণ, বিষয় দুঃখময়—উহা সুখের মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বদা জীবকে প্রবঞ্চনা করে মাত্র। সেই দুঃখময় বিষয়ভোগে জীব কি কখনও

সুখী হইতে পারে? অগ্নির মধ্যে যে শীতলতার অনুসন্ধান করে সে কি মূর্খ নয়? যাহা অল্প, ক্ষণভঙ্গুর, পরিবর্ত্তনশীল সেই বিষয়ের মধ্যে নিত্য সুখশান্তির আশা করা কি পাগল ও মূর্খের কার্য্য নয়? এই দেহের যে সৌন্দর্য্যলাভকে তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া অশেষ প্রকার চেষ্টা করিতেছ, একটী কঠিন পীড়া আসিয়া তোমার সেই চাঁদমুখখানিকে কি বিকৃত করিয়া দিতে পারে না? যে অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া আজ গুরুতর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিতেছ, একটী দায় বা মোকর্দ্দমার ব্যয়ে কি তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে না? অর্দ্ধভূমণ্ডলের অধিপতিকে কি একদিনের মধ্যে পথের ভিখারী হইয়া প্রজাদিগের ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতে দেখা যায় না? যে সন্তানসন্ততি লাভ হইলে আনন্দে দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া থাক, বল দেখি, তুমি কি তাহাদের চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে? একদিনও কি কাহারও নির্ম্মম হস্ত তোমার অঙ্ক হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না? তখন তোমার কি দশা হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

বালক নচিকেতা যমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালাভের বাসনা জানাইলে যম তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বলিলেন—"হে নচিকেতা, তুমি এই বিরাট্ বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হও, তুমি অসংখ্য যানবাহনাদি গ্রহণ কর, তুমি নরলোকের দুষ্প্রাপ্য সুন্দরী অপ্সরাগণকে লইয়া যতদিন ইচ্ছা সম্ভোগ কর, তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্রাদি লাভ কর, আর নিজ জীবন অল্পায়ু হইলে সমুদয় সুখসম্ভোগই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সুতরাং হে নচিকেতা, তোমার যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকিয়া এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী স্ত্রী, যানবাহনাদি ও পুত্রপৌত্রাদি লইয়া বিহার কর। তথাপি তুমি আমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা ভিক্ষা করিও না।" নচিকেতা ঠিক জানিতেন, মানবদেহ ও জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সেই দেহ ও জগৎ লইয়া নিত্যসুখ অসম্ভব।

এ বর যিনিই দান করুন না কেন, তাহা কেবল মানবমনকে ভুলাইবার জন্য—তাহা কার্য্যতঃ কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে না। তাই তিনি এই ভীষণ প্রলোভনেও কিছুমাত্র বিমুগ্ধ না হইয়া অক্ষুব্ধ সাগরবৎ প্রশান্তভাবে উত্তর করিলেন—"হে মৃত্যো, সমস্তই শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মাদিরও জীবন যখন সেই অনন্তের তুলনায় কিছুই নহে, তখন আমার কয়েক শত বর্ষব্যাপী জীবনের আর কথা কি? আর যে ধনরত্ন ও যানবাহনাদির কথা বলিলেন, তৎসমস্তও 'শ্বোভাবা' অর্থাৎ কল্য পর্য্যন্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ; এবং যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্না সুরনারীগণের কথা বলিলেন, তাঁহারা ত মানুষের বল, বীর্য্য, আয়ু সমস্তই ক্ষয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাতেই বা আমার প্রয়োজন কি? অতএব হে যম, আপনার নৃত্যগীত, আপনার সুরনারী ও যানবাহনাদি আপনারই থাকুক—আমার ও সকলে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

সুতরাং যখন দেখিতেছি যে, শুধু এ জন্মে নহে, শত শত জন্ম ধরিয়া এই বিষয়ের মধ্যেই নিত্য সুখের অনুসন্ধানে ফিরিতেছি কিন্তু শত শত জন্ম ধরিয়াই প্রতারিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি—শত শত জন্ম ধরিয়া কেবল সুধাভ্রমে বিষ পান করিয়া ভীষণ জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তখন এমন একটী বস্তু চাই যাহাতে অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ আছে—জরা-ব্যাধি-মৃত্যু যে সুখের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। এমন ধন চাই যাহার নিকট জগতের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি তুচ্ছ। সে বস্তুটী কি?

সেই বস্তুটী অনন্ত সুখের উৎস, অনন্ত জ্ঞানের আকর, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, অনন্ত সৌন্দর্য্যময় ভগবান্। সেই অনন্তময়ের সত্তা আব্রহ্মজীব সকলের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন এবং তজ্জন্য কেহই অল্প, সীমাবদ্ধ ও সান্ত বস্তু লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না বা থাকিতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান্ মানব—যাঁহারা এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা সকল ছাড়িয়া অনন্ত ভগবানকে ধরিয়া থাকেন—কারণ, তাঁহারা জানেন যে সেই সুখ, শান্তি ও আনন্দ

অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করিলেও কখনই ফুরাইবার নহে। তাই সকল দেশের সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরাই বলেন যে, একমাত্র ভগবানের করুণা লাভ করিলেই জীব প্রকৃতপক্ষে চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে।

"If you are a lover of beauty where can you find such beauty as in God? If you are a lover of eloquence who can be more eloquent than God, from whom all the vedas have come into existence? If you are a lover of power what being can be more powerful than God? Every man loves one of these and all of these are to be found in an infinite degree in God. If you love a beautiful woman, her beauty will only last for a short time, but God's beauty is perennial. So if you want perennial beauty, indestructible life, all power and all knowledge, you must go to God." * "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। —যাঁহাকে লাভ করিলে জগতের সমস্ত বস্তুই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, সেই প্রেমময় ভগবানকে লাভ করা ভিন্ন মানুষ কি আর অন্য কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি" সেই পরমধন ভগবানকে লাভ না করিয়া মানুষের অতৃপ্ত ধনাকাঙ্ক্ষা কি আর মিটিতে পারে? হে মানব, যাহার সৌন্দর্য্য ও রূপের নিকট সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাবলি ও বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময় ভগবানকে ছাড়িয়া রমণীর দুদিনের হেয় রূপে বিভ্রান্ত হইয়া তুমি অনন্ত দুঃখসাগরে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছ—কই, তবু ত তোমার চৈতন্য হইতেছে না? হে মানব, তুমি সেই ভগবৎপ্রেমের জন্য পাগল হও। "হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটী মাত্র চুম্বন!—যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্দ্ধিত

* The path to perfection.

হইয়া থাকে—তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়—সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়। প্রিয়তমের সেই চুম্বন তাঁহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া তোলে। ভগবান্ একবার যাহাকে অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া যায়, চন্দ্রসূর্য্যের অস্তিত্ব থাকে না, আর সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিশাইয়া যায়।" *

হে সততবিভ্রান্তচিত্ত মানব, সমস্ত ছাড়িয়া সেই অনন্ত প্রেমের আকর ভগবানকে লাভ করিয়া তাঁহার অফুরন্ত প্রেমসুধা পান করিয়া জন্মজন্মান্তরের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান কর।

ইহাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মহামায়ার মায়ার ঘোরে সব ভুলিয়া ছিলে করিতে আর করিতেছ। কাঞ্চন ভুলিয়া কাচ কুড়াইতেছ, রত্নাকারে রত্নের সন্ধানে আসিয়া সামান্য উপলখণ্ড লইয়া ঘরে ফিরিতেছ!

এখন সত্যের দ্বার উদঘাটিত হইল—জানিলাম জীবনে সত্য কি—প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত আনন্দ কোথায়। কিন্তু কিরূপে উহা লাভ করিব? উপায়—তোমারই আন্তরিক ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হইলে কেহ তোমাকে ঐ পথে লইয়া যাইতে পারিবে না। কথায় বলে, "যে চায় সে পায়"। "চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—আঘাত কর, তবেই দ্বার উন্মুক্ত হইবে—অনুসন্ধান কর, তবেই উহা খুঁজিয়া পাইবে।" †

তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে খোঁজা চাই—শুধু মুখে 'হে করুণাময়, আমি তোমাকে চাই' বলিলে হইবে না। অন্তরে অন্তরে তাঁর জন্য অভাব বোধ করা চাই—জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিলে তুমি

* ভক্তিযোগ—স্বামী বিবেকানন্দ।

† Sermon on the mount—Christ,

যেরূপ বায়ুর জন্য অভাব বোধ কর, ভগবানের জন্য যখন ঠিক সেইরূপ অভাব বোধ করিবে—যখন তুমি, তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছুতেই বাঁচিতে পার না—তখনই তুমি তাঁহাকে লাভ করিবে।

নিবেদন।

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত)

জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি, তবু
তোমারে দেখি না কেন ?
যে আঁখি তোমারে না পায় দেখিতে,
কেন দিলে আঁখি হেন ?
দুদিনের তরে ধনজন দিয়ে
নিজে কোথা হায় লুকাইলে গিয়ে,
পুতুলের মত রাখিলে ভুলায়ে,
এ ধরায় অকারণ !
জগৎ জুড়িয়া আছ তুমি, তবু
তোমারে দেখি না কেন ?

অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি ;
পরিচয় কোথা তার ?
অন্তরবাণী শুনিছ বসিয়া—
শুনিছ না হাহাকার ?
ব্যাকুল হ'য়েছে হৃদয় আমার,
তোমা পানে ছোটে প্রাণ অনিবার,
ছেড়ে যেতে চায় মোহের আগার,
তাই ডাকি বারে বার।

ওগো, অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি;
পরিচয় কোথা তার ?

কত শত যুগ চলি' গেল প্রভো,
দরশন নাহি পাই।

যাতনার ঐ আশ্রয়তলে
কবে দিবে মোরে ঠাঁই ?

করমের কবে হইবে বিরতি,
ভরি' দিবে প্রাণ অচলা ভকতি,
মায়া পাশ হ'তে চির যে মুকতি—
তাই শুধু আমি চাই।

কেন এ বাঁধন সংসার মাঝে ?
তোমারেই যেন পাই।

আবেদন।

(শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন গুপ্ত)

নিশীথে যখন নিখিল ভুবন
আঁধারে আবরি' থাকে,
প্রাণ মন ভরে সবে সকাতরে,
তোমারেই বুঝি ডাকে।

তেমনি আমারে প্রাণমন ভরে
ডাকিতে শিখাও, প্রভো!
ত্যজিয়ে কামনা, লাজ ও ভাবনা,
ডাকিতে শিখাও, বিভো!

স্বামি দেবতায় সতী রমণীর
যেমন মনের টান্,

বিষয় লাগিয়া বিষয়ীর মন
করে যথা আনচান্,
সন্তানতরে জননীহৃদয়ে
অসীম যেমন স্নেহ
—তেমনি আমারে, ওগো দয়াময়,
তেমনি ভকতি দেহ!

প্রতি পলে পলে তোমা নাহি ভুলে
আমার মানস যেন,
মায়ার বাঁধন করিব ছেদন,
শকতি প্রদান হেন।
তেজ বল প্রীতি সহিষ্ণুতা ধৃতি
দাও দয়া দয়াময়!
তোমার চরণে চিরদিন যেন
অচলা ভকতি রয়।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

মঠ, বেলুড়,
২।৪।১৭

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীযুক্ত বি— তোমার পত্র পাঠে সকল অবগত হইয়া তারকদা ও হরিভায়াকে শুনাইয়াছি। তোমার কার্য্যে তাঁহারা অতিশয় খুসী আছেন। তুমি তাঁহাদের অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ভগবান্ তোমায় বল দিন, শক্তি দিন ও প্রভুপদে তোমার মন

মগ্ন হউক, এইমাত্র প্রার্থনা। কৃষিজীবী লোকদের আপনার ভাই ভেবে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চল্‌বে; তাহলে দেখ্‌বে তারা তোমার গোলাম হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি শ্রীস্বামিজীর শিক্ষা মত নিজেকে তাহাদেরই সেবক জানিতে চেষ্টা করিও। এই চেষ্টার নাম তপস্যা। দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবই শিখাইয়াছিলেন সখা অর্জ্জুনকে গীতায়। ঠাকুর সোজা করে বলে গেলেন, ১০ বার গীতা গীতা কল্লেই ত্যাগী এসে যায়—ইহাই হ'ল গীতার সার। হও নিষ্কাম কর্ম্মী। হও পূর্ণ অনাসক্ত। কর্ত্তা হয়েও নিজেকে অকর্ত্তা জান।—র চিঠি বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ, উহা বাঙ্গালা করে সবাইকে শুনিও। ভালবাসায় ভাসিয়ে দাও ও দেশ। সকল কাজই শ্রীশ্রীঠাকুর কচ্চেন, বিশ্বাস কর্ব্বে। যতনকে যত্ন কর্ব্বে। ভালবাসায় জগৎকে জয় কর—ইহাই রামকৃষ্ণ মিশন। নিজে খুব সাবধানে থাকিবে। সর্ব্বদা প্রভুকে প্রাণমনে ডাক্‌বে। ঠাকুরের ভোগ না দিয়ে বৃথা অন্ন কেন গ্রহণ কর্ব্বে? আমাদের ভালবাসা জান্‌বে ও সকলকে জানাবে। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৪।৪।১৭।

পরম স্নেহভাজনেষু—

তোমার সব চিঠিই পাইয়াছি। এরই মধ্যে অত উতলা হচ্চ কেন? ঠাকুর একটি গান গাহিতেন—"মন কর পণ প্রাণাবধি, ত্যজ মান অপমান জ্যান্তে মর, সহজ মানুষ ধর্ব্বি যদি"। দেখ, বাবা, যদি কোন কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে; নতুবা ঠাকুরের নাম নিয়ে কেবল একটা হৈ চৈ করে এই মহামূল্য জীবনটা বৃথা নষ্ট করা কি তোমার মত আক্কেলবন্ত লোকের সাজে? যখন লেগেছ তখন নিশ্চয় ওটাকে পাকা করে তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড় নাই চাষার ক্ষেত্রে জল আনার

বিষয়! কি রোখ! কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ যে জলন্ত জীবন্ত ব্যাপার! ঐ উপদেশগুলো কি কেবল পুস্তকেই থাক্‌বে, না কাজে লাগাতে হবে? তোমাদের যে এক একটা আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে। যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই যে তোমাদের প্রভুর শিক্ষা। 'এসেছ যখন এ ঘরে, নাম যদি লিখিয়ে থাক এ খাতায়, তখন আর পেছুলে চল্‌বে না, চাঁদ? ঐস্থানে বসে কেবল একমনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা প্রভুকে ডেকে যাও—সব পাবে, সব পাবে—কোন্ ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। দেখ্‌চ না, ভগবৎশক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান!'

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামিজীর সম্বন্ধে পড় নাই কি, কেমন করে নিঃসম্বলে একা বন্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাজ করে এলেন? একি সত্য, না স্বপ্ন? তোমরা কি সেই মহাপুরুষের অনুসরণ কর্ত্তে প্রস্তুত? নতুবা যাও, যেমন সহস্র সহস্র সাধু এই ভারতে কেবল পেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে! * * * যদি তোমার ও কাজ ভাল না লাগে যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহিত আমাদের কোন্ সম্বন্ধ থাকবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়

স্নেহাস্পদেষু—   ৩।৩।১৭

মা— তোমার চিঠি পড়িলাম। র নিকট নিকট হইতে দীক্ষা লইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানবদেহ ধারণ।

ভা - এ আশ্রমস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রমস্থাপনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্তহৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা"—শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয়, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়ে

সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর্‌বার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর—জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন তুমি, আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচ্‌বে তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, এইটী উপলব্ধি কর্‌বার জন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, বন্দনা, রোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপা লাভ হয়। পবিত্রতাময় প্রীতিও ভালবাসায় পূর্ণ হ'য়ে যাক্ তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত কর। আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক্ হ'য়ে যাক্, ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানিবে না যে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যা মোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে।

**—কে বিশেষ করে পড়াশুনা কত্তে বল্‌বে। অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক—তাকে বুঝিয়ে দেবে, মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না, বাবা। ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে, ধন? ধর্ম্মকর্ম্ম কি ছেলে মানুষি ব্যাপার? শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য, মানের জন্য, অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা। আর ধর্ম্মলাভের জন্য, শাস্ত্রপাঠের জন্য, শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা। ইহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছা হইলে এখানে আসিয়া থাকিতে পার; তবে আজকাল অনেক লোক মঠে, তাই থাকিবার কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে।

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা, সেজন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না। কিছু ভয় নাই—সব ঠাকুর করিয়া দিবেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ।

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা।

স্নেহভাজনেষু— বেলুড়মঠ।

শ্রীমান্—তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যারা ভগবৎ পথের পথিক হ'তে চায় তারাই আমাদের পরম আত্মীয়, চিরবন্ধু, নিত্যসহচর। তোমরা অসঙ্কোচে ঠাকুরের নাম করে যাও—উহাতেই শান্তি, ভক্তি, মুক্তি পাবে। যারা —র কৃপা পেয়েছে তারা নিত্যমুক্ত—তারাই শুদ্ধ পবিত্র—তারাই পুণ্যবান্।

শ্রীশ্রীপ্রভুপদে মন রেখে কাজ করে যাও। তিনিই সৎ মনবুদ্ধি দিয়ে ঠিক পথে চালাবেন। সংশয়বুদ্ধিই সয়তান, উহাকে সর্ব্বদা দূর কত্তে হবে। নামে তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে দেও তাড়া। রাম নামে ভূত পালায়, ঠাকুরের নামে সয়তান, কাম, ক্রোধ পালাবে।

আমরা ভাল আছি। মায়ের শনিবার ভক্তেরা টাঙ্গাইলের নিকট ঘারিণ্ডা নামক পল্লীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা কচ্চে।

তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কনোজকুমারী বা সংযুক্তা (ঐতিহাসিক নাটক)—শ্রীমণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। নাট্যকার স্বনামধন্য কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের বংশধর এবং নাটকখানি পরম শ্রদ্ধেয় গুপ্ত কবিকেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

প্রথমতঃ নাটকের আকার দেখিয়াই আমরা একটু ভড়কাইয়াছিলাম। তারপর মনে হইয়াছিল, গ্রন্থখানি যদি "আকার-সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" হয় তাহা হইলেই ত গেছি। এই বিপুল গোলক-ধাঁধাঁর ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাভ হইবে কেবল আগম ও নির্গম, কিন্তু তাহা নহে। এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা যে নির্ম্মল কাব্যরসের আস্বাদটুকু পাইয়াছি তাহা পরম লাভ বলিয়া মনে করি এবং অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় পুরস্কৃত হইবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কবিভূষণ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু বি, এ, এই একই বিষয় অবলম্বনে "পৃথ্বীরাজ" নাম দিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাকাব্য ও এই দৃশ্য কাব্যের আখ্যান-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং দৃশ্যকাব্যেই ঐতিহাসিক তথ্য সমধিক রক্ষিত হইয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন—চাঁদকবি রচিত "পৃথিরাজ রাসো" "দড়পিড়ি" এবং মহাত্মা টড্ প্রণীত "রাজস্থান"। মোগলসম্রাট আকবরের ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলের ন্যায় চাঁদকবিও স্বয়ং ঘটনার রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেতা। উভয়েরই বর্ণনা অতিরঞ্জনদোষদুষ্ট, কিন্তু অমূলক নহে।

মণিবাবুর নাটকের প্রধান ত্রুটি এই যে, তাহা ব্যাপক এবং চরিত্রবহুল। দর্শক ইহাতে উদ্‌ভ্রান্ত এবং ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়ে; নাট্যকার নিপুণহস্তে যে ছায়ালোকসম্পাতে চরিত্রের পুষ্টি এবং ঘটনার ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছেন সে কলাকৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়। কাটিলে ছাঁটিলে নাটকখানিকে ছোট করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আর এক ক্ষতি। নাটক হইলেও এ পুস্তকের বহুল স্থলে মহাকাব্যোচিত যে মনোরম উচ্ছ্বাস আছে দর্শককে তাহার আস্বাদনে বঞ্চিত হইতে হয়।

এই নাটকের প্রধান অপ্রধান সকল চরিত্রই সুরক্ষিত, সুরঞ্জিত এবং সুস্পষ্ট। ইহার আখ্যানবস্তুর সূচনা, সমাবেশ এবং সমাপ্তি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চিত্তগ্রাহী। ইহার ভাষার তেজ এবং প্রাণস্পন্দন আছে—গুরুবর্ণনায় যেমন গম্ভীর, হাস্যরসোদ্দীপন স্থলে তেমনি চটুল। ৪২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে দোষ বাহির করা যায় না, এমন নহে। কিন্তু সমালোচনায় সে মক্ষিকাধর্ম্ম অবলম্বনের পক্ষপাতী আমরা নহি।

পরিশেষে বক্তব্য, নাট্যকার যে ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, অনুসন্ধান ও গবেষণা সহকারে এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ-নিবারণকার্য্য।

বাঁকুড়া ও মানভূম।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে বাঁকুড়া এবং মানভূম জিলার অন্নকষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। তাহার উপর আবার ভয়ানক জলকষ্ট। শীঘ্র যদি প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে অন্নকষ্টের কথা ছাড়িয়া দিলেও জলাভাবেই লোকেরা দেশ ত্যাগ বা প্রাণ ত্যাগ করিবে। আমাদের মানভূমের সেবকবৃন্দ সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জানাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"* * * শতকরা ৯০ জন লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত। তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এতদিন কুল ছিল, সেইজন্য অবস্থার ভীষণতা বোধ করা যায় নাই—এখন আবার তাহাও নাই। যাহাদের মহুয়ার গাছ আছে, তাহারা যে অল্প পরিমাণ ফল জন্মিয়াছে তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছি লোকেরা খাদ্যাভাবে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, চলৎশক্তিহীন, শয্যাশায়ী—কোন কোন লোক অনাহারে সংজ্ঞাহীন। আমরা যাইয়া খাদ্যাদির ব্যবস্থা না করিলে সেই দিন কি পরের দিন মরিয়া যাইত, ইহাতেই যে বাঁচিবে তাহারও কোনও সম্ভাবনা নাই। * * *"

নিম্নে ২৫শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মানভূম এবং বাঁকুড়ার সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মানভূম (বাগ্‌দা কেন্দ্র হইতে)।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	মন—সের
১১	১৯৬	৯৷৮২
১১	১৯৯	১০/৮
১১	২০১	১০।৮
১৭	৪৩৪	২১৷৷৮

১৮	৪৬৫	২৩।০
১৯	৫২৪	২৬/৮
১৯	৫৩৫	২৭/০
১৯	৬৫৬	৩৩/০
১৯	৬৪৬	৩২৸২

বাঁকুড়া (ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে)।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	মন—সের
২৪	১৮৭	৯৸৮
২৪	২০১	১৫/৫
২৫	২২০	১১॥২
২৫	২২০	১১৸২
২৬	২৪৯	১২॥৯
২৬	৮৮১	১৪।৯

এতদ্ব্যতীত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাগ্‌দা কেন্দ্র হইতে ১৮১ খানা এবং ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে ১৪ খানা বস্ত্র বিতরিত হইয়াছে। যথেষ্ট অর্থাভাব বশতঃ আমরা আবশ্যক মত সাহায্য করিতে পারিতেছি না। আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ আশু অর্থ এবং বস্ত্র সাহায্য করিয়া তাঁহাদের দুঃস্থ ভ্রাতাভগিনীগণকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন। প্রেরিত অর্থ বা বস্ত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণমিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।
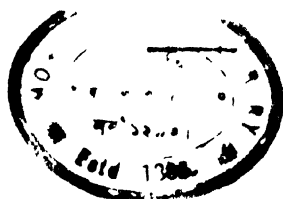
বৈষ্ণব-দর্শন

নারায়ণ-তত্ত্ব।

(অধ্যাপক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

(৩)

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের (৮২।৫-৬) এই বাণী উপদেশ করিতেছে—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড তাহা কি ? দেবগণ যে অণ্ড মধ্যে অবস্থিত তাহা জলমধ্যে ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন।

জন্মরহিত যিনি তিনিই নারায়ণ পদবাচ্য হইলেন; তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড তাহা ব্রহ্মা হইলেন। নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টী বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুতঃ নরের পুত্র। জল ব্রহ্মের প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া পরম পুরুষের নাম নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

মনু—১।১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন যে, নর বলিলে পরমাত্মাকে বুঝায়। পরমাত্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, সুতরাং প্রথমে নর হইতে জাত বলিয়া জলের নাম হইয়াছে 'নারা'। Bibleএর Genesisএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠিক এই ভাবের কথা আছে। সেখানে লেখা আছে—

1. "In the beginning God created the heaven and the earth.

2. And tne earth was without form, and void, and darkness was upon the face of the deep and the spirit of God moved upon the face of the waters."

বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অধ্যায়) বলেন যে, পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন; অতঃপর তিনি জলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে বিষ্ণুপুরাণ মনুর উল্লিখিত বচনই অবিকল তুলিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও প্রায় তাহাই করিয়াছে, কোথাও বা একটু আধটু বদলাইয়াছে। কেবল মৎস্য, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত বচনের ভিন্নরূপ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণে প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নাপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচী।
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥

সৃষ্টির আদিতে যখন সেই পুরুষ অণ্ড বিভেদ পূর্ব্বক বিনির্গত হইলেন, তখন তিনি আপনার অয়নের সমিচ্ছু হইয়া জল সৃষ্টি করিলেন—শুচি যিনি তিনি শুচিরই সৃষ্টি করিলেন। এই সলিল-সমষ্টির মধ্যে তিনি নিজ স্বরূপেরই সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তিনি সহস্র বৎসর থাকিয়া পুরুষোদ্ভব জলরাশি হইতে নারায়ণ নাম লাভ করেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে (১৪।১৪) নারায়ণের ব্যাখ্যা অন্যরূপেও

প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমি যখন সমস্ত 'দেহীর আত্মা তখন কি তুমি নারায়ণ নও?' নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ এবং অয়ন শব্দের 'অর্থ আশ্রয়।' জীবসমূহ যাহার আশ্রয় সেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্দের বাচ্য। তুমি অধীশ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তক বলিয়াও নারায়ণ। কারণ, নারের অর্থাৎ জীব-সমূহের বা তত্ত্ব-সমূহের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকে নারায়ণ বলা যায়। তুমি নারায়ণ—কেননা, তুমি যে নিখিল লোককে জানিতেছ—সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছ—তুমি যে নিখিল লোকের সাক্ষী। আবার তুমি নারায়ণ, যেহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং তাহা হইতে সঞ্জাত যে জল এই দুইটা তোমার আশ্রয়। সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমার অঙ্গ বা মূর্ত্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নন। তবে সেই নারায়ণের তাদৃশ পরিচ্ছিন্নতা সত্য নহে—ইহা তোমার লীলা অর্থাৎ নারায়ণরূপ তোমার সেই মূর্ত্তি সত্য, উহা মায়িক নহে।

নারায়ণস্ত্বং নহিসর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

ভাগবতের এই যে নির্দ্দেশ, ইহা ভাগবতের নিজস্ব বা নূতন ব্যাখ্যা নয়। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে নর অর্থাৎ আত্মা হইতে তত্ত্বসকল জাত হয় এবং আত্মাতেই প্রলীন হয়, তাই তাঁহার নাম নারায়ণ।

নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

বোধায়নশ্রৌতসূত্রে আছে—

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

নারায়ণ সমস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুর ভিতর বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুতেই বিরাজিত আছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে (১০৯ অধ্যায়) নারায়ণ শব্দের দুইটী অভিনব অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে।

প্রথমটী হইতেছে—

নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
ততোজ্জ্ঞানং ভবেদ্ যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

নার বলিতে মোক্ষ বুঝিতে হইবে এবং অয়ন শব্দের অর্থ করিতে হইবে অভীপ্সিত জ্ঞান। যাহা হইতে এই উভয় বিষয়ক জ্ঞান হয় তিনিই নারায়ণ বলিয়া কথিত হন।

এই গেল এক ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যা হইতেছে—

নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

যাহারা কৃতপাপ—পাপী, তাহারা নারাশব্দবাচ্য। অয়ন শব্দের অর্থ গতি। যাহা হইতে পাপীর গতি—মুক্তি হয়, তাহার নাম নারায়ণ।

পুরাণে এইরূপে নারায়ণ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনু জলকে নারায়ণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে হরিবংশ মনুর সহিত একমত; মনুর ব্রহ্মা এবং হরিবংশের হরি প্রথমে জলে ভাসিতেছিলেন। ব্রহ্মা ও হরি উভয়েই এই হিসাবে নারায়ণ। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণের বচনের সহিত মনুর বচনের ঐক্য আছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নারায়ণ ক্ষীরসমুদ্রে সর্পশয্যায় শায়িত। কোন কোন মতে এই নারায়ণের স্বর্গ হইতেছে শ্বেতদ্বীপ। কথাসরিৎসাগরে এক স্থানে লিখিত আছে যে, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধি কর্ত্তৃক শ্বেতদ্বীপে হরির নিকট নীত হইয়াছিলেন। হরি তখন শেষ নাগের গাত্রোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন; নারদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত ছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য স্থলে উল্লিখিত আছে যে, কতিপয় দেবতা শ্বেতদ্বীপে গিয়া দেখিলেন, হরি রত্নমণ্ডিত অট্টালিকায় সর্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৮৮-৮৯ অধ্যায়) প্রলয়কালের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে :—সমস্তই জলে জলময়, আর কিছুই ছিল না; কেবল একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অস্তিত্বমাত্র ছিল। সেই বৃক্ষের এক শাখার উপরিভাগে এক খট্টার উপর এক বালক শয়ন করিয়া ছিল। মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, বালক মুখব্যাদান পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়কে গিলিয়া ফেলিল। মার্কণ্ডেয় বালকের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া এক নূতন বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎপরে বালক মার্কণ্ডেয়কে উদ্গার করিয়া ফেলিল। তখন মার্কণ্ডেয় আবার চতুর্দ্দিক্ জলময় দেখিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল, আমিই জলকে "নারায়ণ" নামে অভিহিত করিয়াছি। জলই আমার আশ্রয়; সেই জন্য আমি নারায়ণ নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় অনেক কালের ঋষি, তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিয়া পুরাকালের এই কাহিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আর উপদেশ করিয়াছিলেন, হে যুধিষ্ঠির, তোমার আত্মীয় জনার্দ্দনই সেই নারায়ণ। এই আখ্যায়িকার মার্কণ্ডেয়ের সহসা আবির্ভাবের ব্যাপারটী ভাল বোঝা গেল না। যখন কিছুই ছিল না তখন মার্কণ্ডেয় কোথা হইতে আসিলেন? যাহা হউক, নারায়ণের সর্ব্ব প্রথমে সলিলাশ্রয়ের কথাটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। মেধাতিথি ও গোভিল উভয়েই বলিয়াছেন, "আপো নরাঃ"—জলসমূহের নামই 'নরাঃ'। পরম পুরুষের অপর একটী নাম যে নর তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতের একস্থানে (১৩।১৪৯।৩৯) লিখিত আছে— "জহ্নুর্নারায়ণো নরঃ"—ভাষ্যকার ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, "নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নারানি তানি কার্য্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ।"—অর্থাৎ নর শব্দে আত্মা বুঝাইতেছে। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহার নাম 'নারা'। এই নারা কারণস্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া নারায়ণ সংজ্ঞা হইয়াছে।

যথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়া নারায়ণের অর্ণবশায়িত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পাইয়াছি তাহা নিবেদিত হইল। এইবার নারায়ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ, মহাকাব্য, পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আজও তাহার সেই নারায়ণ নাম তাহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। বেদের খুব প্রাচীনভাগেও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইঁহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ-নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয় পূর্ব্বে এক তত্ত্ব ছিলেন না। কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৩।৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুষ-নারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরমাত্মায় ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩।৬।১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্রসত্র করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন। তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্ম-প্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠক, ১১শ অনুবাকে নারায়ণ বিরাট্‌রূপ পরব্রহ্ম, বিশ্বাত্মা, পরোজ্যোতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভুবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥ ঋক্ ১
বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ঋক্ ২
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্॥ ঋক্ ৩
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরোজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ॥ ঋক্ ৪

মহানারায়ণ উপনিষদে (১১।৪-৫) এই একই কথা দ্যোতিত হইয়াছে।

সুবালোপনিষৎ (৭) উপদেশ করিতেছেন—

"যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্"..."যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্নবেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।"—"যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে পরিচালিত করেন"—"মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না; তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য অলৌকিক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ"।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ, তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" (তৈত্তিরীয়, ৬।২)—"তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন।" এই শ্রুতিতে নারায়ণকে আত্মা এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহকে তাঁহার দেহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহানারায়ণোপনিষৎ (৩।১।১—১২) বলিতেছেন—

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

'এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।' এই রচনের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন যে, 'জগৎকারণবাদী

বাক্যটী সাংখ্যের প্রধানাদি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ নয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে স্থির হইল—সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সমস্ত দোষসংস্পর্শশূন্য, যাঁহার অবধি নাই, যিনি নিরতিশয় এবং অশেষ কল্যাণগুণবারিধিস্বরূপ, তিনিই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম। অবশ্য জিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্মে মুখ্য ঈক্ষণ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীবাদরায়ণের শ্রুতি সমুদয়ের সাহায্যে এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুবালোপনিষদে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে—এমন কি, বৃহদারণ্যকে যে তত্ত্বগুলি উল্লিখিত হয় নাই সেগুলিকেও এই উপনিষৎ ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার 'আত্মা'রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুবালোপনিষৎ উপদেশ করিতেছেন—'বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অহঙ্কার যাঁহার শরীর, চিত্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।' এখানে মৃত্যু বলিতে তমঃশব্দবাচী অতি সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মক তত্ত্বসকল ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে—যেমন পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়-সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সকল আবার ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতা পরমাত্মায় একীভূত হয়।' এই উপনিষদে এই পদার্থগুলি নারায়ণের শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে (১৮২।১) ভীষ্মকে প্রশ্ন করা হয়—স্থাবর-জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? এবং প্রলয়কালে কাহাকে আশ্রয় করে? উত্তরে ভীষ্ম বলেন—

"নারায়ণো জগন্মূর্ত্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ।"

অনন্তরূপী সনাতন নিত্য নারায়ণই জগন্মূর্ত্তি অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।

মহোপনিষদে আছে—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নি ন সোমো ন সূর্য্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়ানি"—(১।১)

অগ্রে 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই দ্যাবা-পৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য ছিল না; তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না; তিনি ধ্যানস্থ হইলে, পর তাঁহার একটী কন্যা ও দশটী ইন্দ্রিয়' উদ্ভূত হইল। বৃহদারণ্যকও (৩।৪।১১) এই কথার একরূপ পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বা ইদমেক-মেবাগ্র আসীৎ" 'অগ্রে এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন'; তাহার পর তিনি তৃপ্তিলাভ না করিয়া সংকল্প করিলেন, "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছান্দোগ্য ৬।২।১)—'আমি বহু হইব, জন্মিব'—অমনই, 'ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রো পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ' (বৃহদারণ্যক, ৩৪।১১) এই দেবক্ষত্রিয়গণ উত্তমরূপে তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র বাসুদেবের কথা আছে। অন্যত্রও কোথাও কোথাও বাসুদেব ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চ্চনার কথা বিশেষ জানা যায় না। বাসুদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্বলাভ করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী এই—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ" (১০।১।৬)

মহাভারতের প্রতিপর্ব্বের আদিতে নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কারপূর্ব্বক উক্ত শাস্ত্রপাঠের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাভারত রচনাকালে নরনারায়ণ বিশেষভাবেই পূজিত হইতেন। বনপর্ব্বে (১২।৪৬,৪৭) জনার্দ্দন অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি নর ও আমি নারায়ণ। আমরা সেই ঋষি নর-নারায়ণ। আমরা উপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে আসিয়াছি। হে পার্থ! তোমাতে আমাতে কিছুই প্রভেদ নাই। কেহই আমাদিগকে ভিন্ন বুঝিতে সমর্থ নয়।" ঐ পর্ব্বেরই ত্রিংশ অধ্যায়ে (১ম শ্লোক) দেবাদিদেব শিব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বজন্মে তুমি নর ছিলে ও নারায়ণের সহিত একত্র বিরাজ করিতে। তোমরা উভয়ে বদরিকাশ্রমে বহুসহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলে।" উদ্যোগপর্ব্বে (৪৯ ১৯) কথিত আছে, "বাসুদেব ও অর্জ্জুন, এই মহাবীরদ্বয় সেই প্রাচীনদেব নর-নারায়ণ।"

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণ ও বাসুদেবের অভিন্নতা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে নারায়ণ মূর্ত্তিচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ তাঁহার চারি মূর্ত্তি। তন্মধ্যে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বনপর্ব্বেও (৬ষ্ঠ অধ্যায়) এই বিবরণ পাওয়া যায়। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ ধর্ম্মের পুত্র— অহিংসা তাঁহাদের মাতা। ধর্ম্মের সহিত অহিংসার মিলন, ইহাকে ভারতীয় ধর্ম্মের এক নূতন যুগ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। যাগযজ্ঞে পশুহিংসায় ক্রমে বিতৃষ্ণা হওয়ায় এক নবীনভাব মানবমনে অঙ্কুরিত হওয়া বিচিত্র নয়। অহিংসা পরমোধর্ম্ম—এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মমতেরই যে এক বিশেষত্ব তাহা নহে। এই ভাবটী বৌদ্ধধর্ম্মে

প্রণালীবদ্ধভাবে প্রচলিত হইবার বহুপূর্ব্বে মানবমনকে আলোড়িত করিয়াছিল। এইভাব পরিশেষে ভারতীয় মানব-সমাজের এক্ষাংশকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনটী শাখাধর্ম্মে পরিণত হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারিটীতে চতুঃসনের ন্যায় একটী অবতার।

বৃহদারণ্যকভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চতুর্ব্যূহবাদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ, ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহবাদ অগ্রাহ্য আনন্দগিরি বৃহদারণ্যকভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শাঙ্করমত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেননা আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদন-প্রণালী। যথা, পৌষ্করসংহিতায়— 'যাহাতে গুরুশিষ্যভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র। সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্বিধগুণ সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন— ভগবদ্বিভব অর্চ্চনায় প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভ

শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। 'ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ নিত্যসিদ্ধ-গুণময়দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম।"* পৌষ্করসংহিতাও বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন' এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্য নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ শরীরধারণরূপ জন্ম প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরম-পুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, একান্তিক ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেব ধর্ম্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরম স্রষ্টা। তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই মূর্ত্তি চতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মণ্ডলীপুত্ত

* পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বাঙ্গালা তর্জ্জমা।

মতবাদে এই ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্য্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহ-পূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি-সূত্রে (৪,৩,৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দ্দেশে 'বাসুদেব', 'বলদেব' শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্ব-সমাসে 'সঙ্কর্ষণ বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর-পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে ক্ষোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুইশত বৎসরের প্রাচীন। দুঃখের বিষয় শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারিদিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা ক্ষোদিত আছে তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, Diyaর পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন; কোন রাজনীতিক কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Amtalikita হইতে পূর্ব্ব মালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই ক্ষোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-

সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন। সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক্ নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একস্থলে (৭।৪।৫) ভগবান্ তাঁহার একাধিক অষ্টপ্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

গীতোক্ত জীব ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটী ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবারভুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত অনুগীতায় দশম অধ্যায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্রতত্ত্বের সহিত চাতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্য্যু—বলির জন্য উদ্গাতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাঁহারা নারায়ণকে প্রকৃতরূপে বুঝেন তাঁহাদের দ্বারা এতৎ সম্পর্কে ঋঙ্মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ যাঁহার নিকট পূর্ব্বে তাঁহারা জীব বলি দিতেন। এ বিষয়ে সামগানও গীত হইয়া থাকে; তাহার উদাহরণও প্রদত্ত

হইয়াছে। সেই নারায়ণ-দেবকে উপলব্ধি কর, কেননা তিনিই সর্ব্বভূতাত্মা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও চতুর্ব্যূহতত্ত্ব স্বীকার করিয়া স্তুতি করিতেছেন—

"নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।"

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভট্ট কুমারিলের সময় শৈবমত ও ব্যূহবাদ উভয়ই প্রকৃষ্টরূপ সমুন্নত ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বৈষ্ণব-দর্শনের ব্যূহবাদ বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ?

(স্বামী বিবেকানন্দ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কি ফল হইবে? তাহাতে আমাদের লাভ কি? ধর্ম্ম কি মানবজীবনের একটী অঙ্গস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে দুঃখে সান্ত্বনা ও বিপদে সাহায্য প্রদান করিবে? আর মানবহৃদয় স্বভাবতঃই কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে যে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চায় তাহারই বা কি হইবে? সে সমস্তই বজায় থাকিবে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাবও থাকিবে, পরন্তু উহা শ্রেষ্ঠতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। নির্গুণ ব্রহ্ম উহাকে আরও দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, নির্গুণ ব্যতীত সগুণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। যদি বল, এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এক ব্যক্তিবিশেষ আছেন, যিনি শূন্য হইতে কেবল মাত্র স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহা প্রমাণ

করা যায় না—এরূপ ব্যাপার হইতেই পারে না। কিন্তু যদি আমরা নির্গুণের ধারণা করিতে পারি, তাহা হইলে সেই সঙ্গে সগুণের ধারণাও করিতে পারিব। এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সেই এক নির্গুণের বিভিন্ন পাঠান্তর মাত্র। যখন আমরা ইহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, তখন ইহাকে জড়জগৎ বলি। যদি এমন কোন প্রাণী থাকে যাহার পাঁচটীর বেশী ইন্দ্রিয় আছে, তাহা হইলে সে উহাকে অন্য একটা কিছু দেখিবে। যদি আমাদের কেহ বৈদ্যুতিক স্পন্দন গ্রহণ করিবার ইন্দ্রিয় লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি আবার এই জগৎকে অন্য একরূপ দেখিবেন। সেই এক সত্তাই নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে—এই সকল বিভিন্ন জগতের ধারণা তাহারই বিভিন্ন পাঠান্তর মাত্র এবং মানবমস্তিষ্ক সেই নির্গুণ স্বরূপের যতদূর উচ্চ ধারণা করিতে পারে, তাহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং এই চেয়ারখানি যতদূর সত্য অথবা এই পৃথিবী যতদূর সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততদূরই সত্য—তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। ইহা নিত্য সত্য নহে। অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর সেই নির্গুণ ব্রহ্মই এবং সেইজন্য ইহা সত্য, যেমন, আমি মানুষ হিসাবে সত্যও বটে আবার সত্য নয়ও বটে। আপনারা আমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, আমি যে ঠিক সেইরূপই তাহা সত্য নহে; আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আপনারা আমাকে যাহা মনে করিতেছেন আমি তাহা নহি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই আপনারা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। কারণ, আলোক, বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন, আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তন, এবং আমার ভিতরকার নানা প্রকারের গতি—এই সমস্ত মিলিয়া আপনারা আমাকে যেমনটী দেখিতেছেন তেমনটী করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন একটীর পরিবর্ত্তন হইলেই আমারও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আপনারা একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন আলোয় ফটোগ্রাফ তুলিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ, আপনাদের ইন্দ্রিয় সমূহের সম্পর্কে আমাকে যেরূপ দেখাইতেছে, আমিও সেইরূপ হইতেছি। তথাপি, এই সমস্ত ঘটনা সত্ত্বেও এমন একটা অপরিবর্ত্তনীয়

কিছু রহিয়াছে, যাহার এইগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র—উহা সেই নিরাকার আমি, যাঁহা হইতে সহস্র সহস্র সাকার 'আমি'রূপ ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছে।' আমি শিশু ছিলাম, আমি বালক ছিলাম, আবার আমি বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। জীবনের প্রত্যেক দিনে আমার শরীর ও চিন্তা বদলাইয়া যাইতেছে—কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও উহাদের সবটা মিলিয়া যাহা হয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ইহাই সেই নিরাকার 'আমি' এবং এই সমুদয় বিকাশ যেন তাহার অংশস্বরূপ। সেইরূপ, আমরা জানি, সমষ্টি জগৎ স্থির-গতিহীন; কিন্তু এই জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিষটী গতিশীল, প্রত্যেক জিনিষটী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেছে; সেই সঙ্গে আবার ইহাও দেখিতে পাই যে, এই সমুদয় বিশ্ব সমষ্টি হিসাবে স্থির-গতিহীন; কারণ, 'গতি' শব্দটী আপেক্ষিক। এই চেয়ারখানির সহিত তুলনায় আমি নড়িতেছি, কারণ, চেয়ারখানি স্থির রহিয়াছে। অন্ততঃ দুইটী জিনিষ না থাকিলে গতি সম্ভব হয় না। সমস্ত জগৎকে একটী জিনিষ ধরিয়া লইলে আর উহার গতি থাকে না; কাহার তুলনায় উহা নড়িবে? অতএব চরম সমষ্টিটা অপরিবর্ত্তনীয় ও নিশ্চল, এবং যত কিছু গতি ও পরিবর্ত্তন তৎসমুদয়ই এই প্রাতিভাসিক—সসীম জগতের। সেই সমষ্টিই নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে যিনি জগতের স্রষ্টা পাতা, যাঁহার নিকট আমরা নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি, সেই সগুণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমুদয় ব্যষ্টিই সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তর্গত। এরূপ সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।' এই প্রকার সগুণ ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্মের সর্ব্বোচ্চ বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তুমি আমি উহার অতি নিম্নতম বিকাশ, আর সগুণ ঈশ্বর, আমরা উহার যতদূর উচ্চ বিকাশ ধারণা করিতে পারি তাহাই। কিন্তু তুমি বা আমি কখনও সগুণ ঈশ্বর হইতে পারি না। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' বাক্যের লক্ষ্য সগুণ ঈশ্বর নহে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে। এক তাল মাটী হইতে একটা প্রকাণ্ড হাতী তৈয়ার করা হইল এবং সেই একই মাটী হইতে একটা ছোট ইঁদুরও তৈয়ার করা হইল। সেই মাটীর ইঁদুরটী

কি কখনও মাটীর হাতীটীর সমান হইতে পারিবে? কিন্তু উহাদের উভয়কেই জলে রাখিয়া দাও, দেখিবে, উভয়ে একই মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্তিকা হিসাবে উভয়েই এক, কিন্তু ইঁদুর ও হাতী হিসাবে উহাদের মধ্যে চিরকাল ব্যবধান থাকিবে। অনন্ত বা নির্গুণ তত্ত্ব এই দৃষ্টান্তোক্ত মৃত্তিকা সদৃশ। আমরা ও জগতের শাসনকর্তা স্বরূপতঃ এক। কিন্তু ব্যষ্টি প্রকাশ হিসাবে আমরা তাঁহার নিত্যদাস—তাঁহার চির উপাসক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সগুণ ঈশ্বর বজায় রহিয়াছে, এই আপেক্ষিক জগতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটী বজায় রহিয়াছে এবং ধর্ম্মও উৎকৃষ্টতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অতএব সগুণকে জানিতে হইলে আমাদের অগ্রে নির্গুণকে জানা দরকার। আমরা দেখিয়াছি, যুক্তির নিয়মানুসারে বিশেষ ঘটনা কেবল সাধারণ ঘটনা দ্বারাই জানা যায়, সেইরূপ মানুষ হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা সর্ব্বোচ্চ সাধারণতত্ত্ব—নির্গুণ তত্ত্বের মধ্য দিয়া জানা যায়। প্রার্থনাদি সমস্তই থাকিবে, কেবল তাহাদের উদ্দেশ্য আরও ভাল হইয়া যাইবে। প্রার্থনা সম্বন্ধে সেই সমস্ত অর্থহীন ধারণা—প্রার্থনার অতি নিম্ন ভাবসমূহ—যাহাতে আমাদের মনের সকল প্রকার তুচ্ছ বাসনাকে ভাষায় ব্যক্ত করা হয় মাত্র—সেগুলি হয়ত আর থাকিবে না। কোন যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মেই ভগবানের নিকট কামনা করা চলে না; তবে দেবতাদের নিকট কামনা করা চলে বটে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। রোমানক্যাথলিকগণ মহাত্মাগণের নিকট কামনা করেন; তা বেশ, কিন্তু ভগবানের নিকট কামনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। ভগবানের নিকট একটু বাতাস, এক পশলা বৃষ্টি, বাগানে প্রচুর ফলোৎপাদন ইত্যাদির জন্য কামনা করা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মহাত্মাগণ এক সময়ে আমাদেরই মত ক্ষুদ্র প্রাণী ছিলেন—তাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু যিনি নিখিল জগতের অধীশ্বর তাঁহার নিকট আমাদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য 'দেহি' 'দেহি' করা এবং বাল্যকাল হইতে বলা—"হে প্রভু, আমার মাথা ধরিয়াছে, তুমি উহা ছাড়াইয়া দাও" ইহা বড়ই হাস্যজনক।

এই জগতে লক্ষ লক্ষ ভাল লোক মারা গিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই এখানে রহিয়াছেন; তাঁহারা দেবতা বা এঞ্জেল হইয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের সাহায্য করুন'। কিন্তু ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা! কখনই নহে। তাঁহার নিকট আমরা আরও শ্রেষ্ঠ জিনিষের জন্য গমন করিব। "উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।" গঙ্গাতীরে বাস করিয়া যে ব্যক্তি জলের জন্য কূপ খনন করে সে মূর্খ, অথবা যে ব্যক্তি হীরার খনির নিকটে বাস করিয়া কাচখণ্ডের নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন করে সেও মূর্খ।

বাস্তবিক, যদি আমরা অনন্ত করুণা ও অনন্ত প্রেমের আকর ভগবানের নিকট তুচ্ছ ঐহিক বিষয়ের কামনা করি, তবে বলিতে হইবে, আমাদের মত মূর্খ আর নাই। তাঁহার নিকট আমরা জ্ঞান, বীর্য্য, প্রেম এই সমস্ত প্রার্থনা করিব। কিন্তু যতদিন আমাদের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও দাসসুলভ অধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সগুণ ঈশ্বরোপাসনার এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ভাব থাকিবে। কিন্তু যাঁহারা খুব উন্নত তাঁহারা এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন না—আপনাদের জন্য কোন কিছু প্রার্থনা করা—কোন জিনিষ চাওয়াটাই তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এই ভাবটা প্রবল রহিয়াছে—"নাহং নাহং"—আমি নই, হে ভ্রাতঃ, তুমি। এই সকল ব্যক্তিই নিগুর্ণ ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে নিগুর্ণ ঈশ্বরোপাসনা কি প্রকার তাহা বলিতেছি। "হে প্রভু, আমি অতি দীনহীন, আমাকে কৃপা কর"---এবম্বিধ দাসত্ব তথায় নাই। আপনারা সেই পুরাতন পারসিক কবিতাটীর ইংরাজী তর্জ্জমা পড়িয়া থাকিবেন—"আমি আমার প্রিয়তমের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আমি উহাতে আঘাত করিলাম এবং ভিতর হইতে একটী স্বর শুনিতে পাইলাম—'কে তুমি?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি অমুক।' কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার আমি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম; আমাকে সেই একই প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করা হইল এবং আমিও সেই একই উত্তর দিলাম। কিন্তু দ্বার খুলিল না। আমি তৃতীয়বার আসিলাম এবং সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল। আমি উত্তর দিলাম—'প্রিয়তম, তুমিই আমি।' নির্গুণ ঈশ্বরকে সত্যের দ্বারা উপাসনা করিতে হইবে—সত্য কি? আমিই তিনি এই জ্ঞান। যখন আমি বলি, আমি তুমি নই, তখন মিথ্যা বলা হয়। যখন আমি বলি, আমি তোমা হইতে পৃথক্ তখন আমি ভয়ানক মিথ্যা কথা বলি। আমি এই বিশ্বের সহিত এক—এক হইয়াই জন্মিয়াছি। আমি যে বিশ্বের সহিত এক এ জ্ঞান আমার ইন্দ্রিয়গণের স্বতঃসিদ্ধ। আমি আমার চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত বায়ুর সহিত এক, উত্তাপের সহিত এক, আলোকের সহিত এক, নিখিল বিশ্বাত্মার সহিত অনন্তকালের জন্য এক—যাঁহাকে 'বিরাট্' নামে অভিহিত করা হয়, যাঁহাকে ভুলক্রমে এই জগৎ বলিয়া মনে করা হয়। কারণ, ইহা তিনি ব্যতীত অন্য কিছু নহে, যিনি সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে চিরন্তন দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া 'আমি আছি' বলিতেছেন—যিনি মৃত্যুহীন, নিদ্রাহীন, সদাজাগ্রত, অবিনাশী—যাঁহার মহিমা কখনও ম্লান হয় না—যাঁহার শক্তি কখনও প্রতিহত হয় না, আমি তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন—'সোঽহমস্মি'। ইহাই নির্গুণের উপাসনা। আর ইহার কি অদ্ভুত ফল দেখা যাউক। ইহা মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। বল—বলই একমাত্র জিনিষ, আমাদের জীবনে যাহার এত অভাব। কারণ, যাহাকে আমরা পাপ ও দুঃখ বলি তাহাদের একমাত্র কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলতা হইতেই অজ্ঞান আসে এবং অজ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহা আমাদিগকে সবল করিবে—তখনই আমরা দুঃখকষ্টকে হাসিয়া উড়াইতে পারিব, তখনই পৈশাচিক অত্যাচার দেখিয়া হাস্য করিব, এবং হিংস্র ব্যাঘ্রের রক্তলোলুপ স্বভাবের পশ্চাতে আমার নিজের আত্মাকেই দেখিতে পাইব। নির্গুণের উপাসনায় এই ফল হইবে। যিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভেদ জানিয়াছেন, তিনিই একমাত্র বলবান্—অন্যে নহে। আপনাদের বাইবেলেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে

পাইবেন। বলুন দেখি, ন্যাজারেথের যীশুর সেই অসীম অনন্ত শক্তি কোথা হইতে আসিল, যাহাতে তিনি বিশ্বাসঘাতকদিগকে মোটেই গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই এবং যাহারা তাঁহার প্রাণবিনাশে কৃত-সংকল্প হইয়াছিল তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন? ইহা সেই নী—"আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক", ইহা সেই প্রার্থনা—"হে পিতঃ, আমি যেরূপ তোমার সহিত এক, ইহাদিগকেও সেইরূপ আমার সহিত এক করিয়া দাও"। ইহাই নির্গুণের উপাসনা। জগতের সহিত এক হইয়া যাও—তাঁহার সহিত এক হইয়া যাও। আর এই নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে কোন পরীক্ষা বা প্রমাণের প্রয়োজন নাই। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষাও নিকটতর, আমাদের চিন্তাসকল অপেক্ষাও নিকটতর। তাঁহার মধ্য দিয়াই আমরা দেখি ও চিন্তা করি। কোন কিছু দেখিতে গেলেই আমরা অগ্রে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। এই দেয়ালটী দেখিতে গিয়া আমি প্রথমে তাঁহাকে দেখিতেছি, তৎপরে এই দেয়ালটীকে দেখিতেছি। কারণ, তিনিই চিরন্তন সাক্ষীস্বরূপ। কে কাহাকে দেখিতেছে? তিনি এই দেহে আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। শরীর মন বদলাইয়া যায়, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ আসে আবার চলিয়া যায়, দিন মাস, বৎসর অতীতের গর্ভে চলিয়া পড়ে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মরিয়া যায় কিন্তু তাঁহার বিনাশ নাই। 'আমি আছি' 'আমি আছি' এই বাণী অনাদিকাল হইতে একই ভাবে রহিয়াছে। তাঁহাকে এবং তাঁহার মধ্য দিয়াই আমরা সকল বস্তু দর্শন করি। তাঁহাতে এবং তাঁহার মধ্য দিয়া আমরা অনুভব করি, চিন্তা করি, বাঁচিয়া থাকি এবং এক্ষণে রহিয়াছি। আর সেই 'আমি', যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বলিয়া ভুল করি, শুধু আমার 'আমি' নহে—পরন্তু তোমার, সর্ব্বভূতের, সকল প্রাণীর, সকল দেবতার, এমন কি, নীচ হইতে যে নীচ তাহারও 'আমি'। সেই 'আমি আছি' হত্যাকারীর মধ্যেও যেমন সাধুর মধ্যেও তেমনি, ধনীর মধ্যেও যেমন দরিদ্রের মধ্যেও তেমনি, পুরুষের মধ্যেও যেমন স্ত্রীর মধ্যেও তেমনি, মানুষের মধ্যে ও যেমন পশুর

মধ্যেও তেমনি। নিম্নতম জীবাণু হইতে উচ্চতম মহাপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের অন্তরেই তিনি বিরাজ করিতেছেন এবং অনাদিকাল ধরিয়া "সোঽহং" "সোঽহং" উচ্চারণ করিতেছেন। যখন আমরা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান এই অভ্যন্তরীণ বাণী বুঝিতে পারিব যখন আমরা এই শিক্ষা লাভ করিব, তখন সমস্ত জগৎ তাহার রহস্য ব্যক্ত করিবে, তখন প্রকৃতিদেবী তাঁহার রহস্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদিগের নিকট উন্মুক্ত করিবেন। তখন আর কিছুই জানিবার থাকিবে না। এইরূপে সকল ধর্ম্ম যে সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে আমরা তাহা দেখিলাম অর্থাৎ এই সমস্ত জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান গৌণমাত্র; যে জ্ঞান আমাদিগকে বিশ্বের সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বরের—ব্রহ্মের—সহিত এক করিয়া দেয় তাহাই একমাত্র সত্যজ্ঞান।

(সমাপ্ত)

বায়স্কোপ ও বেদান্ত-দর্শন।

(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মজুমদার)

ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পন উপলক্ষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে বিরাট্ উৎসব হইয়াছিল তাহাতে নানাবিধ প্রদর্শনীর মধ্যে বায়স্কোপও দেখান হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই একবার যে বায়স্কোপ না দেখিয়াছি এমন নহে, কিন্তু এরূপ ফাঁকা মাঠে কখনও দেখি নাই এবং ইহার প্রদর্শনীতত্ত্বও বিশেষ বুঝিতাম না। প্রথমতঃ দেখিলাম, মাঠে মনুমেণ্টের গায়ে একখানা সাদা কাপড় মাত্র ঝুলান আছে এবং কিছু দূরে একটা "অপারেটাস্" বা আলোকাধার রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু কিছুই ছিল না।

ক্রমে অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে ঐ আলোকাধার হইতে

কতকটা আলোকরশ্মি ঐ কাপড়ের উপর পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হইল। দৃশ্যাবলি অন্যান্য প্রত্যক্ষ ঘটনার মতই দৃষ্ট হইল। যেখানে আমি কেবল একখানা কাপড়মাত্র দেখিয়াছিলাম, সেইখানে এখন "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" দেখিলাম। —সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, মানুষ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা চক্ষুর ভ্রম নহে সুতরাং একটীও মিথ্যা বলিবার জো নাই, যেহেতু দৃশ্যগুলি প্রকৃত ঘটনা সমূহেরই প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু তত্ত্বান্বেষণ করিলে ইহার মূলে একখানি সাদা কাপড় ও একটা আলোক এবং কতকগুলি ছোট ছোট ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেবল শিল্পনৈপুণ্যে এই অদ্ভুত দর্শন ঘটিয়া থাকে।

বেদান্ত মতে জগৎপ্রপঞ্চও ঠিক এইরূপ ছায়াবাজি মাত্র। বেদান্ত বলেন, মায়াপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই জগৎ। বায়স্কোপ দৃশ্যের ন্যায় ইহারও কোন সত্তা নাই। অর্থাৎ মায়ারূপ বস্ত্রে চিদাভাসরূপ আলোক প্রতিভাত হইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে। বায়স্কোপ দেখানর সময় যদি কেহ ঐ বস্ত্রখানি সরাইয়া লয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় দৃশ্য বিলুপ্ত হইয়া কেবল আলোকমাত্র থাকে সুতরাং আলোকসত্তাই দৃশ্যাবলির অস্তিত্ব, নচেৎ উহার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই। তদ্রূপ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের আভাস মায়ারূপ জড়ে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে প্রতিভাত হইলেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। বায়স্কোপের অন্তর্নিহিত ছবিগুলির প্রতিবিম্ব যেমন আলোকপ্রভায় প্রতিভাত হইয়া দৃশ্যরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মায়া বা মূল প্রকৃতিতে সৃষ্টির বীজ অব্যাকৃতাবস্থায় বিলীন থাকে, উহাতে চিদাভাস প্রক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই ঐ বীজ সকল উপাধিবিশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুরূপে পরিণত হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমংকৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" ৯অঃ, ৮ শ্লোক।

আমি মদধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া (প্রাক্তন কর্ম্ম নিমিত্ত স্বভাববশে) অবিদ্যাপরবশ ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি॥ পুনরায় বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥" ৯অঃ, ১০ শ্লোক।

আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাচরাত্মক জগৎ প্রসব করে, হে কৌন্তেয়, এই জন্যই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় (আমার, সন্নিধি মাত্রেই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা)। সুতরাং বায়স্কোপতত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বৈদান্তিক মায়াবাদতত্ত্ব কথঞ্চিৎ ধারণা করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, যদি কোন বালককে শিশুকাল হইতে আজীবন বায়স্কোপ দেখান হয়, উহার রহস্য তাহার নিকট কখনও উদ্ঘাটিত করা না হয়, তাহা হইলে ঐ বালক বৃদ্ধ হইলেও কদাচ উহার সত্তায় অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। বালকের কথা দূরে থাক্ আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ হইয়াও অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মনুমেণ্টের গায়ে একখানা কাপড় মাত্র দেখিযাও যখন তন্ময় হইয়া বায়স্কোপ দেখিতেছিলাম, তখন সেই অভ্রভেদী মনুমেণ্ট ও কাপড় খানির কথা এককালেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু ঐ ঘটনাবলিকে আমার সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইয়াছিল। অতএব সামান্য একটা বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ায় যদি এত বড় একটা ভ্রম জন্মিতে পারে তবে সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র খেলায় যে আমরা মোহিত হইব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং মায়াই যে সৃষ্টির উপাদান তাহাতে আর সংশয় নাই। যেখানে মায়া নাই সেখানে সৃষ্টিও নাই। এই মায়া সামান্য পদার্থ নহে, ইহা সেই মায়াময়েরই মায়া। মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে হইলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে, যেহেতু জগতের আধার মায়া এবং মায়ার আধার ভগবান্। গুণময়ী মায়া নিজ সৃষ্ট জগৎকে মোহিত করিতে পারেন কিন্তু নিজ আধার

গুণাতীত ভগবান্‌কে পারেন না। শ্রীভগবান্ মায়াকে সুদুস্তরা বলিয়াছেন।

"দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গীতা, ৭অঃ, ১৪।

আমার এই সত্ত্বাদিগুণবিকারময়ী, অলৌকিকী মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা আমাকেই (অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহারা এই সুদুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন (তৎপরে আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন)। সুতরাং করুণাময় ভগবানের দয়া ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার আর উপায় নাই।

যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে অগ্রাহ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র আমিটার শক্তিতে মায়া অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে তাহার পতন ও ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। এই হেতুই বলদর্পিত শুম্ভনিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। মহামায়া স্বয়ং বলিয়াছেন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥"
চণ্ডী, উত্তমচরিত্র, ১২০ শ্লোক।

যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে, অথবা যে আমার দর্পচূর্ণ করিবে, কিংবা ত্রিভুবনে যে আমার তুল্য বলশালী, সেই আমার স্বামী হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি নিজ বলে আমাকে (মায়াকে) অতিক্রম করিতে পারিবেন, আমি (মায়া) তাঁহারই বশীভূত হইব। কিন্তু যে মায়ায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও মোহিত, এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও সময়ে সময়ে যোগমায়ায় অভিভূত থাকেন, সে মায়ার কবল হইতে মুক্ত হওয়া কি মায়িক জীবের সাধ্য? বাস্তবিক এরূপ অধিকারী সংসারে অতীব বিরল—শুদ্ধাদ্বৈতের অধিকারী জগতে সহস্র বৎসরে একটী আসে কিনা সন্দেহ। তাই বায়স্কোপে বস্ত্রখানি স্থানান্তরিত করিলে যেমন খেলা সাঙ্গ হইয়া কেবল আলোকমাত্র থাকে, সেইরূপ মায়া তিরোহিত হইলেই জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। পুরাকালে মায়াবাদী

বেদান্তবিদ্ মহর্ষিরা আধুনিক বায়স্কোপতত্ত্বের ন্যায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান বলে মায়াতত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অবতারপ্রমুখ মহাপুরুষগণ মায়ার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবকে মোক্ষের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

যিনি অজ্ঞান বা মায়ারূপ অন্ধকার নাশ করিয়া জ্ঞানালোকে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই সৎস্বরূপ পরমপুরুষ শ্রীগুরুচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

চার্ব্বাক-দর্শন।

(অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত সেন গুপ্ত, এম-এ, বি-এল)

ভারতভূমি চিরকাল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এখানে যত ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে বা যত বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ আছে জগতে আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না; এজন্য ভারতভূমি চিরকাল ধর্ম্মভূমি বলিয়া জগতে বিখ্যাত থাকিবে। এখন আর কেহ ভারতকে "Land of Heathens" বা "Land of Barbarian Hindus" বলিতে সাহস করেন না। এখন অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে, আধ্যাত্মিক জগতে ভারত এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। জড়জগতে ভারতের স্থান খুব নিম্নে হইলেও হইতে পারে; এ সম্বন্ধে আমাদের জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই। ভারত জড়-জগতে জ্ঞানের সোপানে কতদূর উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা হারাইয়াছি, এই প্রমাণের জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয়বিধৌত উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত্রই আদিম সভ্যতার উৎপত্তি স্থান। জড়জগতের জ্ঞান প্রথম এই বাবিলন হইতে

আরম্ভ হয়, পরে ঈজীপ্ট, গ্রীস্, রোমে ইহার প্রভাব বিস্তার হয়; পরে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান প্রবেশ করে। তবে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, ভারতীয় হিন্দুগণ অল্পদিনের মধ্যে এই জড়-জগতের জ্ঞানে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতে সভ্যতা আগমনের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে ঋগ্বেদাদি প্রচলিত ছিল, একথা সকলে স্বীকার করেন। বোধ হয় প্রথমে অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যগণ এই জগতের প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য প্রকৃতির উপাসনা করিতে থাকেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন প্রকৃতিলব্ধজ্ঞানে জগতের রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, তখন তাঁহারা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভের চেষ্টায় বিরত হইলেন এবং কিসে জন্ম-মরণশীল এই জগতের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে অন্যত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কারণ অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ—" ইত্যাদি।

আর্য্যগণ দেখিলেন, প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিময়ী প্রতীয়মান হইলেও ইহা জড় মাত্র; ইহার পারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষ আছেন, তিনি এক মাত্র সৎ এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ও অমৃতত্ব লাভ হয়। জগতের আদিকারণ আনন্দময় পুরুষের সন্দর্শনে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয় দেখিয়া আর্য্যগণ প্রাকৃতিক জগতের বর্ণনা হইতে বিরত হইয়া আদিপুরুষের গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জগতে অতুলনীয় বেদ বেদান্ত ভারতে দেখা দিল। অন্যান্য জাতিগণ জড়জগতের জ্ঞানলাভে ব্যস্ত থাকায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে তাদৃশ যত্নবান্ হইতে পারেন নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্মকে জীবনের সার জানিয়া তচ্চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং ইহার ফলে ক্রমশঃ দেশকালপাত্রানুযায়ী নানা ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সাংখ্যাদি ষড়দর্শন, পুরাণতন্ত্রের আবির্ভাব হইল। এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরস্পর আপাতবিরোধী বোধ হইলেও সকলের মূলে এক উদ্দেশ্য নিহিত দেখা যায়। কিসে এই সংসারে ত্রিতাপ

যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করতঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই তাহার উপায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রদর্শন করিতেছে। সাংখ্য দর্শন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিলেও ইহা আস্তিক দর্শন, যেহেতু জীবের ত্রিতাপ দুঃখ নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্রই যুক্তি তর্ক দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়া জীবের মুক্তি মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছে।

যে আর্য্যগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, যাঁহারা ঈশ্বরানুভূতি, স্বস্বরূপোপলব্ধি বা আত্মসাক্ষাৎকার জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া বিবেকসাহায্যে জড়জগতের নশ্বর সুখের প্রলোভন হইতে মনকে সংযত রাখিতে সতত যত্নবান্, তাঁহারা যে কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবেন ইহা মনে করিতেও যেন কেমন একটা সঙ্কোচ ভাব আসে; এমন ধর্ম্মপ্রাণ জাতি কেন যে নাস্তিক দর্শনের অবতারণা করিয়া মানবকে সংসার সুখের দিকে প্রেরিত করিবেন তাহা সহসা বোধগম্য হয় না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, পুণ্য ভারতবর্ষে এক সময়ে চার্ব্বাক-দর্শন নামক নাস্তিক দর্শন প্রচলিত হইয়াছিল। চার্ব্বাক-দর্শন মতে "সুখমেব পুরুষার্থঃ"।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" ইত্যাদি।

মোটকথা এই দর্শনমতে দেহই আত্মা—দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী-সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উৎকৃষ্ট বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজনীয় নাই। চার্ব্বাকমতে পরলোক নাই, এইজন্য এই দর্শনের আর একটী নাম "লোকায়ত" দর্শন। চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণ বলেন, যদি পরলোক গমনের পর আত্মার দেহান্তর প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, তবে স্বজনস্নেহে মৃতব্যক্তির আত্মা কেন পূর্ব্বদেহে প্রবেশ করে না? ইঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডও মানেন না—বলেন, এসব কেবল লোককে প্রতারিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের উদরান্নের সংগ্রহচেষ্টা মাত্র।

প্রমাণ স্বরূপে ইঁহারা বলেন, যদি যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তবে যজমান কেন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতাকে যজ্ঞে বিনাশ করেন না? তাহা হইলে'ত পিতামাতার অনায়াসে স্বর্গলাভ হইত, আর তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে বৃথা শ্রাদ্ধাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। আর যাগযজ্ঞ করিয়াও স্বর্গ লাভ হয় না, ইন্দ্র বহু যজ্ঞ করিয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সম্বিৎ ভক্ষণ করেন। এরূপ ইন্দ্র অপেক্ষা পত্রভোজী পশুও বড়। ইত্যাদি—

অনেকে বলেন, বৃহস্পতি এই দর্শনের প্রণয়ন করেন, পরে চার্ব্বাক ও তৎশিষ্যগণ বৃহস্পতির মত প্রচার করেন। বৃহস্পতি-প্রণীত বলিয়া এই দর্শনের আর একটী নাম "বার্হস্পত্য"। এই বৃহস্পতি যে কে ছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে পদ্ম-পুরাণ মতে, অসুরগণকে ছলনা করিবার নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিই এই বেদ-বিপরীত মত প্রচার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণেও এই রূপ মত আছে দেখা যায়। ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের উপকারার্থ নিজ দেহ হইতে মায়ামোহের সৃষ্টি করেন। মায়ামোহধ্যানানুরত অসুরগণকে চার্ব্বাক মতানুযায়ী উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বেদবিহিত মার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যখন স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু নিজ দেহোদ্ভূত মায়ামোহ দ্বারা নাস্তিকমত প্রচার করিয়াছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি যে নাস্তিক দর্শন প্রণয়ন করিবেন তাহা বড় বিচিত্র নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত এই নাস্তিক দর্শনের প্রচার হয়?—বিষ্ণু ও পদ্মপুরাণ বলেন, বলদৃপ্ত অসুরগণ বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করায় প্রভূত শক্তিশালী হইয়া দেবগণের ত্রাস উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে হীনবল করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই অসুরগণ তমোগুণী মানব ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী নহে। ইহারা কৃচ্ছ্র তপস্যাদি দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত এবং আপনাদিগকে এই জগতের কর্ত্তা ভোক্তা এইরূপ মনে করিত। ইহলোকে ঐশ্বর্য্যাদি ভোগ

ও বেদবিহিত যজ্ঞাদির ফলে পরলোকে স্বর্গসুখভোগ ইহারা জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিত। ইহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড বড় মানিত না, অথবা ইহাদের মুক্তিলাভের ইচ্ছাও ছিল না। তাই বলিয়া যে ইহাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল না তাহা নহে। যে বলিরাজ নিজ ভক্তি বলে ভগবান্‌কে দ্বারী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও একজন অসুর। তবে অধিকাংশ অসুরই ভোগ সুখের জন্য লালায়িত ছিল। ইহারা বেদের জ্ঞানকাণ্ড না হয় মানিত না, কিন্তু বেদবিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর ত ইহাদের আস্থা ছিল; সুতরাং ইহারা যে অত্যন্ত ধর্ম্মদ্বেষী ছিল বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রশ্রয় দিত, একথা বলা চলে না। তবে কেন দেবগুরু ইহাদিগকে নাস্তিক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? ইহাদিগের অপরাধ এই যে, পার্থিব সুখসম্পদ্ ভোগের জন্য ইহারা সদা লালায়িত ও যত্নবান্ ছিল। কিন্তু এই অপরাধের জন্য কি তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ না দেখাইয়া অধর্ম্ম পথে আনিতে হইবে? অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে, অন্যান্য মানবগণও ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া মুক্তিমার্গের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া পার্থিব ভোগসুখের জন্য যত্নবান্ হইয়াছিল, সুতরাং বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে উপেক্ষা করিয়া কর্ম্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিতেছিল। কিন্তু সেইজন্য যে দেবগুরু বৃহস্পতির মত লোক তাহাদিগকে বিনাশের পথে প্রেরণ করিবেন, ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তিনি যদি অন্য মত ভ্রান্ত মনে করিয়া নাস্তিক মত প্রচার করিতেন তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারিত না; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সুরগণের মঙ্গলের জন্য অসুরগণকে ছলনা করিতে তিনি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জানিতেন যে তৎপ্রচারিত নাস্তিক মত ভ্রান্ত এবং সত্যের উপর স্থাপিত নহে।

কিন্তু এরূপ মনে করিলে বৃহস্পতির উপর কলঙ্ক আরোপ করা হয়। ভাল লোকে কখনও কাহারও মন্দ করেন না, তাঁহারা সকলের মঙ্গল সাধনে সর্ত্তত প্রয়াসী। সুতরাং বোধ হয় দেবগুরুর

নাস্তিক মত প্রচারের অন্য মহদুদ্দেশ্য ছিল। তিনি দেখিলেন যে, মানবগণ ভোগসুখপরায়ণ হওয়াতে অনন্যলক্ষ্য হইয়া সতত বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্যের ভয়ে ইচ্ছামত বাসনা তৃপ্তি করিতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে বারম্বার জন্মমৃত্যুর হস্তে নিপতিত হইতেছে। জীব স্বরূপতঃ শিব। কেবল বাসনা বশে আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। এই বাসনারূপ পর্দা অন্তর্হিত হইলে জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। যদি জীব ভোগের দ্বারা সত্বর বাসনা ক্ষয় করিতে পারে, তাহা হইলে বিবেক উদয়ে তাহার স্বরূপজ্ঞান লাভে অধিক বিলম্ব হয় না। অন্তরে বাসনা রহিয়াছে, কিন্তু ভয়ে ভোগ করিতে পারিতেছে না, এরূপ মানবগণের কল্যাণার্থই বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "কেন বৃথা স্বর্গ নরকাদির ভয় করিতেছ? ওসব কিছুই নাই, তুমি ইচ্ছামত মনের বাসনা মিটাইয়া ফেল।" জীব এই আশ্বাস পাইয়া বাসনা পরিতৃপ্তি করিতে অগ্রসর হইল। তাহারা বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করায় দেবগণেরও ভয় গেল, এবং তাহাদেরও মুক্তির পথ নিকট হইল; কেননা ভোগাবসানে চৈতন্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী। মানবগণ নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী না হইলে, তাহাদিগকে প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়া নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করিতে হয়, আর যাহাতে সত্বর ভোগবাসনা ক্ষয় হয় তাহার জন্য বাসনা তৃপ্তির অন্তরায় যে ভয় তাহাও দূর করিয়া দিতে হয়। অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, ভোগের দ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। তাঁহারা বলেন,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"--গীতা।

কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যেহেতু যে বস্তু অনন্ত নহে, একদিন না একদিন তাহার অবসান হইবেই হইবে। জগতে এক ভগবান্ ব্যতীত আর কিছু অনন্ত হইতে পারে না। অতএব বাসনা সান্ত হওয়ায় ভোগের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব নহে। আর

ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলে জীবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না।

চার্ব্বাক-দর্শনের এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কিনা বিচার করিতে হইলে ইহার অনুকূল কোন নজীর আছে কিনা দেখিতে হয়। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সুললিত মধুর কথায় পৃথিবীতে আবহমানকাল প্রচলিত সমুদয় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর ঠিক এই মত সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন কিনা জানা নাই, তবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একবার এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিবস শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলেন, "মহাশয় আমার মনে হয়, যখন আমার জন্মাবার আগে আমার গুরু জন্মিয়াছেন, তখন আর ভয় বা ভাবনা কি।" তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "এর পারে আর গাঁ নাই; যে যার এমন বিশ্বাস তার বেতালে পা পড়ে না"। এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু চিন্তান্বিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার ত এখনও খুব বেতালে পা পড়ে, তাহা হইলে আমার কি গুরুতে বিশ্বাস হয় নাই?" শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশ বাবুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তবে কি জানিস, এমন অবস্থায় গুরু বলেন—"শীঘ্র খেয়েলে, পরেলে, সব বাসনা মিটিয়েলে।" শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার বোধ হয় তাৎপর্য্য এই যে, ঠিক্ ঠিক্ শ্রীগুরুতে বিশ্বাস হইলে শিষ্যের চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু যতক্ষণ শিষ্যের বাসনা থাকে ততক্ষণ গুরুর প্রতি ঠিক বিশ্বাস হয় না সুতরাং সম্যক চৈতন্যলাভও হয় না। শিষ্য বিবেক সাহায্যে যদি বাসনা দমন করিতে না পারে, তবে গুরু তাঁহাকে ভোগের দ্বারা সত্বর বাসনা মিটাইয়া লইতে বলেন। শিষ্য গুরুবাক্যে নির্ভয়ে বাসনা মিটাইয়া সত্বর চৈতন্য লাভের অধিকারী হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার এইরূপ অর্থ হইলে ইহা বৃহস্পতির মতের পোষকতা করে।

রাজা অজাতশত্রুর শান্তিলাভ।

(পালি হইতে)

(শ্রীগোকুল দাস দে, এম-এ)

মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্বের শেষ ভাগে একবার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হন। বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রাজ্য গ্রহণে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে রাজ্যদান করিয়া নির্জ্জনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অজাতশত্রু স্বীয় গুরু দেবদত্তের পরামর্শে সেই স্থলেই তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। পরে আপনার একটী পুত্রের জন্ম হইলে পিতৃ-স্নেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া সেই দিনই পিতাকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিম্বিসার উহার অল্প পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তাহা জানিয়া আপন মাতা বাসবীদেবীর নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার নিকট পিতার তৎপ্রতি অসীম ভালবাসার কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই স্বীয় মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহপরায়ণা বিমাতা কোশলদেবী পতির শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুদেব দেবদত্তেরও অধঃপতন হইল। অজাতশত্রু আর শোকা-বেগ দমন করিতে না পারিয়া উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। রাজবৈদ্য জীবকের অতুলনীয় চিকিৎসায় তাঁহার শিরোরোগ উপশম হইল বটে কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তিনি বহুরাত্রি বিনিদ্র হইয়া শান্তিলাভের জন্য বিশিষ্ট সাধু দর্শন করিয়া কাটাইতেন। কিন্তু উহাতেও শান্তি না পাইয়া সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় মর্ম্মন্তুদ যাতনা অনুভব করিতেন। পাছে তিনি হঠাৎ রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া নিরুদ্দেশ হন এই ভয়ে অমাত্যবর্গ সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। জীবক অধিকাংশ

সময় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার উপর 'সর্ব্বভূতহিতেরত' ভগবান্ তথাগতের কৃপাদৃষ্টি পড়িল।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। পূর্ণচন্দ্রিকার রজতশুভ্র অঞ্চলাবরণে প্রকৃতি হাস্যময়ী। বর্ষার খরস্রোতা নদী আবেগে রাজগৃহ ধৌত করিয়া জাহ্নবী-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। দূর হইতে সেই কলু কলু ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; ক্বচিৎ দুরন্ত শৃগাল কুক্কুরের রব ব্যতীত জগৎ নিস্তব্ধ ও সুপ্ত। কেবল অজাতশত্রুর নিদ্রা নাই। তাই তিনি অমাত্যবৃন্দ ও জীবকের সহিত প্রাসাদের মুক্ত ছাদে উপবেশন করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে-ছিলেন; সহসা তাঁহার প্রাণে মঙ্গলময়ের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর রাত্রি! এখানে এমন কে আছে যে আমাকে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট লইয়া গিয়া আমার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে?" উপস্থিত সকলে একে একে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, পূর্ণ কাশ্যপের নিকট চলুন, তিনি আপনার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবেন। কেহ বলিলেন, মহারাজ, মস্করী গোশালের নিকট চলুন, আপনি শান্তি পাইবেন।" এইরূপে সকলে নিগ্রন্থ নাতপুত্র, সঞ্জয়, অজিত কেশকম্বলী ও ককুধ কাত্যায়নের নাম করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন যে, ইতি পূর্ব্বেই তিনি উক্ত ছয়জন মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তখন জীবক বিনয় সহকারে বলিলেন, "মহারাজ, ভগবান্ তথাগত এক্ষণে আম্রকাননে অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন চলুন, তিনি আপনার পিপাসা নিবৃত্তি করিবেন।" অজাতশত্রু ইতিপূর্ব্বে বহু সাধু দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগতের নিকট যাইবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনি দেবদত্তের পরামর্শে তাঁহার অতি প্রিয় শিষ্য বিম্বিসারের মৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার নিজের প্রাণ বিনাশার্থ দস্যু প্রেরণ করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছেন। উহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে বিভীষিকা উৎপাদন

করিত। তথাগত যে তাঁহার ঘাতকের উপরেও ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? তাই তিনি জীবককে বলিলেন; "জীবক, আমি তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি ত ক্রুদ্ধ হইবেন না?", জীবক বলিলেন, "মহারাজ, সেই সর্ব্ববন্ধন-বিমুক্ত, 'সর্ব্বভূতহিতেরত' ঋষিকুলতিলক তথাগতকে অদ্যাবধি স্বয়ং মার পর্য্যন্ত রুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি তাহারও মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন।" এই কথা শুনিয়া রাজা অজাতশত্রু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, "জীবক, বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমি এখনি যাত্রা করিব।" অতঃপর সেই কৌমুদীপ্লাবিত নিস্তব্ধ নিশীথে জীবক ও কয়েকটী মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে রাজা ভগবৎউদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে ভগবান্ তখন পর্য্যন্তও সংঘকে ধর্ম্মোপদেশ দান সমাপ্ত করেন নাই এবং ঐ সময়ে ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মের গভীরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম্ম মহাসমুদ্রের ন্যায় যে আটটী বিশেষ গুণসম্পন্ন তাহা শ্রবণ কর। (১) মহাসমুদ্র যেরূপ ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে, সেইরূপ এই ধর্ম্ম সামান্য নীতি হইতে আরম্ভ করিয়া দুরবগাহ নির্ব্বাণে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) সমুদ্র যেরূপ স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়া কখনও বেলা অতিক্রম করে না, সেইরূপ এই ধর্ম্মস্থিত কোন উপাসক বা ভিক্ষু প্রাণান্তেও অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। (৩) সমুদ্রে যেরূপ কোন মৃত জন্তু থাকিতে পারে না, তাহা ভাসমান হইয়া তীরে আনীত হয়, সেইরূপ এই ধর্ম্মে শ্রমণ নামধারী কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি গুপ্ত থাকিতে পারে না, শীঘ্রই দৃষ্ট হইয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত হয়। (৪) গঙ্গা যমুনা, সরযূ প্রভৃতি নদীসকল যেরূপ সমুদ্রে পড়িয়া আপনাদের নাম-রূপ বর্জ্জন করে সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে যে কেহ এই ধর্ম্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে একমাত্র 'শাক্যপুত্র শ্রমণ' নামে অভিহিত হইয়া তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব নাম ও গোত্র ত্যাগ করে। (৫) পৃথিবীর

সমস্ত নদী এবং বারিধারা সমুদ্রে পতিত হইলেও তাহার বারিরাশির যেরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ বহু ভিক্ষু এই ধর্ম্মে নির্ব্বাণ লাভ করিলেও সেই অপ্রমেয় নির্ব্বাণের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। (৬) যেরূপ এই বিশাল সমুদ্রের সর্ব্বত্রই এক লবণাম্বুর আস্বাদ, সেইরূপ এই ধর্ম্মের সকল অংশেই একমাত্র সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তির আনন্দ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। (৭) যেরূপ সমুদ্রে সর্ব্ববিধ রত্ন জন্মে, সেইরূপ এই ধর্ম্মও দয়া, দাক্ষিণ্য, তেজ, বীর্য্য, বল, আয়ু প্রভৃতি বহুবিধ অমূল্য রত্ন প্রসব করে। (৮) যেরূপ সমুদ্রে তিমি, তিমিঙ্গল, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি মহা মহা প্রাণিসকল বাস করে, সেইরূপ এই ধর্ম্মে অতি নিম্ন অবস্থার ব্যক্তি হইতে দেবমানবের শীর্ষস্থানীয় অর্হৎগণ পর্য্যন্তও বিরাজ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন বলিয়া আর্য্য-সন্তানেগণ ধর্ম্মাচরণে এত আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।" ভগবান্ ধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিতেছেন ও সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুসংঘ তাহা আকণ্ঠ পান করিতেছেন। সেই নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ জনমণ্ডলী মধ্যে একটু মাত্র শব্দ নাই। সেই ব্রতপরায়ণ সংযত ভিক্ষুগণ হিমাদ্রির ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; দেহকম্পন বা অঙ্গচালন-জনিত বিন্দুমাত্র শব্দও শ্রুত হইতেছে না। কেবল প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা-শ্রেণী দূর হইতে তাঁহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অজাতশত্রু জীবকের আম্রবন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দীনভাবে তথাগতের নিকট যাইবেন বলিয়া অনুচরবর্গকে দূরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ত বনের নিকটে আসিলাম, আর কতদূর যাইতে হইবে?" জীবক বলিলেন, "মহারাজ, আর দূর নাই, ওই অদূরে আলো জ্বলিতেছে, ভগবান্ সংঘকে উপদেশ দিতেছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানে কতগুলি ব্যক্তি আছেন? জীবক বলিলেন, প্রায় পাঁচ শত হইবে। এই কথায় রাজা যেন ভয়চকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! পাঁচশত ব্যক্তি এখানে একত্র রহিয়াছে আর তাহাদের কোন সাড়াশব্দ নাই! তুমি ত আমায়

কোন শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিবে না?" জীবক উত্তর করিলেন, "মহারাজ, এ দাস বোধ হয় অদ্যাবধি কখনও আপনার কোনরূপ সন্দেহভাজন হয় নাই। ভিক্ষুদিগের কথোপকথন ও কার্য্য অতি শান্ত ভাবেই পরিচালিত হয়। আপনি উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন। আর বিলম্ব করিবেন না। তথাগতের বিশ্রামের সময় উপস্থিত।" অনন্তর উভয়েই ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনাদি করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ-সান্নিধ্যের অদ্ভুত মোহিনীশক্তিতে অজাতশত্রুর প্রাণ কিছু সান্ত্বনালাভ করিল। কারণ, তিনি উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "অহো, এই ত্যাগী যতিদিগের কি শান্ত ও সৌম্য ভাব! আমার ইচ্ছা যেন আমার পুত্র উদায়ীকুমার বড় হইয়া এইরূপ শান্তশিষ্ট হয়।" ভগবান্ অজাতশত্রুকে অত্যন্ত পুত্রবৎসল জানিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অজাতশত্রুও ভগবানের কুশল সংবাদ পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, একটী গুরুতর সমস্যা আমার মনে উঠিয়াছে। আমি বহু শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" ভগবান্ অনুমতি প্রদান করিলে রাজা বলিলেন, "মহাশয়, ইহজগতে প্রব্রজ্যার ফল কি? সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, শিল্পীরা স্ব স্ব শিল্পের দ্বারা আপন আপন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। শ্রামণ্যের এইরূপ প্রত্যক্ষ কোন ফল দেখাইতে পারেন কি?" উত্তরে ভগবান্ শ্রামণ্যের বহুধা ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন; উহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। ঐ যে ভিক্ষু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শীতকালের রাত্রে মুক্তস্থানে বসিয়া ধ্যানসুখ অনুভব করিতেছেন, তিনি কি সেই শ্রেষ্ঠী, যিনি সুরম্য হর্ম্ম্যের রুদ্ধকক্ষে দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় চারিটী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা-

পেক্ষা অধিক সুখী নন? নিশ্চয়ই অধিক সুখী। ইহাই প্রথম ফল।'

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন দাস, দরিদ্র, কৃষক বা ব্যবসায়ী নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হন তাহা হইলে রাজা কি তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবসায় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিবেন অথবা উপাসকের ন্যায় তাঁহাদিগের সম্মুখে মস্তক অবনত করিবেন? এই শ্রেষ্ঠ পদবী লাভই শ্রামণ্যের দ্বিতীয় ফল।

তৃতীয়তঃ, যখন শ্রমণগণ ধ্যান ধারণাদি দ্বারা চিত্তবিকার দূর করিয়া আপনাদের দেহমন লঘু করিয়া ফেলেন তখন তাঁহাদের কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়, যথা, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ইচ্ছা-মৃত্যু, সর্ব্বত্র গমনাগমন প্রভৃতি। ইহাই তৃতীয় ফল।

কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন আর্য্যসন্তানগণ উহাতে বিচলিত হইবেন না। কারণ, শ্রামণ্যের সহিত উক্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যগুলি জড়িত থাকিলেও ঐগুলি মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রার্থনীয় নহে, উহারা আগন্তুক ফল মাত্র।

ইহার চতুর্থ ও প্রধান উদ্দেশ্য জন্ম-জরা-মরণরূপ মহাদুঃখস্কন্ধের বিনাশ সাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ। এই দুঃখের আদি কারণ অবিদ্যা এবং উপস্থিত কারণ তৃষ্ণা বা ভোগবাসনা। অবিদ্যা হইতে ভোগবাসনার উৎপত্তি হইয়া জীবকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করাইয়া অশেষবিধ দুঃখ দিতেছে। সংসার ত্যাগ করিলে সেই অবিদ্যাবিনাশী সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয়, অন্যথা নহে। সেই জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপুসমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় বাসনার নাশ হয়। ভিক্ষু তখন জন্ম-জরা-মরণ অতিক্রম করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং নির্ব্বাণসুখ অনুভব করেন। ইহাই শ্রামণ্যের একমাত্র মুখ্য ফল।

এই বলিয়া ভগবান্ সেই রাত্রের কথাপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলেন। তখন রাজা অজাতশত্রু আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য আমার চৈতন্য হইল। অন্ধ ব্যক্তি চক্ষুলাভ করিলে তাহার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও সেইরূপ

আনন্দ হইতেছে। ভগবন্, আমি শান্তি লাভ করিয়াছি। আমি পিতার মৃত্যুর কারণ হওয়ায় এতদিন হৃদয়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহা দূর হইয়াছে।" ভগবান্ বলিলেন, "মহারাজ, পিতার মৃত্যুতে আপনি যে নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আপনি আর উদ্বিগ্ন হইবেন না; অতঃপর ধর্ম্মের রাজত্ব করিয়া প্রজা পালন করুন।"

রাজা তখন ভগবান্‌কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমাকে আপনার উপাসক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।" ভগবান্ উহা স্বীকার করিলেন। তখন জীবক ভগবান্‌কে অভিবাদনাদি করিয়া রাজার সহিত প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে অজাতশত্রু এক কৌমুদীপ্লাবিত নিস্তব্ধ নিশীথে জীবনে অদম্য উৎসাহ ও শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন, "আহা, এই ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ যদি পিতৃমৃত্যুর ভাগী না হইতেন তাহা হইলে এইখানেই নিষ্পাপ অর্হত্ব লাভ করিতে পারিতেন।" ইহা অজাতশত্রুর পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে। কারণ, ইহা তাঁহাকে জগতের সমক্ষে পিতৃহত্যার পাতকে সাক্ষাৎ লিপ্ত থাকার অপরাধ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল। তিনি স্বীয় পিতাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিলে কখনই ধর্ম্মকায় তথাগত তাঁহাকে 'ধর্ম্মরাজ' ও 'ধার্ম্মিক' উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না; এবং বোধ হয় তিনিও ইহজীবনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(৩৬)

দুষ্ট সঙ্গ বর্জ্জন।

জ্ঞানী হইলেও দুষ্টের সঙ্গ করিবে না।

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং কচিৎ।

শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে না। উর্ব্বশীর মোহে পড়িয়া ঐল রাজার দুর্গতি এই প্রসঙ্গে ভগবান্ বর্ণন করিলেন।

ঐল গাথা।

ঐল রাজার গাথা আছে।

বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।

কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্॥

নারী যার মন হরণ করিয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্যা, ত্যাগ, শ্রুত, বিজনবাস, মৌন এ সবে কি হবে?

স্ত্রীলোক ও স্ত্রৈণের সঙ্গ করিবে না।

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।

বিদুষাঞ্চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্॥

অতএব অবলোকন দ্বারাও স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রৈণের সঙ্গ করা উচিত নহে। বিদ্বান্‌দেরও ষড়বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন মাদৃশ অবিবেকীদের কথা আর কি বলিব?

কামুকের সাধুসঙ্গ পরম ঔষধ।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সাধুরা উপদেশ দ্বারা কামীর মনব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন।

(৩৭)

সাধু সঙ্গের ফল।

উপদেশ শ্রবণে ভক্তি লাভ হয়।

তা যে শৃন্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।

মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

সাধুদের উপদেশ যাহারা শুনে, গান করে এবং আদরের সহিত অনুমোদন করে তাহারা মৎপর এবং শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তি লাভ করে।

সাধুসেবা দ্বারা অজ্ঞান নাশ।

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।

শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

যে ভগবান্ অগ্নিকে সেবা করে তাহার শীত, ভয়, তম নাশ হয়। সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তাহার জাড্য, সংসারভয় ও অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়।

সাধু সংসারতরণে নৌকা।

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।

সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥

এই ঘোর ভবসাগরে যাহারা অনবরত ভাসিতেছে ডুবিতেছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মবিৎ শান্ত সাধুরা পরম আশ্রয়—যেরূপ জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে দৃঢ় নৌকা।

সাধু একমাত্র শরণ।

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাম্ শরণম্ ত্বহম্।

ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্বিভ্যতোঽরণম্॥

প্রাণীদের অন্নই যেমন প্রাণ, আর্ত্তদের আমি যেমন শরণ, ধর্ম্ম যেরূপ মানুষের পরলোকের বিত্ত, সেইরূপ সাধু সংসারপতনভীত জনের শরণ।

সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন।

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।

দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

সূর্য্য উদিত হইলে বহির্বস্তুর চক্ষুস্বরূপ হন বটে কিন্তু সাধু অন্তশ্চক্ষু দান করেন। সাধু দেবতা এবং বান্ধব। সাধু আত্মা এবং ভগবান্।

(৩৮)

ক্রিয়াযোগ।

পূজার স্থান।

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া।

প্রতিমাতে, পৃথ্বীতে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে, হৃদয়ে, দ্বিজ ভক্তির সহিত দ্রব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুস্বরূপ ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিবে।

অষ্টবিধ প্রতিমা।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শিলাময়ী, দারুময়ী সুবর্ণময়ী, মৃচ্চন্দনময়ী, চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা।

ভক্তের পূজায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই—কেবল ভাব চাই।

ভক্তস্য চ যথালব্ধৈঃ হৃদি ভাবেন চৈবহি।

ভক্তের পূজা যথালব্ধ দ্রব্য দ্বারা এবং হৃদয়ের ভাব দ্বারা হইয়া থাকে।

ভক্তের পূজা ও অভক্তের পূজা।

শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।

ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সামান্য জলগণ্ডূষও আমার প্রিয়। আর অভক্তের ভূরি দ্রব্যেতে আমার পরিতোষ হয় না।

পূজার প্রণালী, বেদ ও তন্ত্র।

উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে।

বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভুক্তি ও মুক্তি সিদ্ধির জন্য আমার পূজা করিবে।

(৩৯)

প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না।

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ॥

অপরের স্বভাব ও কর্ম্ম ভাল হউক বা মন্দ হউক নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না।

কারণ অবস্তু।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

দ্বৈত যখন অবস্তু, তখন তার ভদ্রই বা কি, আর অভদ্রই বা কি? তার কতটা ভদ্র, আর কতটাই বা অভদ্র?

অর্থকারী বলিয়া সত্য নহে।

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।

এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥

প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি এবং আভাস (যেমন শুক্তিতে রজতাভাস) যদিচ অবস্তু কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাদি বস্তু যদিচ অসৎ তথাপি মৃত্যু অবধি ভয় দিতেছে।

বিদ্বানের আচরণ।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।

বিদ্বান্ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না—সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে বিবরণ করেন।

(৪০)

সংসার আধ্যাসিক।

উদ্ধব প্রশ্ন করেন—দেহ দৃশ্য, জড় আত্মা দ্রষ্টা, চৈতন্য। দেহ দারুবৎ আত্মা অগ্নিবৎ। এই সংসার জড় দেহের হইতে পারে না, কারণ, নিদ্রাবস্থায় সংসার থাকে না। এই সংসার চৈতন্য আত্মার হইতে পারে না, কারণ, তুরীয় অবস্থায় সংসার থাকে না। তবে এই সংসার কাহার? ভগবান্ বুঝাইলেন, কেবল দেহের সংসার নহে বা কেবল চৈতন্যের সংসার নহে কিন্তু উভয়ের মিলনে সংসার।

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ।

দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখনই সংসার দেখা যায়। এই সংসার মিথ্যা হইলেও অবিবেকীর নিকট স্ফূর্ত্তি হয়।

(৪১)

বিচার।

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥

(১) দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্থিব।

(২) ইন্দ্রিয়, দেবতা, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কৃতি আত্মা নহে কারণ, ইহারা অন্নময়।

(৩) বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পৃথ্বী, আত্মা নহে, কারণ ইহারা জড়।

(৪) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও প্রকৃতি আত্মা নহে, কারণ ইহারাও জড়।

(৪২)

বিঘ্নের প্রতিকার।

(ক) কালের প্রতীকার।

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নাম সংকীর্ত্তনাদিভিঃ।

কামাদি বিঘ্ন আমার অনুধ্যান ও নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নাশ করিবে।

(খ) দম্ভমানের প্রতিকার।

যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ।

যোগেশ্বরদের সেবা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ দম্ভমানাদি অন্যান্য অশুভপ্রদ বিঘ্ন নাশ করিবে।

দেহসিদ্ধি ।

কেহ কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহসিদ্ধির জন্য যত্ন করে কিন্তু উহা ব্যর্থ। [দেহসিদ্ধি—অর্থাৎ দেহ সবল, সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে ।]

অন্তবত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥

বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী—শরীর ফলবৎ নশ্বর ।

(৪৩)

হংসগণের আশ্রয় ।

উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন ।

হে অরবিন্দলোচন ! যাঁহারা হংস অর্থাৎ সারাসার বিবেক-চতুর তাঁহারা কেবল তোমার আনন্দপরিপূরক পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন—তাঁহারা আর কিছু চান না। তোমার উপকার একবার যে জানিয়াছে সে আর তোমাকে ভুলিতে পারে না।

ভগবান্ই দ্বিবিধ গুরু—আচার্য্য ও অন্তর্য্যামী ।

যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ।

তুমি বাহিরে আচার্য্যশরীরে গুরুরূপে, অন্তরে চৈত্ত্যশরীরে অন্তর্যামীরূপে অশুভ বিষয় বাসনা নাশ করিয়া নিজ অনুরূপ গতি দান কর ।

(৪৪)

ভগবান্ লাভের সহজ উপায় ।

ভগবান্ কতকগুলি সহজ উপায় বলিলেন,

(১) পুণ্য দেশাশ্রয় ।

(২) ভক্তসঙ্গ ।

(৩) ভগবানের পর্ব্ব, যাত্রা, মহোৎসবাদি অনুষ্ঠান ।

(৪) সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ।

ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কেস্ফুলিঙ্গকে ।

অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, চোর দাতায়, অর্ক বিস্ফুলিঙ্গে, শান্ত ক্রূরে যে সম দৃক অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে, সেই পণ্ডিত।

(৫) কায়, মন, বাক্য দ্বারা সর্ব্বভূতের সেবা।

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবোনোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ।

যে অবধি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে অবধি সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞানে বাক্য, মন ও কায় দ্বারা সেবা করিবে।

কর্ম্মত্যাগ কখন?—যখন সব জিনিষে ব্রহ্ম দেখিবে।

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতঃ মুক্তসংশয়ঃ॥

সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনরূপ বিদ্যা দ্বারা এইরূপ উপাসকের নিকট সমস্ত ব্রহ্মাত্মক বোধ হয়। তখন তিনি নিঃসংশয় হন। তখন তাঁহার আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ।

এষাবুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥

নশ্বর মনুষ্য দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্যস্বরূপ অমৃতস্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি—তাহাই মনীষীদের মনীষা অর্থাৎ চাতুর্য্য।

(৪৫)

উদ্ধবের অচলা ভক্তি প্রার্থনা।

উদ্ধবের ভগবানই চতুর্বর্গ।

ভগবান্ বলিলেন,

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থঃ নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ।

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি,

কৃষ্যাদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু উদ্ধব, আমিই তোমার এই সমস্ত ফল।

উদ্ধবের প্রার্থনা।

ভগবান্ এইরূপ যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব প্রীতিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কেবল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দে শিরঃ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা আমার বিজ্ঞানময় প্রদীপ অপহরণ করিয়াছিলে, আবার কৃপা করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিলে। সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য যদুকুলে আমার স্নেহপাশ প্রসারিত করিয়াছিলে, আবার আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিলে।"

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃস্যাদনপায়িনী।

হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমার শরণাগত। এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা অহেতুকী ভক্তি হয়।

(৪৬)

উদ্ধবকে বদরিকাশ্রম যাইতে আজ্ঞা।

ভগবান্ বলিলেন,

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।

হে উদ্ধব! যদিও তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার কোন সাধনাপেক্ষা নাই, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি বদরীকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাও।

ভর্ত্তৃপাদুকাশিরে উদ্ধবের প্রস্থান।

সুহৃদ্দুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ॥

সুদুস্ত্যজ স্নেহবিয়োগকাতর উদ্ধব তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়ায় তাঁহার খুব

কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কৃপাপ্রদত্ত ভর্তৃপাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া চলিলেন।

ওঁ তৎসৎ ॥

সমাপ্ত)

স্বপ্নতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার)

মানসিক ভ্রম দ্বারাও যে ছায়া দর্শন হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ জনৈক ইংরাজ মহিলার ছায়া দর্শনের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন,—"আমি বসিবার ঘরের আলো সরাইয়া শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ আমার ভ্রাতার ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমি এই ঘটনায় এত বিস্মিত হইয়া গেলাম যে আলোটি আর সরাইতে পারিলাম না—স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রাতার ছায়ামূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ক্রমশঃ উহা আমার চক্ষুর সম্মুখে মিলাইয়া গেল। আমি এই দৃশ্যের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। অতঃপর পুনরায় আলোক সরাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম নীচের জানালায় কে টোকা দিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিতে-ছেন—"আমি তোমায় ডাক্‌ছি, কোন ভয় পাইও না।" তারপর আমি তাঁহাকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইলে তিনি বলিলেন, "তুমি ত বেশ সাহসী দেখিতেছি আমি মনে করিয়াছিলাম, জানা-লায় টোকা দেওয়ায় তুমি ভয় পাইবে।"

আমার ভ্রাতা কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লণ্ডন হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার

বাড়ীর নিকটে আসিয়া তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষে অন্ধকারে আমার বাড়ীর পিছতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন"।

ছায়াদর্শন সম্বন্ধে এই যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইল, ইহাতে দুইটি বিশেষত্ব আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলিতে নাই। সে দুইটি বিশেষত্ব এই ;—

(১) এই কল্পিত-দর্শনের সহিত বহির্জগতের একটি সত্য ঘটনার সম্বন্ধ আছে।

(২) কিন্তু এই ঘটনাটি কল্পিত-দর্শনের সময় সাধারণ ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, ঐ কল্পিত-দর্শন বহির্জগতের কোন বাস্তব ঘটনা প্রসূত ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে উদ্ভূত নহে। এই বিশেষত্ব দুইটি অধিকাংশ কল্পিত-দর্শনের মধ্যে দেখা যাইবে। পূর্ব্বের ঘটনাটি জীবিত ও জাগ্রত ব্যক্তির কল্পিত ছায়া-দর্শন সম্বন্ধে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে। নিম্নে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে—

গটস্‌চক (Mr Gottschalk) তাহার বন্ধু থর্প (Thorpe) কে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবে তাহার অভিনয় হইবে? থর্প থিয়েটারে অভিনয় করিতেন। গটস্‌চক তাহার অভিনয় শুনিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। প্রিন্স থিয়েটারে এই পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গটস্‌চক বলিতেছেন, "সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়াছি। এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুখে একটি আলোক চক্র দেখিতে পাইলাম। চক্ষুর সম্মুখে অন্যান্য জিনিস যাহা দেখিতেছিলাম, তাহাদের তুলনায় এই আলোক চক্র যেন বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। ইহা আমার চক্ষু হইতে কতদূরে অবস্থিত ছিল, তাহা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই আলোকিত স্থানের মধ্যে আমি দুইটি হস্ত দেখিলাম। এই হস্ত দুইটি একটি

চিঠির থাম (envelope) হইতে চিঠি বাহির করিতেছে। আমি আমার মনের মধ্যে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিলাম যে 'চিঠিখানি আমার লিখিত। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ আমার মনের মধ্যে উদয় হইল যে, হস্ত দুইটি থর্পের। এই বিশ্বাসটি এত দৃঢ়ভাবে উদিত হইল যে বাধা দেওয়া অসম্ভব।' কিন্তু ইহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থর্পের কোন কথাই মনে উদয় হয় নাই। এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যে স্তম্ভিত না হইয়া আগ্রহের সহিত আলোক মধ্যস্থ ছায়ামূর্ত্তিটি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। হস্ত দুইটির রং খুব সাদা বলিয়া বোধ হইল। হাতের কব্জি দুইটি অনাবৃত। বিশেষ একরূপ কুঞ্চিত পোষাকে কব্জির উপরিভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যটি এক মিনিটকাল আমার চক্ষুর সম্মুখে স্থায়ী হইয়াছিল। তাহার পর মিলাইয়া গেল। ঠিক এই সময় থর্প কি করিতেছিলেন তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটস্থ গ্যাসপোষ্টের নিকটে যাইয়া ঘড়ি খুলিয়া সময়টি দেখিয়া রাখিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে থর্পের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। পত্রখানি এইরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,—"বল দেখি, প্রিন্সেস্ থিয়েটারের তাকের উপরে একখানি খামের উপর নজর পড়িবামাত্রই কি করিয়া বুঝিলাম যে ঐ চিঠিখানি তোমার নিকট হইতে আসিয়াছে?"

গটসৃচকের সঙ্গে থর্পের কয়েকদিন পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল মাত্র। গটসৃচক থর্পকে আর কখন চিঠি লেখেন নাই, এমন কি, থর্প গটসৃচকের হাতের লেখাও কখন দেখেন নাই। তাকের উপর চিঠিখানি এরূপভাবে চাপা দেওয়া ছিল যে, থর্প চিঠির ঠিকানাও দেখিতে পান নাই।

এই ঘটনার তিন দিন পরে একজন বন্ধুর বাড়ীতে গটসৃচক এবং থর্পের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে থর্পের নিকট হইতে চিঠির এইরূপ বিবরণ জানা যায়।

তাকের উপর চিঠি দেখিয়াই থর্প কোনরূপে মনের ভিতর বুঝিতে পারিলেন যে, গটসৃচকের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে। সেদিন থর্পের থিয়েটারে আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ভাল করিয়া

ঐ পত্রখানি না পড়িয়াই তাড়াতাড়ি বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অভিনয় করিতে গেলেন। অভিনয় শেষ হইয়া গেলে গটস্‌চকের চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু গোলমালে চিঠিখানি কোথায় রাখিয়া দিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। চিঠিখানির জন্য সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন এবং না পাইয়া কিছু বিরক্তও হইলেন। শেষে তিনি অভিনয় করিবার জন্য যে পোষাক পরিয়াছিলেন, সেই পোষাকের জামার পকেটে এই চিঠিখানি পাওয়া গেল। অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার হাতে সাদা রং মাখিতে হইয়াছিল এবং এই অভিনয়ের পোষাকের হস্তের আস্তিন একরূপ বিশেষভাবে কুঞ্চিত ছিল। থর্পকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি ঠিক কোন সময়ে অভিনয়-পরিচ্ছদের পকেট হইতে চিঠিখানি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন, তখন থর্প বলিলেন, তাঁহার যতদূর অনুমান হয়, তখন ৮টা বাজিতে ১০ মিনিট ছিল। তখন গটস্‌চক পকেট হইতে নিজের ডায়েরী বাহির করিয়া তাহাদের দেখাইলেন, যে তিনি ঐ দিন সন্ধ্যার সময় কল্পিত দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সময় ৮টা বাজিতে ৯ মিনিট লেখা আছে।

নিম্নলিখিত ঘটনাটি, মনস্তত্ত্ব সভা বিশেষ অনুসন্ধান করিবার পর তাঁহাদের প্রকাশিত Census of Hallucination পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—দুই ভগ্নী উপাসনা করিবার জন্য গির্জ্জায় গিয়াছিলেন। তৃতীয় ভগ্নী বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারও গির্জ্জায় যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু লেখা পড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তথায় যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে উপাসনালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, তিনিও উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। এই স্থলে দুই জনের এক সঙ্গে কল্পিত দর্শন বিশেষ আশ্চর্য্যজনক।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি বৈদেশিক। আমাদের দেশেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমি শিক্ষা বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ পূর্ব্ববঙ্গবাসী কর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি।

যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন তিনি একটি বেসরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এক সময় কোন পর্ব্বোপলক্ষে তিনি অল্পদিনের ছুটী পাইলেন, এবং এই সময় তাঁহার পরিচিত জনৈক বৈষ্ণব সাধু তাঁহাকে কীর্ত্তনোৎসবে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার প্রকৃতিটি অতিশয় ভক্তিপ্রবণ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম ও কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ কাজ থাকায় ঐ অল্প দিনের ছুটীতে তাঁহার মহোৎসবে যোগ দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না, বাড়ীতেই যাইতে হইল। তিনি যখন বাটী হইতে ফিরিতেছিলেন তখন মহোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি যে স্থানে মহোৎসব হইয়া ছিল, সে স্থানটি রাস্তায় পড়ায় তাঁহার একবার সেই বৈষ্ণব সাধুটির সহিত দেখা করিবা যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সেই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন এবং সাধুর আশ্রমে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাধুটি তাঁহাকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পাশের ঘরে তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই দেখ—বাবু আসিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীপতি যেন একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং আগন্তুককে দেখিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি কখন আসিলেন ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক তাঁহার বন্ধুপুত্র এবং বিশেষ পরিচিত। পরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, দুইদিন পূর্ব্বে কীর্ত্তন শেষে মন্দির প্রদক্ষিণের সময় তিনি তাঁহাকে অপর এক ভদ্রলোকের সহিত মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। আরতি শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁহাদিগকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কোথায় গেলেন, প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না?" তখন শুনিলেন তাঁহারা আসেন নাই! তিনি স্পষ্ট তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়াছেন অথচ তাঁহারা যথার্থই আসেন নাই জানিয়া তিনি নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তদবধি দুইদিন সেই ভাবেই ছিলেন। এক্ষণে ভদ্রলোকটিকে দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।

এইরূপ ছায়াদর্শন সমূহ কখন কখন জীবনে গভীর দাগ রাখিয়া যায়। যে স্থলে এইরূপ কল্পিত-দর্শন মানসিক ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া

দেওয়া যায় না, সেইরূপ দর্শনের অস্তিত্ব বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, উপরে আমরা যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছি তাহাতে দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট ব্যক্তি উভয়েই জীবিত এবং জাগ্রত।

উপরে যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তির কল্পিত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে, তিনি যদি মৃত কিম্বা নিদ্রিত হইতেন তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিতাম যে, মৃত কিম্বা নিদ্রিত ব্যক্তি সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন জাগ্রত ব্যক্তির ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সূক্ষ্ম দেহের কথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কারণ, যদি এই সকল ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ জড়দেহ হইতে বহির্গত হইত তাহা হইলে তাহাদের চৈতন্যের লোপ হয় নাই কেন? যদি আমরা এরূপ অনুমান করি যে, আমাদের চৈতন্য সূক্ষ্মদেহে অবস্থিত নহে—জড়দেহে অবস্থিত, তাহা হইলে প্রেততত্ত্ব (Spiri tualism) আলোচনা কালে আমরা সূক্ষ্মদেহ প্রকাশের সঙ্গে যে চৈতন্যের লক্ষণ পাই তাঁহার কোনরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

জাগ্রতব্যক্তিদিগের ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের ঘটনা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করে তাহার সহিত দৃষ্ট ব্যক্তির যেন একরূপ মনের যোগ উপস্থিত হয় এবং এই মনের যোগ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দর্শকের মনে এক প্রকার দূরদর্শন শক্তির বিকাশ হইতে দেখা যায়। নিম্নে মনস্তত্ত্বসভার বিবরণ হইতে গৃহীত একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

কোন ভদ্রলোক খাইবার ঘরে তাঁহার মাতা, ভগ্নী এবং একজন স্ত্রী বন্ধু লইয়া সন্ধ্যার সময় বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহার স্ত্রী মভ (Mauve) রংএর পোষাক পরিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাহার স্ত্রীকে কিছু অগ্রসর হইয়া আনিবার জন্য চেয়ার হইতে উঠিলেন। উপস্থিত মহিলাগণ তাঁহার চেয়ার

হইতে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর আসিবার কথা বলিলেন। তাঁহারা কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই ভদ্রলোকটি তাঁহার স্ত্রীকে ঐ রংয়ের পোষাকে কখন দেখেন নাই। এমন কি, তাঁহার স্ত্রীর এই রংয়ের কোন পোষাক আছে তাহাও জানিতেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হওয়ায় ঐ মূর্ত্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী সেই সময় তাঁহার এক মহিলা বন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন, এবং স্বামী আসিয়া পৌঁছিলেন না বলিয়া বন্ধুটির নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। কারণ, সেদিন তথায় এক নৃত্য সভা ছিল, এবং তাহাতে তাঁহার স্বামীর আসিয়া বাজাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বামী বিশেষ কারণে লণ্ডন সহরে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তজ্জন্য তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

এই কল্পিত দর্শনের মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী এই সময়ে যে ঐ রংয়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, স্বামীর তাহা ছায়া দর্শনের দ্বারা উপলব্ধি হইয়াছিল।

ইজিপ্ট যুদ্ধে খার্টুম (Khartoum) নগরে যেদিন জেনারেল গর্ডন (General Gordon) নিহত হইয়াছিলেন তাহার পরের দিন প্রভাতেই সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী কায়রো নগরে (Cairo) সাধারণ লোকের মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত জানা ছিল যে, টেলিগ্রাফ দ্বারা এই সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের সময়ও এইরূপ যুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটিবার অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত, ইহা অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে শুধু যে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছিল তাহা নহে। প্রফেসর হিস্‌লপ তাঁহার একখানি পুস্তকে * এইরূপ অনেক যুদ্ধের ঘটনা অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন।

* Enigmas of Psychical Research, by James H. Hyslop. Vide—pages 96 to 105.

ব্যানকবার্ণ (Bannockburn) এর যুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড স্বাধীন হইয়াছিল। রবার্ট হোয়াইট (Robert white) এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের দিনই এবারডিন (Aber deen) সহরে একজন উজ্জ্বল বর্ম্মাবৃত নাইট (knight) আসিয়া ঐ সহরে যুদ্ধে স্কটদিগের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিল। পরে এবারডিনের লোকেরা কোন সাধু মহাত্মা এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া সেই সাধু মহাত্মার আত্মার কল্যাণার্থে এবারডিন সহরের গির্জ্জায় বাৎসরিক পাঁচ পাউণ্ড করিয়া দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, রয়টারের তারযোগেই সকল সংবাদ শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছে। সেই জন্য যুদ্ধের খবর পাইবার আকাঙ্ক্ষা কাহারও মনে বিশেষভাবে উদয় হয় নাই।

ছায়াদর্শনের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, ইহা যেন যান্ত্রিক ভাবে কার্য্য করে। ইহাতে যেন কোন একটি চিন্তা প্রেরকের মন হইতে উদ্ভূত হইয়া গ্রহীতার মনে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে যেন গ্রহীতার মনের মধ্যে একটি চিত্র সৃজিত হয়, যাহার জড়জগতে কোন সত্তা নাই। চিত্রের মধ্যে গ্রহীতা প্রেরকের ভাবের যেন কতকটা আভাস পায়। প্রেরকের চিন্তা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া একাধিক ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পাইয়াছে—এরূপ ঘটনাও দেখা যায়। যেমন, পূর্ব্বোল্লিখিত একটি দৃষ্টান্তে দুই ভগ্নীর তাঁহাদের তৃতীয় ভগ্নীর ছায়ামূর্ত্তি দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এবারডিনের যে নাইট যুদ্ধের সুসমাচার বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহাকেও যদি এইরূপ চিন্তার মূর্ত্তরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ঐ রূপও একাধিক ব্যক্তির দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক সময় প্রেরকের চিন্তা গ্রহীতার মনের মধ্যে মূর্ত্তরূপ ধারণ করে না। অস্পষ্টভাবেই আভাস দিয়া যায়।

জড়ের কোন সূত্র অবলম্বন না করিয়াই মন নিজের চিন্তা কোন গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিতে পারে, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের জড় দেহের কার্য্যের ভিতর দিয়া কোনরূপেই ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। কাজেই জড়াতীত চৈতন্যের অন্য কোনরূপ আধার হইতে ঈদৃশ কার্য্য হইতেছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য; অধিকন্তু মৃত্যুর পর চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই আধার বা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়।

হিন্দুদর্শন মতে, আমাদের জড়দেহে যেরূপ বাহ্যেন্দ্রিয় আছে, এই জড়দেহের মৃত্যুর পরও যাহার অস্তিত্ব থাকে সেই আধার বা সূক্ষ্মদেহের সেইরূপ কতকগুলি অন্তরেন্দ্রিয় আছে। বাহ্যেন্দ্রিয় বহির্জগতের যে সকল অনুভূতি আহরণ করে, তাহা এই সকল অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা মনোভূমিতে আনীত হয়। কখন কখন এই সব অন্তরেন্দ্রিয় জড় দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। ছায়াদর্শন তাহার একটি প্রমাণ। স্বপ্নের মধ্যেও এই অন্তরেন্দ্রিয় সকল কোন কোন সময়ে জড়দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য্য করে।

যদি আমরা ঐরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, তাহা হইলে দেহবিজ্ঞান কিম্বা জীববিজ্ঞানের কোন কোন ঘটনা, যাহা জড়বাদের দিক্ হইতে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়।

লম্ব্রসো এক হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কুমারীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বালিকা নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া দৃষ্টি করিতে পারিত। যদি আমরা অনুমান করিয়া লই যে, আমাদের অন্তরেন্দ্রিয়েই যথার্থ দৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে, চক্ষু বাহিরের যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে চক্ষুর পরিবর্ত্তে অন্য দৈহিক যন্ত্রও ঘটনাক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এই অন্তরেন্দ্রিয়ের পক্ষে চক্ষুর ন্যায় কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ অনুমান করা একেবারে অযৌক্তিক হইবে না।

ফ্রাঙ্ক (Frank) লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন নিদ্রাচর

(Somnumbulist) মহিলা ঐ অবস্থায় স্পর্শদ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ চিনিতে পারিত*। ফ্রাঙ্ক অনুমান করেন যে, বিভিন্ন প্রকার বর্ণের মধ্যে উত্তাপের তারতম্য আছে। অবশ্য উহা এত সামান্য যে আমরা জাগ্রৎ জ্ঞানে এই পার্থক্য কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় আমাদের অনুভূতির প্রখরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় উত্তাপের তারতম্য ধরিয়া বর্ণের বিভিন্নতা স্থির করা সম্ভব হইতে পারে। আমরা যদি হিন্দুদর্শনের অন্তরেন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লই, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের এইরূপ কষ্টকল্পনা কিম্বা অসম্ভব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতে হয় না।

চক্ষু সম্বন্ধে দেহবিজ্ঞানে উল্লিখিত একটি সাধারণ ঘটনা লইয়া বিচার করিয়া দেখা যাক্। আমাদের চক্ষুর ভিতরে যে অক্ষিপর্দ্দা আছে তাহার উপর আমরা বাহিরের যে সমস্ত বস্তু দেখি তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবিম্ব অক্ষিপর্দ্দার উপরে ঠিক উল্টা হইয়া পড়ে। অর্থাৎ মাথা পায়ের দিকে এবং পা মাথার দিকে যায়। আমাদের চক্ষুর ভিতরে যদিও ছবি এইরূপ উল্‌টাভাবে পড়ে, তথাপি আমরা দেখিবার সময় কোন জিনিষই উল্‌টা দেখি না, সবই সোজা দেখি। দেহবিজ্ঞানে এই ঘটনার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। আমাদের মনে হয়, ইহার সহজ ব্যাখ্যা এই যে, আমাদের চক্ষুর ভিতরে যে ছবিটি পড়ে সেইটিই যে মনের ভিতর দেখি তাহা নহে। চক্ষুর ভিতরের এই ছবিটি মানসিক চিত্রে পরিণত হয়। এই পরিণতির সময় চক্ষুর ভিতরের ছবিটির যে ভুল ছিল তাহা সংশোধিত হইয়া যায়। স্নায়ুর অনুভূতি কি প্রকারে মনোভূমিতে উপনীত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পান নাই।

যাঁহারা অশরীরী দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দর্শন সময় কিছু দীর্ঘ—প্রায় এক মিনিট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হয়ত

* Sleep—by Marie De Manaceine (St. Petersberg).

তাঁহাদের অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন মুহূর্ত্ত কালের জন্য হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মুহূর্ত্তকালের দর্শন আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে কিরূপেই বা ততোধিক কাল স্থায়ী হয়? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কবি বলিয়াছেন,—'আকাশে চপলা কেন চমকি চলিয়া যায়'—কিন্তু এই চমকান যে কত কম সময়ের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা সকল কবিরই ধারণার বাহিরে। চপলার গতি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। সেই চপলার এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইতে কতটুকু সময় লাগে তাহা অনুমান করুন। কিন্তু আকাশে বিদ্যুৎ চমকান আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া থাকি। তাহার অর্থ এই যে জড় জগতের কার্য্যটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ে উহার অনুভূতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

আকাশে যখন বিদ্যুৎ দেখি, তখন একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া অন্যদিকে যাইতেছে দেখিতে পাই। বিদ্যুতের চমকানটি ঠিকই দেখি বটে, কিন্তু উহার গতির ভঙ্গীটি যাহা দেখি তাহা ভুল দেখি। দুইজনে যদি একই বিদ্যুতের খেলা দেখে, তাহার গতির ভঙ্গী দুইজনে ঠিক একরূপ দেখে না। অনেক স্থলে অশরীরী দর্শনের সময় এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

মুহূর্ত্তের জন্য যেন মনের ভিতর একটি নূতন শক্তি হইতে উদ্ভূত জ্যোতির দীপ্তি খেলিয়া যায়। তাহা হইতে যে মানসিক চিত্র উদ্ভূত হয় তাহা অধিকক্ষণ ব্যাপী হয়। সেই মানসিক চিত্রের মধ্যে অনেক স্থলে কতকটা নিজের মনের ভাবও আরোপিত হইয়া যায়। সেই জন্য সেই চিত্র অনেক সময় বাহিরের ভাবের নিখুঁত প্রতিবিম্ব মনে করিলে ভুল হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন কতকটা এইরূপ ভাবের।

(ক্রমশঃ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

৯।৯।১৫

পরম স্নেহাস্পদেষু,

চা—, তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পূজ্যপাদ নাগ মহাশয়ের কি ভক্তি, কি অদ্ভুত প্রেম, কি অমানুষী অকিঞ্চন ভাবই দেখিছি—আর ভক্তেরা কি এনে ফেলেচে! এরই নাম অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা'র খেলা। মা'র এলাকা এড়ান কি অসম্ভব ব্যাপার বুঝে নাও। কেবল কাঁদ আর প্রার্থনা কর,—মা দয়াময়ী, কৃপা করে মুখ তুলে চাও, পথ ছেড়ে দাও, আমি ভজনহীন সাধনহীন, অতি দুর্ব্বল সন্তান তোমার, রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমরা কি রকম বুঝ্‌লে বল দেখি? পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে ঠাকুরের সঙ্গে বাঁদর, ভালুক, গরু, রাখাল হয়ে এসেছিলে, এবার না হয় মানুষের মুখোস পরে আগমন হয়েছে; কিন্তু ভিতরকার সেই বাঁদুরে কিচিরমিচির—গোরুর গুঁতোগুঁতি যাবে কোথায় বল? ভগবান্ ত সর্ব্বকাল পরম উদার আছেনই আছেন, কিন্তু ভক্তেরা দ্বেষাদ্বেষী, ঈর্ষ্যা, হিংসা, দলাদলি, গণ্ডীকাটা কবে ছেড়েছে? প্রভু আসেন বেড়া ভেঙ্গে দিতে—আমরা নূতন মত নূতন ভাব বলে প্রচার করে খুব কসে বাঁধুনি লাগাই, আর বলে বেড়াই—এমন অপূর্ব্ব উদার ভাব আর নাই, তোমাদের সকলের মত সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভুল, আর একমাত্র আমাদের মতই নিত্য, নির্ভুল।

আমি দেখ্‌চি তোমার উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা। তুমি একান্তে একা একা বেশ আছ; প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। সিদ্ধ হও, জীবন্মুক্ত হও, ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মেতে যাও।

লোকে ভাল বলুক্ মন্দ বলুক্ খেয়াল ক'রোনা। এই জীবনে, এই শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চাইই চাই। তখন তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে ভগবৎবাণী—অহঙ্কার, অভিমান দেশ ছেড়ে পালাবে।

দেখ্‌চ না মানুষে কি চায়? কেবল চায় ঐহিক সুখসম্পদ্ ভোগ—ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করে? আর যদি বিশ্বাস করে, ক'টা লোক তাঁকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়? বাবা! যা লোকমাত্র, কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে রেখেছেন, এ ছাড়িয়ে উঠে এমন বীর কটা আছে?

* * * সৃষ্টি অনন্ত—ভাব অনন্ত। অপরের দোষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে এসে পড়ে। আমরা তো লোকের দোষ দেখ্‌তে কিম্বা দোষ শোধরাতে আসি নাই, এসেচি কেবল শিখ্‌তে। সর্ব্বদা পরীক্ষা করিব কি শিখিলাম। চতুর্দ্দিকে দেখ্‌চো ত কত বিজাতীয় কত বিধর্ম্মী ভাব রয়েছে। তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার বল? এসেছি আঁম খেতে, পেটভরে আঁম খাবার চেষ্টা করা যাক্। এই ভাল। আর তোমার আমার কথা লোকে কৃপা করে শুনে মাত্র। নিজেদের ধারণা কত হ'ল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্যে নিলে কিনা জান্‌বার ইচ্ছা। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি কৌথায়, একবার চিন্তা করি এস। প্রচারে কাজ নাই, এখন পালাতে পাল্লে হয় বাপ্। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, তাই রক্ষে, নতুবা চারিদিকে তো কেবল দাবানল, বাড়বানল আর জঠরানল! এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি কত্তে পার? পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

"প্রেমিক চায়নাক' জাতি, চায় না সুখ্যাতি,
সে ভাবে পূর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ণ, রট্‌লে অখ্যাতি;
আবার চোদ্দভুবন ধ্বংস হলে, আনন্দ ধামেতে বানায় ঘর
প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
(ও ভাই থাকে না তার আত্মপর)।"

সে মানুষের দোষগুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাল বেসে বেসে মরে; মরেই বা কেন? ভালবাসায় যে অনন্তজীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা—এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আগুিল হয়ে যাই। এ জিনিষ লড়াই করে কেড়ে নেবার জো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বলছি জানবে। বিশ্বাসবল, শ্রদ্ধাবল চাই এ ধন লাভ কত্তে হলে। সম্মুখে ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমরা কতই ভাগ্যবান্। কিন্তু মা সব ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দেন; এই এক মহামোহ। তবে শরণাগতকে রক্ষা করেন, সৎবুদ্ধি, সৎমন, সৎসঙ্গ দানে।

ভালটা দেখাই উত্তম। বালি চিনিতে মেশামিশি, পিঁপড়ে হয়ে এস চিনিটে নি। কাজকি বাবা কোন্দল ঝগড়ায়; বিবাদ-বিসম্বাদে। তুমি আমার ভালবাসা ও স্নেহ সম্ভাষণাদি জানিবে। আর ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি কহিবে। *

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

(২)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

১২।১১।১৫।

স্নেহাস্পদেষু,

যথাসময়ে তোমার পত্র পাইয়াছি। এখন হতে ভাল অভ্যাস কত্তে চেষ্টা কর। খুব আঁট আন, যার নাম নিষ্ঠা—প্রাণ ঢেলে ভালবাসা চাই আদর্শকে। যে নাম তোমার অভিরুচি, সেই নামে তুমি ডুব দাও। উপরে ভাস্‌লে কি হবে। নিয়ে এস বিশ্বাস গুরু-বাক্যে, সাধুবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে—তবে ত ফল পাবে। ম্যাদাটে ভাবে কাজ হয় না। চাই খুব রোক্—আমি এই জন্মেই সিদ্ধ হব, নির্লিপ্ত হব, জীবন্মুক্ত হব, আমার অসাধ্য কি আছে? নিষ্ঠা করে

কথামৃত নিত্য পাঠ করিবে। উহার গানগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া গাহিতে চেষ্টা করিবে। ভয় ভাবনা দূর করিয়া দিবে। ভাবিবে আমরা ভগবানের সন্তান, তাহলে দুর্ব্বলতা আসিতে অবসর পাবে না।

প্রার্থনা ও ধ্যান অভ্যাস ভাল। সৎ চিন্তা করিলে অসৎ চিন্তা পালাবে।

"দূর হয়ে যা যমের ভটা
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা;
তোর যমের যম হতে পারি
ভাব্‌লে মায়ের রূপের ছটা।"

এই সব ভাব জাগাবে, তবেই ত অবিদ্যা দূরে যাবে। আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ।

সমালোচনা।

সুনীতি—সামাজিক উপন্যাস—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ১॥০। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক্ষমা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সহজাত শুভসংস্কারসমূহের অধিকারী মানব প্রতিকূল অবস্থাকেও অনুকূল করিয়া লইয়া স্বীয় জীবন শান্তিময় এবং সংসর্গাগত বিপথগামী ব্যক্তিগণকেও চরিত্র-বলে শান্তির অধিকারী করিয়া তুলে ইহাই সুনীতিতে বিবৃত হইয়াছে। পিতৃমাতৃহীন বালক সুনীতি দ্বাবিংশবর্ষে খুড়ীমার দুর্ব্যবহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৌকায় মাঝির কর্ম্ম করিতে করিতে উক্ত গুণসমূহের বলেই বিন্দুমাধব বাবুর গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া সুপণ্ডিত ও পরে কৃষ্ণমোহন বাবুর বিপুল ধনের অধিকারী

হয় এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত প্রতিবাসিগণের আশা ভরসা স্থল হইয়া উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করে। সুনীতির চরিত্রটী ফুটাইতে গ্রন্থকার যে ঘটনাবৈচিত্র্যের অবতারণা ও তাহাদের পারম্পর্য্য বিধানের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনস্বিতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ডাকাতদের হস্ত হইতে সুনীতিকে মুক্ত করিবার জন্য বিপিন ও অনুকূলকে আনয়ন করাটা আমাদের একটু অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য, বর্ণনার চাতুর্য্যে, ভাষার মাধুর্য্যে এবং গার্হস্থ্য জীবনের সুখময় চিত্রের সন্নিবেশে উপন্যাসটী অতি উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্য।

মানভূম ও বাঁকুড়া।

সহৃদয় দেশবাসিগণের সানুগ্রহ দানে আমরা এতদিন কোন প্রকারে মানভূম ও বাঁকুড়া জেলাস্থ ক্ষুৎপিপাসা ও বস্ত্রাভাবক্লিষ্ট জনসাধারণের অভাব-অনাটনের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি আমরা মানভূম জেলায় সাহায্য-কার্য্য ১১টী হইতে ৬৭টী গ্রাম পর্য্যন্ত বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছি এবং তাহাতে উক্ত জেলায় সাহায্যগ্রাহীর সংখ্যাও ১৬৭ হইতে ২৩৮০ জন হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায়ও ২৬ খানা গ্রামের ভিতর ২৯৩ জন আর্ত্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত জলকষ্ট নিবারণের জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দিবার উদ্দেশ্যে আমরা মানভূম জেলাস্থ বাগদা কেন্দ্রে একটী পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কারকার্য্য ও একটী নূতন কূপ খনন এবং বাঁকুড়া জেলাস্থ ইন্দপুর কেন্দ্রে ৫টী নূতন কূপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আরও, ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত গরীব ও নীচজাতীয় লোকদের ভিতর কার্য্যক্ষম বিধবাগণ 'ধানভাঙ্গা' প্রভৃতি কার্য্য করিয়াই

সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সেজন্য ঐ শ্রেণীর লোকদের ভরণপোষণার্থ আমরা তাহাদিগকে অগ্রিম ধান্য দিয়াছি। ইতিমধ্যে উড়িষ্যা বিভাগে ভুবনেশ্বরের নিকট ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া অনেক লোকের ঘরবাড়ী—যথা সর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ হইয়া যাওয়ায় আমরা তথায়ও সাহায্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। কুমিল্লা হইতে দুর্ভিক্ষের খবর পাইয়া আমরা তথায়ও লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং কিছুদিন হইল তথায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার নিকট একটী সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ এই প্রকার অন্নবস্ত্রহীন দুঃস্থ স্বদেশবাসী জনসাধারণকে আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে কখনই বিরত হইবেন না। এতদ্দেশের গরীব জনসাধারণের অবস্থা যে কি হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা কাগজে লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। কোন কোন স্থান হইতে আমরা এরূপ সংবাদ পাইয়াছি যে, পরিধেয় বস্ত্রাভাবে গৃহবধূগণ নগ্নপ্রায় হইয়া বিচরণ করিতেছেন! কোন প্রতিকারের উপায় নাই অথচ চক্ষের সম্মুখে স্বীয় পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যার এই প্রকার হৃদয়বিদারক অবস্থা—ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুরুষদের অনেকে দেশছাড়া হইয়াছে।

উদারহৃদয় দেশহিতৈষিগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা তাঁহাদের এই দীন দুঃখী ভাইভগ্নীদের জীবন ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য যাহা পারেন, অর্থ বা বস্ত্র সাহায্য, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

১। প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া।

২। সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।
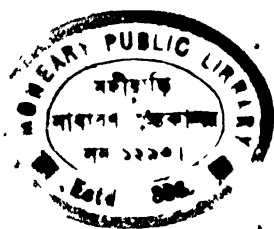
ভোগ না ত্যাগ ?

(স্বামী বাসুদেবানন্দ).

অদ্বৈতরূপিণী মায়ের শরণগ্রহণে সকল ভোগবাসনার ক্ষয় হয়। হিন্দু শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদ শুনিয়া যাঁহাদের মনে মহা ভীতির সঞ্চার হয়—যাঁহারা ভাবেন ইহজন্মকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতেই হইবে, এই নিষ্ঠুর কার্য্যকারণাত্মক বাদ হইতে কাহারও নিস্তার নাই—ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতা হইতে নিরয়কীট পর্য্যন্ত সকলকেই ইহার করাল কবলের বশবর্ত্তী হইতেই হইবে—তাঁহাদের ভরসা কেবল ঐ অদ্বৈতরূপিণী মহামায়া। একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং দ্বন্দ্বের অবসানে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিরোধ নাশ পায়। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা দৈহিক, মানসিক ও দেবসুখ ভোগ করা যায় সত্য কিন্তু সে সুখ আপেক্ষিক—আত্যন্তিক নহে। যেখানে সুখ, দুঃখও যেন পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার অনুসরণ করে। বহু সৎকর্ম্মসঞ্চিত ফলে সুরেন্দ্রাদি লোক লাভ করিতে পার কিন্তু সে দিব্য লোকসকলও অসূয়া ও পতনাদি দোষদুষ্ট। আর দৃষ্ট ইহলোকের কথা ত আমরা সকলেই অবগত আছি। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া জগতের সর্ব্ববিধ ভোগ সুখ উপভোগ কর না কেন, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিরহ প্রভৃতি দুঃখের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই!

এখন প্রশ্ন হইতেছে, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ নশ্বর জানিয়াও কেন লোকে সেই ক্ষণিকসুখেই মগ্ন হয়? তাহার উত্তরে অস্মদ্দেশীয় ঋষিরা বলিয়াছেন—জীব অমৃতের সন্তান, তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। অনাদি মায়াকল্পনা হেতু সে তাহার নিজের স্বরূপজ্ঞান হারাইয়াছে বটে কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ বাঁচিয়া থাকিবার, জ্ঞানলাভের, ও সুখভোগের

সংস্কাররূপে তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, তাই সে নানা ক্ষুদ্র সান্ত বাসনার সৃষ্টি করিয়া সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছে। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া যখন সে উপলব্ধি করে যে ইন্দ্রিয়জ সুখের দ্বারা কিছুতেই তৃপ্তি হয় না যেটুকু সুখ লাভ করা যায় তাহাও আবার বিদ্যুল্লতার ন্যায় ক্ষণিক এবং দুঃখও বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করে তখন সে তাহার স্বস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। ক্রমে প্রবৃত্তির মোহবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির ক্ষুরধারবর্ত্মে অগ্রসর হয়। অগ্রসর কালে তাহাকে প্রারব্ধ সংস্কারের ভীষণ আক্রমণ পুনঃ পুনঃ সহ্য করিতে হয়। যশ, বিত্ত, রূপ, নাস্তিকতা প্রভৃতি নানাকারে প্রারব্ধ তাহার রীর্য্যবত্তা প্রকাশ করে। কিন্তু যে সহিষ্ণুহৃদয় সেই উত্থান-পতন ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিজ আদর্শে স্থির থাকিতে সমর্থ হন তিনিই সন্ন্যাসী। আর যিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই পরমহংস।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—বড় বড় কথায় কতকগুলি আদর্শ মানবের সমক্ষে ধারণ করিলেই চলিবে না, উহা বাস্তবজীবনে পরিণত করিবার ক্ষমতা মানবের আছে কিনা না জানিয়া শ্রুতিমধুর কল্পনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া "আকাশে পক্ষিপদচিহ্ন অনুসন্ধানের" নিমিত্ত মানবকে উত্তেজিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? সমাজে থাকিয়া সে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের দ্বারা কত নব নব সুখস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়া, নিজের ও পারিপার্শ্বিক জীবের হয়ত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের কত সুবিধা করিতে পারিত। তাহা না করিয়া যাহা কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই এরূপ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি অনুধাবিত করিবার জন্য মানবকে আহ্বান করিতেছ কেন? নিবৃত্তিমার্গের ইতিহাস ত আমাদের অগোচর নাই। তোমাদের ত্যাগী গুরু শিব ব্রহ্মা হইতে বিশ্বামিত্র, ব্যাস প্রভৃতি সকলেই ত জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে গিয়া পুনঃ পুনঃ সেই একই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন যখন অসম্ভব তখন সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন

করিয়া "হেয়" এবং "প্রেয়" এই দুইটি বিচার করিয়া যথাসম্ভব সুখ ভোগ করাই ত উচিত। কাঁটা আছে বলিয়া গোলাপ ফুল তুলিব না উহা যেরূপ, দুঃখ আছে বলিয়া সুখ ভোগ করিব না ইহাও সেইরূপ একই প্রকারের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইহার উত্তরে আমরা বলি তুমি যাহাকে বৈরাগ্যবাদীদের জীবনে ক্ষণিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ তাহাকে আমরা উত্থানেরই সোপান বলিয়া থাকি। মানব জন্মাবধি বাহ্য প্রকৃতির সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা তাহার কায়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণকর তাহা সেই বাহ্য প্রকৃতি হইতেই আদায় করিয়া লইতেছে এবং যাহা তাহার বিরোধী সে তাহা প্রাণপণে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কোন্‌টি তাহার মধ্যে 'হেয়' এবং কোন্‌টি তাহার মধ্যে 'প্রেয়' ইহা তাহাকে অভিজ্ঞতা হইতেই জানিতে হয়। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়—এই অভিজ্ঞতা শিশুকে উপার্জ্জন করিতে হইলে তাহাকে একবার না একবার আগুনে হাত দিয়া দহনযন্ত্রণা ভোগ করিয়া উক্ত জ্ঞানের উপলব্ধি করিতেই হইবে। তোমরা যে সংসারের মধ্যে থাকিয়া যতদূর সম্ভব বাছিয়া বাছিয়া ভোগের নিমিত্ত সুখ সঞ্চয় করিতেছ এ কথা তোমাদিগকেও মানিতে হইবে। ভুল করিয়াই মানব সদসদ্‌ বিচারের অধিকারী হইয়াছে। নতুবা বৃক্ষ বা প্রস্তরখণ্ডের জীবনের নির্ভুলতা দর্শন করিয়া তাহাকেই ত মানবেরও শীর্ষদেশে বসান উচিত হইয়া পড়ে। মানব এত বড় কেন? কারণ সে তাহার জীবনে যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তিতে পড়িয়াছে এবং সেই ভুলগুলি সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞ বলিয়া।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে যে, আমরা 'প্রেয়' বা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব না কেন? একটা অজানা জিনিষের অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর আমরা নিজ প্রকৃতি হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কারণ, বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা জীবের নাই। দার্শনিক হিসাব নিকাশ ছাড়িয়া দিয়া যদি পারিপার্শ্বিক ঘটনা সকল উপস্থাপিত করা

যায় তাহা হইলে দেখা যায়, মানবের প্রকৃতি যেমন তাহাকে ভোগে নিযুক্ত করে সেইরূপ তাহার প্রকৃতিই আবার তাহাকে ত্যাগের অভিমুখী করিয়া দেয়। ভোগ কথাটি উচ্চাবচ সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি কুৎসিত প্রকৃতির লোক বা পশু যাহা ভোগ করে এবং দার্শনিক উচ্চ উচ্চ বিষয়ের চিন্তার দ্বারা যাহা ভোগ করেন, এই উভয়ের ভোগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। 'শেষোক্তের' নিকট যদি পূর্ব্বোক্তের ভোগ সকল উপস্থিত করা যায় তাহা হইলে সে ভোগে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিবে না, স্বভাবতঃ উহার ত্যাগেই তাঁহার মতি জন্মিবে। বৈরাগ্যসাধনে যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন না তাঁহাদের নিকট এমন অনেক ভোগোপাদান আছে যাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। যাঁহারা সংসারের ভোগ্য বস্তুসকল তুচ্ছ করিয়া উহার বদ্ধ প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন নির্ম্মল পবিত্র আনন্দের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। কারণ, আনন্দ ব্যতিরেকে ত কেহ কোথাও কোন প্রকারে নিমেষার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারে না। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পার, ত্যাগীর আনন্দ ভোগীর আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি করিয়া জানিলে? তদুত্তরে আমরা বলি, যে নির্ম্মল পবিত্র বায়ুর মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে সেই বলিতে পারে আপাতসৌরভযুক্ত ভবিষ্যতে মস্তিষ্কের পীড়াদায়ক চম্পক গন্ধ অপেক্ষা উন্মুক্ত নির্ম্মল পবিত্র সান্ধ্য সমীরণ কত সুন্দর। সংসারকাননে সুগন্ধ কুসুমও আছে আবার দুর্গন্ধ কুসুমও আছে। জীব দুর্গন্ধ ছাড়িয়া সুগন্ধেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকে। কিন্তু সুগন্ধ কুসুমও তাহার চিরকাল ভাল লাগে না, সে উহাতে ক্লান্তি বোধ করে। পরে কানন বহির্ভাগে উন্মুক্ত প্রান্তরের অনুসন্ধান পাইয়া তাহার পবিত্র গন্ধহীন বাতাসের উপভোগে আনন্দ লাভ করে। সু বা কু গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়া গন্ধহীন নির্ম্মল বায়ু সেবনে হৃদয়ের যথার্থ প্রসন্নতা লাভ হয় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা 'হেয়' ও 'প্রেয়' এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ে'র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য মানবকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, আত্মা সদাপূর্ণ ও এক। অনাদি অঘটনঘটনপটীয়সী অনির্ব্বচনীয়া মায়াকল্পনা হেতু আত্মা স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া "দেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃত" করিয়া তাহাতে অভিমান হেতু নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ মনে করিতেছেন। কিন্তু চিরকাল তাহার এই ভাব ভাল লাগে না। এই ভাল না লাগা এবং নিত্য বস্তু লাভের যে ইচ্ছা তাহাই মুমুক্ষুত্ব। তখন জীব মায়ান্তর্গত সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্বরূপে ফিরিয়া যাইবার প্রয়াস পায়। ক্রমে সেই জীব 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—সিংহের ন্যায় পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বহির্গত হন—ইহাই মুক্তি। তাই ভগবান্ শঙ্কর উপদেশ করিতেছেন, "বর্ণ, ধর্ম্ম, আশ্রম এবং আচার এতৎ সমস্তই শাস্ত্ররূপ যন্ত্র দ্বারা নিবদ্ধ। বৎস! পিঞ্জর হইতে কেশরীর ন্যায় তুমি জগজ্জাল হইতে নির্গত হও। বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম তোমার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাত্যভিমান এবং আশ্রমাভিমান থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য শ্রুতির দাস—অর্থাৎ শ্রুতিনিরূপিত পথে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। মানব যখন বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান শূন্য হয়, তখন শ্রুতি তাহাকে মস্তকে রাখেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যাবৎ পর্য্যন্ত প্রমাণ দ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি বাধিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপলব্ধ হয়। যখন 'আমি দেহ নহি' এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন তোমার সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।" (অজ্ঞানবোধিনী)

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদ্বৈত নীতি অবলম্বন করিয়া অসৎলোকেদের সমাজে ব্যভিচারের স্রোত বহাইবার এক প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। সমাজের বিধি নিষেধ এইরূপভাবে 'দেহজ্ঞান-রহিত' প্রভৃতি সন্দেহজনক আদর্শকে ভিত্তি করিয়া যদি উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সংসারে শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ব কিছু থাকিবে না, বরং পাশ্চাত্য Nihilismকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। কেহ ত কখনও দেহ জ্ঞানরহিত হইবেই না বরং 'আমিই ঈশ্বর, আমিই সব' এ প্রকার জ্ঞান হইতে তাহাদের সমাজের শাসন ও দায়িত্ব দূর

হইয়া যাইবে এবং সমাজে যথেচ্ছাচারিতার স্রোত প্রবলবেগে বহিতে থাকিবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি সকলই সত্য। যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিলেও যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা মর্ম্মে মর্ম্মে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে বুঝিয়াছেন এবং প্রতিপদে সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এরূপ মুমুক্ষু বীতরাগ জনের প্রতি উহা আদৌ প্রযুজ্য হইতে পারে না। মতবাদ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন সংসারে চিরকাল একদল লোক থাকিবে যাহারা উহার কদর্থ করিয়া নিজেদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবে। তাই বলিয়া সে মতকে উঠাইয়া দিতে হইবে তাহার মানে কি? অসৎ লোকদের জন্য শাস্ত্রে বিধিনিষেধের অভাব নাই এবং এখনও বহু শাস্ত্রকার উঠিয়া নিজের মতে জগৎকে চালাইবার জন্য বহু বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া তাহা সকলকে মানিয়া চলিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। কিন্তু তুমি যে Nihilism এর কথা বলিলে অদ্বৈতবাদ তাহার সমর্থন করে না। যথেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতায় যেরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান Nihilism এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যেও সেইরূপ পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে। কারণ—অদ্বৈতজ্ঞানী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করায় তাঁহার সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয় বলিয়া বিধিনিষেধ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অবশ্য সাধন অবস্থায়,—

> অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ যঃ
> কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তুকামো বিরাগী।
> বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্

তিনিই আবার যখন পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন,—

> সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা
> গাঙ্গং বারি সমস্ত বারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
> বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
> সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরব্রহ্মণি॥ (ধন্যাষ্টক স্তব)

যিনি প্রথমে নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,

সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ দেখিয়াছিলেন, বিষয় সকলকে দুরন্ত বিষবৎ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার যখন অখণ্ডৈকরসস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলেন তখন এই নিখিল জগৎ তাঁহার নিকট আনন্দকানন সদৃশ, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ, সকল জলই গঙ্গাজল সদৃশ, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্যতুল্য এবং সমস্ত পৃথিবীই বারাণসী তুল্য হইল। কারণ, সর্ব্বভূতেই তিনি প্রিয়তম আত্মাকে অনুভব করিতেছেন, তাঁহার 'হেয়' বা 'প্রেয়' কি করিয়া থাকিতে পারে? কেহ কেহ মনে করেন অদ্বৈতজ্ঞানীরা অতি শুষ্ক বা নীরস—কিন্তু বাস্তবিক তাহা একেবারেই নহে। তাঁহারা 'রসো বৈ সঃ' 'আনন্দব্রহ্মকে সর্ব্বভূতে সম্ভোগ করেন।

আবার ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য সকল বস্তুতেই আত্মার স্ফুরণ দর্শন করিয়াও কি নিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছু হইলেন। এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী তাঁহার পতির নিকট বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া রূপে, রসে, গন্ধে আত্মার ভোগ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর আধুনিক ভোগবাদীদের অসদৃশ উদাহরণস্থল যে জনক তাঁহাকে তাঁহার গুরু যাজ্ঞবল্ক্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে পাওয়া যায়—

"এতৎ হ স্ম বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা উভে হ্যেতে এষণ এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মা।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২) এবং তাঁহারা বোধ হয় জানেন না যে রাজর্ষি জনক বহু বৎসর হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

আধুনিক সংসারসর্ব্বস্ব কতকগুলি লোকের আর একটি যুক্তি এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ম্ম করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন—"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—"তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়

মুক্তসঙ্গঃ সমাচার"—এবং তিনি নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াই এই সংসারেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন তখন তাঁহাকেই আদর্শ না করিয়া প্রব্রজ্যা সন্ন্যাস প্রভৃতি বাক্য লইয়া নিজেদের ব্যস্ত করি কেন? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" তাঁহার সহিত সাধারণ জীবের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি তিনি একদিকে যেমন অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহবশতঃ 'শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে' বলিতে শুনিয়া 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং' ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করিয়া—

"ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ (গীতা—২য় অ)

বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অন্য দিকে উত্তম অধিকারীবোধে উদ্ধবকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন—

"গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমং।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধুতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বনভুক্ সুখনিস্পৃহঃ॥
তিতিক্ষু দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্‌চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব।
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবদ্, ১১ স্ক)

আবার যাঁহারা আরও উন্নত তাঁহাদের সম্বন্ধে একেবারে নৈষ্কর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৩য় অ)

ইহাতেও কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা না হয় হইল; কিন্তু তোমরা অদ্বৈতবাদাত্মক ত্যাগের ধর্ম্ম সাধারণের নিকট প্রচার করিতে পার না, কারণ, অনুপযুক্ত লোক তোমাদের বাক্যমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ উহা গ্রহণ করিয়া পরে প্রবৃত্তির তাড়নায় 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইবে। কিন্তু ইহা ত অদ্বৈতবাদ বা তাহার বৈরাগ্য সাধনের দোষ নয়। অদ্বৈতবাদ ত বলিয়াই রাখিয়াছেন—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ—তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে।" (১অ, ১পা, ২সূ, শারীরক-ভাষ্য) কিন্তু ভ্রমবশতঃ যে সে চিরকাল নষ্ট হইবে তাহাও কথন নহে। কারণ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥" (গীতা ৬ষ্ঠ অ)

তাহাতে শ্রীভগবান্ উত্তর করিয়াছিলেন,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥" (গীতা ৬ষ্ঠ অ)

ভ্রষ্ট ব্যক্তিও 'কল্যাণকৃৎ' ইহাই শ্রীভগবানের শাসন, উপরোক্ত শ্লোকের দ্বারা অনুমিত হয়।

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে,—এই অদ্বৈতবাদ যাহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহার দ্বারা জগতের কি কিছু কল্যাণ সাধিত হইতে পারে? তোমরা ত আত্মতৃপ্ত আত্মরতিসম্পন্ন, অতএব স্বার্থপর জগতের দিকে কি তোমাদের নজর আছে?—জগৎ তোমাদের ত নিকট

মিথ্যা। প্রশ্নোত্তরের পূর্ব্বে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে জগতের হিতকারী, তোমাদের এই জগৎ হিতকার্য্য কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? আমরা নয় স্বীকার করিলাম যে, তোমরা বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, রামানুজ প্রভৃতি সন্ন্যাসী এবং তাঁহাদের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জগৎহিত করিয়াছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সন্ন্যাসীর ভেকের দ্বারা অসৎকার্য্যের অবতারণা—অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের সৃষ্টিই বা কত হইয়াছে, আর অপর লোকদের দ্বারাই বা কত হইয়াছে? সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে কয়টি তৈমুর, নাদির জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আর চণ্ডাশোককে ধর্ম্মাশোকই বা কে করিল? জাতি, কুল ও অর্থমর্য্যাদার প্রবল অত্যাচার হইতে মানবকে সাম্যের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কাহারা আজীবন চেষ্টা করিয়াছে? জগতের সকল স্নেহের বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়া নিঃস্বার্থভাবে, হীনব্যক্তির প্রতি করুণার বা সহানুভূতির চক্ষে নহে, সর্ব্বভূতে প্রিয় আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমের চক্ষে কাহারা এই জগৎকে দেখিয়াছে? একটি ক্ষুদ্র ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কাহারা অম্লানবদনে নিজ মস্তক দান করিয়াছে? আবার মহাপ্রাণ গৃহস্থরাও সময়ে সময়ে যে অপূর্ব্ব ত্যাগ দেখাইয়াছেন তাহাই বা কাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া?

বিশ্বপ্রেমই বল, জগৎহিতই বল, যদি উহা অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে তোমার সকল নীতিই ভাসিয়া যাইবে। কেহ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে—'কেন জগতের উপকার করিব? তোমার মৃত্যু হইতেছে বটে কিন্তু তাহা আমার বড় কৌতুক লাগে।' এ প্রশ্নের সমাধান, তুমি দয়া, সহানুভূতি, প্রয়োজন বা আর কিছুর দ্বারা করিতে পারিবে না। তথাপি বলিতে পার, আমরা ত অদ্বৈতবাদ মানি না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ত জগৎহিতব্রতে ব্রতী। সত্য, তর্কে মান না বটে কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক আর, অজ্ঞাতসারেই হউক, পরমাত্মীয় নিজ আত্মার স্ফুরণ সর্ব্বত্র দেখ বলিয়াই তোমার হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠে।

এক্ষণে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, সকলকেই অদ্বৈতবাদ ও উহার তীক্ষ্ণধার ত্যাগের রাস্তা মানিয়া চলিতে হইবে। সময় উপস্থিত হইলে একদিন সকলকেই ত্যাগের রাস্তা গ্রহণ করিতেই হইবে, মাথা ধরিলে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না যে মাথা ধরিয়াছে। আর যাহারা ঐ মত সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে করে, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক, কিন্তু তোমার মতই একমাত্র সত্য, একথা বলিয়া মানবের চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশ রুদ্ধ করিবার তোমার কি প্রয়োজন? সমুদ্রযাত্রী হইয়া যদি অর্দ্ধপথে বিশাল নদীবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া 'ইহাই সমুদ্র' বলিয়া নঙ্গর ফেলিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর বসিয়া থাক, কিন্তু অপরকে সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিও না।

শ্রীশ্রীমহাবীর-চরিত।

(শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ)

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকল হিন্দু নরনারীই রামায়ণ-মহাবারিধির অমূল্য নিধি মহাবীর হনুমান্-চরিত স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। মাদৃশ হীনবুদ্ধি শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমহাবীরের নিষ্কলঙ্ক নিরূপম চরিত্র চিত্রিত করিবার প্রয়াস বামনের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা মাত্র। তথাপি পরশমণি স্পর্শে লৌহ যেমন স্বতঃই সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অদ্য মহাবীরের পূত জন্মদিনে তাঁহার পুণ্য নাম কীর্ত্তন করতঃ মদীয় মনোমালিন্য বিধৌত করিয়া অকৃতী জীবন ধন্য করিব।

পুরাকালে অপ্সরাদিগের মধ্যে অঞ্জনা নাম্নী এক পরম রূপবতী

অপ্সরা ছিলেন। তিনি ঋষিশাপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে পবনের ঔরসে এক পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বরাঙ্গনা অঞ্জনা এই শিশুসন্তান প্রসব করিয়া ফল-সংগ্রহমানসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সদ্যোজাত শিশু ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া মাতৃঅদর্শনে অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে অরুণদেব জবাকুসুমতুল্য লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রভাত-গগনে উদিত হইতেছিলেন। ঐ নবকুমার নবোদিত সূর্য্যকে পক্ক ফলভ্রমে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্যোমমণ্ডলের দিকে ধাবিত হইলেন। বায়ুতনয় বাল্যাবস্থায় প্লবমান হইলে দেবদানবযক্ষ সকলেই বিস্মিত হইলেন। তখন বায়ু তাঁহার স্বাভাবিক শৈত্য দ্বারা স্বীয় সুতকে সূর্য্যের দাহভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব বায়ুপুত্রের এবম্বিধ কার্য্য বাল-সুলভ-চপলতা বশতঃ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। যে দিন সূর্য্যকে ধরিবার জন্য পবননন্দন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন, সে দিন সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পবনপুত্রকে দেখিয়া রাহু ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন, "বাসব! আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আপনি আমাকে চন্দ্রসূর্য্য দান করিয়াছেন, কিন্তু আর একজন আসিয়া আমাকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়াছে"। রাহুর কথা শুনিয়া ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বজ্রহস্তে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করতঃ পবনপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। মারুতি ঐরাবতকে দেখিয়া তাহাকেও একটী বৃহৎ ফল বিবেচনা করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে শচীপতি যারপরনাই ক্রোধান্বিত হইয়া হস্তস্থিত বজ্রদ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। বজ্রপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি পর্ব্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই আঘাতে তাঁহার বামহনু ভগ্ন হইল। নিজ পুত্রকে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাহত ও ভগ্ন-হনু দেখিয়া অঞ্জনা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রোরুদ্যমানা অঞ্জনার কাতর ক্রন্দনে পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় গতি রোধ করিলেন। তাহাতে স্থাবর, জঙ্গম, খেচর, ভূচর যাবতীয়

জীব শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইল। সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া ব্রহ্মা পবনের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া পুত্র-শোকাতুর পবন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে বারত্রয় প্রণাম করিলেন। বিধাতা হস্তদ্বারা প্রহৃত শিশুর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। কমলযোনী ব্রহ্মার কর-স্পর্শে শিশুর চেতনা লাভ হইল। পবন স্বীয় পুত্রকে জীবিত ও সুস্থ দেখিয়া বিরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সানন্দে সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন "হে দেবগণ! তোমরা সকলে পবনতনয়কে আশীর্ব্বাদ কর, কালে এই শিশুদ্বারা তোমাদের বহুতর কল্যাণকর কার্য্য সাধিত হইবে।" তখন ইন্দ্র বলিলেন, "আমার বজ্রাঘাতে ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই কপিবর হনুমান্ নামে খ্যাত হইবে। অদ্যাবধি হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে"। তৎপরে সূর্য্য কহিলেন—"আমার তেজের শতাংশের একাংশ ইহাকে দিলাম। যখন এই বালক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, তখন ইহাকে আমি শাস্ত্র শিক্ষা দিব, তদ্দ্বারা হনুমান্ বাগ্মীপ্রবর হইবে"। তৎপরে বরুণ কহিলেন—"আমার পাশ অথবা বারি দ্বারা শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না"। যম প্রীত হইয়া বর দিলেন, "এই বালক যমদণ্ডের অবধ্য ও নিয়ত অরোগী হইবে এবং যুদ্ধে কখনও অবসন্ন হইবে না"। ধনপতি কুবের বর দিলেন, "আমার অস্ত্রের ও আমার অবধ্য হইবে"। দেবাদিদেব মহাদেবও এইরূপ উত্তম বর দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন "আমি যে সকল দিব্য অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়া চিরজীবী হইবে"।

দেবগণ বর দ্বারা বালককে এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিলে ব্রহ্মা বায়ুকে বলিলেন, "তোমার পুত্র শত্রুগণের ভয়ঙ্কর ও মিত্রগণের শুভঙ্কর হইবে। অধিকন্তু এই কপিশ্রেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ, যথেচ্ছা গমন ও ভক্ষণ করিতে পারিবে। এই শিশু কীর্ত্তিমান্ ও অপ্রতিহত-গতি হইবে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের বিনাশকারণ ও রঘুকুলপতি

রামচন্দ্রের প্রীতিকর হইবে, এবং কালে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে"। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ পবনপুত্রকে এইরূপ বর দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং অঞ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। দেবগণের বরে হনুমান্ সাতিশয় বলশালী হইয়া বালসুলভচাঞ্চল্য বশতঃ মুনিদিগের আশ্রমে নানারূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন এবং স্রগ্ ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সকল প্রকার ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য জানিয়া মুনিগণ তাঁহার সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিলেন। অবশেষে অঙ্গিরা ও ভৃগুবংশজাত মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমান্‌কে এই শাপ দিলেন "হে হনুমান্ তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমাদের উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে বিমোহিত হইয়া দীর্ঘকাল সে শক্তি বিস্মৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যখন তোমার কীর্ত্তি তোমাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দিবে, তখন তোমার সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হইয়া কার্য্য করিবে"। ঈদৃশ শাপগ্রস্ত হইয়া হনুমান্ ধীরভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিগণের শাপবশতঃ তিনি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত স্বীয় শক্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন পরে সীতান্বেষণার্থ যুবরাজ অঙ্গদ হনুমান্ এবং জাম্বুবান্ প্রমুখ বানরগণ সহ বহির্গত হইলে বানরবাহিনী যখন শত যোজন বিস্তৃত দুস্তর সাগর অবলোকন করিয়া বিষণ্নমনে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন জাম্বুবান্ হনুমানের বলবিক্রম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদবধি হনুমান্ স্বীয় বলবিক্রম পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপে তিনি শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কানগরীতে সীতাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি বলবিক্রম, শাস্ত্রজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতিগুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষার্থ সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য প্রভৃতি মহাগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় শাস্ত্রবিশারদ আর কেহ ছিল না বলিলেই হয়; ইনি আজীবন অখণ্ডব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি কর্ম্ম সকল বিষয়ে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাবীরের জীবনী হইতে আমরা ২।১টী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। ইঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য সকলেই বিদিত আছেন—কিরূপে তিনি শত যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি তথাকার অসংখ্য রাক্ষস সেনা বধ ও লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলেন—তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি একাকী সমস্ত লঙ্কানগরী ধ্বংস করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করিতে পারিতেন, কেবলমাত্র সীতাদেবীর আদেশক্রমে তাহা করেন নাই। হনুমান্ যখন লঙ্কানগরী ধূলিসাৎ ও রাবণকে নিধন করিবার জন্য সীতাদেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "বৎস! তুমি যে একাকী এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার তাহা আমি জানি, কিন্তু রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যদি রাবণকে স্বহস্তে বধ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, তবে সূর্য্যবংশের অক্ষুণ্ণ গৌরব রক্ষা হয়। সুতরাং তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন কর এবং রামকে সসৈন্যে শীঘ্র লঙ্কায় আসিবার জন্য আমার মিনতি জানাইও"।

সীতাহরণের পর রামলক্ষ্মণ সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন তখন বালি কর্ত্তৃক বিতাড়িত সুগ্রীব তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ হনুমান্‌কে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার কথোপকথন ও বাক্যাবলী শ্রবণে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলেই মহাবীরের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবত্তার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"নানৃগ্বেদ বিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম।
বহুব্যাহারতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥

ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা।
অন্যেষ্বপি চ সর্ব্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ॥
অবিস্তরমসন্দিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্।
উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ত্ততে মধ্যমস্বরম্॥
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্ভুতামবিলম্বিতাম্।
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্॥
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া।
কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি॥
এবংবিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু।
সিধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্য্যাণাং গতয়োঽনঘ॥
এবং গুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্য্যসাধকাঃ।
তস্য সিধ্যন্তি সর্ব্বেঽর্থা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ॥"

(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, তৃতীয় সর্গ, ২৭-৩৫)

"ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক শাস্ত্র বহুবার পাঠ করিয়াছেন। বাক্যপ্রয়োগকালে ইঁহার মুখে, নয়নে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যায় নাই। ইনি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যমস্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিমধুর, সংক্ষিপ্ত ও সরল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ ত্রিস্থানসংযুক্ত স্বরে উচ্চারিত ঐ বিচিত্র বাক্য শ্রবণে কাহার না চিত্ত প্রসন্ন হয়? খড়্গোত্তোলন পূর্ব্বক বধোদ্যত শত্রুর চিত্তও উহা শুনিয়া দ্রব হয়। হে অনঘ! যে রাজার এরূপ দূত না থাকে তাঁহার কার্য্য সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? যাঁহার এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন দূত আছে তাঁহার দূত-বাক্য দ্বারাই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়।"

লঙ্কায় উপনীত হইয়া সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন হনুমান্ রাবণের রাজপ্রাসাদে সুকোমল শয্যাসীনা বিপর্য্যস্তবসনা রত্নালঙ্কারভূষিতা, রূপযৌবনসম্পন্না অনেক নারী দর্শন করিয়াছিলেন,

তখন তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল রামায়ণ হইতে তদ্বিষয়ে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।
ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি॥
নহি মে পরদারাণাং দৃষ্টিবিষয়বর্ত্তিণী।
অয়ঞ্চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ॥
তস্য প্রাদুরভূচ্চিন্তা পুনরন্যা মনস্বিনঃ।
নিশ্চিতৈকান্তচিত্তস্য কার্য্যনিশ্চয়দর্শিনী॥
কামং দৃষ্টা ময়া সর্ব্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ।
নতু মে মনসা কিঞ্চিদ্বৈকৃত্যমুপপদ্যতে॥
মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥
নান্যত্র হি ময়া শক্যা বৈদেহী পরিমার্গিতুম্।
স্ত্রিয়োহি স্ত্রীষু দৃশ্যন্তে সদা সম্পরিমার্গণে॥
যস্য সত্ত্বস্য যা যোনিস্তস্যাং তৎপরিমার্গ্যতে।
ন শক্যং প্রমদা নষ্টা মৃগীষু পরিমার্গিতুম্॥"

(সুন্দরকাণ্ড, একাদশ সর্গ, ৩৯-৪৫)

"হনুমান্ সেই প্রমদাদিগকে দেখিতে দেখিতে বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলে ধর্ম্মলোপ হয় এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া চিন্তাকুল হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, নিদ্রাতুরা বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলাম ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ম হইবে, কেননা ইতিপূর্ব্বে কখনই পর-নারীর প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। পরস্ত্রী দেখিলাম ইহাতে যে আমার পাপ হইবে এমন নহে, পরদারাপহারী এই পাপিষ্ঠ রাবণকে দেখিলাম বলিয়া নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে। মনস্বী হনুমান্ স্থিরচিত্তে প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বচিন্তা খণ্ডনপূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য বিচারক্ষম অন্য চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শায়িতা রাবণ-মহিলাগণকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমার মন কিছুমাত্র চঞ্চল হয় নাই। মনই ইন্দ্রিয়দিগকে শুভাশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে, সেই মনই যখন আমার বশীভূত রহিয়াছে, তখন আমাকে

পাপস্পর্শ করিবে কেন? আমি বৈদেহীকে আর অন্যস্থানে অনুসন্ধান করিতে পারি না। প্রায়ই দেখা যায় লোকে স্ত্রীদিগের মধ্যেই স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যে যাহার সমান জাতি, সেই জাতির মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত। মৃগীদিগের মধ্যে অনুদ্দিষ্টা অঙ্গনার অন্বেষণ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে।”

উপরোক্ত শ্লোকাবলী হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মহাবীর শুধু জিতেন্দ্রিয় ছিলেন তাহা নহে, তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কার্য্য করিতেন। ‘পরস্ত্রী দর্শনে পাপ হয়’ এই নীতি যদি বর্ণে বর্ণে মহাবীর অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে বাস্তবিক আদৌ সীতাউদ্ধার হইত কিনা সন্দেহ।

সাগরলঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া মহাবীর যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লঙ্কার বন, উপবন, পর্ব্বতকন্দর, প্রাসাদ, ভবন সমস্ত অন্বেষণ করিয়া সীতাদেবীর দর্শন পাইলেন না, তখন তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

সীতাকে প্রথম দর্শনের পর অভিজ্ঞানচিহ্নস্বরূপ মহাবীর যখন রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন, তখন সীতাদেবী তাঁহার বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য রামচন্দ্রের অঙ্গচিহ্ন বর্ণন করিতে বলিলেন। বৈদেহীর বাক্য শ্রবণে তিনি যেরূপ ভক্তিগদ্গদচিত্তে রামরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

রাবণ বধের পর বানরগণের সহিত রামচন্দ্র অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন সসীতা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন এবং বানরগণকে বিদায় দিবার প্রক্কালে বহু রত্নরাজি উপঢৌকন প্রদান করিলেন; কাহাকেও বা সস্নেহ আলিঙ্গন, কাহাকেও বা মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ দ্বারা কৃতার্থ করিলেন, তখন তাঁহারা কাকুৎস্থ রামের কথা শ্রবণে তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভূয়োভূয়ঃ ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন! বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদবন্দনা পূর্ব্বক কি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে

কিরূপ স্নেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু নিত্যদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা বীর ভাবো নান্যত্র গচ্ছতু॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে বৎস্যন্তি প্রাণা মম ন সংশয়ঃ॥
যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যকথা তে রঘুনন্দন।
তন্মমাপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥
তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তবচর্য্যামৃতং প্রভো।
উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ॥
এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনুমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সস্বজে স্নেহবাক্যমেতদুবাচ হ॥
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা॥
তাবত্তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা।
লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ॥
একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণামাপৎস্বায়াতি পাত্রতাম্॥
ততোঽস্য হারং চন্দ্রাভং মুচ্য কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ॥"

(উত্তরকাণ্ড, পঞ্চাশৎ সর্গ)

"হে রাজন্! আপনার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি ও ভালবাসা থাকে, আর আমার মন যেন অন্য বিষয়ে লিপ্ত না হয়। ধরাতলে যতদিন রামকথা থাকিবে, ততদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব সংশয় নাই। আপনার যে দিব্য চরিত বিখ্যাত রহিয়াছে ইহা অপ্সরাগণ আমাকে শুনাইবে। বায়ু যেমন মেঘখণ্ড অপসারিত করে, তদ্রূপ আমিও আপনার চরিতামৃত পান করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূর করিব।

"এই কথা শুনিয়া রাম দিব্যাসন হইতে উঠিয়া স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত লোকসমাজে আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া বাস করিবে। অধিক কি, যতদিন এই ত্রিলোক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে। কপিবর! তোমার এক একটী উপকারের জন্য আমি প্রাণদান করিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্টের জন্য আমি ঋণী রহিলাম। তুমি যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক, যেহেতু বিপৎকাল আসিলেই মানুষ প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। অনন্তর রামচন্দ্র নিজ কণ্ঠ হইতে বৈদূর্য্যমণিপরিশোভিত রত্নহার হনুমানের গলায় পরাইয়া দিলেন।

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী শ্রবণে সহজে প্রতীয়মান হয় শ্রীশ্রীমহাবীরের ভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল। যাবৎ রামচরিত লোকসমাজে বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎ তিনি দেহধারণ করিয়া রামসুধা পান করিবেন, ইহা জগতের ইতিহাসে অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার মনপ্রাণ রামময় ছিল, তিনি রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা করিতেন না। তিনি যেমন কর্ম্মবীর, তেমনি ভক্তচূড়ামণি ছিলেন।

মহাবীর হনুমান্ সর্ব্বনীতিবিশারদ ছিলেন। দেশকালপাত্র বিশেষে সাম দান ভেদ ও দণ্ড নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেন। লঙ্কায় উপনীত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যপদেশে যে ঔপনিষদিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং নরাক্ষসীবুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ॥ ১
ত্বং ব্রাহ্মণোহ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো নাস্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো হ্যহ॥ ২

শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়দুঃখসন্ততির্ন তে ন চ ত্বং তব নির্ব্বিকারতঃ।
অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সন্ততেরসত্ত্বমস্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ। ৩
ইদন্তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়াবিকারহেতুর্ন চ তেঽদ্বয়ত্বতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গতস্ত্বাত্মেতি বুদ্ধ্যাখিলবন্ধভাগ্ ভবেৎ। ৪
চিন্মাত্রমেবাহমজোঽহমক্ষরো হ্যানন্দভাবোঽহমিতি প্রমুচ্যতে।
দেহোঽপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো ন প্রাণআত্মানিল এষ এব সঃ। ৫
মনোঽপ্যহঙ্কারবিকারএবনো ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা।
আত্মা চিদানন্দময়োঽবিকারবান্ দেহাদিসঙ্ঘাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ। ৬
নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা জ্ঞাত্বৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে।
অতোঽহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মহামতে। ৭
বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীবনির্ম্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ।
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুং বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ং॥
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্রবান্ধবো রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ॥ ৯

(অধ্যাত্মরামায়ণম্ সুন্দরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

"হে রাবণ বিবেকবলে লোকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসারমোচনী দৈবীগতি অবলম্বন কর। তুমি উত্তম বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণ, তুমি পুলস্ত্য ঋষির পৌত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা; দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেও তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর তত্ত্বজ্ঞান মতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি রাক্ষস নহ ইহা আর বলিতে হইবে না। শরীর বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় হইতে সম্ভূত দুঃখরাশি তোমার নহে, এবং তুমিও শরীর, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ; কেননা তুমি নির্ব্বিকার।

যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিতেদেখিতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া বিবেচনা করে, অথচ বস্তুতঃ তাহা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ এই অজ্ঞানমূলক সুখ দুঃখাদি অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু, বস্তুতঃ তাহা অলীক। তোমার বিকার নাই, একমাত্র তুমি সত্য, তুমি ভিন্ন অতিরিক্ত বস্তু নাই বলিয়া বিকারের হেতু অজ্ঞানও সত্য

নহে। যেমন আকাশ জগদ্ব্যাপক হইলেও ধূলি প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম তুমি দেহ সংশ্লিষ্ট হইলেও সুখদুঃখাদি দ্বারা লিপ্ত হও না। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি অথবা সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিলেই জীব সকল বন্ধনে বদ্ধ হয়। আমি চৈতন্য মাত্র, আমি জন্মরহিত, আমি অবিনাশী এবং আমি আনন্দস্বরূপ, ইহা বুঝিলে জীব মুক্ত হয়। দেহ আত্মা নহে, কেননা উহা পৃথিব্যাদির বিকারে উৎপন্ন, প্রাণ আত্মা নহে, কারণ তাহা বায়ুমাত্র, মন অহঙ্কারের বিকার, অতএব তাহা আত্মা নহে, এবং প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন বুদ্ধিও আত্মা নহে। আত্মা চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ—তাঁহার বিকার নাই, তিনি কাহারও বিকারসম্ভূত নহেন। আত্মা দেহাদিপ্রকৃতিসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত, ঈশ্বর, নিরঞ্জন ও সর্ব্বদা নিরুপাধি (সুখ দুঃখাদি উপাধিশূন্য)। আত্মাকে এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যাহাতে তোমার এইরূপ ধারণা হয়, সেইজন্য তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। হে মহামতে! মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বিষ্ণুভক্তি হইতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা হইতে নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব সেই পুরাণ পুরুষ প্রকৃতির পরস্থিত বিভু রমাপতি শ্রীহরি রামকে ভজনা কর। মূর্খতা ও তাঁহার প্রতি শত্রুতা ত্যাগ কর। সীতাকে প্রত্যার্পণ করিয়া শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুত্রপৌত্রাদি বন্ধু বান্ধবগণ সহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

উপসংহারে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং মহাবীর হনুমান্ সম্বন্ধে উত্তরকাণ্ডে কি বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"অতুলং বলমেতদ্বৈ বালিনো রাবণস্য চ।
নত্বেতাভ্যাং হনূমতা সমস্তিতি মতির্ম্মম॥
শৌর্য্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ॥

দৃষ্টৈব সাগরং বীক্ষ্য সীদন্তীং কপিবাহিনীম্।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ॥
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তদা।
দৃষ্ট্বা সম্ভাষিতা চাপি সীতাহ্যাশ্বাসিতা তথা॥
সেনাগ্রগামন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ।
এতে হনূমতা তত্র একেন বিনিপাতিতাঃ॥
ভূয়ো বন্ধাদ্বিমুক্তেন ভাষয়িত্বা দশাননম্।
লঙ্কা ভস্মীকৃতা যেন পাবকেনেব মেদিনী॥
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্বিত্তপস্য চ।
কর্ম্মাণি তানি শ্রূয়ন্তে যানি যুদ্ধে হনূমতঃ॥
এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা সীতা চ লক্ষ্মণঃ।
প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ॥
হনূমান্ যদি মে ন স্যাদ্বানরাধিপতেঃ সখা।
প্রবৃত্তিমপি কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ॥
(উত্তরকাণ্ড, চত্বারিংশ সর্গ)

"বালির এবং রাবণের বলের তুলনা নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা কেহই হনুমানের সমকক্ষ নহে। বিশেষতঃ শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্রকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নয়সাধন, বিক্রম এবং প্রভাব সমস্ত গুণই একাধারে হনুমানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাগর দেখিয়া বানর সৈন্য যখন অবসন্ন হইল, তখন মহাবাহু হনুমান্ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া শতযোজন বিমানপথে অতিক্রম করিলেন। লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতার দর্শনলাভকরতঃ মিষ্টবচন দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, সেনাপতিগণ মন্ত্রিতনয়গণ, ভৃত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে হনুমান্ একাকী তথায় নিহত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া অগ্নিসংযোগে মেদিনীর ন্যায় লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছেন। যুদ্ধে হনুমানের যেরূপ পরাক্রম দেখিয়াছি তাহা যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও শ্রুত হয় না। ইহার বাহুবলপ্রভাবে রাজ্য, জয়, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূত হইয়াছে।

বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি আমার সহায় না হইত, তাহা হইলে জানকীর অনুসন্ধান করিতে আর কে পারিত?"

প্রাগুক্ত রামায়ণোদ্ধৃত শ্লোকাবলী পাঠে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কি ঔপনিষদিক জ্ঞানবাদ, কি গীতোক্ত কর্ম্ম ও কি ভক্তিবাদ সকল বিষয়ে মহাবীর জগতে উচ্চতম আসন লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হনুমান্‌জী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হনুমান্ বার তিথি নক্ষত্র জানিতেন না, কেবল রাম চিন্তা করিতেন। তিনি বলিতেন, 'রাম, কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, কখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ, কখনও দেখি তুমিই আমি আমিই তুমি।'" ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ এই ভাবত্রয়ের পূর্ণবিকাশ মহাবীরের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চাধিকার চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্য নির্ণয় করে। যিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের ভিত্তি তত দৃঢ় হইয়াছে। জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সাহায্যে যে সমস্ত উচ্চ বিষয় ধারণা করা যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিকের মনে তদপেক্ষা উচ্চতর অতীন্দ্রিয় বিষয় স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পায়।

ধর্ম্মজগতে মহাবীর কত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার আজীবন প্রভুসেবা, প্রভুভক্তি ও প্রভুচিন্তা জগতে অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি যে সর্ব্বনীতিবিশারদ, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ হইবেন এবং অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল উপলব্ধি করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কে তাঁহার ন্যায় আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রভুকার্য্যে জীবনপাত করিয়াছেন, কে তাঁহার ন্যায় প্রভুর নামসুধা পান করিবার জন্য চিরকাল অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করিয়াছেন, কে তাঁহার ন্যায় শত যোজন সাগর লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপ্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং শত্রুকুল নিধন করিয়া বীরত্বের অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন? বস্তুতঃ, একাধারে এরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়মূর্ত্তি জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। *

---

* গত চৈত্রপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীমহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষে রাঁচিতে পঠিত।

ওঁ বেদস্তুতি।

(শ্রীবিহারীলাল সরকার)

(১)

নির্গুণ ব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জনককে, বেদসমূহের ব্রহ্মপরত্ব অর্থাৎ বেদ সকল কেবল ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে এই উপদেশ দিলেন। রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ হয়, বেদ ব্রহ্মপর হইবে কিরূপে ? বেদ, শব্দরাশি মাত্র। শব্দের মায়াময় বস্তুতে প্রবৃত্তি হইতে পারে, মায়াতীত বস্তুতে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রকারে ? শব্দের প্রবৃত্তি ত্রিবিধ—মুখ্যা, গৌণী ও লক্ষণা। ঘট শব্দ উচ্চারিত হইলে বস্তু ঘটকে নির্দ্দেশ করে, ইহাই শব্দের মুখ্যাবৃত্তি। ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, অতএব ব্রহ্মে মুখ্যা-বৃত্তি সম্ভব নহে। গৌণীর উদাহরণ "দেবদত্ত সিংহ" অর্থাৎ দেবদত্তের সিংহের ন্যায় বলবিক্রম। ব্রহ্মে গৌণীবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ। লক্ষণার উদাহরণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতে আভীরপল্লী বাস করে। "গঙ্গাতে" শব্দের মুখ্য অর্থ গঙ্গার জল-প্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা সম্ভব নহে, সে জন্য লক্ষণা দ্বারা গঙ্গার তীর বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণা প্রবৃত্তি মায়াময় বস্তুতে সম্ভব হইতে পারে বটে। কিন্তু ব্রহ্ম কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত বস্তু, সুতরাং ব্রহ্মে লক্ষণা সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্ম কোন পদের অর্থ নহেন। পদের যদি অর্থ না হন, বাক্যেরও অর্থ হইতে পারেন না। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্য নহেন। সেজন্য রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পরীক্ষিদুবাচ—

ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥

হে ব্রহ্মণ্! "গুণবৃত্তয়ঃ শ্রুতয়ঃ" শব্দরাশি মাত্র শ্রুতিরা "সাক্ষাৎ কথং ব্রহ্মণি চরন্তি" সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে কিরূপে প্রতিপাদন করিবে? কারণ, "অনির্দ্দেশ্যে" ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য—ব্রহ্মের আকার নাই, জাতি নাই, গুণ নাই; অতএব মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা বেদের ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "নিগুর্ণে" গৌণীবৃত্তি দ্বারাও ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিগুর্ণ—কোন ধর্ম্ম তাঁহাতে নাই। লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম "সদসতঃ পরে"—কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অতীত বস্তু।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবের ভোগমোক্ষ।

শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্‌জনানামসৃজৎ প্রভুঃ॥
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥ ২॥

"প্রভুঃ" ঈশ্বর "জনানাম্" অনুশয়ী জীবের "বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্" বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ "অসৃজৎ" সৃজন করিয়াছেন। (১) "মাত্রার্থং" মাত্রা অর্থাৎ প্রমিতির বিষয় অর্থাৎ অর্থ। বিষয়ার্থ বুদ্ধি সৃজন করিয়াছেন। (২) "ভবার্থং" ভব অর্থাৎ জন্ম। জন্ম কর্ম্মজন্য। ইন্দ্রিয় না থাকিলে কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছেন। (৩) "আত্মনে" আত্মা লোকান্তরগামী। মন বিনা লোকান্তর গমন হয় না। লোকভোগার্থ মন সৃজন করিয়াছেন। (৪) "অকল্পনায়" কল্পনা মায়া, কল্পনানিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্য প্রাণ সৃজন করিয়াছেন। প্রাণ বিনা মোক্ষ সম্ভব হয় না। জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই, সে জন্য তিনি "প্রভু" অর্থাৎ নিত্যমুক্ত। জীবের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের জন্য যথাক্রমে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃজন করিয়াছেন।

ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সৈষাহ্যুপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েৎ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ॥ ৩॥

"সা এষা ব্রাহ্মী উপনিষৎ" এই ব্রহ্মপরা উপনিষৎ "পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বৈঃ" অতিবৃদ্ধ সনকাদি "ধৃতা" ধারণ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তনও "যঃ" যে "তাং" সেই উপনিষৎকে "শ্রদ্ধয়া" আদরের সহিত "ধারয়েৎ" ধারণ করিবে, অর্থাৎ বাজে তর্ক না করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ধারণ করিবে, "সঃ" সেইব্যক্তি "অকিঞ্চনঃ" দেহবুদ্ধিশূন্য হইয়া "ক্ষেমং গচ্ছেৎ" পরপদ প্রাপ্ত হইবে। যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাহা উপনিষৎ। ত্রিবর্গ সাধনপরা উপনিষৎ ত্রিবর্গনিষ্ঠ মরীচ্যাদি ঋষিগণ ধারণ করিয়াছিলেন। আর ব্রহ্মপরা অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা উপনিষৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সনকাদি ঋষিগণ ধারণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ-নারদ-সংবাদ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্॥
নারদস্য চ সংবাদমৃষে র্নারায়ণস্য চ॥ ৪॥

"অত্র" এবিষয়ে "নারায়ণান্বিতাম্" নারায়ণ কর্ত্তৃক কথিত "গাথাং" ইতিহাস "তে বর্ণয়িষ্যামি" তোমাকে বলিতেছি। "ঋষেঃ নারায়ণস্য" ঋষি নারায়ণ ও "নারদস্য সংবাদম্" নারদের সংবাদও বলিতেছি। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট শুনিয়া সনন্দনাদি যাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে বলেন।

বদরিকাশ্রমে নারদের গমন।

একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ॥
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্॥ ৫॥

একদা "ভগবৎপ্রিয়ঃ নারদঃ" ভগবৎপ্রিয় নারদ "সনাতনম্ ঋষিম্" পুরাতন ঋষি শ্রীনারায়ণকে "দ্রষ্টুম্" দেখিতে "নারায়ণাশ্রমম্ যযৌ" নারায়ণাশ্রম অর্থাৎ কলাপগ্রামাখ্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

কল্পারম্ভ হইতে অদ্যাপি নারায়ণের তপস্যা।

যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ॥ ৬॥

"অস্মিন্ ভারতবর্ষে" এই ভারতবর্ষে "যঃ বৈ" যে শ্রীনারায়ণ ঋষি

"নৃণাম্" মানুষের "ক্ষেমায়" ঐহিক সুখের জন্য "স্বস্তয়ে" আমুষ্মিক মঙ্গলের জন্য "ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতং তপঃ" দয়া, তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত তপস্যা "আকল্পাৎ" কল্পের প্রথম হইতে "আস্থিতঃ" অদ্যাপিও করিতেছেন।

নারদ প্রশ্ন।

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ॥ ৭ ॥

হে কুরূদ্বহ! "কলাপগ্রামবাসিভিঃ" কলাপগ্রামবাসী শ্রীনারায়ণের ঋষিগণ শিষ্য কর্ত্তৃক "পরীতং" পরিবেষ্টিত হইয়া "তত্র উপবিষ্টম্" সেই আশ্রমে উপবিষ্ট (অর্থাৎ ব্যগ্রতারহিত) ঋষি নারায়ণকে নারদ "প্রণতঃ" প্রণাম করিয়া "ইদম্ অপৃচ্ছৎ" এই প্রশ্ন সর্ব্ব সমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ তুমি অদ্য আমাকে যে প্রশ্ন করিলে সেই প্রশ্ন করেন।

জনলোকবাসিগণের ব্রহ্ম নির্ণয়।

তস্মা অবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃন্বতামিমম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

"ভগবান্" নারায়ণ "শৃন্বতান্ ঋষীণাম্" অন্য শ্রোতা ঋষিদের সম্মুখে "তস্মৈ" নারদকে "ইদম্ অবোচৎ" এই কথা বলিলেন। "যঃ" যাহা "পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্" জন, তপঃ, সত্যলোক-নিবাসী বৃদ্ধগণের "ব্রহ্মবাদঃ" ব্রহ্মবিষয়ক নির্ণয়। [জন অর্থাৎ জন, তপঃ, ও সত্যলোক]

জনলোকে ব্রহ্মসত্র।

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৯ ॥

"শ্রীভগবান্" ঋষি নারায়ণ বলিতেছেন— 'হে স্বায়ম্ভুব!" নারদ

"পুরা" কল্পের আদিতে "জনলোকে" জনলোকে "তত্রস্থানাং মানসানাং" তত্রস্থ মানসজাত "ঊর্দ্ধরেতসাম্ মুনীনাম্" ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রতধারী মুনিদের মধ্যে "ব্রহ্মসত্রম্ অভবৎ" ব্রহ্মসত্র হইয়াছিল। [যেখানে সমান যজমানগণের মধ্যে একজন ঋত্বিক্ হইয়া কর্ম্ম করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের সকলের তুল্যফল হয় সেই কর্ম্মকে কর্ম্মসত্র বলে। যেখানে সমান সাধুরা ব্রহ্মজ্ঞাপনার্থ একজন বক্তা অপরে শ্রোতা হইয়া ব্রহ্মমীমাংসা করেন, উহা ব্রহ্মসত্র।]

মনুষ্যলোকে এ বিষয়ে এই প্রথম প্রশ্ন।

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়োঃ যত্র শেরতে।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্ন স্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি॥ ১০॥

তুমি ইহা জানিতে পার নাই, কারণ, "তদীশ্বরম্ দ্রষ্টুং" তত্রস্থ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিতে "ত্বয়ি শ্বেতদ্বীপং গতবতি" তুমি শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলে। সেই সময়ে "যত্র শ্রুতয়ঃ শেরতে" যেখানে শ্রুতিরা নিদ্রা যায় অর্থাৎ নিবৃত্ত ব্যাপার হয়, "তত্র" সেই জনলোকে "ব্রহ্মবাদঃ" ব্রহ্মবিচার "সুসংবৃত্তঃ" আরম্ভ হইয়াছিল। "ত্বং মাং যম্ অনুপৃচ্ছসি" যে প্রশ্ন তুমি আমাকে করিতেছ "তত্র" সেই জনলোকে "অয়ম্ প্রশ্নঃ" এই প্রশ্ন "অভূৎ" হইয়াছিল। জনলোকের পর তুমি এই প্রশ্ন করিলে। তোমার পূর্ব্বে এখানে আর কেহ এ প্রশ্ন করে নাই।

সনন্দন বক্তা, সনকাদি শ্রোতা।

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে॥ ১১॥

"তুল্যশ্রুততপঃশীলাঃ" জনলোকে তাঁদের অধ্যয়নাদি তুল্য, জিতেন্দ্রিয়ত্বাদি তুল্য, স্বভাব তুল্য। "তুল্যস্বীয়াবিমধ্যমাঃ" সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হেতু তাঁহাদের মিত্র, অরি ও উদাসীনের প্রতি সমদৃষ্টি ছিল অর্থাৎ তাঁহারা নিরুপম করুণ। "অপি" অতএব সকলেই প্রবচন-যোগ্য। তথাপি শ্রৌতবিচারকুতূহলবশতঃ "একম্" সনন্দনকে

"প্রবচনম্" প্রবক্তা করিলেন। "অপরে, শুশ্রূষবঃ" সনকাদি অপর ঋষিগণ শ্রোতা হইলেন অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা হইলেন একজনকে বক্তা না পাইলে স্ফূর্ত্তি হয় না।

শ্রুতিগণের নিদ্রিত ভগবান্‌কে প্রবোধন।

শ্রীসনন্দন উবাচ—

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥ ১২।

সনন্দন বলিতেছেন—"স্বসৃষ্টম্ ইদম্" নিজসৃষ্ট এই বিশ্ব "আপীয়" প্রলয়কালে সংহার করিয়া "শক্তিভিঃ সহ শযানং" সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন প্রকৃতিপুরুষকালাদি শক্তিসহ যোগদেহনিদ্রিতের ন্যায় বর্ত্তমান "পরম্" ভগবান্‌কে "তদন্তে" প্রলয়ান্তে "শ্রুতয়ঃ" প্রথম নিশ্বাসাবির্ভূত শ্রুতিরা অর্থাৎ শ্রুত্যধিষ্ঠাতৃ দেবতারা "তল্লিঙ্গৈঃ" ঈশপ্রতিপাদক বাক্য দ্বারা "বোধয়াঞ্চক্রুঃ" প্রবোধন করিতে লাগিলেন।

স্তাবকের ন্যায় শ্রুতিগণের ভগবান্‌কে প্রবোধন।

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ॥
প্রত্যুষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥ ১৩॥

"যথা" যেরূপ "শয়ানং সম্রাজং" শযান সম্রাট্‌কে "প্রত্যুষে" প্রাতঃকালে "অনুজীবিনঃ বন্দিনঃ" অনুজীবী স্তাবকেরা "অভ্যেত্য" জানুপাতিয়া "তৎপরাক্রমৈঃ সুশ্লোকৈঃ" সম্রাটের দিগ্বিজয়াদি ও জগৎকর্ত্তৃত্বাদি পরাক্রমবোধক শোভন কীর্ত্তিবচন দ্বারা "বোধয়ন্তি" প্রবোধন করে।

শ্রুত্যধিষ্ঠাতৃ দেবতারা বর্ণভেদে অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়া অষ্টাবিংশতি পদ্য দ্বারা স্তব করিতেছেন।

(১)

জীবের অবিদ্যানাশ কেবল ভগবান্ করিতে পারেন। ব্রহ্ম যে কি তাহার প্রমাণ কেবল শ্রুতি।

শ্রীশ্রুতয় উচুঃ—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকতে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ১॥ ১৫॥

প্রথম শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা বলিতেছেন,

হে অজিত! জয় জয়। উৎকর্ষ আবিষ্কার কর।

প্রশ্ন—কিরূপে উৎকর্ষ আবিষ্কার করিব?

উত্তর—"অগজগদোকসাম্ অজাং জহি" স্থাবর জঙ্গম শরীরী জীবের "অজাং" অবিদ্যা নাশ কর। ['অগ—স্থাবর, জগৎ—জঙ্গম; ওকঃ—বাসস্থান।]

প্রশ্ন—গুণবতী অবিদ্যাকে কেন নাশ করিব?

উত্তর—সত্য বটে অবিদ্যা গুণবতী। কিন্তু "দোষগৃভীতগুণাং" আনন্দ আবরণের জন্য অবিদ্যা গুণগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বৈরিণীর ন্যায় পরপ্রতারণার জন্য গুণগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব হন্তব্যা। [গৃভীত—গৃহীত, ভকার ছান্দস।]

প্রশ্ন—তাহা হইলেও আমাতে দোষ পড়ে।

উত্তর—"যৎ ত্বম্" যেহেতু তুমি "আত্মনা" স্বরূপে "সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ" সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্রান্ত হইয়া আছ। তুমি মায়াকে বশ করিয়া আছ। মায়া তোমার বশে। তুমি মায়ার বশে নও।

প্রশ্ন—জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা অবিদ্যা নাশ করুক না কেন?

উত্তর—তুমি যে "অখিলশক্তিঅববোধকঃ" অখিল শক্তির অববোধক। তুমি জীবের অন্তর্যামী অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তির উদ্বোধক। অতএব জ্ঞানের পূর্ব্বে জীব স্বতন্ত্র নহে। জীব তোমার অধীন। "কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

প্রশ্ন—আমি অকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট এ বিষয়ে প্রমাণ কি?

উত্তর—শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ।

"ক্বচিৎ" কদাচিৎ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির সময় "অজয়াচরতঃ" মায়ার

সঙ্গে ক্রীড়া কর "আত্মনা চ" তখনও তোমার ঐশ্বর্য্যের লোপ হয় না অর্থাৎ তুমি সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ একরস আত্মরূপে বর্ত্তমান থাক। সেই সৃষ্ট্যাদি সময়ে "নিগমঃ অনুচরেৎ" বেদসমূহ তোমাকে প্রতিপাদন করে। ["চরতঃ বর্ত্তমানস্থ তব" কর্ম্মে ষষ্ঠী] অর্থাৎ বেদসমূহ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং বলিয়া তোমাকে প্রতিপাদন করে।

প্রশ্ন—বেদ কিরূপে আমাকে প্রতিপাদন করে ?

উত্তর—(১) ভৃগু বরুণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মের লক্ষণ কি ? বরুণ বলিলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, প্রাণ ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়, নাশ কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে এবং তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম। যেহেতু উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশকালে ভুতগণ "আত্মতা" ত্যাগ করিতে পারে না সেই হেতু উহাই ব্রহ্মের লক্ষণ।

(২) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।" যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদিকে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাকে বেদরাশি প্রদান করিয়াছেন মুমুক্ষু আমি সেই আত্মান আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক দেবের আশ্রয় লইলাম।

(৩) উদ্দালক—অন্তর্যামী কে বলুন ?

যাজ্ঞবল্ক্য—"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো যং আত্মা ন বেদ যস্য আত্মা শরীরম্ য আত্মানমন্তরো যময়তি এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" যিনি জীবাত্মাতে অবস্থিত হইয়াও জীবাত্মা হইতে দূরস্থ আত্মা, এই জীবাত্মা যাঁহাকে জানেন না, যাঁহার শরীর এই জীবাত্মা, যিনি জীবাত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া নিয়মন করেন, ইনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা।

(৪) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম।

(৫) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ যঃ সর্ব্ববিৎ।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ যিনি সর্ব্ববিৎ তিনিই ব্রহ্ম। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তোমাকে এইরূপে প্রতিপাদিত করে।

স্বামিকৃত স্তব।

জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপানীতমৃষা গুণাম্।
নহি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণব তানব॥

হে অজিত! জয় জয়! স্থাবর জঙ্গম জীবের আনন্দাবরক মিথ্যাগুণালঙ্কৃতা অবিদ্যাকে নাশ কর! হে নিগমগীতগুণার্ণব! তোমা ছাড়া জীবগণের উৎকর্ষ হইতে পারে না! স্থাবর জঙ্গম জীবগণকে "অব" রক্ষা কর।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

মঠ, বেলুড়।
১৩।১২।১৫।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

মা— তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত শুক্রবারে মহারাজ এখানে এসেছেন। তাঁহাকে তোমার চিঠির কথা শুনাই-লাম, তুমি এখানে আসিতেছ শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। —র শ্রীচরণ দর্শন করে তোমার বাসনা তৃপ্ত হয়েছে এ অতি সৌভাগ্যের বিষয় জানবে। তুমি যথার্থই ভক্ত লোক। এখানে ফিরিবার পূর্ব্বে আবার একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কর আমার ইচ্ছা। আর ঞ— বী— এদেরও একবার করে তাঁর দর্শনে পাঠাবে। ওখান থেকে কেহ না অমনি ফেরে। যা খরচা হয় আমায় লিখিলে পাঠাব। গুরুদর্শনে রিক্ত হস্তে যেতে নেই, কিছু কিছু নিয়ে যাবে। তাঁর কাজ কর্ম্ম ভাল করে দেখে শিখে আসবে—জীবন কি করে চালাতে হয়।

কেবলমাত্র জপ করলেই সিদ্ধ হয় না। আদর্শ জীবন না দেখলে, কি করে বুঝবে আমাদের উদ্দেশ্য এই? ঐ স্থানে থেকে কিছুদিন তাঁর-সেবা করে ধন্য হয়ে যাও, মানবজীবন সার্থক কর—ইহাই আমার অন্তরের বাসনা। কি ধৈর্য্য, কি ক্ষমা, কতই সহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি ঘর করেন এইখানেই দেখবে। অমনটী জগতে আর কখনও হয় নাই ইতিপূর্ব্বে। তাঁহাকে দেখে যদি জীবন তৈয়ার না হয় তবে আর আশা নাই জানবে। তাঁকে দেখাও যা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাও তাই। এই খানেই তিনি কি বস্তু ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে। কত উদার, কত ভালবাসা অনুভব করবে। তাঁকে দেখলে অভিমান অহঙ্কার নিশ্চয় পালাবে। ভাল করে তাঁর আচরণগুলি শেখবার চেষ্টা করো। তাঁর অসীম কৃপা জীবের উপর। আমরা এক কণা পেলেই পূর্ণ হয়ে যাব। ক্ষুদ্র আধার নিয়ে এসেছি, কত আর ধরবে? মগ্ন হও, ডুবে যাও, এই প্রার্থনা। তোমরা সবাই আমার ভালবাসা জানবে। আমি তোমাদের তোমরা আমার। ইতি—

তোমাদেরই প্রেমানন্দ।

(২)

বেলুড় মঠ।

৬।৪।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ওখানকার কার্য্য উত্তমরূপে চলছে জেনে সকলেই আনন্দিত। বিশ্বাস কর,—যা কিছু হচ্ছে জানবে প্রভুর শক্তিতে, তোমরা যন্ত্র মাত্র। ঐ কর্ম্মকে কর্ম্ম মনে করবে না, কেবল নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তে চেষ্টা করিও। ওতেই বন্ধন ছুটে যাবে। একই ঔষধে অনুপান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়। তেমনই কর্ম্মই বন্ধন, আবার অনাসক্ত হয়ে ভগবৎ উদ্দেশে কর্ত্তে পারলে ওতেই ভক্তি মুক্তি লাভ হয়। নাম, লৌকিকতার দিকে নজর

রাখ্‌লেই গোল্‌ বাধে।—কে বলিও ঐ কর্ম্মকে সাধন ভজন ত্যাগ তপস্যা যেন মনে করে। দেখেছি, রসে বসে ধ্যান কত্তে গিয়ে ঢুলছে। এই চাও না।সেবা কত্তে কত্তে দিলাম শরীরপাত করে—কোনটা শ্রেষ্ঠ? তবে গোঁ কিম্বা অতি পরিশ্রম উচিত নয়। শরীরের দিকে খুব নজর রাখ্‌বে। সময়ে স্নান আহার বিশেষ দরকার। নিয়মমত নিদ্রা চাই। সকল কাজ ভালবাসা দ্বারা যেন চলে, কঠোর আইন কানুন ভাল নয়। স্নেহ, প্রীতি, প্রেম যেন তোমাদের মূল মন্ত্র হয়। এতেই ছেলেরা মেতে যাবে—প্রাণ দেবে। মঠে থেকে থেকে এই শিখিছি যে, ছেলেরা যদি কোন দোষ করে, বিচার করে দেখি, সেটা তাদের দোষ নয়, যা কিছু অপরাধ সে আমারই। তাই আপনার কল্যাণ যদি চাও নিজের দুর্ব্বলতা শোধরাতে চেষ্টা কর। সর্ব্বদা আপনার দিকে দৃষ্টি রাখ। যদি খুঁত হয় সে আমারই, ঠাকুর ইহা খুব শিখাচ্ছেন। যদি বড় হতে চাও, সকলকে বড় দেখ—মহৎ দেখ। বীর বিবেকানন্দের আদেশ—'হে বঙ্গীয় যুবকগণ তোমরা জগতে শ্রেষ্ঠ হবেই হবে।' সাক্ষাৎ শিববাক্য, বিশ্বাস কর। * * * যুবকগণ, সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন তোমাদের আদর্শ, উহাই অনুসরণ কর, তবেই নব বলে বলীয়ান্ হবে নিশ্চয় জেনো। সর্ব্ব-শক্তির আধার আমাদের প্রভু! * * * সুবিধা মত পড়াশুনা করবে। লোকজনের সঙ্গে খুব মিশ্‌বে, ন্যারায়ণ জ্ঞানে।—কে বলো কিছু ভাবনা নাই! মহারাজ তার কথা অনেক সময়েই জিজ্ঞাসা করেন। তোরা হচ্ছিস মা'র সন্তান, তোদের আবার ভয় ভাবনা কি? * * * মহারাজ ভাল আছেন। মঠের মঙ্গল, আজ কাশী যেতে হবে চার জনের। মঠে নিত্য উৎসব চলেছে। সাড়া পড়ে গেছে জগৎ জুড়ে। এখন কেবল 'লোক পাঠাও' 'লোক পাঠাও' এই রব শুনছি। শান্তিপ্রচারে তোমাদের জীবন আহুতি দাও। আমাদের ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(৩)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৭।৪।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু,

ম—তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। * * * মিশনের ঘর বাড়ী হচ্চে—উত্তম, সেই সঙ্গে তোমাদেরও ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ বৈরাগ্য বাড়ুক্, নতুবা ঐসব ঐশ্বর্য্য বন্ধন ও বিড়ম্বনার কারণ মাত্র। তোমরা সকলে —র কাছে দীক্ষা নিয়েছ, ঘর দোর ত্যাগ করে এসেছ, ভক্তি-মুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তত্রাচ যে তোমরা তিন জনে একমন একপ্রাণ হতে পাচ্ছনা এ অতি আক্ষেপের বিষয়! আমরা যে বলে বেড়াই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সব এক হতে হবে; এগুলি কি কথার কথা—মনের ব্যথা নয়? তবে আর আমাদের —র দর্শনে কি লাভ হল? কি শিখলুম তাঁর অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবন দেখে? প্রভুদর্শনে সব বন্ধন কেটে যায়, যেমন সূর্য্যোদয়ে আঁধার পালায়। আমাদের কি অভিমান-আঁধার দূর হয়ে ভক্তি প্রেমের উদয় হবে না? * * * তিনটে লোক এক হতে পার না, দম্ভ দূর কত্তে পার না, ভালবাসায় মেতে আপন-হারা হতে পার না, জ্যান্তে মরা হতে পার না, আবার চাও কিনা ভগবান্? তোমরা নাকি আবার ঠাকুর পূজা কর, * * শিবজ্ঞানে জীবসেবা কর—ধিক্ তোমাদের! যদি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা না থাকে তবে তোমাদের পড়াশুনা পাঠ পূজা প্রচার সব কথা!

ঠাকুর বলেছেন, ভক্তের জাতি নাই। আমরা যে জগৎ জুড়ে একটা জাত বাঁধবার ইচ্ছা করি। * * * দেখ বাবা, এখনও সময় আছে। তোমরা ছেলে মানুষ, তোমাদের মন কাঁচা, প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে কাঁদ ও প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেনই দেবেন। 'আমি' 'আমার'গুলো ফেলে দাও। আজ থেকে একমন একপ্রাণ তোমাদের হয়ে যাক্ প্রভুর কৃপায়। তিনি তোমাদের শুভ বুদ্ধি দিন এই নিবেদন। মনের কথা যখন বলে ফেলেছ তাতে ভালই হবে।

তোমার একলার জন্য নয়, সকলের জন্যই ইহা লিখ্‌লাম। তোমার প্রতি আমার ক্রোধ নাই, কাহারও উপর নাই। তোমাদের কল্যাণের জন্যই লিখ্‌লাম; তোমাদের আপনার ভাবি বলে। * * * ভালবাসা এলে গলে যাবে, আনন্দ পাবে। ভাল ভাল জিনিষ পেলে নিজে না না খেয়ে ভাইদের খেতে দিও, এই করে ভাব বাড়ে ভক্তি আসে। পরস্পর কেবল গুণ দেখ্‌বে, দোষের দিকে মোটেই নজর দেবে না। দোষ দেখ্‌ব—কি বিপদ! ওতে কোন লাভ নাই। আমরা এই ভাবে বরানগরে ছিলাম। উত্তম দ্রব্য পেলেই ভাইদের খাওয়াতাম। আমার আবার হাত পা ধরে মুখে গুঁজে দিত উত্তম খাবার। একদিন নরেনকে দেখ্‌তে না পেলে দৌড়ুতুম কল্‌কাতা। আর নরেনের কি টান, কি অসীম স্নেহ—শেষ দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত! সে সব যেন এখন উপকথা! দেখ্‌ রা— ভায়া মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে শুন্‌লে আমার ভিতরটা যেন ফাঁক হয়ে যায়, খালি খালি বোধ হয়।

মনটা কিছু না কিছু নিয়ে থাক্‌বেই থাক্‌বে, তবে ভক্ত ভগবান্ নিয়ে থাকা ভাল। যখন ঘর ছেড়েছ, তখন ভক্তদের পরম আত্মীয় বলে জান্‌বে। এরই নাম সাধন ভজন, যোগ যাগ, ত্যাগ তপস্যা। ভালবাসায় হয়ে যাও আত্মহারা—মাতোয়ারা, ভুলে যাও 'আমি' 'আমার'। দেখ্‌বি ক্ষুদ্র 'কাঁচা আমি'টা গেলে ভিতর থেকে আসল বস্তু বেরোবে, আর মহানন্দে চিদানন্দে ভাস্‌বি!

দেখ্, তোদের আপনার মনে করি তাই মন্দ বলি, মঙ্গলের জন্য। আর কারুকে পর কত্তে ইচ্ছা হয় না, সারা সংসারকে আপন কত্তে ইচ্ছা করে। দুনিয়া শুদ্ধ আপনার হয়ে যাক্।

চা—দাদার কাছে চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, কথামৃত, স্বামিজীর গ্রন্থাবলী, বীরবাণী এই সব পড়্‌বে, আর ধ্যান, জপ, বিচার করবে। নিজ নিজ দোষ বা'র কত্তে চেষ্টা ও শোধরাবার কৌশল শিক্ষার নাম সাধন। পরের গুণ সর্ব্বদা দেখ্‌লে ও সাধ্যমত অনুকরণ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হওয়া যায়। এই জীবনে যদি সিদ্ধ হতে না পার তবে সহস্র জন্মে হয় কিনা সন্দেহ। বিশ্বাস কর এই শরীরেই

হবে—হবে—হবে, মোহ কেটে যাবে/ আঁধার দূর হবে। * * *
সবাই ভাল এই 'আমি'ই মন্দ, এইটাকে দূর কত্তে পারলেই বেড়ার বাহির হওয়া যায়।

সকলকে—যে যে আছে প্রত্যেককে—আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবে ও তুমি জানবে। আমরা ভাল আছি। খুব ধূম চলেছে মঠে। চারদিক্ হ'তে নিমন্ত্রণ আসচে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।*

(শ্রীগোকুল দাস দে, এম এ)

বৈরাগ্যের লীলাভূমি ভারতগৌরব শৈলরাজ হিমালয়ের সানুদেশে শাক্যপুরী নামে একসময় এক ক্ষুদ্র জনপদ বর্ত্তমান ছিল। সেই পুণ্য পুরীই শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মস্থান। রোহিণী নদী এই স্থানটীর পাদমূলে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে ধনধান্যে সর্ব্বদা পূর্ণ ও অতুল-বৈভবশালী করিয়াছিল। বহুপূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুরাজ তাঁহার প্রিয়তমা রাণীর সন্তানকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছায় অপর মহিষীজাত করণ্ডক, হস্তীনিক এবং সিনিপুরকে নির্ব্বাসিত করেন। ইঁহারাই শাক্যজাতির আদিপুরুষ। গরিমাপূর্ণ ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্যগণ কখন নিজ জাতিবর্গ ছাড়িয়া ভিন্ন কুলে বিবাহাদি বা অন্য কোন ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে যাইতেন না। স্বদেশনিবদ্ধ এই শাক্যজাতি শ্রীবুদ্ধের জন্মপরিগ্রহের সময় বিলাসবৈভবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য অন্য জাতির নিকট কোন প্রয়োজনে কখন দ্বারস্থ হন নাই বা মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদিগের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তাঁহারা কখনও হিংসাপরবশ হইয়া কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন না। সংগ্রামে শত্রুর প্রাণনাশ তাঁহাদের বড়ই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল বলিয়া

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণোৎসব সভায় পঠিত।

কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহাদিগকে দেখা যাইত না।
তখন মহারাজ শুদ্ধোদন শাক্যদিগের নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

"ভূভৃৎপরার্ধ্যোঽপি সপক্ষ এব প্রবৃত্তদানোঽপি মদানুপেতঃ।
ঈশোঽপি নিত্যং সমদৃষ্টিপাতঃ সৌম্যস্বভাবোঽপি পৃথুপ্রতাপঃ॥"

তিনি রাজাধিরাজ হইয়াও স্বজনমণ্ডলীবেষ্টিত থাকিতেন, তিনি দানে মুক্তহস্ত হইয়াও অহঙ্কারবর্জ্জিত ছিলেন, একছত্র সম্রাটের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়াও তাঁহার পক্ষপাত ছিল না এবং প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাব সৌম্য ছিল। মহারাজ শুদ্ধোদনমহিষী মায়াদেবী

"প্রজাসু মাতেব হিতপ্রবৃত্তা গুরৌজনে ভক্তিরিবানুবৃত্তা।
লক্ষ্মীরিবাধীশ কুলে কৃতাভা জগত্যভূত্তমদেবতা যা॥"

মাতার ন্যায় প্রজাদিগের মঙ্গলবিধানে যত্নবতী ছিলেন। স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভক্তির ন্যায় গুরুজনের সেবায় নিরত থাকিতেন এবং রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই বংশের প্রদীপস্বরূপ হইয়া জগতের সম্পৎবিধায়ক শ্রেষ্ঠ দেবতার মত বিরাজ করিতেন।

তখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তসমাজ বিলাসিতার বিপুল স্রোতে নিমগ্ন হইয়া এক মহা বিপদের দিকে তাড়িত হইতেছিল। ধর্ম্মকে ইহলোক-সর্ব্বস্ব ভোগতৃষ্ণায় পর্য্যবসিত করিয়াও লোকে তৃপ্তি পাইতেছিল না। অতৃপ্ত বাসনায় ইহলোকে অধিকতর ভোগসুখের জন্য এবং পরলোকে তদপেক্ষাও সুখকর স্বর্গলাভের আশায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে অপরিসীম পশুহত্যা, এমন কি, নরহত্যাও সাধিত হইত। কেবল জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু ব্যতীত ভোগের আর অন্য অন্তরায় ছিল না। বোধহয় তাহারা জগৎকারণ ঈশ্বরকেও সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময় বোধিসত্ত্ব ৩০টী পারমিতায়পূর্ণ হইয়া তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। দেবমণ্ডলী আসিয়া তাঁহাকে নরলোকের এই দারুণ দুরবস্থা মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অবতরণের সহায়-স্বরূপ ৫টী মহাবিলোকন (দর্শনযোগ্য বস্তু) যথা, (১) সময় (২) মহা-দেশ, (৩) দেশ, (৪) জাতি এবং (৫) গর্ভধারিণীর অন্বেষণ করিয়া

দেখিলেন অবতীর্ণ হইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তখন তিনি জন্মগ্রহণের জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র মহাদেশ ভারতভূমির অন্তর্গত শাক্যস্থান, শাক্যজাতি ও জননী মায়াদেবীকেই নির্দ্ধারিত করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক আষাঢ় পূর্ণিমায় চিন্ময় মহাকায় ষড়্‌দন্তযুক্ত শ্বেতহস্তীর আকারে উত্তরাস্য হইয়া জননীগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে বৈশাখী পূর্ণিমার উদয় হইল। পূর্ণগর্ভা মায়াদেবী লুম্বিনী-উদ্যানে সমাগতা। তখন নিদাঘসমাগমে সমস্ত উদ্যান এক রমণীয় শ্রী ধারণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেমন মায়াদেবীর অন্তরে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আভাস ফুটিয়া উঠিল অমনি সহসা তাঁহার প্রসবকাল উপস্থিত হইল। মানসসুষমার পরমাধার ভগবান্ বুদ্ধদেব এই শুভ মুহূর্ত্তে যেন বাহ্য ও অন্তর্জগতের চরম সৌন্দর্য্যসমূহের একত্র সমাবেশ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন।

"বাতা ববুঃ স্পর্শসুখা মনোজ্ঞা দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ।
সূর্য্যাৎ স এবাভ্যধিকং চকাশে জজ্বাল সৌম্যার্চ্চিরনীরিতোঽগ্নিঃ॥"

স্পর্শসুখকর ফুল্লবায়ু বহিতে লাগিল, দিব্য বস্ত্র সকল আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইল এবং নবজাত কুমার সূর্য্যের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর হইয়া বিরাজিত হইলে দীপশিখা বায়ুস্পর্শ ব্যতীত ম্লান হইল। জন্মের পর রাজ্যের সকল অর্থ সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মহারাজ তাঁহার 'সিদ্ধার্থ' নাম রাখিলেন। রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দ হইতে লাগিল। কেবল মহারাজাকে নিদারুণ নির্ব্বেদ প্রদান করিয়া মায়াদেবী স্বল্পকাল মধ্যে স্বর্গগতা হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং শুদ্ধোদনের অপর মহিষী মহাপ্রজাপতী গোতমী মাতার ন্যায় কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি অসিত ধ্যানবলে তাঁহার জন্ম অবগত হইয়া কুমারকে দর্শন করিবার জন্য শাক্যরাজভবনে অতিথি হইলেন। মহারাজ শুদ্ধো-দনের আজ্ঞায় কুমার ধাত্রীর ক্রোড়স্থ হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে ঋষিবর সেই দ্বাত্রিংশৎ-মহাপুরুষলক্ষণসমন্বিত মহাযোগী বালককে দেখিয়া স্বর্গমুখী হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধোদন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঋষিবর, আমার এই সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত বালককে দেখিয়া আপনি কাঁদিতেছেন কেন? ইহার কি কোনরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা করেন?' পরে কুমারকে দেখাইয়া বলিলেন,

"অপ্যক্ষয়ং মে যশসো নিধানং কচ্চিদ্ধ্রুবো মে কুলহস্তসারঃ।
অপিপ্রযাস্যামি সুখং পরত্র সুপ্তেঽপি পুত্রেঽনিমিষৈক চক্ষুঃ॥"

"আমার এই যশের নিধান অক্ষয় হইবে ত? আমার পবিত্র কুলের এই প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে না ত? আমি ত সুখে পরলোক গমন করিতে পারিব? মুনিবর, পুত্র সুপ্ত থাকিলেও আমার চক্ষু অনিমেষদৃষ্টিতে তাহার উপর পতিত থাকে।" উত্তরে ঋষিবর বলিলেন, "রাজন্, আমি সেজন্য শোক করিতেছি না। আমি শোক করিতেছি কারণ, আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি আর ইঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ধর্ম্মসুধা পান করিবার অবসর পাইব না।"

"বিহায় রাজ্যং বিষয়েষনাস্থস্তীব্রৈঃ প্রযত্নৈরধিগম্যতত্ত্বং।
জগত্যয়ং মোহতমোনিহন্তং জ্বলিষ্যতি জ্ঞানময়ো হি সূর্য্যঃ॥"

"ইনি বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য ও কঠোর প্রযত্নের দ্বারা পরম তত্ত্ব লাভান্তে জগতের মোহনাশকর জ্ঞানময় মহাসূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইবেন।"

"অস্যোত্তমাং ধর্ম্মনদীপ্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ॥"

"তৃষ্ণার্ত্ত জীবলোক ইঁহার প্রবর্ত্তিত বিমল ধর্ম্মনদীর জল পান করিয়া একদিন শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু আমি তাহা দেখিতে পাইব না।"

মহর্ষির বচনে রাজা আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পর কুমারের গৃহত্যাগ চিন্তা করিয়া মহা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতায় অভ্যস্ত হইলে বোধ-হয় পুত্রের সংসারে উদাসীন হওয়া দুর্ঘট হইবে। তজ্জন্য যাহাতে সংসারের শোকদুঃখের ছবি কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত না হয় সেইরূপ বিধান করিয়া তিনি কেবল মোহকর কৌতুক বিলাসের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কুমারের জন্য শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতুর উপযুক্ত

তিনটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং তাঁহাকে অনন্যচিত্তে সর্ব্বদা সেই সকল প্রাসাদে অপূর্ব্ব নৃত্যগীত ও সৌন্দর্য্যে মগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। কুমার এইরূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বহুপরে ভিক্ষুদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, পিতা আমায় অতি বিলাসিতার মধ্যে পালন করিয়াছিলেন। আমার জন্য তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মনস্তুষ্টির জন্য তন্মধ্যে অহর্নিশি নৃত্যগীতাদি হইত। জলবিহারের জন্য প্রতি প্রাসাদে শ্বেত, রক্ত, নীল পদ্মের তিনটী সরোবর থাকিত। অনুচরগণ সর্ব্বদাই আমার গাত্র মহার্ঘ চন্দন দ্বারা লিপ্ত করিয়া রাখিত। অতি সূক্ষ্ম কাশীর বস্ত্র আমার পরিধেয় ছিল। এমন কি, আমার দাসদাসীসকলে ধনবানেরও দুর্লভ খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি পাইত। কিন্তু এসকলে আমার তৃপ্তিসুখ ছিল না। জগতের দুঃখ মনে করিয়া সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ধ্যানস্থ থাকিতাম—ভাবিতাম এ মহা দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার কি উপায় নাই ?"

কুমার বহু স্বর্ণমণিময় আভরণে ভূষিত থাকিতেন এবং নিজ কুলানুযায়ী বহু বিদ্যা তাঁহার অধিগত ছিল। আমরা ললিতবিস্তরে অবগত হই যে, অসামান্যবলসম্পন্ন রাজকুমার ৬৪টী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহারই অভিমতে শুদ্ধোদন মনোহরা যশোধরা বা গোপার সহিত তাঁহাকে পরিণীত করেন। কুমার যখন পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাসাদে আবদ্ধ সেই সময় একদিন তাঁহার বহির্দ্দেশদর্শনে ইচ্ছা জন্মিল। পিতা তাহা অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতে আতুর, ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পথ হইতে স্থানান্তরিত করাইয়া কুমারকে উপবনে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। উপবনে গমন করিবার পথে তিন দিন পর পর দেবগণপ্রসাধিত জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং সারথির নিকট ঐ সকল অবস্থার ব্যাখ্যা শুনিয়া তিন দিনই তিনি রথ ফিরাইয়া আনিবার আদেশ করিলেন। কুমারের অন্তরে যে অত্যল্পমাত্র প্রফুল্লতা ছিল তাহা সমস্তই নিঃশেষে অন্তর্হিত হইল। তখন

কুমারের অবস্থা 'ন জগাম রতিং ন শর্ম্মলেভে হৃদয়ে সিংহইবাতিদিগ্ধ-বিদ্ধঃ' হৃদয়ে শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় শান্তিহীন এবং নিরানন্দ। ইহার পর আর একদিন তিনি বনস্থলী সন্দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। তথায় সলিলোর্ম্মির ন্যায় কর্ষিত ভূমি নিরীক্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গল দ্বারা বহু কীট বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত ও আর্ত্ত-চিত্তে অনুচরদিগকে বহু দূরে রাখিয়া এক বটবৃক্ষতলে জগতের দুঃখ-চিন্তায় ধ্যানস্থ হইলেন। এমন সময় ভিক্ষুবেশপরিহিত এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহার নয়নযুগল আকৃষ্ট করিল। কুমার তাঁহাকে পীতবস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে সেই ছদ্মবেশী দেবতা বলিলেন, 'আমি জন্ম জরা মৃত্যুর ভয়ে মোক্ষলাভের জন্য প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রমণ হইয়াছি। প্রব্রজ্যা লাভ করিতে হইলে সংসারত্যাগ প্রয়োজন।' এই কথা বলিয়াই ছদ্ম দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। কুমার মুক্তি পথের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া সেইদিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং পিতার নিকট আসিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ক্ষান্ত করিবার জন্য রাজা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু কুমার মধুরস্বরে বলিলেন, "আপনি যদি আমায় এই চারিটী বর প্রদান করেন তাহা হইলে আমি তপোবনে গমন করিব না।—'

"ন ভবেন্মরণায় জীবিতং মে বিহরেৎস্বাস্থ্যমিদং চ মে ন রোগঃ।
ন চ যৌবনমাক্ষিপেজ্জরা মে ন চ সম্পত্তিমপহরেদ্বিপত্তিঃ॥"

"আমি কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হইব না। চিরকাল নিরাময় সুস্থদেহে থাকিব। জরা কখনও আমার যৌবন গ্রাস করিবে না এবং এই সম্পত্তি কখনও বিপত্তি দ্বারা বিনষ্ট হইবে না।" এই সকল অপরিহার্য্য বলিয়া রাজা কুমারকে অসম্ভব কল্পনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন এবং পুত্রের মানসিক অবস্থায় ভীত হইয়া অধিকতর পরিমাণে বিলাস উৎসবের মাত্রা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার যাহাতে অলক্ষিতে রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত প্রহরীদিগকে সদা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে আদেশ করিলেন।

অচিরে সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের জন্ম হইল। কুমার সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, 'রাহুলো জাতো বন্ধনং জাতং'—রাহুল জন্মিয়াছে, এইবার ত সংসারের দৃঢ়বন্ধন ঘটিল। অবিলম্বেই সংসার হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিতে হইবে'। এই সময় কৃশা গোতমীর নিবৃত্তিমূলক গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংসারমুক্তিলাভের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইল। কুমার আর কালবিলম্ব করিলেন না। সেই দিন রাত্রিসমাগমে পূর্ব্ববৎ নৃত্যগীত শ্রবণে জাগ্রত না থাকিয়া প্রথম প্রহরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চিত্তানন্দদায়িকা গায়িকা নর্ত্তকীবৃন্দ তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া অবসর পাইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মধ্য রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গে কুমার দেখিলেন বিলাসভবন নিস্তব্ধ। কেবল ঝিল্লীর সহিত একতান মিলাইয়া ভৈরবী নিশা যেন কি মহা বৈরাগ্যের গান গাইতেছে। প্রাসাদ-প্রসাধন পুষ্পরাজি শুষ্ক, আলোকমালা নির্ব্বাপিত প্রায়। সেই আলোক অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্ত্তি-সকল নীরব, নিথর, নিস্পন্দ—যেন শবদেহের ন্যায় লম্বমান! তাহাদের বিলাসভূষণ স্রক্‌চন্দন স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কুমার ভাবিতে লাগিলেন, এই ত শ্মশানের প্রতিচ্ছবি! আমি শ্মশানে অধিষ্ঠিত! কে বলে এই প্রাসাদ বিলাসের উৎসবমন্দির? শ্মশান—শ্মশান—প্রাণহীন শ্মশান! সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বরক্ষক ছন্দককে ডাকিয়া তাঁহার প্রিয় অশ্ব কন্থককে সুসজ্জিত করিবার আদেশ করিলেন। দেবগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ছন্দক যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। নগররক্ষীরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই বিশাল নগরদ্বার আপনি মুক্ত হইল। সেই নিস্তব্ধ নিশিতে কুমার অশ্বপৃষ্ঠে ছন্দকসহায়ে কপিলবস্তু পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ তাঁহার গমনের সুবিধার জন্য

"অকুরুত তুহিনে পথি প্রকাশং ঘনবিবরপ্রসৃতা ইবেন্দুপাদাঃ"

—মেঘবিবরনিঃসৃত জ্যোৎস্নাকিরণের ন্যায় তুষারময় পথ দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। গমনকালে জন্মভূমিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন, "সিদ্ধিলাভ না করিয়া আমি তোমার অঙ্কে ফিরিয়া আসিব

না।" মনের আবেগে এক রাত্রির মধ্যে বহু যোজন পথ অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে যখন তাঁহারা অনোমা নদীর তীরে মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন তখন কুমার আপনার আভরণগুলি একত্র করিয়া ছন্দককে অর্পণ করিয়া বিদায় লইবার জন্য বলিলেন—

"জরামরণনাশার্থং প্রবিষ্টোঽস্মি তপোবনং।
ন খলু স্বর্গতর্ষেন নাস্নেহেন ন মন্যুনা॥"

"আমি জরা মরণ নাশের জন্য তপোবন গমন করিতেছি, স্বর্গকামনায় কিম্বা অস্নেহ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া নহে।"

"তদেবমভিনিষ্ক্রান্তং ন মাং শোচিতুমর্হসি।
ভূত্বাপি হি চিরং শ্লেষঃ কালেন ন ভবিষ্যতি॥"

"অতএব আমার অভিনিষ্ক্রমণের জন্য শোক করিও না। দেখ, এই মিলন থাকিয়াও কালে বিনষ্ট হইবে।"

"যদপিস্যাদসময়ে যাতো বনমসাবিতি।
অকালো নাস্তি ধর্ম্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি॥"

"যদি বল আমি অসময়ে তপোবন গমন করিতেছি, বিবেচনা করিয়া দেখ জীবন অতি চঞ্চল; বাস্তবিক ধর্ম্মলাভ করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল থাকিতে পারে না।" ছন্দক প্রভুকে কোন মতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া শোকাকুলহৃদয়ে কন্থককে লইয়া কপিলবস্তুতে ফিরিয়া আসিল। তাহারা রাজপুত্রের সহিত যে পথ এক রাত্রিতে গমন করিয়াছিল তাঁহার বিরহে ফিরিবার সময় তাহাতে আটাহ গত হইয়াছিল।

ছন্দক চলিয়া যাইবার অল্প পরেই ইন্দ্র ব্যাধ সাজিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ব্যাধের ভিক্ষুবেশ বিসদৃশ বিবেচনা করিয়া কুমার তাহার সহিত আপনার মহামূল্য বস্ত্র বিনিময় এবং পরে অস্ত্রের দ্বারা মস্তকের কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া উভয়ই অনোমা নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন।

এইবার সিদ্ধার্থ সিদ্ধ মহর্ষির ন্যায় সেই তপোবনে প্রবেশ করিলে

লক্ষ্মীবিযুক্ত হইয়াও বপুঃশ্রীতে সকল আশ্রমবাসিগণের চক্ষু আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

"দেবৈর্ষভস্যেব বপুর্দ্বিতীয়ং ধামেব লোকস্য চরাচরস্য।
স দ্যোতয়ামাস বনং হি কৃৎস্নং যদৃচ্ছয়া সূর্য্য ইবাবতীর্ণঃ ॥"

—তিনি দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় বপুষ্মান্ হইয়া যেন এই চরাচর বিশ্বজগতের মহিমার মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ সূর্য্যের মত সমগ্র আশ্রমপদ আলোকিত করিলেন। কিন্তু আশ্রমবাসীদিগকে স্বর্গলাভ কামনায় নানারূপে তপাচারী দেখিয়া মোক্ষাভিলাসী সিদ্ধার্থ দুঃখিতান্তঃকরণে সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার আশ্রমত্যাগে শোক করিতে লাগিলেন, কেবল এক জনমাত্র তাঁহাকে আচার্য্য আড়ার কালামের নিকট মোক্ষমার্গ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

"পুষ্টাশ্বঘোণং বিপুলায়তাক্ষং তাম্রাধরোষ্ঠং সিততীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
ইদং হি বক্ত্রং তনুরক্তজিহ্বং জ্ঞেয়ার্ণবং পাস্যতি কৃৎস্নমেব ॥
গম্ভীরতা যা ভবতস্ত্বগাধা যা দীপ্ততা যানি চ লক্ষণানি ॥
আচার্য্যকং প্রাপ্স্যতি তৎ পৃথিব্যাং যন্নর্ষিভিঃ পূর্ব্বযুগেঽপ্যবাপ্তং ॥"

"আপনার এই বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় নাশা, বিপুল আয়ত চক্ষু, তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠ, শ্বেততীক্ষ্ণ দন্ত ও ক্ষীণ রক্তবর্ণ জিহ্বাযুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই অবগত হইবেন। এবং আপনার অগাধ গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বাঙ্গের দীপ্তি দেখিয়া মনে হয় আপনি পৃথিবীর যাবতীয় আচার্য্যদিগের অপ্রাপ্ত এক মহিমময় আসন অলঙ্কৃত করিবেন।"

"আমাদের আদর্শ"।*

(সমালোচনার প্রতিবাদ)

(স্বামী শর্ব্বানন্দ)

'উদ্বোধনের' মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত "আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় প্রবর্ত্তকের পঞ্চম সংখ্যায় "স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ শীর্ষক" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। প্রবন্ধলেখক স্বামী শুদ্ধানন্দের যুক্তিরাশিকে "পাঁচ মিনিটের জেরায় উল্‌টো সুর" ধরাবার প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখনী চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইল যে, লেখক তাঁর বহু আয়াসে প্রবর্ত্তকের আট পৃষ্ঠা ভরিয়া কেবল অজ্ঞতাপ্রসূত কুতর্কের আবর্জ্জনা জড় করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বেদান্ততত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানিবার এবং বুঝিবার জন্য যে বিশেষ শ্রমস্বীকার করেন নাই তাহা তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদি তিনি প্রাচীন ভারতের মনীষিগণের বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহের গভীর গবেষণার সহিত পরিচিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি এরূপ উদ্ভট কথা লিখিতে পারিতেন না। যথা—"এ জগৎটা মিথ্যা প্রমাণ কর্‌তে হলে তোমাকে চোখ বুজ্‌তে হবে, নাক কান বন্ধ কর্‌তে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজী খেতে হবে" ইত্যাদি, "লক্ষপ্রমাণ যে জিনিসটাকে আমার ভিতর থেকে অন্তর্হিত করিয়ে দিতে পারে না—সেটা হচ্ছে, আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি", "আসলে আমি যে আছি এটা ঘোর মায়াবাদীকেও মান্‌তে হবে", "এই চৈতন্যেই আমার আমিত্ব",

* এই প্রবন্ধটী প্রথমে 'প্রবর্ত্তকে' ছাপিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু উহা উক্ত পত্রিকায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় 'উদ্বোধনেই' প্রকাশিত হইল। —উঃ সঃ।

"এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখ্‌ছি যে আমি নিগুর্ণ নই, আমি সগুণ—আমি আমার চৈতন্যে তিনটী জিনিসের পরিচয় পাচ্ছি—এই তিনটী জিনিস হচ্ছে—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম", "আর এই যে এদের প্রকাশ—এই প্রকাশের অন্তরালে আমার দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই—এর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমার একটা আনন্দ, একটা মহত্ব-বোধ", "মানুষের চৈতন্যের ঐ জ্ঞান, শক্তি, প্রেমই তার ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে প্রত্যেক নিমেষটীতে চাচ্ছে ও হচ্ছে" ইত্যাদি। এই Pragmatic রংএ রঞ্জিত বর্ত্তমান ভারতের অর্ব্বাচীন ত্যাগভোগসমন্বয়বাদ বেদবেদান্তবহির্ভূত এবং যে সত্যের উপর হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাহার সহিত উহার চিরবিরোধ। উক্ত মতের বিশ্লেষণ এবং ঐ বিরোধটী কোথায় তাহা আমরা নিম্নে দেখাইবার প্রয়াস পাইলাম।

প্রথমতঃ, সত্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা সম্যক্‌রূপে আমাদের জানা দরকার। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখক "সত্য" "সত্য" করিয়া খুব চীৎকার করিয়াছেন কিন্তু তাঁর প্রবন্ধপাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, চিরন্তন সত্যের গভীর রহস্যটী এখনও তাঁহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতের অদ্বৈতাচার্য্যগণ এই সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে গভীর যুক্তিরাশির অবতারণা করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সত্যকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহার প্রতিযোগী অসত্যকে বোঝা দরকার। অসত্য বা মিথ্যা বলিতে আমরা দুই প্রকার বস্তু বুঝি—একটী অপহ্নব, অপরটী অনির্ব্বচনীয় বস্তু। যাহা কোনও কালেই বিদ্যমান নাই, যথা, 'বন্ধ্যাপুত্র', তাহাই অপহ্নবরূপ মিথ্যা বা অসৎ; এবং যাহা কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানগোচর হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, যথা, 'রজ্জুসর্প' ভ্রমের সর্প, উহাকে অনির্ব্বচনীয়রূপ মিথ্যা বলে। ইহার বিপরীতে সৎ বলিতে আমরা সেই বস্তুটী বুঝি যাহার কোনও কালেই বিলয় ঘটে না, অর্থাৎ যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। সেই জন্যই ভারতের দার্শনিকরা পারমার্থিক সত্যের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, ত্রিকালাবাধিত বস্তুই

পারমার্থিক সৎ * এবং তদ্বিপরীত ত্রিকালবাধিত অর্থাৎ যাহা কাল-ত্রয়ে বিলয়শীল তাহাই অসৎ। বৈদান্তিকের মতে পারমার্থিক-সৎ-বহির্ভূত সত্ত্ব তিন প্রকার, যথা—ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক এবং তুচ্ছ। রূপ রস গন্ধযুক্ত এই পাঞ্চভৌতিক জগৎ, যাহা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান কালে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্যাবহারিকরূপ সৎ, কিন্তু যেহেতু উহা ত্রিকালবাধিত সেইজন্য উহা পারমার্থিকরূপ সৎ নহে অর্থাৎ পারমার্থিক হিসাবেই উহা অসৎ। রজ্জু-সর্পের সর্পসত্তা প্রাতিভাসিক সৎ এবং বন্ধ্যাপুত্রের সত্তা তুচ্ছ সৎ অর্থাৎ আত্যন্তিক অসৎ। যখন বৈদান্তিক জগৎকে মায়াবিকল্পিত অনির্ব্বচনীয়রূপ অসৎ বলে তখন উহাকে সেই ত্রিকালাবাধিত পারমার্থিক সৎ এবং ত্রিকালবাধিত আত্যন্তিক অসতের মধ্যসত্তায় স্থাপন করেন, তাঁর দৃষ্টিতে এই জগৎ আত্যন্তিক সৎও নয় আত্যন্তিক অসৎও নয়, উহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সদসৎবিলক্ষণরূপ একটী বস্তু। যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়া-বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই—বিশেষতঃ আধুনিক মায়াবাদবিরোধীরা মায়ার এই অনির্ব্বচনীয়ত্ব না বুঝিয়াই বকাবকি করিয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয় করেন। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখকও যে জগতের সত্যাসত্যের বিষয় বলিতে গিয়া ঐরূপ করিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

দর্শনের কূট তর্ক ছাড়িয়া দিলেও, এই নামরূপ রচিত জগতের অনির্ব্বচনীয় রূপ মিথ্যাত্ব পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ করিয়া চলিয়াছে। এই যে লেখনিটী, যাহা দ্বারা আমি লিখিতেছি, ইহা যদিও আমার প্রয়োজন সাধনার দিক্ হইতে সত্য বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, তথাপি যাঁহার একটু জড়বিজ্ঞান জানা আছে তিনিই বলিবেন, এই লেখনিটী পারমার্থিক সত্য নহে—ইহার পারমার্থিক সত্যতা কতকগুলি পরমাণুপুঞ্জে, বা ইলেক্‌ট্রনে বা ঈথরে। এখানে সেই ইলেক্‌ট্রন বা ঈথরই হইতেছে ত্রিকালাবাধিত পারমার্থিক সৎ, তাহার কলমরূপটী ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক

* "ত্রৈকালিকাত্যন্তাভাবাপ্রতীতত্বং সত্বমিতি"।—অদ্বৈতসিদ্ধি।

সৎ মাত্র। কারণ দুধ যেমন ছানা হয় ইলেকট্রন বা ঈথর সেইরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কলম হয় নাই। ইলেকট্রন ইলেকট্রনই আছে, কেবল তাহার বিভিন্ন স্পন্দনগুণে আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট কলমরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের ঐ কলমরূপটী আমার ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতার ফলস্বরূপ। উহার বাস্তব অস্তিত্ব কোনখানেই নাই—ইলেকট্রনেও নাই, আমার ইন্দ্রিয়ে নাই, অথচ উহা যেন আমার ইন্দ্রিয় এবং ইলেকট্রনের মাঝামাঝি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন পিত্তদোষযুক্ত চক্ষু সাদা বস্তুকে হলুদে দেখে সেইরূপ আমার অক্ষম ইন্দ্রিয় ইলেকট্রনকে ইলেকট্রনরূপে না দেখিয়া কলমরূপে দেখিতেছে। মনে কর, যদি এমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয় যাহা দ্বারা ইলেকট্রনের স্বরূপ ধরিতে পারা যায়, আর যদি সেই যন্ত্র এই কলমের উপর ধরা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আর কলম দেখিতে পাইব না, তৎস্থানে নিত্যবিরাজিত ইলেকট্রনই নয়নগোচর হইবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের এই অক্ষমতা প্রথমে ইলেকট্রনের স্বরূপ আমাদের নিকটে আবৃত করে এবং তাহার স্থানে কলমরূপ সদসৎ-বিলক্ষণ একটী নূতন বস্তু উৎপন্ন করে। এই কলমটী ইলেকট্রনের মত আত্যন্তিক সৎও নহে, এবং বন্ধ্যাপুত্রের মত অত্যন্ত অসৎও নহে। ইলেকট্রনের দিক্ হইতে দেখিলে বলিতে হয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাই অবিদ্যা বা মায়া, এবং তাহার ঐ আবরণী শক্তি দ্বারা ইলেকট্রনের স্বরূপ আবৃত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা কলমরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তটীর সৃষ্টি করে। এই কলমের অধিষ্ঠান বা বিশেষ্য হইতেছে সৎবস্তু ইলেকট্রন, কিন্তু উহার বিশেষণ 'কলমরূপ' ত্রিকালবাধিত, সেইজন্য ব্যাবহারিক ভাবে সৎ হইলেও পারমার্থিকরূপে অসৎ। তদ্রূপ এই কলমটীর মত জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনির্ব্বচনীয়-অসৎ—আধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রতি পদে এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। "Things are not what they seem"—বস্তুটী যে ভাবে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় উহা তাহার স্বরূপ নহে। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের নিকট

মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে, ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা দেখি হীরক ও কয়লা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, একটী অতি স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় অপরটী অতি কদাকার, অস্বচ্ছ, মলিন। ইন্দ্রিয়ের দিক্ হইতে দেখিলে কে বলিবে দুইই এক বস্তু—এক কার্ব্বনেরই বিভিন্ন প্রকার, অথবা আর একপদ অগ্রসর হইয়া বলিতে পারা যায়—উহা এক ইলেক্‌ট্রনেরই বিভিন্ন প্রকাশ! সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৎ এবং তাহার নাম রূপের মেলাও চিরন্তন সৎ। কিন্তু জড়বিজ্ঞান-বাদী দার্শনিক বলেন যে, এই নানাত্বময় জগৎ আপেক্ষিক সৎ (Relative truth) মাত্র। বাস্তবিক সৎ (Absolute truth) হইতেছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" জড় ইলেক্‌ট্রন। এই বৈচিত্রটা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের ভেল্কি (Sense aberration)।

প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধলেখক লিখিতেছেন, "এ জগৎটা মিথ্যা প্রমাণ কর্‌তে হলে তোমাকে চোখ বুঁজ্‌তে হবে, নাক কাণ বন্ধ কর্‌তে হবে, হাত পা বাঁধ্‌তে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খেতে হবে—কেননা সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ কর্‌তে হলেই যে অসাধারণ বেগ পেতে হয় তা ত আমরা সবাই জানি। আর আমার জগৎ আছে তার প্রমাণ অতি সহজে চোখ খুল্লেই পাই—এর শব্দ গন্ধ রূপ রস আমার ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমার অন্তরাত্মাকে প্রতি নিমেষে জানিয়ে দিচ্ছে—"আমি আছি গো আমি আছি"। লেখকের এই সহজ প্রমাণের বিষয় পড়িতে পড়িতে আমাদের এক গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার একটী অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে আমরা গ্লোবের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, এই পৃথিবীটা গোল এবং উহা লাটিমের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ লোকটীকে আমরা এই ভৌগলিক তথ্যটী বুঝাইতে পারি নাই। সে ক্রমাগত এই কথাই বলিতেছিল, "পৃথিবী যদি গোল হত ত আমরা সকলে গড়িয়ে পড়ে যেতাম্, তা ছাড়া মুসাই গো আমি কত

তেপান্তরের মাঠে গিয়ে দেখেছি সব সমান চৌরস্ত জমি, গোলটোল কোনখানে নেই।" সে পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির বিষয় শুনিয়া বলিয়াছিল, "কি বলেন মুসাই! আমাদের এই পৃথিবীটা যদি লাটিমের মত ঘুর্‌ত, তাহলে মনে করেন কি আমাদের এই বাড়ীঘরগুলো এই রকম দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ত, না, আমরাই খাড়া থাক্‌তে পাত্তাম? সব ঘুরে ছিট্‌কে পড়্‌তাম না? লাটিম যখন ঘোরে, দেন ত তার উপর একটা কুটো, সে ছিট্‌কে ফেল্‌বে না! আর কি বল্‌ছেন মুসাই পৃথিবী ঘুরচে, রোজ দেখ্‌চি সূয্যিঠাকুর পূবদিকে উঠ্‌ছেন আর পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছেন। আপনি কি আমার চোক্‌কে অবিশ্বেস কত্তে বল্লেন।" প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকারের মত এই গ্রাম্য লোকটীর কথাতেও গমক ও মূর্চ্ছনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন কথা এই যে, তাহার ঐ সহজ প্রমাণ যাহা সে "সহজে চোখ খুল্‌লেই পায়", তাহাই আমরা গ্রহণ করিব, না কোপার্নিকস্‌, গ্যালিলিও, হর্সেল, ল্যাপ্লাস্‌ প্রভৃতি ধুরন্ধর জ্যোতির্বিদগণ আজীবন সাধনার দ্বারা যে জ্যোতিষতত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিব? ইহার সমাধান সুধী পাঠকবর্গের উপর ছাড়িয়া দিলাম। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকার হয় ত তাঁর Pragmatic viewর অনুযায়ী বলিবেন যে, ঐ লোকটী তার সরল মন (unsophisticated mind) লইয়া যাহা বুঝিযাছে, তাহাই তাহার পক্ষে সত্য, তাহাতেই সে সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আর জ্যোতির্বী বুধমণ্ডলী যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহাদের কাছে সত্য। উভয় সত্যই সংসার সুখের পক্ষে সমান মূল্যবান্‌। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে মানুষকে কোনরূপে শিক্ষা দেওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ, শিক্ষা দিলেই তাহার "সহজ" জ্ঞানের বিপর্য্যয় ঘটিবে, আর ঐ ইন্দ্রিয় কথিত "সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ" করিবার জন্য "মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খেতে থাক্‌বে" আর কি !!!

যাহা হউক, আধুনিক জড়বিজ্ঞান মুখর হইয়া এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, জগতের মূলতত্ত্ব ইলেক্‌ট্রনই বাস্তব বস্তু, উহার বৈচিত্র্য-

বিকাশ বাস্তব নহে।' পাশ্চাত্য জগতের হেক্‌লপ্রমুখ জড়ের একত্ববাদিগণ এই বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু জড়বাদিগণ তাঁহাদের বিশ্লেষণ ঐ ইলেকট্রন বা ঈথরে পরিসমাপ্ত করিয়া উহাকেই মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্‌সর জড়বাদীদের এই মূলতত্ত্ব দর্শনের দিক্ হইতে দেখিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "The Atomic Theory is a philosophical absurdity" এবং অস্মদ্দেশীয় আচার্য্য শঙ্কর হার্বার্ট স্পেন্‌সরের অন্ততঃ পঞ্চাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের তর্কপাদে কণাদের পরমাণুবাদ-নিরাকরণ-মুখে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। আর যে উক্তি পরমাণুর বিষয়ে সত্য, ইহা ইলেকট্রন বা ঈথরের পক্ষেও সমীচীন। তাহা হইলেই দেখিলেছি, জড়ের প্রাথমিক অবস্থা উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া আমরা চৈতন্যেই আসিয়া পড়ি—Physics merges into Metaphysics. এ বিষয়ের বহুল যুক্তি বাহুল্যভয়ে এখানে প্রদত্ত হইল না।

সত্য সম্বন্ধে সকলের শেষ কথা এই যে, যাহা কিছু আমাদের প্রজ্ঞারূঢ় হয় তাহাই আমাদের নিকট সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেন প্রজ্ঞা নিজের 'সৎ' রঙে রঞ্জিত করিয়াই উহাকে নিজের কাছে ধরে। এখন এই প্রজ্ঞারূঢ় বস্তু—যুস্মদ্‌জগৎ, ত্রিকালাবাধিত সৎ নহে, কারণ, উহা ষড়্‌বিকারী, অর্থাৎ নিত্যপরিণামশীল ও ত্রিকালবাধিত। ইহার মধ্যে ঐ প্রজ্ঞাই অথবা বেদান্তের পরিভাষায় বলিতে গেলে, প্রজ্ঞা উপলক্ষিত চৈতন্যই ত্রিকালাবাধিত সৎ। কারণ, এই প্রজ্ঞার কোনকালে বাধ হয় না। এই ত্রিকালাতীত প্রজ্ঞা 'যুস্মদস্মদ্'দ্বন্দ্ব-গন্ধবিহীন, একরস ও চিরন্তন সত্য। বাল্য-যৌবন-জরার শারীরিক ও মানসিক ক্রমপরিবর্ত্তনের মাঝে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়ের অবস্থাবিপর্য্যয়ের ভিতর এই প্রজ্ঞা সমানভাবে অচল অটল কূটস্থ নিত্য। জগৎ-ব্রহ্ম নির্দ্দেশ স্থলে পূজ্যপাদ আচার্য্য বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন—

"অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপনাম ইত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগৎরূপং ততোদ্বয়ম্॥"

প্রত্যেক বস্তুকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই পাঁচটি জিনিষ পাই যথা, অস্তি, ভাতি, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ এবং নাম ও রূপ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটীই ব্রহ্মরূপ, কারণ, উহা সার্ব্বভৌমিক ও চিরন্তন। এবং পরের দুইটী অর্থাৎ নাম ও রূপই জগৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। এই নামরূপ জগতের অনিত্যত্বের আর একটী প্রমাণ এই যে, প্রজ্ঞার বা চৈতন্যের তুরীয় অবস্থা নামক এমন একটী অবস্থা আছে যেখানে নামরূপ-জগতের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে—সেখানে "আমি"ও নাই "তুমি"ও নাই; আছে কেবল—

"অবাংমনসগোচরং বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

প্রজ্ঞার এই অবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন নির্ব্বিকল্পজ্ঞানী এবং আমাদের শাশ্বত বেদ। শ্রুতি বলেন—

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্য-মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

"এষ নেতি নেতি আত্মা।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রাচীনকালের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই যুগের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল মহামনীষিগণই এই বৈদিক শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। এখন যদি কেহ তাঁহাদের এই উপলব্ধিকে "মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক ডিগ্‌বাজি খাওয়া" বলেন তাঁহার ধৃষ্টতার বিচার আমরা সুধী পাঠকবর্গের হস্তেই অর্পণ করিতেছি।

এই ত গেল প্রবন্ধকারের জগতের সত্যাসত্য লইয়া বিচার। দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছে চৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ধারণা। তিনি বলেন, "লক্ষ প্রমাণ যে জিনিষটাকে আমার ভিতর থেকে অন্তর্হিত করিয়ে

দিতে পারে না—সেটা হচ্ছে, আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি।” “আসলে যে আমি আছি এটা ঘোর মায়াবাদীকেও মান্‌তে হবে। কেন না মায়াবাদীর আসল তর্কটাই হচ্ছে যে আমি আছি কিন্তু জগৎ নেই। আমিও নেই যদি মায়াবাদী বলে তবে তার মায়াবাদও দাঁড়াবার স্থান পায় না।” আমি সত্য বলে, মান্‌লেই জগৎটা মিথ্যা বল্‌তে পারি। এটা অতি সোজা কথা।” বাদীর পক্ষ বিষয়ে প্রতিবাদীর অজ্ঞতাকে ন্যায়ের ভাষায় ‘নিগ্রহস্থান’ বলে, কারণ, ঐখানেই প্রতিবাদী সহজেই নিগৃহীত হন। মায়াবাদী কখনও বলে না, “আমি আছি অথচ জগৎ নেই”। সে এই সহজ সত্যটী খুবই জানে যে, আমি থাকিলেই জগৎ থাকে, আর জগৎ থাকিলেই আমি থাকি,—দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শন ও দৃশ্য আছে এবং দৃশ্য ও দর্শন থাকিলেই দ্রষ্টা আছে। পিতা আছে অথচ পুত্র নাই ইহা হইতেই পারে না। যুষ্মদ্ অস্মদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ মায়াবাদী বেশ জানেন, উহা তাহাকে বহ্বারম্ভের সহিত জানাইয়া দিতে হয় না। সে জানে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটিই জগৎ। চিরন্তন সত্যস্বরূপ আত্মায় “আমি”ও নাই, জগৎও নাই; সেখানে আছে কেবল অখণ্ডৈকরস অপরিচ্ছিন্ন সৎ, চিৎ, আনন্দ—“নেতি নেতি আত্মা”। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই ঐ ত্রিপুটির পশ্চাতে বিরাজমান—যাহার সত্তায় ঐ ত্রিপুটি সত্তাবান্। যেমন সিনোমেটোগ্রাফের চলৎ চিত্রগুলি তাহার আধারপটের সত্তায় সত্তাবান্ হয় বা রজ্জুসর্পভ্রমের সর্পের সত্তা ঐ রজ্জুসত্তা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও সেইরূপ। এই ত্রিপুটির “আমি” যে নিত্য নয় তাহা বেদবেদান্তও বলেন, আর যে মহাত্মাগণ প্রকৃত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন। পরমহংসদেবের একটী উক্তি এই যে,—“যেমন প্যাঁজের খোসা যত ছাড়াও তত খালি খোসাই বেরোয়, ভেতরের মাঝ আর পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই আমিকে ধর্‌বার জন্য যত বিচার কর দেখ্‌বে এই আমি বলে কোন বস্তু আর পাবে না।” ভগবান্ নাগসেন রাজা মিলিন্দ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, “মহারাজ

আপনি বলিতেছেন, আপনি রথে আসিয়াছেন, আপনার এই রথটী কি? আমাদের সম্মুখে যে বস্তু রহিয়াছে যাহাতে আপনি রথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, উহা ত দেখিতেছি কতকগুলি বস্তুর সমষ্টি মাত্র। উহার কোনটী রথ? উহার চক্রটী কি রথ, না ধুরাটী রথ, না চূড়াটী রথ, না অগ্রভাগটী রথ? ইহার কোনটীই রথ নহে। এবং উহাদের সমষ্টিও কোন একটি পৃথক্ বস্তু নয়। অতএব আপনার রথ কুত্রাপি নাই। উহা আপনার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। সেইরূপ আত্মা (বা আমি) বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা একটী সমষ্টি মাত্র—রূপ, বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান এই পাঁচটীর সমষ্টি, উহার পৃথক্ অস্তিত্ব কোনখানেই নাই।" বেদান্ত মতে অন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বিত চিৎ বা চিদাভাসই "আমি"—"এই চৈতন্যেই আমার আমিত্ব" নহে। এই 'আমি'র স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে তিনটী রূপ আছে, বেদান্তে তাহাদের নাম—বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ। তদতিরিক্তই প্রত্যগাত্মা বা শুদ্ধচৈতন্য। সেখানে "আমি", "তুমি", কিছুই নাই। এই প্রত্যগাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

এখন এই বেদান্তোক্ত শাশ্বত সত্যকে নাকচ করিয়া প্রবন্ধকার তাঁহার "অতি সহজে চোখ খুললেই পাওয়া" জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টভাবে দেখ্‌ছি যে, আমি নির্গুণ নই, আমি সগুণ—আমি আমার চৈতন্যে তিনটী জিনিষের পরিচয় পাচ্ছি—জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম!" তিনি যদি প্রকৃত চোখ খুলিয়া চাহিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, ঐ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমবিমণ্ডিত তাঁর 'আমি'রূপ কুয়াসার পশ্চাতে এক ত্রিকালবিহীন দ্বৈতাদ্বৈতগন্ধশূন্য চিদেকরস সত্তা নিত্য বিরাজমান যাহার ছায়াপাতে চিত্তকুহেলিকায় ঐ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। উহা

চিত্তের ধর্ম্ম, চিদের নহে। প্রবন্ধকার চিৎভ্রমে চিত্তকে লইয়া যত গোল বাধাইয়া বলিয়াছেন—"আর এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভব আমি পাচ্ছি—এই অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুঃখ পাচ্ছি না, বেদনা পাচ্ছি না, আমি আমাকে দীন করে দরিদ্র করে অধম করে পাচ্ছি না—ঐ জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমার আছে একটা বিপুল আনন্দ,—ঐ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমি দীন নই দরিদ্র নই অধম নই পাপী তাপী নই—আমি এই সৃষ্টির মাঝে সর্ব্বোত্তম রহস্য। এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেম এ আমার কাঁধে বোঝার মতো চেপে পড়েনি—এ অমৃতের মতো আমার অস্তিত্বে বিছিয়ে আছে।" কিন্তু যাহারা জগতের একটু অভিজ্ঞতা রাখে তাহারাই বলিবে ইহা বাস্তব জগতের কথা নহে। আজ দুর্ভিক্ষের দিনে আইস ঐ দরিদ্রের কুটীরে যেখানে দীন গৃহস্বামী ক্ষুৎপিপাসার কঠোর তাড়নে কঙ্কালসার হইয়াছে—পেটে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, গৃহে কপর্দ্দক নাই; অভাব অনটনের প্রেতমূর্ত্তি তাহার প্রাঙ্গণের সর্ব্বত্র নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; গৃহলক্ষ্মীর অলক্ষ্মীর বেশ; ঘরের নন্দদুলালেরা অস্থিচর্ম্মসার কোটরগতচক্ষু সর্ব্বতোভাবে কুমারশ্রীবিহীন, বুভুক্ষার বিকট তাড়নায় আহারের জন্য কাতর চীৎকার করিয়া উপায়হীন গৃহস্বামীর হৃদয়ে নিরানন্দের বীভৎস তুলিতেছে। এখন তাহার কাছে গিয়া যদি বল, "কেমন বল ত বাপু, তোমার ভেতরে কেমন একটা বিপুল আনন্দ পাচ্ছ, না? কোথায় তোমার দৈন্য দারিদ্র্য? তোমার আছে কেবল বিপুল আনন্দ, কি বল?" তাহা হইলে সেই গৃহস্বামীর শরীরে তখনও যদি যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে ত তোমায় উন্মাদ মনে করিয়া যষ্টি দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিবার চেষ্টা করিবে, নচেৎ তোমার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নিজ ললাটে করাঘাত করিবে। কারণ, সে জানে তার জ্ঞান নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই, প্রাণ হতে অমৃতের আলোক নিভিয়া গিয়াছে; আছে কেবল হৃদয়ভরা বেদনা, দারিদ্র্যদৈন্যের প্রহেলিকা, অশক্তির মর্ম্মদাহ, অভাবের অসহ হীনতা, আর তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া নাচিতেছে মৃত্যুর করাল ছায়া।

প্রবন্ধকার যদি আরও একটু চোখ্ খুলিয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন যে তাঁর এই "চোখ খুল্‌লেই পাওয়া আমি"র ভিতর কেবল জ্ঞান শক্তি প্রেম আছে তাহাই নহে,—জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান আছে, শক্তির সহিত অক্ষমতা আছে, প্রেমের সহিত দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আছে, আনন্দের সহিত নিরানন্দ আছে, সুখের সহিত অসুখ আছে, মহত্ত্বের সহিত হীনতা আছে, আর আছে সমস্ত আমিত্ব ভরিয়া সসীমত্ব, ক্ষুদ্রত্ব। সূতিকাগারে নবশিশুর ক্রন্দন হইতে অন্তিমে গঙ্গাজলির নাভিশ্বাস পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনই এই সসীমত্বের একটী বীভৎস লীলা।

যিনি এই লীলার বাহিরে, 'আমি' 'আমার' পারে সেই নিত্যবুদ্ধমুক্তস্বভাব চিদেকরস আত্মাই অসীম, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।

যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা অথ যত্র অন্যৎপশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্। যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

এখন এই শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রবন্ধকারের "চোখ্ খুল্‌লেই পাওয়া" 'আমি'—যদিও তাঁহার ঐ 'আমি' এই সৃষ্টির মাঝে যে সর্ব্বোত্তম রহস্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—সেই ভূমা বস্তু নহে, সে 'অল্প' বস্তু, কারণ সে "অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি", সেই জন্যই সে অসুখী, নিরানন্দময় ও মর্ত্ত্য।

এখনও হয় ত প্রবন্ধকার বলিবেন যে, বেদ যাহাই বলুন না কেন, আমার ভিতরকার সত্য এই বলিতেছে আমি তাহাই গ্রহণ করিব—তাহার উত্তরে বলি, তাঁহার সত্যের মূল্য তাঁহার নিকট যাহাই হউক না কেন, বেদবেদান্তআশ্রিত হিন্দুসমাজের নিকট তাঁর ঐ অবৈদিক সত্যের মূল্য কিছুই নহে।

তৃতীয়তঃ, সন্ন্যাসই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তৎসম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দজী যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবর্ত্তকের লেখক উহার নিরাকরণ করিবার চেষ্টা কোনখানেই করেন নাই, কেবল তদ্-

বিপরীতে কতকগুলা নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেই জন্য উক্ত বিষয়ে বিশেষ বলিবার আমাদের কিছুই নাই। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকারের অনুধাবনের জন্য কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সন্ন্যাস অর্থে ভোগবিরাগ ও গুণবৈতৃষ্ণ্য, এই উভয়ই আমাদের শাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাস অর্থে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা রূপ এষণাত্রয়ের সম্যক্ ন্যাস। সেই আদিম বৈদিক যুগ হইতে এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ এবং সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার হইতে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মদর্শী মহাপ্রাণগণ—যাঁহাদের পবিত্র চরণস্পর্শে ধরা পবিত্রীকৃত হইয়াছে, যাঁহাদের করুণাকটাক্ষ লাভ করিয়া কত সহস্র সহস্র মানব সংসারের দাবানল হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতপথের পন্থী হইয়াছে—তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"

আজীবন ধরিয়া সমগ্র মানব সেই অমৃতের হ্রদের দিকে ছুটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ সেই অমৃতের সন্ধান না জানিয়া "অগ্রেঽমৃতোপমং পরিণামে বিষোপমম্" বিষয়সুখে নিমজ্জিত হয়। এখন এই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপায় সেই ভূমা পরমপুরুষকে জানা—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)

আর এই পরমপুরুষকে জানা মানে তাহাই হওয়া—

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডকোপনিষৎ) এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র উপায় ঐ সন্ন্যাস—সন্ন্যাসই উহার সাধন এবং সন্ন্যাসই উহার সিদ্ধি। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—

"তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা"॥ (মুণ্ডক উপনিষৎ)

"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতোতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

"পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ॥
(কৈবল্যোপনিষৎ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতায় বলিতেছেন—"জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্"। এবং এইরূপ বলিবার কারণ ও যুক্তি যথেষ্ট আছে, তাহা সংক্ষেপে এই যে, ঐ নির্ব্বিকল্পরূপ প্রত্যগাত্মা বা পরব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে হয়। ঐ নির্ব্বিকল্প অবস্থাতেই চিজ্জড়গ্রন্থি কাটিয়া আত্মার কেবল স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অন্য অবস্থায় নহে। তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। অর্থাৎ সেই নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থাতেই দ্রষ্টা যে পুরুষ তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। অপর সময়ে মনের বৃত্তির সহিত তিনি মিশ্রিত হইয়া থাকেন এবং মনের এই নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছিতে হইলে তাহার সমস্ত প্রত্যয়ের ঐকান্তিক নিরোধের আবশ্যক—"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস-পূর্ব্বসংস্কারশেষোঽন্যঃ" (পাতঞ্জল যোগসূত্র)। এখন মনের এই নিরুদ্ধ অবস্থা এবং পূর্ণমাত্রায় নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ একই কথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় তাহাই বলিতেছেন—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ (গীতা)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত কর্ম্মত্যাগ, সমস্ত বাসনাত্যাগ, এমন কি, সমস্ত চিন্তা ত্যাগ পর্য্যন্ত না করিলে আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া একান্ত অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে সর্ব্বভোগত্যাগরূপ সন্ন্যাস যে অপরিহার্য্য তাহার আর কা কথা। এ সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি এবং আত্মবিদ্‌গণের উক্তি হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে দেওয়া হইল না। এখন আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, যদি কেহ সাংসারিক সুখাসক্ত হইয়াও বলেন যে তিনি আত্মদর্শী ত জানিয়া রাখ, এই লোক কপটাচারী, মিথ্যাবাদী অথবা বাতুল। কারণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্যহীন ভোগবিলাসী, তাঁহার পক্ষে কায়িক এবং মানসিক উভয় প্রকারেই আত্মজ্ঞান লাভ করা একান্ত অসম্ভব। সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্ব লোকের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—'সত্যেন লভ্য

স্তপসা হ্যেষ আত্মা স ্যক্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্”। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জ্ঞানসাধনের লক্ষণ কহিতেছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ। (গীতা ১৩, ৮)
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। (ঐ, ১৩,১০)
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ (গীতা, ১১, ১৩)

এখানে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞানাভিলাষী তাঁহার পক্ষেই হওয়া উচিত—“এ জগতে আনন্দ নেই, এ সৃষ্টিতে অর্থ নেই, এ জগতের প্রত্যেক নিমেষটাই ব্যর্থ”, (তাঁহার পারমার্থিক জীবনের পক্ষে) জাতি সমাজ দূরে রেখে, বনে বা নির্জ্জনে গিয়ে অধ্যাত্মজ্ঞানসাধন। প্রবর্ত্তকের প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—“এখন সৃষ্টির এই শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শকে বরণ করলেই যে সন্ন্যাসীর চাইতে আমি হীন হব এই কথাটা সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ ‘উদ্বোধনে’র প্রবন্ধে বল্‌তে চেয়েছেন। কিন্তু ভগবানের সৃষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ, রসকে বরণ করলেই যে কোন মানুষ হীন হবে এমন কথা বল্‌বার মতো চাপরাস কোন সন্ন্যাসীর বা আর কারো আছে বলে, আমরা স্বীকার কর্‌তে নারাজ।” ইহার এক কথায় উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁর সৃষ্ট রূপ, রস প্রভৃতিকেই বরণ করে সে অব্যভিচারিণী ভক্তিসংযুক্ত ভগবৎব্রতী নহে। তাহার জীবন পিপাসার চিরনিবাসভূমি, অশান্তির আকর। সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে চক্ষু না ফিরাইলে যে স্রষ্টার পুণ্যদর্শন লাভ হয় না তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সেই জন্যই অসীম কাল হইতে আমাদের হিন্দুসমাজ তুরীয় আশ্রমকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছে এবং দেখাইয়াছে সমস্ত বর্ণের, সমস্ত আশ্রমের পরিসমাপ্তিই ঐখানে, কারণ, মানুষের অভিব্যক্তির চরম পরিণতিই ঐ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধ পরমহংস। যদি কখনও ভগবৎকৃপায় আমাদিগের এই ভোগের নেশা কাটিয়া যায় তবেই আমরা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে গাহিব, “কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ”।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ-কার্য্য।

(বাঙ্গলা ও বিহার)

গত মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দেশের দুঃখ দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় যে সকল চারা ধানগাছ হইয়াছিল তাহারাও নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

আমাদের বাগ্‌দা কেন্দ্র হইতে একটী পুষ্করিণী এবং ইন্দপুর হইতে তিনটী কূপ খনন করা হইয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই আমরা বীজধান্য বিতরণ আরম্ভ করিব।

ইন্দপুর কেন্দ্রে একটী চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে। সেখানে আমরা সস্তাদরে চাউল ক্রয় করিয়া ঠিক সেই দরেই বিক্রয় করিতেছি। পুরুলিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান বাগ্‌দায় ঐরূপ একটী দোকান খুলিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় ঐরূপ একটী দোকান খোলা হইবে, তবে এখানকার চাউল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডই সস্তাদরে যোগাইবেন বলিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আমরা বাঁকুড়া জেলায় কনিয়ামারা ও কোয়ালপাড়া নামক স্থানে দুইটী এবং সাঁওতাল পরগণায় কুণ্ডা নামক স্থানে আরও দুইটী কেন্দ্র খুলিয়াছি। অর্থাভাববশতঃ আমাদিগকে অতি কষ্টের সহিত কার্য্য চালাইতে হইতেছে। উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলে আমরা বাঁকুড়া, মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণায় আরও সাহায্য-কেন্দ্র খুলিতে পারি।

চাউল ও বস্ত্রবিতরণ-কার্য্যের সাপ্তাহিক বিবরণ।

(২৩শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে মে পর্য্যন্ত)

বাগ্‌দা (মানভূম)

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
৫৩	১৯৬৪	৯৯।৮	১২১
৬৪	২২৭৫	১১৪॥৫	
৬৯	২৩৮০	১২০।০	
৩৩	১৩৩৭	৬৭৸২	
৬৮	২০৯৮	১০৬॥৬	২৪

৬৪	১৭৬২	৮৯/৪	২৪
৫১	১৪৭২	৭৪॥৪	০
৫৫	১৫১৭	৭৭॥৯	০
৫৫	১৫০৬	৭৪॥৪	০
ইন্দপুর (বাঁকুড়া)			
২৬	২৮৭	১৪॥৭	২৬
২৫	২৯৩	১৫৸১	৮
২৫	৩৩২	১৭॥৭	১৯
২৫	৩৭৪	১৯।৮	২৪
২৫	৪১৮	২১৸৮	১৫
২৭	৪৫৪	২৩৸১	১৫
২৮	৪৮০	২৪॥৩	৩১
২৯	৫০৪	২৫৸৮	৩০
কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)			
৩	৬	।২	০
৫	১৯	৸৮	০
৫	৩২	১॥৪	০
৭	৩৩	১॥৬	০
৯	৩৯	২৸০	০
১২	৯২	৫/৮	০
১৪	১১১	৬/৬	১
১৮	১৭০	৮৸৪	০
ব্রাহ্মণবেড়ীয়া (ত্রিপুরা)			
১৭	১৯৫	৬।৭	০
৩০	৫৩৯	২৬৸৮	০
৩১	৬১৬	৩০৸২	০
দেওঘর—কুণ্ডা (সাঁওতাল পরগণা)			
৩	১৪	৸১	০
৫	৪৫	২।৮	১
৯	৯৫	৬৸২	২

বাঁকুড়া জিলার অন্তঃপাতী কনিয়ামারা গ্রামে ও সাঁওতাল পরগণার সার্ম্মা গ্রামে যে একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহাদের কার্য্য-বিবরণী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বর্ত্তমানে মোট ১৫৬ খানি গ্রামে ৩৭৬৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আমরা সাহায্য করিতেছি।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

নাম	স্থান	টাকা
অনৈক মহিলা,	কলিকাতা	২৲।
কাপ্তেন কে, সি, সেন, সিবি		১০৲
শ্রীমতী কৃষ্ণমনোমোহিনী দেবী,	,,	১০৲
শ্রীযুত রাজেন্দ্র নাথ বসু,	,,	১৲
,, নগেন্দ্র নাথ বসু	,,	৩৲
শ্রীমতী শৈলবালা বসু,	,,	২৲
শ্রীযুত পান্নালাল দত্ত,	,,	১৲
,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস,	,,	৫০৲
,, বি, এন, চৌধুরী,	সিলেট	
,, জগবন্ধু লাহা, মালিযারা,	বাঁকুড়া	১৲
,, পি, সি, সরকার,	আন্দুল	২৲
,, হরিদাস রায়,	নীলফামারি,	৫৲
অনৈক মহিলা,	কলিকাতা	৫৲
,, টি, এন, মৌলিক	,,	৫৲
,, জগৎ কিশোর বিরালা	,,	২০০৲
,, কার্ত্তিকচন্দ্র বকসী,	আঁটপুর	২৲
অনৈক বন্ধু,	কলিকাতা	২।০
অনৈক বন্ধু,	,,	১০২৲
শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,	,,	৪৲
,, এস, সি, ঘোষ,	মাধুবাণী	৫৲
,, জগবন্ধু লাহা,	ঢাকা	৫৲
,, শ্রীশচন্দ্র ঘটক	রাঁচি	১৲
,, পি, সি, সরকার,	আন্দুল	৫৲
শ্রীশ্রীবিগ্রহজী,	কলিকাতা	৫০০৲
অনৈক বন্ধু	,,	১৲
শ্রীযুত পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	॥০
,, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কর্ণেলগঞ্জ	২
,, সত্যেন্দ্রনাথ সেন,	ভাওয়ালিবাগান	২
,, কানাইলাল রায়		
,, আর, এস, আচার্য্য,		
,, জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ,	কলিকাতা,	১০৲
সুশীল চন্দ্র কর্ম্মকার,	পাইটা	৫৲
উমেশচন্দ্র দত্ত,	পইগু	১০৶০
শ্রীযুত নৃত্যলাল মুখার্জ্জী,	কলিকাতা	১১৲
জি, এল্, এলেন,	কলিকাতা	২০৲
জালিম সিং	,,	১০৲
নগেন্দ্র নাথ রায়,	পাটনা	১০৲
উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,	বালকারগঞ্জ	২৲
বীরেন্দ্র নাথ মিত্র,	নৈহাটী	
,, ললিত মোহন রায়,	ভাটপাড়া	৫৲
,, সিদ্ধেশ চন্দ্র দত্ত,	নাগপুর,	৩৲
,, অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়	নলহাটি	৪৲
,, ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন,	হৈদাকান্দি	১৲
মাঃ ,, জি. বি, বক্সী এম, এ,	বসরা	৫৫৲
,, প্রতাপ চন্দ্র বসাক,	ঢাকা	১০৲
,, সারদা চরণ শূর,	ইলিয়টগঞ্জ	২৲
,, রাজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত,	পাইকপাড়া	৪॥/০
ইণ্ডিয়ান এসিষ্টেণ্ট এণ্ড ব্রোকারস্ মেসার্স জেমস স্কট এণ্ড সন্স লিমিটেড,		৫৲
পি, সি, সরকার,	আন্দুল	২৫৲
অনৈক বন্ধু	কলিকাতা	৬৲
অনৈক বন্ধু,	,,	২৲
শ্রীযুত গোপী নাথ মিত্র	,,	৫৲
,, ললিত মোহন বসু	,,	২৲
,, নগেন্দ্র ভূষণ দত্ত,	চট্টগ্রাম	৩৲
অনৈক বন্ধু,	কলিকাতা	১০০৲
ব্রহ্মচারী দুর্গানাথ,	কাশী	৫৲
শ্রীযুত চন্দ্রনাথ গুপ্ত,	শ্রীপুর	২৲
চন্দ্রনাথ, এম্, জি, স্কুলের ছাত্রগণ		২।/৫
বোর্ডারস্, লাল কুঠীমেস,	কুমিল্লা	৫৲
[illegible]নাথ কুমার বসু	কৃষ্ণনগর	১০৲
[illegible] ব্যানার্জ্জী,	কলিকাতা	২৫৲

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

কাশীপুরের উদ্যান-বাটি।

(স্বামী সারদানন্দ)

কলিকাতার উত্তরাংশে যে প্রশস্ত রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত বরাহনগরকে বাগবাজার পল্লীর সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে তাহার উপরেই কাশীপুরের উদ্যান-বাটি বিদ্যমান।

বাগবাজার পোলের উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত উদ্যানের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত কাশীপুরের চৌরাস্তা পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার প্রায় উভয় পার্শ্বেই দরিদ্র মুটেমজুর-শ্রেণীর লোকসমূহের থাকিবার কুটীর এবং তাহাদিগেরই দৈনন্দিন জীবননির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণিসকল দেখিতে পাওয়া যায়; উহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকখানি ইষ্টকালয়—যথা, কয়েকটি পাটের গাঁট বাঁধিবার কুঠি, দাস কোম্পানির লৌহের কারখানা, রেলির কুঠি, দুই একখানি উদ্যান বা বাসভবন ও কাশীপুরের চৌরাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পুলিসের ও অগ্নিভয়নিবারক ইঞ্জিনাদি রক্ষার কুঠি এবং উহারই পশ্চিমে অনতিদূরে ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির—যেন মানবদিগের মধ্যে বিষম অবস্থা-ভেদের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার জন্যই দণ্ডায়মান। শিয়ালদহ রেলওয়ের উন্নতি ও বিস্তৃতি হওয়ায় অধুনা আবার, উক্ত রাস্তার ধারে অনেক-গুলি টিনের ছাদসংযুক্ত গুদাম ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া কয়েক

বৎসর পূর্ব্বে উহার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ছিল তাহারও অধিকাংশের বিলোপ সাধন করিয়াছে। ঐরূপে ঐ প্রাচীন রাস্তাটি নয়ন-প্রীতিকর না হইলেও ঐতিহাসিকের চক্ষে উহার কিছু মূল্য আছে। কারণ, শুনা যায়, এই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াই নবাব সিরাজ গোবিন্দপুরের বৃটিশ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন এবং বাগবাজার হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল উত্তরে উহারই একাংশে মসীমুখ নবাব মীর্জাফরের এক প্রাসাদ এককালে অবস্থিত ছিল। ঐরূপে বাগবাজার হইতে কাশীপুরের চৌমাথা পর্য্যন্ত পথটি মনোজ্ঞ-দর্শন না হইলেও উহার পর হইতে বরাহনগরের বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উহার অংশটি দেখিতে মন্দ ছিল না। উক্ত চৌমাথা হইতে উত্তরে স্বল্পদূর অগ্রসর হইলেই মতিঝিলের দক্ষিণাংশ এবং উহার বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে আমাদিগের পরিচিত ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সুন্দর বাসভবন তৎকালে দেখা যাইত। রেল কোম্পানী অধুনা উক্ত বাটির চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানের অধিকাংশ ক্রয় করিয়া উহার ভিতর দিয়া রেলের এক শাখা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া উহাকে এককালে শ্রীহীন করিয়াছে। ঐস্থান হইতে আরও কিছু দূর উত্তরে অগ্রসর হইলে বামে মতিঝিলের উত্তরাংশ এবং তদ্বিপরীতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে কাশীপুর উদ্যানের উচ্চ প্রাচীর ও লৌহময় ফটক নয়নগোচর হয়। মতিঝিলের পশ্চিমাংশের পশ্চিমে অবস্থিত রাস্তার ধারে কয়েকখানি সুন্দর উদ্যান-বাটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তন্মধ্যে ৺মতিলাল শীলের উদ্যানই—যাহা এখন কলিকাতার ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর হস্তগত হইয়া ইতিপূর্ব্বের বিরাম ও সৌন্দর্য্যের ভাব হারাইয়া কর্ম্ম ও ব্যবসায়ের ব্যস্ততা ও উচ্চ ধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত রহিয়াছে—প্রশস্ত ও বিশেষ মনোজ্ঞ ছিল। মতিশীলের উদ্যানের উত্তরে তখন বসাকদিগের একখানি ভগ্ন বাসভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। রাস্তা হইতে উক্ত জীর্ণ ভবনে যাইবার যে পথ ছিল তাহার উভয় পার্শ্বে বৃহৎ ঝাউগাছের শ্রেণী বিদ্যমান থাকায় তখন এক অপূর্ব্ব শোভা ও দিব্যধ্বনি সর্ব্বদা নয়ন ও শ্রবণের সুখ সম্পাদন করিত।

কাশীপুরের উদ্যান-বাটিতে ঠাকুরের নিকটে থাকিবার কালে আমরা উক্ত শীলমহাশয়দিগের উদ্যানে অনেক সময়ে গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতাম এবং ঠাকুর ভালবাসিতেন বলিয়া ঘাটের ধারে অবস্থিত বৃহৎ গুলচি পুষ্পের গাছ হইতে কুসুম চয়ন করিয়া আনিয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতাম। অনেক সময়ে আবার অপূর্ব্ব ঝাউবৃক্ষ-রাজিশোভিত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া বসাকদিগের জনমানবশূন্য উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া থাকিতাম। ঐ উদ্যানের কিঞ্চিৎ উত্তরে ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর প্রশস্ত স্নানের ঘাট এবং তদুত্তরে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নীর বিচিত্র গোপাল-মন্দির। ঐ স্থানেও আমরা কখন কখন স্নান এবং ৺গোপালজীর দর্শন জন্য গমন করিতাম। রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপালচন্দ্র ঘোষ কাশীপুর উদ্যান-বাটির সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহারই নিকট হইতে উহা ঠাকুরের বাসের জন্য মাসিক ৮০৲ টাকা হার নিরূপণ করিয়া প্রথমে ছয় মাসের এবং পরে আরও তিন মাসের অঙ্গীকার পত্র প্রদানে ভাড়া লইয়াছিল। ঠাকুরের পরম ভক্ত শিমলাপল্লী-নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রই উক্ত অঙ্গীকার পত্রে সহি করিয়া ঐ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ না হইলেও কাশীপুরের উদ্যান-বাটিটি বেশ রমণীয়। পরিমাণে উহা চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে অপেক্ষা ঐ চতুষ্কোণ ভূমির প্রসার পূর্ব্ব পশ্চিমে কিছু অধিক ছিল এবং উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। উদ্যানের উত্তর সীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচারসংলগ্ন পাশাপাশি তিন চারিখানি ছোট ছোট কুটারি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে একখানি দ্বিতল বাসবাটি; উহার নীচে চারিখানি এবং উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্ব্বের

ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও আহার দক্ষিণের ঘরখানি—যাহার পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা ছিল—সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশনাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকতেন। উহার দক্ষিণে, প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন এবং উত্তরে সিঁড়ির ঘরের উপরের ছাদ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুই একজন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বসতবাটির পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর উদ্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উহার পশ্চিম দিকের প্রাচীর সংলগ্ন দ্বারবানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র ঘর এবং তদুত্তরে লৌহময় ফটক। ঐ ফটক হইতে আরম্ভ হইয়া গাড়ি যাইবার প্রশস্ত উদ্যানপথ পূর্ব্বোত্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইয়া বসতবাটির চতুর্দ্দিকের গোলাকার পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। বসতবাটির পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। হলঘরে প্রবেশ করিবার পশ্চিমের সোপানশ্রেণীর বিপরীতে উদ্যানপথের অপর পারে উক্ত-ডোবাতে নামিবার সোপানাবলী বিদ্যমান ছিল। উদ্যানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারি পাঁচগুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে দুই তিনখানি একতলা ঘর ছিল। তদ্ভিন্ন উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম কোণে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ডোবার পশ্চিমে আস্তাবল ঘর এবং উদ্যানের দক্ষিণ সীমার প্রাচীরের মধ্যভাগের সম্মুখেই মালীদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট দুইখানি পাশাপাশি অবস্থিত জীর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত ঘর ছিল। উদ্যানের অন্য সর্ব্বত্র আম্র, পনস, লীচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকলের উভয় পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ-

রাজীতে শোভিত ছিল এবং ডোবা ও পুষ্করিণীর পার্শ্বের ভূমির অনেক স্থল নিত্য আবশ্যকীয় শাকসবজী উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্ব্বক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসন্তকাল এবং সন ১২৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ আট মাস কাল ব্যাধি যেমন প্রতিনিয়ত প্রবৃদ্ধ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরকে জীর্ণ ভগ্ন করিয়া শুষ্ক কঙ্কালে পরিণত করিয়াছিল, তাঁহার সংযমসিদ্ধ মনও তেমনি উহার প্রকোপ ও যন্ত্রণা এককালে অগ্রাহ্য করিয়া, তিনি ব্যক্তিগত এবং মণ্ডলীগতভাবে ভক্তসংঘের মধ্যে যে কার্য্য ইতিপূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য নিরন্তর নিযুক্ত থাকিয়া প্রয়োজনমত তাহাদিগকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিজ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যৎ কথা ভক্তগণকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, যথা—"যাইবার (সংসার পরিত্যাগ করিবার) আগে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব (অর্থাৎ নিজ দেব-মানবত্ব সকলের সমক্ষে প্রকাশিত করিব)" ; "যখন অধিক লোকে (তাঁহার দিব্য মহিমার বিষয়) জানিতে পারিবে, কাণাকাণি করিবে তখন (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটা আর থাকিবে না, মা'র (জগন্মাতার) ইচ্ছায় ভাঙ্গিয়া যাইবে" ; "(ভক্তগণের মধ্যে) কাহারা অন্তরঙ্গ ও কাহারা বহিরঙ্গ তাহা এই সময়ে (তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার সময়ে) নিরূপিত হইবে" ইত্যাদি—সেই সকল কথার সাফল্য আমরা এখানে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ-সম্বন্ধী তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সকলের সফলতাও আমরা এই স্থানেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যথা—"মা তোকে (নরেন্দ্রকে) তাঁর কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন"—"আমার পশ্চাতে

তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়।—"এরা সব (বালক ভক্তগণ) যেন হোমা পাখির শাবকের ন্যায়; হোমা পাখি আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া অণ্ড প্রসব করে, সুতরাং প্রসরের পরে উহার অণ্ড সকল প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা হয় না, ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই অণ্ড বিদীর্ণ করিয়া শাবক নির্গত হয় এবং পক্ষ প্রসারিত করিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধে আকাশে উড়িয়া যায়; ইহারাও সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।" তদ্ভিন্ন, নরেন্দ্রনাথের জীবনগঠনপূর্ব্বক তাহার উপরে নিজ ভক্তমণ্ডলীর, বিশেষতঃ বালক ভক্তসকলের, ভারার্পণ করা ও তাহাদিগকে কিরূপে পরিচালনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ঠাকুর এই স্থানেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীপুরের উদ্যানে সংসাধিত ঠাকুরের কার্য্য-সকলের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তাহা বলিতে হইবে না।

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল গুরু গম্ভীর কার্য্য যেখানে সংসাধিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি যাহাতে তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চিরকাল মানবকে ঐ সকল কথা স্মরণ করাইয়া বিমল আনন্দের অধিকারী করে তদ্বিষয়ে সকলের মনেই প্রবল ইচ্ছা স্বতঃ জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু হায় ঐ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন অধুনা উদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, উক্ত উদ্যান-বাটি রেল কোম্পানী হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব লীলাস্থল যে শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া পাটের গুদাম বা অন্য কোনরূপ শ্রীহীন পদার্থে পরিণত হইবে তাহা বলিতে হইবে না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে দুর্ব্বল মানব আমরা আর কি করিতে পারি? অতএব "যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্" বলিয়া ঐ কথার এখানে উপসংহার করি।

জাতীয় জীবনে প্রকৃতিপূজার স্থান।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

প্রকৃতির সহিত ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের অভিব্যক্তি। প্রাথমিক জীবনে প্রকৃতির শাসন অপ্রতিহত। প্রকৃতির অন্ধ অনুসরণই প্রাথমিক জীবনের একমাত্র গতি। অভিব্যক্তির পথে জীবন যতই অগ্রসর হয়, প্রকৃতির শাসন ততই কমিতে থাকে। মানব-শিশু প্রকৃতির অন্ধ উপাসক। কর্ম্মঠ মানব প্রকৃতির নিয়মনে ব্যস্ত। বৈজ্ঞানিক তাহার তত্ত্ব-বিশ্লেষণে বদ্ধপরিকর, কবি তাহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে মগ্ন। পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবন প্রকৃতির অনুশাসনের বহির্ভূত—স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। প্রকৃতি-বিমুক্ত আত্মার স্বরূপ ধ্যানে তাঁহার তৃপ্তি। প্রকৃতি সেই স্বেচ্ছাবিলাস পুরুষের পরিচারিকা। অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে জীবন কখনও প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, কখনও বা প্রকৃতির অতীত আত্মার দিকে প্রধাবিত হইতেছে। প্রথম অবস্থায় প্রাকৃত-জ্ঞানের উন্নতি—শিল্প ও জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কার। দ্বিতীয় অবস্থায় অপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ—দর্শন ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের প্রচার। একপ্রান্তে অপরাবিদ্যা বা প্রকৃতিপূজা, অপরপ্রান্তে পরাবিদ্যা বা আত্মপূজা। জীবনের অভিব্যক্তি এই দুই প্রান্তের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। ভারতের জাতীয় জীবনে এই আন্দোলন কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে এবং যুগে যুগে প্রকৃতি-পূজার দিক্ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

মানুষ যে দিন তাহার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, সুদূর অতীতের সেই দিনকার ইতিহাস এখন আমাদের জানিবার কোনও উপায় নাই। সাহিত্যের ক্ষীণরশ্মি

সেই দূরতম অতীতকে আমাদের মানস-দৃষ্টির সম্মুখীন করিতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। কিন্তু সভ্যতার প্রথম যুগে প্রকৃতিদর্শনে মানবমনে যে ভাবের স্ফুরণ হইয়াছিল, বৈদিক সাহিত্যে তাহার স্মৃতির ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্য্যজাতির নিকট অনন্তবৈচিত্র্যময় প্রকৃতি গতিময়, প্রাণময় ও চৈতন্য-ময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বিশ্বে এক অতীন্দ্রিয় দৈবীশক্তির লীলা চলিতেছে। বিস্ময় ও ভক্তিতে নম্র হইয়া আর্য্যগণ প্রকৃতিপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত দর্শন, মনন ও অনুভূতির ফলে তাঁহারা বিবিধ জড়-বিজ্ঞান ও শিল্পের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সাধনলব্ধ প্রাকৃতজ্ঞান লইয়া তাঁহারা ভারতে সমাজস্থাপনপূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানে ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বৈদিক ভারত প্রকৃতির প্রিয় শিশু—প্রতিপদক্ষেপে বিস্মিত ও নিত্য নূতন আবিষ্কারে আনন্দিত। প্রকৃতির সঙ্গে তখন জীবনের সম্বন্ধ জীবন্ত। প্রকৃতির নবীনত্ব তখন চিত্তাকর্ষক, নব নব জ্ঞানের প্রেরক।

অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ আর্য্যগণ শুধু ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতির রহস্য-লোকে প্রবেশ লাভ করিয়া তাঁহারা প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডার যথাশক্তি লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তর্জীবনের শূন্যভাণ্ডার এইরূপে প্রাকৃতজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রাকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াই আর্য্যজীবনের জ্ঞানতৃষ্ণা নিঃশেষিত হয় নাই। কালক্রমে তাঁহারা ক্রমশঃ একটী বিশ্বাতীত সত্তার সাক্ষাৎলাভ করিলেন, একমাত্র যাঁহাকে জানিলে সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান লাভ হয়। এই পরাৎপর সত্তার এক প্রান্তে জীবাত্মা অপর প্রান্তে পরমাত্মা,—আদ্যন্তহীন, সনাতন। আত্মা ও পরমাত্মার, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-

যোগ দর্শন করিয়া আর্য্যগণ সিদ্ধকাম হইলেন এবং তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে কর্ম্মজগতে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার মানসে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক ভারতবর্ষে দেব-আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রকৃতি এই দেব-জীবনের সাহায্য-কারিণী সঙ্গিনী। প্রকৃতির সঙ্গে তখন জীবনের নির্বৈর জ্ঞানযোগের সম্বন্ধ।

প্রাথমিক যুগে আর্য্যহৃদয়ে যে জ্ঞানতৃষ্ণার উন্মেষ হইয়াছিল, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে তাহা তৃপ্ত হইল। জ্ঞানের গতি শেষ হওয়ায় প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্বও শেষ হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের নূতন দৃষ্টি লইয়া যখন আর্য্যগণ প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার তখন শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য্য, চিরনবীনত্ব ও আকর্ষণীশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার সকল রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। জ্ঞানকে উদ্বোধিত করিতে, জীবনে বিস্ময় আনয়ন করিতে নূতন কোনও রহস্য নাই। প্রকৃতি তখন হৃতসর্ব্বস্ব পথিকের ন্যায় রিক্ত ও পরিত্যক্ত, কেবল দুঃখ ও দৈন্যের আধার। প্রকৃতির রাজ্য নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ও অধ্রুব—অজ্ঞানের জন্মভূমি, দুঃখ শোক জরা মরণের চিরাধিকৃত লীলাক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, আত্মা ও পরমাত্মার ধ্রুব আলোকে উদ্ভাসিত জ্ঞান এমন এক রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে, যেখানে জরামরণাদি পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভেদ-যোগ, আত্মার সঙ্গে আত্মার দৈবসম্বন্ধ—জীবন-তৃষ্ণার পরমা তৃপ্তি। এই উন্নত দৃষ্টিলাভ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান প্রকৃতিকে গ্রহণ করিল না। আত্মার প্রখরালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া দর্শন-গুরু মহর্ষি কপিল দেখিলেন, প্রকৃতি-বিমুক্ত আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মানবের পরমপুরুষার্থ। তখন হইতে জ্ঞানের রাজ্যে প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রকৃতি-পূজার মন্দির-দ্বারও রুদ্ধ হইল। জীবনের দৃষ্টি পড়িল তখন প্রকৃতিকে ছাড়িয়া পুরুষের উপর—জ্ঞানজগতের অধিপতি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মার

উপর। জীবন তাহার স্বরূপধ্যানে নূতন আনন্দের অনুভূতি পাইল। লক্ষ্য হইল তখন আত্মার আত্মত্ব, মুক্তত্ব ও কেবলত্ব। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের সমন্বয় স্থির রহিল না। একমাত্র মোক্ষই জ্ঞানের লক্ষ্য হইয়া পড়িল এবং তাহারই অনুশীলনে জ্ঞান ব্যস্ত রহিল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে প্রকৃতিপূজায় যে দেব-আদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞান যোগে যে আদর্শ কালক্রমে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল, মহাভারতের যুগে সেই দেব-আদর্শ প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে ভারতসাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। বিশাল ভারত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্বন্ধশূন্য, স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়ে। রাজশক্তির অভাবে ব্রাহ্মণ্যশক্তিও অন্তর্ধান করে। শিক্ষাকেন্দ্র সকলের কোনও প্রভাব থাকে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। একটা প্রকাণ্ড সৌধ যেন প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ভারত ইতিহাসের এই অন্ধকার-যুগের আধ্যাত্মিক জগৎও একবারেই দীপ্তিহীন। কতকাল এইরূপে চলিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে সমাজে একটা গতির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ন্যাসিগণ ভ্রমণ করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, শিষ্য করিতেছেন। আত্মা, পরমাত্মা ও পরলোক সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার বিতর্ক চলিতেছে। বৈদিক শিক্ষাদীক্ষা বিজ্ঞানবিরহিত হইয়া কেবল ক্রিয়া-কাণ্ড লইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্যগণের মধ্যে কঠোর সংযম ও তপস্যার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বযুগের জ্ঞানের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়, অতীতের শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের সঙ্গে বর্ত্তমানের সমন্বয় হইতেছে না। পূর্ব্ব সংস্কার ও স্বাধীন চিন্তা পাশাপাশি চলিয়াছে। আত্মা ও পরমাত্মার উন্নত আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীন চিন্তা অসীমের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস।

সকলই যেন অবোধ্য ও অনিশ্চিত। গভীর অন্ধকার যেন চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতের জ্ঞান যখন এইরূপ অতৃপ্তির হাহাকার লইয়া তীব্র বেদনায় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছিল, তখন ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের জন্ম হয়। সহসা যেন অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া এক প্রচণ্ড সূর্য্যের উদয় হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতিঃরাশি পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। ঐতিহাসিক ভারতের জন্ম হইল। গৌতম বুদ্ধ তাঁহার অর্থপূর্ণ-নীরবতা দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধীয় সহস্র বিতর্কের পরিসমাপ্তি আনিয়া দিলেন। জ্ঞান ও প্রেম প্রীতি ও কর্ম্মে স্থির হইয়া রহিল। বুদ্ধি নির্ব্বাণের আঘাতে ফিরিয়া আসিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিল। বুদ্ধদেব যে জীবন্ত বিশ্বপ্রেম ও নীতির তরঙ্গ আনিয়া জাতীয় জীবনে গতিশক্তি সঞ্চার করিলেন, পৃথিবীর প্রতি কোণে সে শক্তির আঘাত লাগিল। সার্থক হইল তাহা ভারতের রাষ্ট্রজীবনে—সম্রাট্ অশোকের রাজত্বে। শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও নীতির দ্রুতপ্রবাহে ভারতবর্ষ পুনরায় তাহার চির গৌরবের স্থান অধিকার করিল। প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইল। প্রেম ও নীতি প্রকৃতিকে নূতন কর্ম্মে আহ্বান করিয়াছে।

সম্রাট্ অশোকের পরেই ভারতের গৌরবরবি পুনরায় অস্তমিত হইল। পরমাত্মার প্রতি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাক্ ঔদাসীন্যে সমাজ-মন বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। ভগবান্ বুদ্ধের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শ মানবত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারতের জাগ্রত চৈতন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বপ্রেম ও নীতির উজ্জ্বল আদর্শ কিছু দিনের জন্য পরমাত্মার চিন্তাকে সমাজ-মন হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। বুদ্ধির দৃষ্টিপথ হইতে যখন তাহা অন্তর্হিত হইল, বৌদ্ধ আদর্শের অসম্পূর্ণতা তখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অন্তরাত্মা প্রেম ও কর্ম্মে স্থির থাকিতে পারে না—চির উপাস্য পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছে। অপর দিকে নির্ব্বাণতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিকবাদ, অস্তিনাস্তিবাদ প্রভৃতি অসংখ্য দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। দার্শনিক মহা কোলাহলে ভারত যেমন মুখরিত হইয়া উঠিল, প্রকৃতিদেবীও তেমনই সুযোগ বুঝিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মানবত্বের আদর্শের সহিত বৈদিক ভাবের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ-দর্শনের কূটতর্ক ভেদ করিয়া তখনও তাহা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময় ভগবান্ শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য্যদেব তাৎকালিক বৌদ্ধদর্শনের কূটতর্কের দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া বৈদিকজ্ঞানের বিজয়স্তম্ভ পুনঃস্থাপিত করেন। আত্মা ও পরমাত্মার সনাতন ভিত্তিভূমি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। পরমাত্মার সঙ্গে তাহার নিত্যযোগ পুনরায় বিঘোষিত হইল। জ্ঞানের উচ্চাধিকার স্বীকৃত হইল। বেদের আত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞান সকলেই পুনর্জীবন লাভ করিল। সমাজ তখনও দর্শনের কূটতর্কে নিমগ্ন। বেদের প্রকৃতিপূজা ফিরিতে পারিল না। ভারতীয় সাধনার আর একটী অঙ্গ অপূর্ণ থাকিয়া গেল।

আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগ স্থাপনের পর দার্শনিক চিন্তার আর বেশী অবসর রহিল না। দার্শনিক কোলাহল কালক্রমে থামিয়া গেল। ভারাক্রান্ত সমাজ-মনও বিচার বিতর্কের লীলা শেষ করিয়া পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শান্তিলাভ করিল। মানব ও ঈশ্বরের সেই জীবন্ত যোগ ভারতীয় হৃদয়ের চিরসঞ্চিত প্রেমরাশি আকর্ষণ করিয়া রস ও মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিল। বুদ্ধদেবের বিশ্বপ্রেম চৈতন্যদেবের জীবে দয়া ও ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হইল। এই ভাববন্ধনে যে ভক্তি ও মাধুর্য্যের উৎপত্তি হইল, তাহাতে ভারতীয় জীবনের এক অব্যক্ত-ধারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। এদেশ জ্ঞানভক্তির ভিখারী। এদেশের

কাজকর্ম্ম আত্মার সঙ্গে আত্মার দৈবসম্বন্ধ লইয়া, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য জীবনযোগ লইয়া। জ্ঞান তাহার দূরস্থ দর্শক ও সাক্ষীমাত্র। অন্তর্জগৎ এখানে আত্মতৃপ্ত, পূর্ণতালাভে বিরামপ্রাপ্ত। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া যে জ্ঞানগতির আরম্ভ হইয়াছিল এইখানে তাহার পরিণতি, পরিসমাপ্তি ও স্থিতি। এই পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিরও বন্ধন মুক্ত হইয়াছে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হইয়াছে। প্রকৃতি এখন জীবনের লীলাসহচরী। আত্মার লীলা প্রকটিত করিবার জন্য—রসসৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতির আবশ্যক। তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাই—আছে সখ্য।

এই সময়ে বাহির হইতে এক প্রচণ্ডশক্তি আসিয়া ভারতীয় জীবনে আঘাত করিয়াছিল। সে আঘাত শক্তির আঘাত, জ্ঞানের আঘাত নয়। বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া তাহা সমাজের জ্ঞানজীবন স্পর্শ করিতে পারে নাই এবং তাহার বিকাশের গতিও রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারজনিত পরিবর্ত্তন-প্রবাহ ভারতের জ্ঞানজীবনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জ্ঞানের স্বারাজ্যে প্রকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়াই তাহা পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ বা শক্তির কোলাহল তাহাকে পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই। মুসলমান রাজত্বে আমরা প্রকৃতিকে গ্রহণ করি নাই।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগৎসৃষ্টি। আমাদের জগতে প্রকৃতির যোগ ছিল না এমন কথা নয়। যোগ না থাকিলে আমরাও থাকিতাম না, আর আমাদের এই বিরাট বিচিত্র বিশিষ্ট জগৎও থাকিত না। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ অবশ্যই ছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সে সংযোগ হইয়াছিল বিয়োগাত্মক—সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের ন্যায় সততই সমদূরবিশিষ্ট। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগের উপকরণ। আমরা প্রকৃতিকে ভোগ করি নাই। আমাদের ভোগবাসনা বৈরাগ্যের জ্বলন্ত শিখায় পতিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের কষ্টিপাথরে তাহার কলঙ্কদাগ চিরতরে লাগিয়া রহিয়াছে।

যাহা জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির বিরোধী, আমাদের তপস্যালব্ধ জ্ঞানজীবনে তাহার প্রবেশলাভ সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতদেবী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছিলেন ভোগের বেশে, 'রঙ্গদর্শয়িত্রী নটীর' ন্যায় আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে, আমাদের আত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য হরণ করিতে, আমাদের জ্ঞানযোগ ভঙ্গ করিয়া আমাদের মোক্ষ, নির্ব্বাণ ও মুক্তি কাড়িয়া লইতে। মহাদেবের ধ্যান ত ভোগের আকর্ষণে ভঙ্গ হইবার নয়। কামদেবের সন্ধান সেখানে ব্যর্থ হইবারই কথা। শত্রুবেশিনী প্রকৃতিকে আমরা গ্রহণ করি নাই, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে হইলে প্রকৃতিকে সাধনাময় জীবনগঠন করিতে হইবে, ভোগের বেশ ছাড়িয়া জ্ঞানের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, এবং আমাদের দেব-আদর্শের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে।

বৈদিক যুগের পর আমরা যে কোনও প্রাকৃতজ্ঞানলাভ করি নাই, জড়বিজ্ঞানের কোনও উন্নতিসাধন করি নাই, এমন কথা নয়। বৌদ্ধযুগে ধর্ম্ম ও নীতির আহ্বানে প্রকৃতিদেবী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পার্থিব উন্নতির দ্রুতপ্রবাহ চলিয়াছিল। জড়বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তান্ত্রিক যুগেও প্রাকৃতজ্ঞানের আবিষ্কার কম হয় নাই। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের প্রাকৃতজ্ঞান পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। কিন্তু কথা এই যে আমাদের সাধনার গতি প্রকৃতিপূজার দিকে ছিল না। প্রাকৃতজ্ঞান-লাভ তাহার লক্ষ্য ছিল না। জড়বিজ্ঞানের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা জীবনের আনুসঙ্গিক ফল। উদ্দেশ্যপূর্ব্বক জ্ঞানকৃত চেষ্টার ফল নয়। আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে আত্মা ও পরমাত্মার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সর্ব্বদা উপস্থিত থাকায়, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি তাহার লক্ষ্যীভূত হইতে পারে নাই। দার্শনিক যুগের শেষে ভক্তির যুগে আমরা প্রকৃতিকে লীলার সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। সে গ্রহণ করুণার গ্রহণ। শিশুর ক্রীড়াপুত্তলিকার মত জননীর

স্নেহের গ্রহণ। গুণের আকর্ষণে আবশ্যকবোধে জ্ঞানের গ্রহণ নয়।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে প্রকৃতিপূজা চলিতেছিল। আমরা সেই বিরাট্ সাধনার কিছু দেখি নাই ও জানি নাই। পাশ্চাত্যদেশের সাধকগণ এই পূজায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মানবচিত্তে বিজ্ঞানরূপ এক অভিনব জ্ঞানতরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতি বিশ্ববিধাতার রহস্য-লোকের বার্ত্তাবাহিনী দেবী। তাঁহার এক হস্তে জ্ঞান এবং অপর হস্তে জীবন। প্রকৃতির উপাসনায় জ্ঞানলাভ করিয়া বিজ্ঞান আজ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের স্পর্দ্ধা করিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে তপস্যাময় জীবন সমাপ্ত করিয়া প্রকৃতিদেবী এই বিজ্ঞানরূপ সাধনাময় জীবন লইয়া সাধনার দেশ ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এই শুভাগমন প্রকৃতির প্রতিশোধ নয়, ইহা দেবতার অযাচিত দান!

ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নূতন পরিচয় সংস্থাপনের ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই সংঘর্ষে কোন্ জাতির সংসার ও জীবনের প্রতি দৃষ্টি কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মানবের চিন্তারাজ্যে কোন্ অভিনব তরঙ্গ উত্থিত-হইয়া বর্ত্তমান পৃথিবীর চিন্তার গতি নিয়মিত করিতেছে, কোন্ জাতির কোন্ বিষয়ে কতটা জয়পরাজয় হইয়াছে পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজ এখনও তাহার কোন সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান ভারতের কর্ম্মজীবনে যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের জ্ঞানজীবনেও যে অনেক দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার নয়। এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের মধ্যে একটী মাত্র পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। তাহা এই, ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রবেশলাভ এবং প্রকৃতিপূজার পুনঃপ্রবর্ত্তন।

আমাদের সাধনার গতি ভক্তি ও মাধুর্য্যের বিকাশের সহিত বিরামপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাধুর্য্যেমগ্ন জ্ঞানের যোগভঙ্গ করিয়া আমাদের

সাধনালব্ধশক্তিকে কর্ম্মজগতে সার্থক করিয়া তুলিতে নূতন দৃষ্টি ও নূতন জ্ঞানের আঘাত আবশ্যক। বিজ্ঞান এইরূপ একটী নূতন দৃষ্টি ও নূতন জ্ঞানতরঙ্গ আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। প্রকৃতির অবগুণ্ঠন কথঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া বিজ্ঞান আমাদের চক্ষে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও নবীনত্ব ফিরাইয়া আনিয়াছে এবং জ্ঞানের পরিচ্ছদ দিয়া তাহাকে আমাদের গ্রহণযোগ্য বেশে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে তাহার বিশুদ্ধির ও কল্যাণকারিণী বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই সত্যময় হউক ভারতের বিবেক বৈরাগ্যের কষ্টিপাথরে তাহার মূল্যের যাচাই করিতে হইবে। মানবসাধনায় তাহার যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে কিছু গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানরাশির সহিত সমন্বয় করিয়া স্বীয় জ্ঞানজীবনের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ তাহার দীর্ঘজীবনের সাম্য বিনষ্ট হইতে পারে। প্রকৃতির পুনরাবির্ভাব এতদিন এইরূপ পরীক্ষাধীন ছিল। সে পরীক্ষার এখন শেষ হইয়াছে এবং প্রকৃতিদেবী তাহাতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আমাদের সাময়িক সাহিত্য তারস্বরে প্রকৃতির শুভাগমন ঘোষণা করিতেছে। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রাকৃত-বেদের নূতন মন্ত্র দর্শন করিয়া প্রকৃতিপূজার নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈদিকযুগের প্রকৃতি নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সংসারে অবিমিশ্র ভাল কিছুই নাই। বিজ্ঞানের জ্ঞানের সঙ্গে অনেকটা অজ্ঞান বা কুজ্ঞানও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ ও ভোগবাদ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাল্যসহচর। এই সহচরটী তাহার জন্মের দেশে যে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিজ্ঞানের সঙ্গে তাহার বাল্যসহচরটীও ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং তাহার স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহার প্রথম দর্শনেই অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শের রোমন্থন করিতেছেন।

কিন্তু বাদবহুল এই দর্শনের দেশে নূতন বাদের প্রবেশদ্বার বড় সঙ্কীর্ণ। প্রত্যক্ষবাদ ও ভোগবাদের আবির্ভাব ভারতে এই প্রথম নয়। চার্ব্বাকের ক্ষীণকণ্ঠ আধ্যাত্মিকতার কোলাহলে চিরতরে মগ্ন হইলেও, তাঁহার শ্লেষাত্মক বাক্যাবলী এখনও আমাদের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রত্যক্ষবাদ ভোগমূলক, জ্ঞানমূলক নয়। সান্ত ও সসীমের বন্ধনের মধ্যে তাহার দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ। বেদ বেদান্তের দেশ—কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্করের দেশ কখনই সান্তের বন্ধনে অনন্তকে বিসর্জ্জন করিবে না। দার্শনিক ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষদুর্গ ভেদ করিয়া অপ্রত্যক্ষকে আবিষ্কার করিয়া লইবে। প্রত্যক্ষবাদকে তাহার জন্মের দেশেই থাকিতে হইবে। ভারতে জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। আচার্য্য তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দির ভারতের গৌরবার্থে দেবচরণে উৎসর্গ করিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের অন্তর্জীবন অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষবাদের স্বাস্থ্যপ্রদ প্রভাব তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিবে। প্রত্যক্ষবাদের ছায়াদৃশ্য সম্মুখে দেখিয়া ভীত হইবার আবশ্যক নাই—ভারতে তাহার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

প্রকৃতির এই নূতন পূজা বা বিজ্ঞানসাধনা বর্ত্তমান ভারতের নূতনব্রত। জ্ঞানের সাধনায় সন্ন্যাসের ব্যবস্থা ভারতে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানের জন্য সংসার ত্যাগ ভারতের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। বৈরাগ্যই অনুরাগের মাত্রা। সাধনা চিরকালই বৈরাগ্যপ্রবণ। জ্ঞানের সাধনায় যে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধার প্রয়োজন, বৈরাগ্য ভিন্ন তাহার উৎপত্তি হয় না। অতীতের সাধনালব্ধ স্বভাব ভারতবাসী এখনও পরিত্যাগ করে নাই। বিজ্ঞান সাধনায়ও যে সে চিরাভ্যস্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ভারতের সাধনা এক্ষেত্রে কোন্ বিচিত্র সিদ্ধি লাভ করিবে, কোন্ অপার্থিব জগতের রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া নবযুগপ্রবর্ত্তনের সাহায্য করিবে, বিজ্ঞানের অস্ফুট আলোকে ভবিষ্যতের সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এই নূতন ব্রতের ফলশ্রুতি এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে

লুকায়িত। সাধনার প্রারম্ভে আচার্য্যের নূতন মন্ত্রদর্শনে ভারতীয় চিন্তার যে অভ্রান্ত বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র ইহাই মনে হয় যে বিজ্ঞান ভারতের চিরআশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূল। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভারতের জ্ঞানময় ও প্রেমময় জীবনকে আরও সুদৃঢ় করিবে।*

মানবের সুখান্বেষণের মূল ও তাহার পরিণতি।

(শ্রীহরিপ্রসাদ বসু, এম, এ, বি, এল)

এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই আপন আপন স্বভাব অনুসারে সুখের অনুধাবন করিতেছে। কি জরায়ুজ, কি অণ্ডজ, কি স্বেদজ, কি উদ্ভিজ্জ যাহা কিছু প্রাণবান্, যাহা কিছু 'জীব' শব্দবাচ্য সকলেরই লক্ষ্য সুখ। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক জীব এমন কোন কর্ম্ম করে না যাহার ফলে সে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে না। ক্ষুদ্র কীটাণু কীট হইতে আরম্ভ করিয়া জীব-সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত মানব পর্য্যন্ত এই একই নিয়মে গাঁথা। বর্ত্তমানসময়ে ইহা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধে উদ্ভিদ্‌ও মানবের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্ভিদের নিকট এমন কোন পদার্থ লইয়া যান যাহা তাহার জীবনীশক্তির হ্রাসকর, যাহা তাহার পক্ষে কষ্টদায়ক সে সঙ্কুচিত হইবে—দুঃখের শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিবে; পক্ষান্তরে

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীতে পঠিত।

এমন কোন পদার্থ লইয়া যাক্‌ যাহা তাহার জীবনীশক্তির পরিপোষক সে প্রসারিত হইবে—সুখের আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করিবে। এই যে দুঃখের নিকট হইতে পলায়ন ও সুখের নিকট অগ্রগমন—ইহা উদ্ভিদের সুখাকাঙ্ক্ষার নিদর্শন। কীট পতঙ্গ ইতর প্রাণী সম্বন্ধেও ইহা সর্ব্বত্রই অনুক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব সম্বন্ধে ত কথাই নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন দুঃখালয় সংসারের সহিত সম্পর্কজনিত দুঃখভোগের ভাবী আশঙ্কা সূচনা করিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠে—তাহার দুঃখ প্রকাশ করে ও তৎকালোচিত শুশ্রূষা দ্বারা তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হয়। সে সুখানুভব করিয়া সুস্থ হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই নিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিতে থাকে। মাতৃ-অঙ্ক শিশুর স্বর্গভূমি, তাই শিশু কষ্টের ইঙ্গিতমাত্রেই মাতৃ-অঙ্কে ধাবিত হয় ও তাহা লাভ করিয়া সুধার হাসি হাসিতে থাকে। ক্ষুৎপীড়িত হইলে মাতৃস্তন্য অন্বেষণ করে ও স্নেহমাখা স্তন্য পান করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করে—তাহার কোমলতা পবিত্রতা পূর্ণ মুখে সুখের আনন্দের বিকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্মেষের সহিত এই সুখের আদর্শের তারতম্য ঘটে বটে—কিন্তু প্রতিপদেই মানব তাহার তৎকালীন আদর্শ-অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। জীবনে যখন সে যাহা সুখ বলিয়া জ্ঞান করে তাহা পাইবার জন্য ধাবিত হয় ও তাহার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহাই করিয়া থাকে এবং তৎপ্রতিকূল অবস্থাকে দুঃখজনক জ্ঞান করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বাল্যে ধূলাখেলা করিয়া, কৈশোরে বিদ্যার্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়া, যৌবনে গার্হস্থ্য জীবন লাভ করিয়া ও অর্থাগমসহ বিবিধ ভোগবাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া মানব সুখের অনুগমন করিয়া থাকে। জগতের নশ্বরতাও যেমন ধ্রুবসত্য জীবের সুখান্বেষণও সেইরূপ ধ্রুবসত্য। এই সুখের জন্যই মানবের দেবারাধনা—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহদেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥"

ইহলোকে কর্ম্মজন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম ব্যক্তিগণ দেবতাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। আবার তাহাতেও যখন মানব তৃপ্তিলাভ না করে, যখন মানুষের অভিজ্ঞতা হয় যে, কর্ম্মসিদ্ধিরূপ সুখ চিরস্থায়ী নহে, তাহা অন্যান্য সুখের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, ও কর্ম্মফলকামনামূলক দেবারাধনা প্রকৃষ্ট আরাধনা নহে, তাহা নিম্ন শ্রেণীর আরাধনা—তখন মানব আরও উচ্চ সোপানে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হয়—তখন সে স্থায়ীসুখের জন্য, নিত্য সুখের জন্য, "ঐকান্তিক" সুখের জন্য ব্যগ্র হয় ও যে লোকে যাইলে সেই পরম সুখ পাওয়া যায়—সেই লোকে যাইবার জন্য চেষ্টা করে, যে আরাধনা করিলে, যে সাধনা করিলে সেই "আত্যন্তিক" সুখের অধিকারী হওয়া যায় সেই আরাধনা সেই সাধনা করে।

মোটের উপর দেখিতে পাওয়া গেল, আনন্দই জীবের তথা মানবের অনুসন্ধানের বিষয়। তাহার কারণ কি? কেন এমন হয়? জীব, মানব আনন্দের অনুসন্ধান করে কেন? কারণ আর কিছুই নয়—জীব বা মানব আনন্দস্বরূপ সে স্বরূপের অনুসন্ধান করে। এই যে স্বরূপের অনুসন্ধান ইহাও নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়। মনে করুন, কোন সমৃদ্ধিশালী জনপদে বা কোন তীর্থস্থানে এক মহামেলার অধিবেশন হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এই অধিবেশনের সংবাদ বিশিষ্টরূপে প্রচারিত হওয়ায় ও সর্ব্বশ্রেণীর মানবের চিত্তবিনোদন-উপযোগী দ্রব্যসম্ভার ও উৎসবাদির আয়োজন বিজ্ঞাপিত হওয়ায় উক্ত মহামেলায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহা মনে করা যায় না যে এই লক্ষ লক্ষ লোক একই প্রকৃতির হইবে। সকলেই সাধু, সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ধনী, সকলেই পরোপকারী এরূপটী ঘটে না। এই লক্ষ লক্ষ লোকপূর্ণ জনতায় সাধু থাকিবেন অসাধুও থাকিবেন, পণ্ডিত থাকিবেন মূর্খও থাকিবেন, ধনী থাকিবেন নির্ধনও থাকিবেন, পরহিতকারী থাকিবেন পরদ্বেষীও থাকিবেন নানা প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। এখন একথা সকলেই বিদিত আছেন যে এইরূপ অসংখ্য জনপূর্ণ মহামেলার অধিবেশনে

যিনি ধর্ম্মপ্রাণ সাধু তিনি সেইরূপ সাধুরই অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, যিনি পণ্ডিত তিনি পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইবেন. যিনি তস্কর তিনি তস্করের সহিত, যিনি মদ্যপ তিনি মদ্যপের সহিত, যিনি লম্পট তিনি লম্পটের সহিত, যিনি সঙ্গীতজ্ঞ তিনি সঙ্গীতজ্ঞের সহিত—এই প্রকার প্রত্যেকে সমধর্ম্মা লোকের সহিত মিলিত হইবেন। অর্থাৎ স্ব স্বরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়া মেলাদর্শন ও উৎসবাদি উপভোগ করিবেন। এখন জীবের স্বরূপ হইতেছে আনন্দ, তাই জীব সংসারে আসিয়া আনন্দ খুঁজিয়া বেড়ায়। জীব বা মানব যে আনন্দস্বরূপ একথা কোথা হইতে পাইলাম? হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মস্থলেই একথা লেখা রহিয়াছে। বেদান্ত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতির সামান্য আলোচনা করিলেও একথা জানিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহ কঠিন ও বহু সময় সাপেক্ষ হইতে পারে কিন্তু যাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়া সকল তথ্যের মধ্যস্থলে চিত্তাকর্ষকভাবে অবস্থান করিতেছে তাহার সহিত পরিচয় হইতে অধিক বিলম্ব হয় না।

আমরা শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ—যাহার তুলনায় আমাদের সৌরমণ্ডল বালুকণায় লক্ষাংশের একাংশও নহে—ইহা ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। ভগবান্ তাঁহার বিভূতি বর্ণনা করিতে গিয়া এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

"অথবা হে ধনঞ্জয় এইরূপ পৃথক্‌বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি (অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই)।"

বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এক ব্রহ্ম হইতেই অনুলোম বিলোম ক্রমে সৃষ্টি, প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। কুম্ভকার, ঘট গড়িতে

যাইলে তাহাকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ঘট গড়িতে হইবে। কুম্ভকার এখানে নিমিত্ত কারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। কুম্ভকারের শক্তি নাই যে সে কোনরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত করে। সেই জন্য ঘট-করণ বিষয়ে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বতন্ত্র কিন্তু জগৎসৃষ্টিতে এই স্বাতন্ত্র্য নাই; যিনিই নিমিত্ত কারণ তিনিই উপাদান কারণ,—ব্রহ্মই নিজ শক্তিবলে উপাদানসহ জগতের সৃষ্টি করেন এই শক্তিই ব্রহ্মের মায়াশক্তি, ইহাঁকেই প্রকৃতি বলে—"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"। গ্রীষ্মাধিক্যে বিকট তাপপ্রযুক্ত ক্ষেত্রস্থিত তৃণগুল্মাদি দগ্ধ হইয়া ক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত হয়, আবার বর্ষাগমে জলধারায় সিক্ত হওয়ায় সেই ক্ষেত্রই তাহার মরুভূমির আকার পরিত্যাগ করে ও নূতন তৃণগুল্মাদিতে পরিশোভিত হয়। কারণ, প্রচণ্ড উত্তাপে ক্ষেত্রস্থিত তৃণাদি শুষ্ক হইলেও বীজ ক্ষেত্রমধ্যে নিহিত ছিল; বৃষ্টিপাতে সরসতা প্রযুক্ত পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হয় ও তাহারা তৃণাদি আকার প্রাপ্ত হয়। প্রলয় সৃষ্টিও সেইরূপ। প্রলয়কালে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ মরুতে, মরুৎ ব্যোমে, ব্যোম অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়—পুরাণের ভাষায় তখন কেবল কারণার্ণবে বটপত্রশায়ী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহই থাকেন না। আবার সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের ঈক্ষণহেতু সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সাম্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া প্রকৃতির ক্ষোভ হইলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি এইরূপে জগতের পুনর্ব্বিকাশ হয়—

> "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
> রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
> ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
> রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"

দিবসের উপক্রমে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে) কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত অর্থাৎ চরাচর প্রাণিগণ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং

রাত্রির উপক্রমে (অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভে) সেই অব্যক্ত রূপ কারণে প্রলীন হয়। এই ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল এইরূপে বারংবার রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় ও দিবস সমাগমে প্রাদুর্ভূত হয়। এই যে দিবস ও রাত্রি ইহা ব্রহ্মার দিবস ও রাত্রি।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে প্রকৃতি হইতে সমস্ত ভূতের সৃষ্টি আবার প্রকৃতিতেই লয়। এই প্রকৃতি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না; ইহা তাঁহারই শক্তি একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ গীতার নবম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥"

"হে কৌন্তেয় প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় 'প্রকৃতিতে' লীন হয় এবং আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি। আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বভাববশে কর্ম্মাদিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।"

"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" "মামিকাং প্রকৃতিং," "স্বাং প্রকৃতিং" এই মামিকা ও স্বা শব্দের উপর লক্ষ্য করিলে নিঃসন্দেহ বুঝা যায় যে, এই প্রকৃতি ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু নহে—তাঁহারই আপনার জিনিষ, নিজের শক্তি। সপ্তমে ভগবান্ আরও পরিষ্কার করিয়া ও বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আমার অষ্টবিধা প্রকৃতি—ইহা অপরা প্রকৃতি। ইহা ছাড়া আমার পরা প্রকৃতি আছে, যাহা জীবস্বরূপ এবং যাহা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। ইহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। অর্থাৎ এই যে 'পরা প্রকৃতি' ও 'অপরা প্রকৃতি' যাহা হইতে সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইতেছে তাহা 'আমার'। আমা হইতে পরতর বা শ্রেষ্ঠতর আর

কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণিগণ গাঁথা থাকে এই জগৎ সেইরূপ আমাতে গাঁথা আছে। তাহার পর বিশেষভাবে বলিতেছেন, "আমি জলে রস, শশিসূর্য্যের প্রভাস্বরূপ, সর্ব্ববেদের প্রণবস্বরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম যে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্ম হইতে জগৎ ও জীব। চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। ব্রহ্মই যদি মায়া-উপহিত হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পান তাহা হইলে ব্রহ্মের লক্ষণ জীবে - যত সামান্য পরিমাণেই হউক না কেন—প্রকাশ পাওয়া বিচিত্র নহে; তাহাই পাইয়া থাকে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"God made man after His own image" অর্থাৎ নিজের মত করিয়া ভগবান্ মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্ম কিরূপ, ভগবানে কি আছে দেখিলেই জীবকে—মানবকে বুঝা যাইবে। আমরা জানি উপনিষদ্ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। কয়েকটী শ্রুতিবাক্য এখানে দেওয়া যাইতে পারে, যথা :—

"সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম" ॥ নৃসিংহতাপনী (পূর্ব্ব), ১৬।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ॥ বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম ॥ সর্ব্বোপনিষৎসার।

"রসো বৈ সঃ" ॥ তৈত্তিরীয়, ২।৭—ইত্যাদি।

গীতায়—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥"

"আমি ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা পর্য্যাপ্তি স্বরূপ।"

ভাগবত পুরাণে—

"নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।"

ভাঃ পুঃ, ৩ ৯ ৩।

"হে পরম তোমার যে মূর্ত্তির প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য সুতরাং আনন্দস্বরূপ।" এই সকল হইতে দেখা যাইতেছে ব্রহ্ম সৎ, ব্রহ্ম চিৎ, ব্রহ্ম আনন্দ। "ব্রহ্মের সত্তাতেই জীবের

সত্তা, ব্রহ্মের চৈতন্যেই জীবের চৈতন্য, ব্রহ্মের আনন্দেই জীবের আনন্দ"। ব্রহ্ম যেন ত্রিবিধ সাগরের ত্রিবেণী সঙ্গম। অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে, তিন প্রকারের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বিশ্বরূপ বেলাভূমিকে প্লাবিত করিতেছে—সেই প্লাবনে বিশ্বের স্থিতি, বিশ্বের জ্ঞান ও বিশ্বের আনন্দ। এই শক্তিত্রয়কে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বলা হইয়া থাকে, ও হ্লাদিনী শক্তিকে অপর দুই শক্তির সার অংশ বলা হইয়া থাকে। এই হ্লাদিনী শক্তিই বৈষ্ণবশাস্ত্রে মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—শ্রীভগবানের লীলার মূল।

"সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ;
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিদ্ যারে জ্ঞান বলি মানি।

*　　　*　　　*

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব।
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
সর্ব্বগুণমণি-কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি॥"

মানবে এই হ্লাদিনী শক্তি সুপ্তভাবে আছে বলিয়াই মানব আনন্দ অনুভব করে ও আনন্দের উৎস খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু মানব ত সসীম, অপরিপূর্ণ, সান্ত; তাহার সাধ্য হয় না যে অসীম, পূর্ণ, অনন্ত কোন ভাব একেবারে গ্রহণ করে ও ধরিয়া রাখে। তাই মানবহৃদয়ে সুখের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া আনন্দের সাময়িক প্রতিষ্ঠা হইয়া আবার তাহা লোপ পায়, তাহা অন্তর্হিত হয়। মানবের সুখানুসন্ধান কি তবে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অসত্য বস্তু? বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশের পর ঘোর অন্ধকার যেমন পথিকের পীড়াদায়ক হয় আনন্দের ক্ষণিক বিকাশও কি সেইরূপ দুঃখের, যন্ত্রণা বর্দ্ধনের হেতুভূত মাত্র? তাহার কি অন্য প্রয়োজন নাই—অন্য সফলতা নাই? করুণাময় ভগবানের রাজ্যে তাহা সম্ভব নয়; উহার সম্পূর্ণ সফলতা আছে। ঐ অস্থায়ী

বিকাশের ভিতর দিয়াই মানব স্থায়ীকে পাইতে পারে, ঐ খণ্ড সুখের ভিতর দিয়াই মানব অখণ্ড সুখের পূর্ণ আনন্দের অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন -

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যাহারা যে ভাবে আমার উপাসনা করে আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। চাই যথার্থ চেষ্টা, প্রকৃত সাধনা। মানব যদি একান্ত মনে আনন্দের অধিকারী হইব বলিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করে সে আনন্দের অধিকারী হইবেই—কেন না ভগবান্ ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করিবে আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করিব অর্থাৎ তাহার সংকল্প সাধনা করিব। কি করিয়া মানব এই সফলতা লাভ করিবে, কোন্ পথ দিয়া কোথায় যাইলে মানব সেই আনন্দের উৎসে পৌঁছিবে অতঃপর আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

সচরাচর নিয়ম এই যে, যে যে দ্রব্যের যেখানে সংস্থান তাহাকে সেই স্থান হইতেই আনিতে হইবে অথবা সেইখানে গিয়া লাভ করিতে হইবে। পুষ্প আহরণেচ্ছু ব্যক্তিকে পুষ্পোদ্যানে যাইতে হইবে, আহার্য্য আহরণেচ্ছু ব্যক্তিকে আহার্য্যের বিপণিতে যাইতে হইবে, গ্রন্থ সংগ্রহেচ্ছু ব্যক্তিকে গ্রন্থালয়ে যাইতে হইবে, বারিলাভার্থ ব্যক্তিকে জলাশয়ে যাইতে হইবে, আনন্দলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে আনন্দধামে যাইতে হইবে। ব্রজগোপীদিগের দুর্দ্দিনে শ্রীবৃন্দাকে কৃষ্ণধন দর্শন ও আনয়ন করিবার জন্য মথুরাধামে যাইতে হইয়াছিল।

"যংলব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

—যাহা লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে গুরুতর দুঃখের দ্বারা বিচলিত হয় না, সেইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইবে—আমাদিগকে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব দিতে হইবে, তবেই সেই অমূল্য রত্ন মিলিবে। কোথায় সেই সচ্চিদানন্দ সাগর?

জ্ঞানীরা বলেন, উহা তোমার নিকট হইতেও নিকটে, শুধু তাহাই নহে, "তত্ত্বমসি"—তুমিই তাহা। ইহা জানিলেই শান্তি। মনরূপ মায়াদ্বারা সেই জ্ঞানসূর্য্য আবৃত রহিয়াছে। মনবুদ্ধির পারে যাইলেই তাঁহার দর্শন মিলিবে।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

—আত্মা বৃহৎ, দিব্য, অচিন্ত্যরূপ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে আবার এই নিকটেই রহিয়াছেন। এই জীবনেই যাঁহারা আত্মসাক্ষাৎকার করেন তাঁহারা তাঁহাকে বুদ্ধিরূপ গুহায় নিহিত দেখিতে পান।

আবার ভক্তেরা বলেন, সচ্চিদানন্দের বসতি বৈকুণ্ঠধামে; তিনি গোলোকধামে নিত্য বসতি করেন। সেই গোলোকধামে যাইতে পারিলে আর তাঁহার সন্দর্শনের অভাব থাকিবে না। কোথায় সেই স্থান? ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি লোকের বহু উর্দ্ধে। চরিতামৃতে আছে—"'মায়াতীতে' ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে"। অন্যত্র—

"প্রকৃতির পার পরব্যোম ন্যাম ধাম
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান্
সর্ব্বগ অনন্ত ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম।"

বৈকুণ্ঠ তাহা হইলে প্রকৃতির পার মায়াতীত স্থান। অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়েই মায়াতীত রাজ্যের নির্দ্দেশ করিতেছেন। দক্ষিণ হইতে তিব্বত রাজ্য যাইতে হইলে যেমন হিমানী-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় বৈকুণ্ঠ রাজ্যে যাইতে হইলে সেইরূপ মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিতে হয়।

কিরূপে সেই দুস্তর মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে? ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা' আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান আসুরভাবাপন্ন দুষ্কৃতকারী নরাধম মূর্খগণ আমাকে লাভ করিতে চায়ও না পায়ও না। অতএব সন্দেহ নাই যে মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইলে অর্থাৎ মায়ার রাজ্য অতিক্রম না করিলে আনন্দধাম বৈকুণ্ঠধামে যাইতে পারা যাইবে না। আসুরভাবাপন্ন মানবের আনন্দনিকেতনে যাইবার অধিকার নাই।

ইহসংসারে মানবের দুইটী ভাব আছে—দৈব ও আসুর। আসুরভাবাপন্ন মানব দুঃখের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পায় না। দৈবভাবাপন্ন মানব দুঃখের পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিত্য আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে—

"দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরীমতা"

দৈবীসম্পদের সাহায্যে মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিতে হইবে। এই দৈবীসম্পদ্ কি?

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে প্রযত্ন, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতার অভাব, দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, চপলতাহীনতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অভিমানশূন্যতা এই সকল সদ্‌গুণ দৈবীভাবাপন্ন মানবকে অলঙ্কৃত করে। মায়ারাজ্য অতিক্রম করিতে হইলে বৈকুণ্ঠযাত্রীকে এই সকল মহামূল্য উপাদান দ্বারা পন্থা নির্ম্মাণ

করিয়া লইতে হয় ও সেই পন্থা সহযোগে আনন্দের দ্বারে—অমৃতের দ্বারে উপনীত হইতে হয়। সহজে কি এই দৈব ভাবকে লাভ করা যায়?

সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে সামান্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে মানবকে কত যত্ন কত চেষ্টা করিতে হয়। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহেন, যে বিষয়ে কৃতিত্বলাভ করিতে চান, অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ের ধ্যান করিতে হয়, সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে হয়। এক প্রণয়ীর দুইজন বা ততোধিক প্রণয়িনীকে সমভাবে আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দুইয়ের সেবা দ্বারা দুইয়েরই কিছু কিছু লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে কিন্তু দুইয়ের ষোলআনা অর্জ্জন করা যায় না। একের সমগ্র স্নেহের অধিকারী হইতে হইলে অপরকে ছাড়িতে হয়। হাস্যরসের শ্রেষ্ঠকবি পূজনীয় দীনবন্ধু বাবুর লিখিত সপত্নীদ্বয়ের প্রেমভাজন ভাগ্যবান্ স্বামীর আলেখ্য ঐ বিষয়ক উৎকৃষ্ট Caricature বা নক্‌সা। উপরোক্ত দৈবভাব লাভ করিতে হইলে তাহার অনন্যসেবক হওয়া চাই। দৈবভাব বলিতে অনেকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে—কিন্তু যেমন বিজ্ঞান শাস্ত্রে তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিবিধ শক্তির উল্লেখ থাকিলেও তাহাদিগকে এক মূল শক্তির অবস্থাবিশ্লেষলব্ধ বিভিন্ন বিকাশমাত্র বলা হইয়া থাকে—সেইরূপ দৈবভাবব্যঞ্জক সদ্‌গুণাবলীকে প্রধানতঃ এক সামান্য শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ বলিতে পারা যায়। সেই অমূল্য শক্তির নাম বৈরাগ্য বা Renunciation; ইহারই বিপরীত শক্তির নাম ভোগলিপ্সা। বৈরাগ্য ও ভোগলিপ্সা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই দুই বিবদমান শক্তির কুরুক্ষেত্ররূপ সংগ্রামস্থল মানবের হৃদয়। যে অবোধ এই দুইয়ের সেবা করিয়া এই দুইকেই সন্তুষ্ট করিতে যাইবে সে সম্ভবতঃ দুইকেই হারাইবে। ভোগের দ্বারা মানব সংসারেই বদ্ধ হইয়া থাকিবে। ভোগীর সংসার অতিক্রম করার চেষ্টা আকাশকুসুম লাভের চেষ্টার ন্যায় অলীক। ভোগের দ্বারা আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় না—লালসার পরিতৃপ্তি হয় না।

অগ্নিযুক্ত ইন্ধনে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভোগের দ্বারা লালসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। তাহার শেষ দেখা যায় না, অবশেষে মানবকে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। সুখের পিছনে দৌড়িয়া সুখকে ধরিতে পারা যায় না। যেমন চক্রবাল স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে কোন মানব দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে সে যত অগ্রসর হয় চক্রবালও ততই পিছাইয়া যায় তাহার চক্রবাল লাভ হয় না পরন্তু দৌড়ানই সার হয়, সেইরূপ "সুখ" "সুখ" বলিয়া তাহার পিছনে যত দৌড়াইবে সুখ ততই পিছাইয়া যাইবে সুখকে পাইবে না, দৌড়ানই সার হইবে। অতএব ভোগকে ছাড়িতে হইবে বৈরাগ্যকে সেবা করিতে হইবে—প্রবৃত্তিকে ছাড়িতে হইবে নিবৃত্তিকে লইতে হইবে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী তাঁহার ভক্তিপূর্ণ গবেষণামূলক "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে যাইয়াও মানব সংসার ও ঈশ্বর, ভোগ ও ত্যাগ উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। ভাগ্যবান্ কোন কোন ব্যক্তিই তদুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া ধারণা করে এবং ঈশ্বরার্থে সর্ব্বত্যাগরূপ আদর্শকে কাটিয়া ছাঁটিয়া অনেকটা কমাইয়া না আনিলে ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য হওয়া অসম্ভব এ কথা বুঝিয়া ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয় না। ঐরূপে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া যাহারা চলিতে চাহে তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এতটা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য ভাবিয়া সীমানির্দ্দেশ পূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত সংসারে নোঙর ফেলিয়া রাখে"। ভগবান্ও এই কথা বলিয়াছেন—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥"

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি (এখানে সর্ব্বত্র শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয়) নিরহঙ্কার স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

"ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ"

ধ্যানযোগপরায়ণ 'নিত্যবৈরাগ্যবান্' ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত অর্থাৎ একমাত্র বৈরাগ্যের সেবা দ্বারা, নিবৃত্তির সেবা দ্বারা—মনরাখা

সেবা হইলে হইবে না—অনন্যযোগদ্বারা যে ঐকান্তিক সেবা করা হয় সেই সেবা দ্বারা পরম বস্তু লাভ করিতে হইবে। ত্যাগের দ্বারা আনন্দকে লাভ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকভাবে ও, ভাষায় বলিতে গেলে জীবকে অন্নময়কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, প্রাণময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, মনোময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, এমন কি, বিজ্ঞানময় কোষ ফেলিয়া দিতে হইবে, তবে জীব আনন্দময় কোষে বিরাজ করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংসারে সামান্য বস্তু লাভের জন্য কত চেষ্টা কত যত্ন কত সাধনার প্রয়োজন। সামান্য বিষয়ে এইরূপ নিয়ম হইলে পরমবস্তু সম্বন্ধে যে তাহার লক্ষগুণ চেষ্টা যত্ন সাধনা চাই তাহাতে সন্দেহ নাই। "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' করিলে শ্যামধন মিলিবে না—কুল ত্যাগ করিতে হইবে তবে শ্যামধন লাভ হইবে।

"নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই ছার তনু করব বিনাশ" —এই ভাব হওয়া চাই। তাঁহাকে চাই আর কিছু চাই না—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার দূর হও—আমার পথে দাঁড়াইও না—আমি শ্যামধন লাভ করিবার জন্য যাইতেছি। মনের এইরূপ অবিচ্ছিন্নাগতি চাই, তৈল ধারার ন্যায় এইরূপ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চাই, তবে গোলক-ধামে আনন্দস্বরূপ শ্যামসাক্ষাৎকার হইবে। তাই ভগবান্ শেষে বলিয়াছেন—

> "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

সকল প্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শোক করিও না। সদা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে—

"এস নাথ! প্রাণবল্লভ! হৃদয়ের ধন! আমার হৃদয়রাসমন্দিরে এস ও দ্বাপরের প্রকট অভিনয় আবার সেইখানে আমাকে দেখাও,

তবেই আনন্দের অনুসন্ধান শেষ হইবে—আনন্দের পথিক আনন্দধামে উপস্থিত হইবে—এই ভবযন্ত্রণা দূর হইবে।

আমরা দেখিলাম, মানবের সুখান্বেষণের মূল—তাহার প্রকৃতিতে ও উহার পরিণতি তাহার স্বরূপলাভে। *

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।

(শ্রীগোকুলদাস দে, এম. এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

কুমারের গৃহত্যাগের পরই কপিলবস্তুতে যে হাহাকার উঠিয়াছিল তাহা ছন্দকের শূন্য অশ্ব লইয়া পুনরাগমনে আরও মর্ম্মবিদারক হইয়া উঠিল। পুরবাসীরা ছন্দেকের নিকট সমস্ত জ্ঞাত হইয়া বলিলেন ;—

'ইদং পুরং তেন বিবর্জ্জিতং বনং বনং চ তক্তেন সমন্বিতং পুরং'

এই নগরী তাঁহার অবর্ত্তমানে অরণ্যের ন্যায় দেখাইতেছে আর সেই অরণ্য তাঁহাকে লাভ করিয়া নগব তুল্য শ্রীধারণ করিয়াছে। মহাপ্রজাবতী গোতমী ও যশোধরা ছন্দককে বহু তিরস্কার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কন্থককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :— "কন্থক, তুমি বহু সমরে বজ্রসদৃশ অস্ত্র ও দুঃসহ শরাঘাত সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে, আজ প্রভুর সামান্য কশাঘাতভয়ে তাঁহাকে রাজপুরী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিলে? তোমাকে শত ধিক্!" ছন্দক বাষ্পবারিপূর্ণ নেত্রে সেই ক্রিয়া দেবপরিচালিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে বুঝাইয়া তাঁহাদের কতকটা সান্ত্বনা দিলেন। রাজা তনয়ের অদর্শনে

* বোলপুর 'বাণীসংঘে' পঠিত।

দেবমন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছন্দকের প্রত্যাগমন শুনিয়া প্রাসাদে আসিয়া কুমারকে দেখিতে না পাইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও কুলপুরোহিত কুমারকে অবিলম্বে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার সান্ত্বনা দিয়া সেই আশ্রমে যাত্রা করিলেন কিন্তু তপোবনে আসিয়া শুনিলেন কুমার ইতিপূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মন্ত্রী ও পুরোহিত লোকোপদিষ্ট মার্গে গমন করিতে করিতে কুমারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন পথের এক পার্শ্বে বৃক্ষমূলে রাজপুত্র মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। সিদ্ধার্থ উভয়কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিলে মন্ত্রী ও পুরোহিত প্রব্রজ্যার নিষ্প্রয়োজনত্ব ও গার্হস্থ্যধর্ম্মের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইতে লাগিলেন; অপিচ বহুল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিশেষে বলিলেন, এইরূপে স্বজনবর্গকে শোকে দহ্যমান করিয়া তাঁহার কোনরূপে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। যদিও কুমার বৈরাগী হইয়াছেন তথাপি পুনরায় গৃহে গিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় বা গৌরবহানি হইবে না। তাঁহাদের সহিত তর্কে নিরুত্তর হইয়া কুমার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন যে, তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহা প্রাপ্ত না হইয়া কদাচ গৃহে ফিরিবেন না।

"তদেবমপ্যেব রবির্মহীং পতেদপি স্থিরত্বং হিমবান্ গিরিস্ত্যজেৎ।
অদৃষ্টতত্ত্বো বিষয়োন্মুখেন্দ্রিয়ঃ শ্রয়েয় ন ত্বেব গৃহান্ পৃথগ্ জনঃ॥"

"সূর্য্য খসিয়া ভূতলে পতিত হইতে পারে, এই মহান্ হিমালয়ও বিচলিত হইতে পারে কিন্তু আমি ইতরসাধারণের ন্যায় তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়াভিমুখী হইব না।" আরও বলিলেন—

"অহং বিশেয়ং জ্বলিতং হুতাশনং ন চাকৃতার্থঃ প্রবিশেয়মালয়ং।"
ইতি প্রতিজ্ঞাং স চকার গর্ব্বিতো যথেষ্টমুত্থায় চ নির্ম্মমো যযৌ॥

"বরং আমি প্রজ্জ্বলিত হুতাসনে প্রবেশ করিব তথাপি অকৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিব না।" এই গর্ব্বিত প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই মায়াবিরহিত রাজপুত্র উঠিয়া আপনার মনে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী ও

পুরোহিতকে ভগ্নমনোরথ হইয়া কপিলবস্তুতে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

অনন্তর সেই ভিক্ষুবেশী রাজপুত্র তরঙ্গভঙ্গময়ী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া আড়ার কালামের নিকট গমন করিবার পথে রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন। সেই শিবতুল্য মহাপুরুষের আগমন শুনিয়া রাজগৃহবাসী সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। প্রজাবর্গের বিচলিত ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন এই সমগ্র পৃথিবী শাসনে সমর্থ রাজপুত্রের ভিক্ষুবেশ দর্শনে রাজগৃহের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। রাজা বিম্বিসার শাক্যরাজ শুদ্ধোদনপুত্র সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জনৈক দূত নিযুক্ত করিলেন। দূত অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কুমার ভিক্ষাপাত্রহস্তে পাণ্ডব-শৈলে গমন করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছেন। সে ফিরিয়া আসিয়া তখনি মহারাজকে ঐ সংবাদ প্রদান করিল। মহারাজ দূতের সহিত সন্ন্যাসী-রাজপুত্রকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি আসিয়া আপনার পরিচয় দান করিলে সিদ্ধার্থ তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজা বলিলেন, "বৎস, তোমার বংশের সহিত আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে, তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, সেইহেতু আমার স্নেহপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ কর। মহা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি এরূপ ভিক্ষুবেশ গ্রহণ করিয়াছ কেন? যদি তোমার পিতার উপর কোন অভিমান হইয়া থাকে আমি এখনি তোমাকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিতেছি, সুখে ভোগ কর। তাহাতে যদি সম্মত না হও যে রাজ্যের জন্য বিরাগী হইয়াছ, চল, আমার সৈন্যসহায়ে সেই রাজ্য উদ্ধার করিয়া লও। তুমি ত্রিলোকের উপর প্রভুত্ব করিতে সমর্থ, এজন্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছি—আমার নিজের বিস্ময়, ঐশ্বর্য্য বা ভোগের জন্য নহে। তোমার এই ভিক্ষুবেশ দেখিয়া আমার চক্ষু স্বতঃই অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। পুণ্যের প্রয়োজন হইলে তুমি গৃহে গিয়া বহু যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গে

ইন্দ্রতুল্য হইতে পারিবে।” বিম্বিসারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র তাঁহাকে বিষয়ভোগের ভয়াবহ পরিণামগুলি একে একে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন—

“নাশীবিষেভ্যোঽপি তথা বিভেমি নৈবাশনিভ্যো গগনাচ্যুতেভ্যঃ।
ন পাবকেভ্যোঽনিল সংহিতেভ্যো যথা ভয়ং মে বিষয়েভ্য এভ্যঃ॥”

“অতি বিষধর সর্প, গগনচ্যুত বজ্রপতন বা বায়ুসংযুক্ত বহ্নিশিখাকেও আমি ভয় করি না কিন্তু এই সংসারজনক ভয়ানক বিষয়কে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভয় হয়।”

তখন রাজা তাঁহার জ্বলন্ত বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন যেন মুক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রথমেই তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। ভগবান্‌ও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে তিনি আড়ার কালামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন; তিনিও সাগ্রহে তাঁহার প্রচারিত পন্থা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু আড়ার কালামের উপদেশে সিদ্ধার্থের তত্ত্ব পিপাসা তৃপ্ত হইল না। এই তাপসপ্রদর্শিত পথ সম্পূর্ণ মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা সন্দিহান হইয়া তিনি অন্য এক আচার্য্য রুদ্রকের আশ্রমে গমন করিলেন। সেখানেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অবশেষে স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা তীরে কঠোর তপস্যারত হইলেন। এই সময় আরও পাঁচজন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যার পর তাঁহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কঙ্কালসার হইল। মস্তকঘূর্ণিত এবং মন সমাধিভূমি হইতে বারম্বার চ্যুত হইতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি সেই কঠোর তপস্যার অসারতা উপলব্ধি করিয়া দেহকে যত্নে পুষ্ট রাখিতে মনস্থ করিলেন। স্নানান্তে আহার করিবেন ভাবিয়া সেই ক্ষীণদেহে ধীরে ধীরে নৈরঞ্জনায় নামিয়া অবগাহন করিয়া যেমন এক বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক তীরে উঠিলেন অমনি অত্যধিক দুর্ব্বলতায় সেই স্থলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়

নন্দবালা নামে এক গোপকন্যা তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তখনি দুগ্ধ আনিয়া তাঁহাকে পান করাইল। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এইরূপে সেই পুণ্যকর্ম্মা গোপবালার নিকট প্রতিদিন দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া তিনি দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন, অচিরে তাহা পূর্ব্ববৎ লাবণ্যশালী ও বলবান্ হইল। সেই সময় উক্ত পাঁচ জন অনুচর তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগী বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। যখন তিনি মনকে আবার সবল করিয়া ধ্যানারূঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই সময় একদিন বৈশাখী পূর্ণিমায় সুজাতার দত্ত পায়সান্ন ভক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই পবিত্র অশ্বথবৃক্ষমূলে সমাসীন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যতে॥"

"এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হউক, ত্বক্অস্থিমাংস বিলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকল্পদুর্লভ বোধি প্রাপ্ত না হইয়া আমি আর এস্থান হইতে উঠিব না।" সিদ্ধার্থ পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। কিন্তু তপস্যার বিঘ্নকর মার আসিয়া তাঁহার মানসপটের উপর বিভীষিকাময় নানাচিত্র প্রতিফলিত করিতে লাগিল। কখন সুবেশা সুকেশা সঙ্গিনীগণের হাবভাবসংযুক্ত বিলাস নৃত্য; কখন ঝঞ্চাবাত শিলাপাত বজ্রাঘাতসংযুক্ত প্রলয় যামিনীর ভীষণ অভিনয়। কিন্তু যতিবরের ভ্রূভঙ্গপাতে মারের সমস্ত অত্যাচার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অতঃপর কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে নির্ম্মল বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রজ্যোতি বিমলিন করিয়া সিদ্ধার্থের হৃদয়ে বহুকল্পদুর্লভ পরমতত্ত্ব প্রতিভাত হইল। পুলকে রোমাঞ্চিত কলেবরে যোগীবর গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তিনি আহারবিহাররহিত হইয়া সপ্তাহ কাল ধরিয়া সেইরূপ অবস্থায় জ্ঞানলাভের প্রথম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

জীব তাঁহার এই সুগভীর তত্ত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে কিনা সন্দেহ করিয়া তিনি জগতের সমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার সে সন্দেহ নিরাকরণ

করিলেন। তখন তিনি দীক্ষাগুরু আড়ার কালাম এবং রুদ্রককে সেই জ্ঞান প্রথম প্রদান করিবেন ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর ধ্যানবলে সেই পূর্ব্ব পঞ্চ অনুচরকে বারাণসীতে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান দান করিবার জন্য ঐ স্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে পূর্ব্ববন্ধু ও পরিব্রাজক উপকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উপক তাঁহার মুখে বহুদিনের পর হাস্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—

"সব্বাভিবূ সব্ববিদূ'হং অস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো
সব্বঞ্জহো তন্হক্খয়ে বিমুত্তো সয়ং অভিঞ্ঞায় কং উদ্দিসেয়্যংতি
ন মে আচরিয়ো অত্থি সদিসো মে ন বিজ্জতি
সদেবকস্মিং লোকস্মিং নত্থি মে পটিপুগ্গলো
ধম্মচক্কং পবত্তেতুং গচ্ছামি কাসিনং পুরং
অন্ধভূতস্মি লোকস্মিং আহঞ্ঞি অমত দুন্দুভিংতি"

"সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া সকল বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক আমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। সর্ব্বত্যাগে তৃষ্ণার উচ্ছেদ করিয়া আমি স্বয়ং জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আর কাহারও নিকট আমার শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। আমার আচার্য্যও নাই, আমার সদৃশও নাই, দেব ও মনুষ্য লোকে কেহই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। সম্প্রতি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত আমি বারাণসীধামে গমন করিতেছি। অন্ধকারাবৃত এই লোকে আমি অমৃতের দুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ করিব।' উপক পরিহাস করিয়া প্রস্থান করিল। তিনি বারাণসীতে সেই পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চতাপস-দিগের নিকট আপনার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। ইঁহারাই তাঁহার প্রথম শিষ্য। তৎপরে বারাণসী হইতে মগধে আসিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত রাজা বিম্বিসারকে দীক্ষিত করিলেন। পথিমধ্যে গয়াতে আরও বহু শিষ্য হইল এবং ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। এখন হইতে ক্রমান্বয়ে ৪৫ বৎসর ধরিয়া অবাধে

পরিশ্রমে তিনি বুদ্ধ নাম গ্রহণপূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র 'বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেব-মনুষ্যাণাং' বিচরণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন ও শিষ্য-বর্গকে সেইরূপ অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন।

বুদ্ধের শিষ্যগণ সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে সকল অবস্থার ব্যক্তি আসিয়া একত্রিত হইতেন। ব্রাহ্মণ হইতে অস্পৃশ্য চণ্ডাল, ঐশ্বর্য্যশালী রাজা হইতে দীন ভিক্ষুক, নিষ্কলঙ্ক বৈরাগ্যবান্ কুমার ব্রহ্মচারী হইতে ক্রূর নরঘাতক দস্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একমাত্র শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের সকলের পরিচয় দান করা অসম্ভব। তবে আনন্দ, সারিপুত্র, মোগ্গলায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, উপালি এই কয়জন তাঁহার প্রায় নিকটে থাকিতেন। তাঁহার অসংখ্য গৃহী ভক্তের ভিতর মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, অবন্তীরাজ প্রদ্যোত, কৌশাম্বীরাজ উদয়ন, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক, ধার্ম্মিকা বিশাখা ও রাজ্ঞী মল্লিকার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই ভগবানের জন্য অর্থে এবং সামর্থ্যে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ বিম্বিসারের অতুলনীয় চিকিৎসক ভারতের অদ্বিতীয় ভেষজাচার্য্য জীবক ভগবান্ বুদ্ধের ও সঙ্ঘের চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। তাহার অদ্ভুত চিকিৎসার একটী উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবার ভগবান্ অসুস্থ হওয়ায় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিরেচক সেবন করাইবার প্রয়োজন হয়, অতি সুকুমারকান্তি তথাগতকে সাধারণ বিরেচক প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়া জীবক তিনটী পদ্ম সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে কোন ভেষজের সূক্ষ্মাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিলেন। ভগবানের নিকট আসিয়া তিনি একটী পদ্ম তাঁহার হস্তে দিলেন। ভগবান্‌ও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া ঘ্রাণ লইলেন। তখন জীবক বলিলেন, 'ভগবন্ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, ইহার ঘ্রাণই বিরেচকের কার্য্য করিবে। প্রয়োজন হইলে আরও দুইটী পদ্ম রহিল তাহা ব্যবহার

করিবেন।' বিরেচকের কার্য্য সিদ্ধ হইলে ভগবান্ অচিরে সুস্থ হইয়াছিলেন।

প্রথম আমরা সিদ্ধার্থকে স্বজনমণ্ডলীর উপর বড়ই বীতশ্রদ্ধ দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার কপিলবস্তু ও শাক্যদিগের উপর কি প্রগাঢ় স্নেহ ছিল, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর তিনি তাঁহাদিগের জন্য কি করিয়াছিলেন অতঃপর তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ভগবানের অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে মন্ত্রী ও পুরোহিত ফিরিয়া যাইবার পর রাজা শুদ্ধোদন কুমারের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের ধারণা ছিল—

"বীরো হবে সত্তযুগং পুনেতি
যস্মিং কুলে জায়তি ভূরিপঞ্ঞো"

"যে বংশে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে বংশের চতুর্দ্দশপুরুষ পবিত্র হন।" রাজা যখন এই ধারণায় দৃঢ়চিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন এবং কুমার কঠোর তপশ্চরণে নিরত, সেই সময় কোন দেবতা শুদ্ধোদনকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে কতকগুলি অস্থি দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনার পুত্র আর জীবিত নাই, এই দেখুন তাঁহার ভস্মাবশিষ্ট অস্থি সকল আনিয়াছি।" দৃঢ়বিশ্বাসী পিতা উত্তর করিলেন, "যতদিন না আমার পুত্রের সিদ্ধিলাভ হয় ততদিন কোন শক্তিই তাহাকে নিহত করিতে পারিবে না। ইহা আপনার পরিহাস মাত্র।" এই কথায় দেবতা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমারের কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার কথা শুনিয়া রাজপুরবাসিগণ অল্পবিস্তর সান্ত্বনা লাভ করিলেন, এমন কি, পতিবিরহবিধুরা সহধর্ম্মিণী যশোধরা স্বামীর তীব্র বৈরাগ্য স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পরিশেষে শুদ্ধোদন যখন সংবাদ পাইলেন তাঁহার পুত্র বুদ্ধ নাম ধারণ করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামে প্রথম ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহারই পূর্ব্ব কথানুযায়ী

তাঁহাকে গৃহে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে সেই ব্যক্তি তথাগতের নিকট আসিবামাত্র রাজাদেশ বিস্মৃত হইয়া ভিক্ষু হইল এবং গৃহে ফিরিবার নামগন্ধও করিল না! রাজা দ্বিতীয় লোক পাঠাইলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিরও ঐরূপ হইল! অতঃপর রাজা চিন্তিত হইয়া প্রধান মন্ত্রী উদায়ীকে পাঠাইলেন। তখন ভগবান্ মহারাজ বিম্বিসার-প্রদত্ত মগধের বেলুবনে অবস্থান করিতেছেন। উদায়ীও আসিয়া ভিক্ষু হইলেন, কিন্তু তিনি আপনার উদ্দেশ্য ভুলিলেন না। উপযুক্ত অবসর লক্ষ্য করিয়া বসন্তের প্রারম্ভেই তিনি তথাগতকে বলিলেন, "ভগবন্, এই মধুর বসন্তে আশান্বিতদিগের আশা পূর্ণ হইবার সময়। আমার আশাও এক্ষণে পূর্ণ হউক। এইবার যেন শাক্যি ও কোলিয়গণ আপনাকে রোহিণী উত্তীর্ণ হইতে দেখিতে পায়। আপনার পিতামাতা ও শাক্যেরা আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উদ্গ্রীব ও উৎসুক হইয়া রহিয়াছেন।" ভগবানের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। তিনি কপিলবস্তু ত্যাগ করিবার সময় বলিয়াছিলেন, 'সিদ্ধিলাভ করিয়া আবার আমি তোমায় দেখিতে আসিব।' অবিলম্বে তিনি কপিলবস্তু দর্শনে উদায়ীর সহিত যাত্রা করিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠবস্তু অর্জ্জন করিয়া গৃহাগত প্রবাসীর ন্যায় আবার তিনি সকলের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সকলেই আসিলেন, কেবল যশোধরা আসেন নাই। পিতার নিকট যশোধরার কঠোর ব্রহ্মচরণের কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মেও যশোধরা ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া 'চন্দকিন্নরী জাতক' বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি মাতা গোতমী ও পিতাকে শ্রোতাপত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রথম সোপানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। আবার আনন্দের হাট বসিল। কিন্তু বৈরাগ্যের আনন্দ যে সংসারসুখ হইতে ভিন্ন তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে মাতা, পিতা ও কপিলবস্তুবাসীর সেই উদ্দাম আনন্দে কিঞ্চিৎ বাধা প্রদান করিতে হইল। পরদিন শুদ্ধোদন দেখিলেন কুমার ভিক্ষাপাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন; কুমারকে বলিলেন, "পুত্র, একি করিতেছ?

ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ হইতেছে না? আমি কি সকলের আহার যোগাইতে পারি না?" বুদ্ধ বলিলেন, "মহারাজ ইহাই আমার বংশের ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্ম পালন করিতেছি মাত্র।" শুদ্ধোদন কহিলেন, "তোমার পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম হইয়াছে। এই বংশের কেহই কখন ভিক্ষা করেন নাই।" বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "আপনার ইক্ষ্বাকু বংশে জন্ম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার ত তাহাতে জন্ম নহে, আমি বুদ্ধবংশে জন্মিয়াছি। আমার পূর্ব্বগামী বুদ্ধেরা সকলেই ভিক্ষা করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি দুইটী গাথা দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মে পিতার চিত্ত নিবদ্ধ করিলেন—

"উত্তিট্‌ঠে ন প্পমজ্জেয়্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥
ধম্মং চরে সুচরিতং ন নং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখংসেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ॥"

"সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত ও সংযত থাকিয়া সুচারুরূপে ধর্ম্মাচরণ করিবে এবং ধর্ম্মপালন করিতে হইলে আগ্রহের সহিত করিতে হইবে, অলসভাবে করিলে কোন ফল হইবে না। কারণ ধর্ম্মাচারী ইহলোক ও পরলোকে মহা সুখে অবস্থান করেন।" অতঃপর যশোধরাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘকাল পরে প্রিয়তমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যশোধরা তাঁহার চরণতলে নিপতিতা হইলেন। ভগবান্ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিবার কালে যশোধরার ইঙ্গিতে পুত্র রাহুল আসিয়া বলিল, "হে শ্রমণ তোমার ছায়া অতীব সুখকর; আমি তোমার দায়াদ, আমায় তোমার সম্পত্তি প্রদান কর।" বুদ্ধদেব পুত্রকে বিহারে লইয়া গিয়া দীক্ষাদানে পরমসম্পত্তি প্রদান করিলেন। পরদিন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুমার নন্দের বিবাহ ও অভিষেক উৎসব। কিন্তু ভগবান্ তাহা বন্ধ করিয়া নন্দকেও বিহারে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিলেন। বৃদ্ধ পিতা তদ্দর্শনে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যেন অতঃপর সিদ্ধার্থ মাতাপিতার অমতে সন্তানকে

দীক্ষিত না করেন। ভগবান্‌ও তাহা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পর কপিলবস্তু হইতে ফিরিবার পথে অনোমা নদীতীরে 'অনুপিয়' নামক স্থানে বিশ্রামকালে বুদ্ধদেবের খুল্লতাতপুত্র আনন্দ, অনুরুদ্ধ, তাঁহার শ্যালক দেবদত্ত এবং নাপিত উপালি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

কালক্রমে সমগ্র শাক্যজাতি, শাক্য এবং কোলিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, উভয়ের মধ্যেই পরস্পর বিবাহাদি সম্পন্ন হইত। তথাগতের মাতা ও স্ত্রী এই কোলিয়বংশীয়া ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে কপিলবস্তুতে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় রোহিণীর জল লইয়া শাক্য ও কোলিয়দিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইয়া যুদ্ধের উপক্রম হইল। যখন যুদ্ধ হয় হয় তখন ভগবান্ শ্রাবস্তী হইতে সহসা আগমন করিয়া সেই বিবাদ শান্ত করিয়া দিলেন। শাক্য ও কোলিয়েরা তাঁহার অপার করুণা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল এবং তাঁহার সেবার জন্য আপনাদিগের মধ্য হইতে ৫০০ শাক্য ও কোলিয কুমারকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিল। ভগবান্ সেই ৫০০ কুমারের শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে হিমালয়ের সুগভীর মহান্ দৃশ্যসকল দেখাইতে লইয়া গেলেন।

পর বৎসর পিতার অন্তিম সময়ে বুদ্ধদেব পুনরায় কপিলবস্তুতে আসিয়া পিতাকে অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া ও জ্ঞাতিবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া বৈশালির মহাবন বিহারে চলিয়া আসিলেন।

এই স্থানে তাঁহার ধর্ম্ম ও সংঘের যুগান্তরকারী একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। এতদিন তিনি স্ত্রীলোককে সংঘে গ্রহণ করেন নাই। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর প্রজাবতী গোতমী ও যশোধরা প্রমুখ পূর্ব্বপ্রব্রাজিত পঞ্চশত শাক্য ও কোলিয় রাজকুমারদিগের পত্নীগণ মস্তকমুণ্ডন ও পীতবস্ত্রধারণ করিয়া তথাগতের নিকট প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিলেন। তিনি দুইবার তাঁহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার আনন্দের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ভিক্ষুণী-ব্রতে

দীক্ষিত করিলেন। এই নারীসংঘের জন্য অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইল। তাঁহারা ঐ সকল কঠোর নিয়মাবলী পালনে স্বীকৃত হইলেন এবং শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডকের সুবৃহৎ জেতবনবিহারে গমন করিয়া স্বতন্ত্র ভিক্ষুণী বিভাগে বাস করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যা দিয়া তথাগত, আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "আনন্দ, আমার ধর্ম্ম যদি ১০০০ বৎসর, সদ্‌ভাবে থাকিত অদ্য স্ত্রীজাতিকে প্রব্রজ্যা দেওয়ায় তাহা মাত্র ৫০০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।"

(ক্রমশঃ)

পবিত্রতা।*

(স্বামী পরমানন্দ)

পবিত্রতাই প্রকৃত শক্তি, পবিত্রতাই প্রকৃত আনন্দ ও আত্মিক তেজ। এই উপায়ে শক্তিসঞ্চয় কর। এই পবিত্রতার বিষয় বিস্মৃত হইও না। অমর হইতে পারিবে। পবিত্রতাই তোমাকে ভীতিশূন্য ও সদানন্দ করিবে। শক্তি ও সাহস অবলম্বন কর, তোমার নিকট যাহাই আসুক উহাকে গ্রাহ্য করিও না। পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত দুর্ব্বলতাকে জয় কর। ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাস রাখিয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হও। তিনিই তোমায় সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন।

এই পবিত্রতার সহিত যাহা কিছু করিবে তাহাই জলন্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং কোন কিছুই ভয় করিবার নাই। ইহা মূল তথ্য। ঈশ্বরের কৃপায় মানব এই রহস্য বুঝিতে পারে। তাঁহার মহান্ শক্তি ও তাঁহার বিকাশ কেবল পবিত্র হৃদয়েই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বদা তোমাদিগকে ঠিক পথেই পরিচালিত করিবেন। কিন্তু বিক্রমের সহিত কার্য্য কর, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না।

* বোষ্টন বেদান্তপ্রচার কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত স্বামী পরমানন্দ লিখিত 'Path of Devotion' নামক পুস্তক হইতে অনূদিত।

এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। সম্মুখে পথ রহিয়াছে, লক্ষ্যে পৌঁছিতেই হইবে। নিদ্রা বা বিশ্রাম চাহিও না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"। যদি তোমার পবিত্র হৃদয়াকাশ কোন সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হয় হতাশ হইও না। মনে রাখিও ভীষণ ঝড়ের পরই প্রকৃতিদেবী শান্তভাব ধারণ করেন। চঞ্চলতার পরেই শান্তি বিদ্যমান। একটী অপরটীকে অনুসরণ করিবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। দুঃখকষ্ট ব্যতীত আমরা সুখ কি তাহা ধারণা করিতে পারি না। আমাদের জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন তাহা আমাদিগকে কোন এক মহৎ শিক্ষা দিবার জন্য হইয়াছে ইহা মনে রাখিতে হইবে। শারীরিক শক্তির বিশেষ চালনার পরেই যে তাহার ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা বোধ হইবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। এই মুহূর্ত্তগুলিই ভক্তের পরীক্ষার স্থল। যিনি এই উভয় অবস্থাতেই বিশ্বাস ও পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থির থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্। "অপরে বালাঃ"।

যখন সমস্তই অনুকূল তখন সকলেই আনন্দানুভব করিতে পারে। কিন্তু যখন সমস্তই মন্দ ও প্রতিকূল তখন যিনি স্থির অবিচলিত থাকিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। পবিত্রতা ও বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হও, শক্তি আপনা হইতেই আসিবে, পথ পরিষ্কৃত হইবে। প্রকৃত ভক্ত কখনও নিশ্চিন্ত থাকেন না, সর্ব্বদা একটু নিঃস্বার্থ হইবার জন্য চেষ্টা করেন, একটু পবিত্র হইতে চান, কারণ এই পবিত্রতাই চরিত্রের ভিত্তি। স্বার্থশূন্য হওয়া বাস্তবিক কি মহান্! মুক্তির উপায়স্বরূপ এই পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা লাভ করিবার জন্য একান্তমনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, অপর সবই বন্ধন-মূলক।

নিঃস্বার্থপরতার সহিত পবিত্রতার নিত্য সম্বন্ধ। একটী অপরটীর অনুসরণ করে। স্বার্থশূন্য কর্ম্মের দ্বারাই হৃদয় পবিত্র হয় এবং সেই পবিত্র হৃদয়ে একমাত্র প্রেমই বিদ্যমান থাকে। অন্তশূন্য অনন্ত ভালবাসা বা প্রেম স্রোতের ন্যায় আসিয়া অন্য সমস্ত বৃত্তিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাংসারিক কোন কিছুই সেই হৃদয়ে স্থান পায় না

শোক, দুঃখ, কষ্ট, হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা যাহা কিছু জাগতিক তাহা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহাকেই আমি "ঐশ্বরিক প্রেম বলি।" ইহাকেই একমাত্র 'ধর্ম্ম' আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

এই মহান্ প্রেমে নিমগ্ন হও, অপর সমস্ত ভুলিয়া যাও। অপরের কথা গ্রাহ্য করিও না। ঈশ্বরলাভের জন্য যত্নশীল হও। বহির্জগৎ তোমার নিকট হইতে অন্তর্হিত হউক। সেই প্রেমে পাগল হইয়া যাও। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"সকলেই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ মানের জন্য, কেহ বা যশের জন্য ইত্যাদি।" তুমি আদর্শের জন্য পাগল হও। দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হও। ভয় কিসের—তোমার হৃদয় ভয়শূন্য হউক। নির্ভীক, আনন্দময় ও পবিত্র হও। জগৎ দেখুক, "তুমি ঈশ্বরের সন্তান।" মনে রাখিও অনন্ত শক্তি তোমার পশ্চাতে রহিয়াছে, সুতরাং সাহস অবলম্বন কর, যেন কোন কিছু তোমায় বিচলিত করিতে না পারে। যাহাই ঘটুক না কেন তুমি সর্ব্বদা অবিচলিত থাক। পবিত্র হৃদয়ে কোন প্রকার দুঃখ বা উদ্বেগ থাকিতে পারে না। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় তোমার মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুক।

হৃদয় যখন একান্ত পবিত্র হয় তখন কেবল অনুরাগ জাগরিত হইয়া থাকে। এই প্রেমানুরাগই মানবকে নিঃস্বার্থ করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ—মায়ের পুত্রের প্রতি স্নেহের কথা ধর। তিনি সর্ব্বদা নিজের চিন্তা ভুলিয়া একমাত্র পুত্রের মঙ্গলসাধন করিতে ব্যস্ত। পুত্রের জন্য মা যে কোন বিপদে সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এইরূপে আদর্শের জন্য আপনার স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিলে তবে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারা যায়। ইহাই ভক্তির প্রকৃত অর্থ।

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। শরীর যাক্ আর থাক্ সে দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। অপরে কি বলিবে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত নয়। আমরা আমাদের আদর্শ—ঈশ্বরের—প্রভুর সেবা করিবই।

একান্তমনে তাঁহার সেবা করিতে করিতে শান্তি ও সুখ আসিবে,

অপর কিছুতে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। নাম যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য কোন কিছুই শান্তি প্রদান করিতে পারে না। তবে এস, আমরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত ভগবানের সেবায় আমাদের প্রাণ মন নিয়োগ করি। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

পবিত্রতা, বীর্য্য, নির্ভীকতা এ সমস্ত ধর্ম্ম হইতেই পাওয়া যায়। ধর্ম্ম অনুভবের জিনিস এবং চরিত্রগঠন করাই ধর্ম্ম কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজ বা ধর্ম্মসংঘে যোগদান করিলেই সুখী হওয়া যায় না। প্রত্যেক দ্রব্য ঠিক ঠিক ভাবে দেখিতে হইবে। কাকে ভয়? ঈশ্বর আমাদের স্নেহময়ী জননী। মা কি ছেলের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন? সত্যনিষ্ঠ হও, পবিত্রতা ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

পবিত্রতা-ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হইবে। তৎপরে ভগবানে মনস্থির রাখিতে হইবে। আত্মসংযম ব্যতীত সত্যের ক্ষণিক আলোক তোমাতে প্রকাশ হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। অবিরত ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে করিতেই সত্যের আলোক প্রকাশিত হইবে। যে মন সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের অধীন হয় তাহার সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হয়। আমাদের মন যতদিন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে রত থাকে ততদিন ইহা চঞ্চল ও অসুখী কিন্তু যখন মন বুঝিতে পারে বাহিরের দ্রব্য হইতেই এই চঞ্চলতার সৃষ্টি, আর ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত হইলেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়, তখন উহা বাহিরের দ্রব্য হইতে সরিয়া আসে এবং হৃদয় ক্রমে ক্রমে পবিত্র হইতে থাকে।

হৃদয় একান্ত পবিত্র হইলেই আমরা আমাদের স্বরূপ বা ঈশ্বর দর্শন করিতে পারি। আমাদের হৃদয় দর্পণস্বরূপ। যতদিন এই দর্পণ মলাবৃত থাকে ততদিন সর্ব্বভূতস্থ আত্মার ছায়া ইহাতে পড়িতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে হৃদয় পবিত্র করিতেই হইবে।

হৃদয় পবিত্র করাই সর্ব্বধর্ম্মের সার। বাহ্য পরিচ্ছন্নতা অন্তঃশুদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং বাহ্য আড়ম্বর করিও না। মনে রাখিও

তুমি স্বভাবতঃই পবিত্র ও অপাপবিদ্ধ। ঈশ্বরের নামে সমস্তই পবিত্র হয়। অকপট ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত বারংবার ঈশ্বরের নাম লও। সমস্ত অপবিত্রতা দূরে পলাইবে। মনকে সর্ব্বদা শুদ্ধ চিন্তায় নিয়োজিত কর, সৎসঙ্গ কর; পবিত্রতায় হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে।

সর্ব্বোপরি আত্মাভিমান ত্যাগ কর। ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত অপবিত্রতা আর কিছু নাই। হৃদয়কে তমসাচ্ছন্ন ও স্বার্থপর করিতে এমন আর কিছুই নাই। প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে অজ্ঞান ও বন্ধনমূলক 'বজ্জাৎ আমি'কে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'বজ্জাৎ আমি' ত্যাগ হইলেই 'দাস আমি' প্রকাশ পাইবে—সারাজগৎ এই 'দাস আমি' পূর্ণ হইবে। আমিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই ত্যাগ করা চাই। যদি নিঃস্বার্থ হইতে চাও, কোন কিছু করার জন্য প্রশংসা লাভের ইচ্ছা ত্যাগ কর। সমস্ত স্বার্থপূর্ণ ইচ্ছা ত্যাগ কর, তবেই গন্তব্য স্থানে যাইতে সক্ষম হইবে।

যদি নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের সেবা করিতে চাও, স্বচ্ছন্দে সানন্দে কাজ করিয়া যাও। ইহাই প্রকৃত কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। এইরূপ স্বার্থশূন্য হইয়া ঈশ্বরের সেবা করিতে করিতেই সমস্ত বন্ধন দূর হয়। হৃদয় পবিত্র ও ধন্য হয়।

ভক্তি ও ভক্ত।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ভক্তি কাহাকে বলে? সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের নাম ভক্তি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টার নাম ভক্তি। শরীর দ্বারা সেবা, মন দ্বারা রূপাদি অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান বা চিন্তা এবং বাক্য দ্বারা নিরন্তর গুণানুকীর্ত্তন করার নামই ভক্তি। যাহা কিছু করিব সকলই ভগবানের প্রীত্যর্থে—নিজের বলিয়া কিছু রাখিলে চলিবে না; ইহাই প্রকৃত ভক্তি। গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ (১২অঃ, ২ শ্লোক)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া পরমশ্রদ্ধাসহকারে যাঁহারা আমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম। (যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়া দিবারাত্র যাপন করেন; সেইহেতু তাঁহাদিগকে যুক্ততম বলাই উচিত)। পুনরায় বলিয়াছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্॥"

(গীতা, ১২অঃ, ৬-৭ শ্লোক)

কিন্তু যাঁহারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তিযোগসহকারে ধ্যাননিরত হইয়া আমার আরাধনা করেন, হে পার্থ, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই মহাত্মাদিগকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি। এই শ্লোকে

দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতে হইলে সমুদয় কর্ম্ম তাঁহাকে সমর্পণপূর্ব্বক অনন্যভক্তিযোগ অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। ব্যভিচারী শব্দে একাধিক ভজনশীল বুঝায়। অব্যভিচারিণী অর্থে একের অনুরাগী। সুতরাং অনন্যভক্তি করিতে হইলে ভক্তের আর কোন বিষয়ের অনুরাগ বা চিন্তা মনে স্থান দিবার অধিকার নাই। এতদর্থে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

(গীতা, ১৮ অঃ, ৬২ শ্লোক)

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হও, (তাহা হইলে) তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি এবং নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে। এখানে বলিতেছেন "সর্ব্বভাবেন ভারত" অর্থাৎ মনোগত সমুদায় ভাব তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে; নচেৎ আমি মুখে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিব আর মন নানা বৈষয়িকভাবে পূর্ণ থাকিবে, এরূপ হইলে আর "অব্যভিচারিণী" শুদ্ধা ভক্তি করা হইল না। সুতরাং প্রকৃত ভক্তের সংসারাসক্তি থাকিতে পারে না। যেহেতু হৃদয়ের অর্দ্ধেকটুকু ভগবানে ও অর্দ্ধেকটুকু সংসারে রাখিয়া বখ্‌রায় ভক্ত হওয়া যায় না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীতা, ১৮ অঃ, ৬৫-৬৬ শ্লোক)

তুমি মদেকচিত্ত, মদেকভক্ত ও একমাত্র আমারই উপাসক হও; একমাত্র আমাকেই নমস্কার কর, (তাহা হইলে নিশ্চয়ই) আমাকে পাইবে। তুমি আমার প্রিয়, তাই তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র

আমাকে আশ্রয় কর; শোক করিও না'; আমিই তোমায় সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। এই দুইটি শ্লোকের ভাবার্থ এই যে সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই আশ্রয় করিতে হইবে অর্থাৎ ভগবান্‌কে প্রীত করিবার চেষ্টা ব্যতীত ভক্তের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। সর্ব্বদাই তাঁহার ইচ্ছাধীনভাবে চলিতে হইবে, তাহা হইলে নিজের কর্তৃত্বাভিমানটি চলিয়া যাইবে; সুতরাং "আমি" "আমার" ভাবটি আর থাকিবে না। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার মাতা ইত্যাদি আর বলিতে পারিবে না। আমার বলিয়া কিছুমাত্র হাতে রাখিলে আর "সর্ব্বধর্ম্ম" পরিত্যাগ করা হইল না এবং সমুদয় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত না হইলেও প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না।

প্রকৃত ভক্তের কিরূপ আত্মত্যাগ ও নির্ভরতা আবশ্যক তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন সময়ে এক ব্যক্তি এক মহাপুরুষের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং উক্ত মহাপুরুষও ঐ ব্যক্তিকে সজ্জনবোধে দীক্ষা দানে প্রতিশ্রুত হন। একদা ঐ শিষ্য একস্থানে নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং গুরুও তৎসন্নিহিত স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বিষধর সর্প তথায় বেগে উপস্থিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে মহাপুরুষ সর্পকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে সর্প তুমি কি নিমিত্ত এই নিদ্রিত ব্যক্তিকে আঘাত করিতে উদ্যোগ করিতেছ? ও ব্যক্তি আমার আশ্রিত সুতরাং আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" সর্প সেই সাধুপুরুষের তেজঃপুঞ্জ-মূর্ত্তি ও গম্ভীর আদেশে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া উদ্যত তুণ্ড ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিল—'হে মহাভাগ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গতজন্মে আমার রক্তপান করিয়াছিল, একারণ কর্ম্মবশবর্ত্তী হইয়া প্রাক্তনবশে আমিও উহার প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি কিন্তু আপনি নিবারণ করিলে আমি অক্ষম হইব সুতরাং কর্ম্মফল ব্যর্থ হইবে। অতএব আপনি বিচারপূর্ব্বক যেরূপ আদেশ করিবেন আমি অবনতমস্তকে তাহাই পালন করিব।'

"সর্পের এতাদৃশ বিনীত বচনে পরিতুষ্ট হইয়া মহাপুরুষ বলিলেন—'হে সর্প তোমার বাক্যে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম; আমি তোমাকে ইহার রক্তদান করিব, অতএব তুমি বল উহার দেহের কোন্ স্থানের রক্ত তোমার অভীপ্সিত।' সর্প কহিল -'হে মহাত্মন্ আমি ঐ ব্যক্তির কণ্ঠরক্ত পান করিতে বাসনা করিয়াছি, অতএব আমাকে ঐ স্থানের রক্ত দান করুন।" গুরুদেব তখন শিষ্যের বক্ষদেশে আরোহণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা উহার কণ্ঠের স্থানবিশেষ কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া রক্ত গ্রহণপূর্ব্বক সর্পকে প্রদান করিলেন। সর্প তখন হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। তিনি যখন ভক্তের বক্ষে আরোহণ করিয়া গলদেশে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি একবারমাত্র চাহিয়াই পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুও শিষ্যকে কিছু বলিলেন না এবং শিষ্যও গুরুদেবকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন না—পূর্ব্ববৎ পরম ভক্তিসহকারে সেবাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে মহাপুরুষ চিন্তা করিলেন 'আমি এই ব্যক্তির গলায় ছুরি দিতেছিলাম দেখিয়াও এ আমাকে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না এবং শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবারও ত কোন ত্রুটি দেখিতেছি না। ইহার অর্থ কি'? এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তিনি এক দিন শিষ্যকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"বৎস, সে দিন যে আমি তোমার গলায় ছুরিকা আঘাত করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ?" শিষ্য যোড়হস্তে কহিলেন,—হাঁ প্রভু, আমি তাহা দেখিয়াছি।" গুরু কহিলেন,—"তবে আমাকে সে বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?" শিষ্য তখন গলদশ্রুলোচনে ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—"হে জগদারাধ্য প্রভু, এই অকিঞ্চিৎকর দেহ, মন ও প্রাণ সকলি ঐ শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়াছি। আমার নিজস্ব বলিবার আর কিছুই নাই। যখন দেখিলাম যে আপনি আমার বুকে বসিয়া গলায় ছুরি দিতেছেন তখন ভাবিলাম এ দেহ ত প্রভুকে দান করিয়াছি তবে উঁহার বস্তু উনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তাহাতে

আমার ত বলিবার কোনও অধিকার নাই। অতএব আমি আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলাম না। আরও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আপনি পরম মঙ্গলময়, যাহা কিছু করিবেন তাহাতেই আমার মঙ্গল হইবে, সুতরাং হেতু অন্বেষণে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না।" এই উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপুরুষ শিষ্যকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"বৎস, তুমি ধন্য, তোমার গুরু হইয়া আজ আমিও ধন্য হইলাম। ধন্য তোমার গুরুভক্তি ও বিশ্বাস। এই ভক্তি ও নির্ভয়ের বলেই আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, নতুবা আমার মাহাত্ম্য কিছুই নাই। ইহা কেবল তোমারই ঐকান্তিক ভক্তির ফল মাত্র।" ইহাকেই পরাভক্তি কহে। এইরূপ নিষ্ঠার প্রভাবেই ভগবান্ প্রহ্লাদকে বারংবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভক্তি সাধনের ধন। বিনা সাধনায় ভক্ত হওয়া যায় না। সাধনা কর্ম্মসাপেক্ষ। কর্ম্মে, চিত্তশুদ্ধিদ্বারে জ্ঞান এবং জ্ঞানে ভক্তিলাভ হয়। এতদর্থে শ্রীমদ্ভাগবৎ বলিয়াছেন—

> "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
> জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতং ॥
> কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
> গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥"
>
> (১ম স্কঃ, ৫ অঃ, ৩৫-৩৬ শ্লোক)

ভক্তিমিশ্র জ্ঞানই মোক্ষসাধক এবং সেই জ্ঞানও ভগবৎতুষ্টিজনক কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। তদীয় লীলা ও লীলাসূচক নাম-সমূহ কীর্ত্তন, শ্রবণ ও মনে অনবরত ধ্যান করাই ভগবানের সন্তোষপ্রদ কর্ম্ম, যাহার বলে ধার্ম্মিকগণ ভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।

আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভক্তি বলি প্রকৃতপক্ষে তাহা ভক্তি নহে। উহা শ্রদ্ধা মাত্র। ভগবানের লীলাশ্রবণে, তাঁহার রূপ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তির আলোচনা করিতে করিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইলে তরলভক্তি বা পরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা হয়। পরোক্ষজ্ঞান

হইতে 'রতি' জন্মে অর্থাৎ তাঁহাকে দেখিবার বা পাইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। রতি হইতে অপরোক্ষানুভূতি বা প্রকৃত জ্ঞানাঙ্কুর উপলব্ধি হয়। জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই পরাভক্তির উদয় হয়। পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবৎ এই ভক্তিমিশ্র-জ্ঞানকেই মোক্ষ-সাধক বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গীতাতেও বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥" (৪র্থ অঃ, ৪০ শ্লোক)

শ্রদ্ধাবান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন; তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র পরমা শান্তি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
১৭।৫।১৬।

স্নেহভাজনেষু—

গত কল্য কু— এসেচে, তার মুখে তোমাদের বিষয় শুনলাম। —ভাল ছেলে, তাকে তোমরা রাখ্‌তে পার, মহারাজ মত দিয়াছেন। * * *

—র বিষয় তোমার পত্রে পড়্‌লাম এবং —র মুখে শুন্‌লাম। লোক চালান অতি কঠিন ব্যাপার, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হলে মুস্কিলে পড়্‌তে হয়, অভিমান অহঙ্কার এসে জোটে। কৌশল হচ্চে আমিত্ব ভুলে তুমিত্ব প্রতিষ্ঠা। "তুমি কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা", "ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু"—এই সব প্রাণে প্রাণে ধারণা চাই।

ভিতরটা ভালবাসায় পূর্ণ কর্ত্তে হয়। যা কিছু করব সব ভালবাসায়। আমায় ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন—আমাদের সবাইকেই তাই। অন্তর্ব্বহিঃ ভালবাসা। গালাগাল-মন্দও ঐ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। প্রভু আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি—ধূলির একটু কমবেশ মাত্র মঠে কোন অশান্তি বা অমঙ্গল হলে সাক্ষাৎ শিব স্বামিজী আমায় গালাগাল দিতেন, কত মন্দ বলতেন কিন্তু সে ভালবাসার অন্ত নাই, পার নাই, সীমা নাই; তখন ভাবতুম—কেন আমায় মন্দ বলেন, আমার কি দোষ? এখন দেখ্‌চি স্বামিজী ঠিকই বলতেন, আমিই সকল দোষের মূল। এই দুষ্ট 'আমি'কে দূর করা চাই। নইলে নিস্তার নাই, কল্যাণ নাই। তারপর দেখ্‌চি আমার দোষগুলো অনেকে আপনা আপনি বেশ নকল কর্ত্তে শিখ্‌চে কিন্তু ভিতরটা দেখ্‌তে চেষ্টাই করে না। আর কর্ব্বেই বা কি! একটা দোষের পুঁটুলি বৈ আর কি আছে আমার ভিতর, তাই তোরাও ঐ রকম হচ্চিস্। যারা ঠাকুরের নাম কর্ব্বে তাদের জগৎ-জয়ী হতে হবে—আপনাকে প্রভুর পায়ে সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় কর্ত্তে হবে।

—আশ্রমে যদি কোন গোল বাধে জানিব সে সব তোমার ও আমার দোষ। সব অপরাধ 'আমার' স্বামিজীর এই মত। চাঁদ, তুমি ভাল হও, আরও ভাল হও। আপন আপন দোষগুলি শোধরাতে চেষ্টা কর। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদ, প্রার্থনা কর—'প্রভো দয়াকরে গাদগুলো ময়লামাটিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দাও', অন্য উপায় নাই। ওখানে যদি কোন অশান্তি আনয়ন কর সে দোষ তোমার জানবে। কি জন্য এ সাজ পরেছ মনে মনে সর্ব্বদা বিচার করিও। পাগলামি ছেড়ে দাও কিম্বা ভগবানের নামে পাগল হও। খুলে যাক্ তোমার দিব্যদৃষ্টি প্রভুর দয়ায়, ভালবেসে সকলকে কিনে ফেল। এই হচ্ছে জ্ঞান, এই হচ্ছে ভক্তি এই নবযুগের। তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

রামকৃষ্ণমঠ,
বেলুড় পোঃ, হাওড়া,
১১।৭।১৬।

স্নেহ

ধী— তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। * * * যতদিন না প্রভুর নামে আশ্রমটী পাকা রকমে বদ্ধমূল হয় ততদিন তোমার ঐ স্থানে থাকা উচিত, নতুবা বুঝিব তুমি অতি অসার, অপদার্থ, নিষ্ঠাহীন। দেখ, স্বার্থ, সুখ, সুবিধা ত্যাগ না করতে পাল্লে সেকি আবার মানুষ? ঠাকুরের নাম করবে, আবার স্বার্থপর হবে!—সে ভণ্ড, তার উন্নতি কোথায়? তার দেশ চিরকাল অন্ধকারে ডুবে থাকবে, না, উন্নতির আলোক পাবে? তুমি খুব ধীর স্থির হয়ে, চিন্তা করে চলবার চেষ্টা করবে। * * * তোমার কথা যে কত লোকের কাছে বলে বেড়াই। তোমায় খুব ভাল—খুব বড় হতেই হবে। আমরা ভাল আছি। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং ওখানকার ভক্তদের সাদর সম্ভাষণাদি কহিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(৩)

মঠ, বেলুড়।
২৬।৭।১৬।

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার অসুস্থ সংবাদে দুঃখিত হইলাম। * * * আমি মাঝে মাঝে গাই—

"যখন যেরূপে মা গো রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে,

বিভূতি বিভূষণ রতন মণি কাঞ্চন
তরুতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাসন পরে।"

* *

"আপনাতে আপনি থাক,
যেওনা মন কারো ঘরে,
যা চাবি তা বসে পাবি
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে
পরমধন এই পরশমণি
যা চাবি তা দিতে পাবে
(ও মন) কত মণি পড়ে আছে
চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাক। কেবল ব্যারাম ব্যাধির চিন্তা কেন? জানবে—সব সময় জানবে—সব অবস্থায় জানবে—আমি প্রভুর, প্রভু আমার নিত্যধন, পরমবস্তু—সর্ব্ব সম্পদের সকল ঐশ্বর্য্যের আস্পদ। 'নাহং নাহং' সর্ব্বদা করবে। যত পার ভগবানের নাম কল্লে আর ভূতের ভয় থাকবে না। আমরা যে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের বাচ্ছা, একথা স্মরণ রাখবে সব সময়।

মহারাজ বাঙ্গালোর গেছেন। আর সব ভাল, সকল ভক্তদের আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানাবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

সমালোচনা।

দরিদ্র-নারায়ণ—শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বিরচিত। প্রকাশক শ্রীহীরালাল সাহা, বালিয়াটী (ঢাকা)। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ।।৵ আনা।

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দুইটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন—একটী ত্যাগ, অপরটী Service বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবা। বর্ত্তমান লেখক তাঁহার সেই সেবাভাবকে অবলম্বন করিয়া পাঁচটী প্রবন্ধে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। যথা, দরিদ্র-নারায়ণ, প্রাচ্যধর্ম্ম ও দরিদ্রনারায়ণসেবা, পাশ্চাত্য সেবাধর্ম্ম, বৈষ্ণবসম্প্রদায় ও দরিদ্রসেবা, দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রণালী।

আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। লেখক বর্ত্তমান যুগপ্রয়োজন বুঝিয়া যে নাটক নভেল ছাড়িয়া এরূপ সদুদ্দেশ্যে তাহার শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি গীতা, উপনিষদ্, বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রভৃতি নানা হিন্দুশাস্ত্র হইতে সেবাধর্ম্মমূলক বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করতঃ শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারপুরুষগণের জীবনালোকে তাহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকের মনে সেবার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচ্য সভ্যতার ঐকান্তিক স্বাধিকারপ্রসার ও ভোগমূলকতা প্রদর্শন করিয়া প্রাচ্য সেবাধর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য সেবাধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ "দরিদ্র-নারায়ণসেবার প্রণালী" আমরা সকল দেশবাসীকেই পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা আমাদের জ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। দরিদ্রের দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের সাময়িক ব্যবস্থার কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"দরিদ্রদিগকে স্বাবলম্বী ও জীবিকানির্ব্বাহক্ষম করিয়া তোলাই

প্রকৃত দরিদ্রসেবা। পাশ্চাত্য জাতি যে সকল দেশব্যাপী অতুলন অনুষ্ঠানগুলি করিয়াছেন, যথা—শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, বয়ন, সীবন, চিত্রকলা, স্বর্ণরৌপ্যাদির কার্য্য, খনিজ শিল্প, সূত্র, বংশ ও বেত্রজ শিল্প, দপ্তরীর কার্য্য, ছাপাখানার কার্য্য, চিকিৎসা, সঙ্গীত, হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে বহুপ্রকার কারিকুরি, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দরিদ্র স্ত্রীপুরুষ ও বালক-বালিকাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য দেশব্যাপী বিদ্যামন্দির-সমূহের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আমাদিগকেও ঐ প্রকার ক'রতে হইবে। তবে পার্থক্য এই যে তাঁহারা ঐহিক ভোগ ও প্রতিপত্তির দিক্ দিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন আর আমাদিগকে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শের দিক্ দিয়া 'প্রাণের টানে' উহার অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিতে হইবে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রায় ২০ কোটী লোক কৃষিজীবী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘোর দরিদ্র। ইহারা যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অত্যল্প পরিশ্রমে অধিক শস্যোৎপাদন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে Model Farm, Agricultural Institution, Loan office, Experimental farm প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য Industrialism বর্জ্জন করিয়া Hand machine সাহায্যে যাহাতে Cottage Industryর প্রচলন হয় তাহার জন্য যত্নশীল হওয়া উচিত।

এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য তিনি দেশের ধনী সদাশয় মহোদয়-গণের এবং ত্যাগী স্বদেশসেবকগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের বড় দোষ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে, দোষ দেখাইয়া বা গালি দিয়া কাহাকেও ভাল করা যায় না। প্রীতি ও সহানুভূতির সহিত বুঝাইলে তবে লোকে কথা শুনে। পুস্তকের কোন কোন স্থান অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াও মনে হইয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—অদ্বৈতজ্ঞান-প্রতিপাদক এক অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। শ্রীরামচন্দ্র সংসারত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ শত শত দৃষ্টান্ত, উপমা ও উপাখ্যান দ্বারা সরলভাবে জগতের স্বপ্নবৎ মিথ্যাত্ব ও তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহাকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মানবমনের সংস্কাররাশি ভস্মীভূত করিয়া উহাকে আত্মতত্ত্বাভিমুখী করিতে ইহার ন্যায় গ্রন্থ আর নাই বলিলেই হয়।

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১০৯ খণ্ড প্রকাশ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ (নির্ব্বাণ প্রকরণের শেষাংশ) প্রকাশ করিতে এখনও প্রায় ২৫ খণ্ড লাগিবে। স্বর্গীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় পণ্ডিতবর শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের সহায়তায় এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

এই কার্য্যে অনুমান ২০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৯ খণ্ড যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ২৫৲ স্থলে মাত্র ১০৲ টাকায় প্রদত্ত হইতেছে। আশা করি, শিক্ষিত জনসাধারণ এই সংবাদে আনন্দিত হইবেন এবং এই স্বল্পমূল্যে উক্ত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচাররূপ মহদনুষ্ঠানে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। প্রাপ্তিস্থান লোটাস লাইব্রেরী, কলিকাতা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—মূল, অন্বয়ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, শাঙ্করভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত টীকা, শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ এবং স্থানে স্থানে তাৎপর্য্য সহ—পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত। ২৮।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুত অনিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খণ্ডাকারে প্রকাশিত। মূল্য গ্রাহকপক্ষে ১৲, সাধারণপক্ষে ১৷৹।

এই উৎকৃষ্ট উপনিষদ্‌মালার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক বার উদ্বোধনের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছি। বৃহদারণ্যকের ১ম ভাগ প্রকাশিত হইবার পর ১৩২২ সালের আষাঢ়ের উদ্বোধনে আমরা উপনিষদের বর্ত্তমান সংস্করণটিকেই "বঙ্গভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে বৃহদারণ্যকের দশম ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাতে চতুর্থ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অনুমান, আরও চারি ভাগে বৃহদারণ্যক সমাপ্ত হইবে।

এই উপনিষদ্‌মালা প্রকাশ করিয়া শ্রীযুত অনিলবাবু দেশের যে কল্যাণসাধন করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উক্ত মহৎ কার্য্যটি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় তাহাই আমাদের প্রাণের ইচ্ছা। এই জন্য আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছি নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থের স্থানে স্থানে মাত্র দেখিবার অবসর পাইয়াছি, তাহাতে মনে হইতেছে, সম্পাদনকার্য্য যথোচিত সতর্কতার সহিত করা হইতেছে না। মুদ্রাশুদ্ধি ত আছেই, তদ্ভিন্ন ব্যাখ্যাও স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২য় অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুবাদের উল্লেখ করিতেছি।

মূলে আছে ;—"অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাৎ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ" ইত্যাদি। ইহাতে আচার্য্যপরম্পরার বর্ণনা করা হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্যে লিখিত আছে —"তত্র প্রথমান্তঃ শিষ্যঃ পঞ্চম্যন্ত আচার্য্যঃ।" বংশতালিকার প্রথা এই যে, নামগুলিকে নীচে নীচে সাজান যাইতে পারে অর্থাৎ একই ব্যক্তি নিম্নতনের গুরু এবং উর্দ্ধতনের শিষ্য। তদনুসারে উক্ত শ্রুত্যংশের অর্থ হইবে এইরূপ,— পৌতিমাষ্য গৌপবন হইতে (শিক্ষাপ্রাপ্ত), গৌপবন (অপর) পৌতিমাষ্য হইতে, ইত্যাদি। তৎপরিবর্ত্তে গ্রন্থে 'পৌতিমাষ্য' কথাটি ছাড়িয়া দিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে—"গৌপবন......হইতে...... গৌপবন" ইত্যাদি। শেষে আছে—"সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মণে নমঃ"। ইহার ভাষ্য শঙ্কর এইরূপ

লিখিয়াছেন—"পরমেষ্ঠী বিরাট্।" ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাৎ। ততঃ পরং আচার্য্যপরম্পরা নাস্তি। যৎপুনর্ব্রহ্ম তন্নিত্যং স্বয়ম্ভু, তস্মৈ ব্রহ্মণে স্বয়ম্ভুবে নমঃ।" ভাষ্যানুবাদে ঠিকই লেখা হইয়াছে—"এখানে পরমেষ্ঠী অর্থ বিরাট্ পুরুষ; 'ব্রহ্মণঃ' অর্থ হিরণ্যগর্ভ হইতে; বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার উপরে আর আচার্য্যক্রম নাই" ইত্যাদি। অথচ মূলানুবাদে লেখা হইয়াছে:—সনগ হইতে সনগ, পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী (বিরাট্) এবং ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ অংশ সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে অপর কাহারও কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে। নতুবা এরূপ অর্থহীন, খাপছাড়া অনুবাদ কিরূপে আসিল? চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে ঐরূপ একটি বংশতালিকা আছে। আশা করি উহার অনুবাদ এরূপ অসঙ্গত ভাবে করা হইবে না।

৩য় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণের "ন বৈ জাতু যুষ্মাকামিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং"—এই অংশের ভাষ্যে শঙ্কর বিভিন্ন স্থলে "ব্রহ্মোদ্য' ব্রহ্মবদনং প্রতি জেতা"......"ব্রহ্মোদ্যং প্রতি এতত্তুল্যো ন কশ্চিৎ বিদ্যতে" এইরূপ লিখিয়াছেন। সুতরাং "ব্রহ্মোদ্যং" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মকথন" বা ব্রহ্ম বিষয়ে বাদ—'ব্রহ্মবাদী" নহে।

৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ব্রাহ্মণের শাঙ্করভাষ্যের "তেনৈব চ অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্দ্দর্শয়িতুং শক্যঃ, ন ত্বন্যথা—অসতি বিষয়ে কস্মিংশ্চিৎ সুষুপ্ত-কাল ইব।" এই অংশের শেষভাগের অনুবাদ করা হইয়াছে—"নচেৎ স্বপ্নসময়ের ন্যায় কোন [বিষয় প্রকাশ্য] থাকিলে, তাহার স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।"—ইহা একবারে উল্টা হইয়াছে। করা উচিত ছিল—"নচেৎ সুষুপ্তিসময়ের ন্যায় কোন বিষয় (=প্রকাশ্য) না থাকিলে, তাহার স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না।"

২য় অধ্যায়ের ১ম ব্রাহ্মণের ৪র্থ কণ্ডিকায় "তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি"—এই অংশের মূলানুবাদ ভ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকের ন্যায় দুরূহভাষ্যসমন্বিত বৃহৎ গ্রন্থে এইরূপ ত্রুটী

থাকা স্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে যদি ইহাকে আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায়, তাহা না করা হইবে কেন? আশা করি ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় সত্বাধিকারী ও সহকারী সম্পাদক মহাশয় আরও একটু যত্ন লইবেন। গ্রন্থপ্রকাশে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে, বাকী কয় খণ্ড একটু শীঘ্র শীঘ্র বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে শিক্ষিত জনসাধারণের বিশেষ সহানুভূতি প্রয়োজন। উপনিষদের উচ্চ তত্ত্বসমূহ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রচারিত হউক; বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা এই মহদনুষ্ঠানের ফলভাগী হউন, পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহজাল ভেদ করিয়া আবার বাঙ্গালী আত্মার মহিমা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হউন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ-কার্য্য।

(বাঙ্গালা ও বিহার)

সংবাদপত্রপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, দেশের কি ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালা এবং বিহারে উত্তরোত্তর সাহায্যকেন্দ্র বর্দ্ধিত করিতেছি সত্য, কিন্তু অভাবের তুলনায় উহা যৎসামান্য মাত্র। আমরা বর্ত্তমানে মানভূম জিলার অন্তঃপাতী বাগদা, বাঁকুড়া জিলার অন্তঃপাতী ইঁদপুর, কণিয়ামারা এবং কোয়ালপাড়া, সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী কুণ্ডা ও সরমা এবং ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দত্তখোলা (ব্রাহ্মণবেড়িয়া) নামক স্থানে সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়াছি এবং শীঘ্রই ঐ জিলার অন্তঃপাতী বিটঘর-নামক স্থানেও সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইবে। ঐ সকল স্থান ব্যতীত আমরা ভুবনেশ্বর, কলমা, লতাবদি এবং ভাককাটিনামক স্থানে দুঃস্থ লোকদিগকে বস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিতেছি। জলকষ্ট-নিবারণকল্পে বাগদায় একটি পুষ্করিণী এবং ইঁদপুর থানার

অন্তর্গত ভালুকা, দেউলভেড়িয়া এবং দামোদরপুর নামক স্থানে তিনটি কূপ খনন করা হইয়াছে। বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা ঐ কার্য্য বন্ধ করিয়া বাঁকুড়া এবং মানভূম জিলায় আমাদের সীমানার মধ্যে বীজধান্য বিতরণ করিতেছি। আমদানী-খরচ বাদ দিয়া কেনাদরে বিক্রয় জন্য ইঁদপুর এবং বাগ্‌দায় যে চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে উহাতে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এবং কুলিমজুরদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইতেছে।

নিম্নে ২৮শে মে হইতে ২৫শে জুন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল ও বস্ত্র বিতরণের হিসাব প্রদত্ত হইল।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বীজের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
বাগ্‌দা (মানভূম)				
	১৪৪৭	৭৩৷৯		৮
৫০	১৩৭২	৬৯৸৯	৩০/৭	,,
৪৯	১৩৫২	৬৮৸২	,,	,,
৪৯	১৩৮৫	৭০/	,,	,,
ইঁদপুর (বাঁকুড়া)				
৩১	৫৪০	২৮।৪	,,	১৫০
৩২	৫৬১	২৮৸২	,,	৫
৩২	৫৬২	২৮৷৯	,,	,,
৩২	৫৬৪	২৮৸৫	২৮/৮	১৫
কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)				
১৯	১৭৫	৯।৩	,,	,,
১৯	১৪৯	৮।৬	,,	১
১৯	১৩৮	৭৷১	,,	৪
১৯	১৩৯	৭৷	,,	৫
কণিয়ামারা (বাঁকুড়া)				
৮	৬২	৩।৫		

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	বীজের পরিমাণ	বস্ত্রের সংখ্যা
৮	৬২	৪।০	২৮/৮	৫
৮	৭০	৪।১	,,	,,
১০	১৩৬	৭।৩	,,	,,
		কুণ্ডা (দেওঘর—সাঁওতাল পরগণা)		
১২	১৩৫	৯।/	,,	১২
১৭	১৭০	৯/০	,,	৮
২৩	২১৬	১১।০	,,	৯
২৭	২৪১	১২॥০	,,	৫
২৬	২৪৫	১২॥৬	,,	১০
		সরমা (মধুপুর—সাঁওতাল পরগণা)		
১৮	১৩৩	১১/	,,	২
২৭	২৫৫	১৪/০	,,	১১
৩০	৩২৯	১৯॥০	,,	২১
		ব্রাহ্মণবেড়িয়া (দত্তখোলা—ত্রিপুরা)		
৩১	৬০২	৩০/৫	,,	,,
৩১	৫৪৭	২৭।৪	,,	,,
৩২	৫৮১	২৯/২	,,	,,
৩২	৫৭৮	২৮৸৬	,,	১
৩২	৫৯১	২৯।	,,	৫

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৬ই এপ্রেল হইতে ৪ঠা জুন, ১৯১৯, পর্য্যন্ত উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত

শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বসু, কলিকাতা ২৲
প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৲
,, হরেন্দ্র নাথ দে, ১৲
,, হরিপদ মিত্র, ১৲
,, তিনকড়ি দে, ১৲
,, পশুপতি বসু,
,, মুক্তারাম সেন,
,, নারাণ চন্দ্র দে
,, জ্যোতিশ্বর সিংহ ,, ॥০
,, শচীন্দ্রনাথ সিংহ ,, ৫৲
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, ,, ৩৲
,, গৌরিমোহন মিত্র, ,, ২৲
,, মণীন্দ্রনাথ সিংহ, ,, ১৲
,, বিজয়মঙ্গল রায়, বরিশাল ১৲
ইণ্ডিয়ান এসিষ্টেণ্টস অব মেসার্স জেমস্
স্কট এণ্ড সনস লিমিটেড— ১৬৲
শ্রীযুত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, পুরি, ১০৲
,, প্রবোধচন্দ্র সরকার, আন্দুল, ১২৲
,, যদুনাথ মজুমদার, কুমিল্লা ৩।৵১
,, উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, মেদিনীপুর, ৫৲
,, গোপেশ্বর দাস, ,, ৬৲
,, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ,, ১৲
,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ,, ২৲
,, কৃষ্ণপ্রসাদ মল্লিক, ,, ১৲
,, শচীন্দ্রলাল মিত্র, ,, ১৲
,, নিরঞ্জন ঘোষ, ,, ১৲
,, জনৈক বন্ধু, ,, ১৲
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, পৈলগাঁ, ৫০৲
,, চিন্তাহরণ ব্যানার্জি, অভয়াপুরী, ২৫।৴
হৈদাস্কুলের শিক্ষকবর্গ, হৈদা ৪৲
,, ছাত্রবর্গ ,, ৫৲
জনৈক মহিলা, ,, ১৲
শ্রীমতি নগেন্দ্রবালা দেবী, তেজপুর ১০৲
টি, পি, গুপ্ত, বহরমপুর, ২৲

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ২৲
,, অক্ষয় কুমার নন্দী, কলিকাতা, ১০৲
ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিভার্সিটি কলেজ ,, ২১৸৵০
খুচরা আদায়, ,, ।৵১০
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী ,, ৫৲
শ্রীযুত চারুচন্দ্র হাজরা ১৫৲
,, কানাই লাল দাস ,, ৫৲
সরোজ কুমার রায়, দিল্লী, ২৲
,, এ, সি, রায়,
শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার পরামাণিক, বালিয়াটি ২৲
কালিচরণ মিত্র, কলিকাতা ৫৲
হররঞ্জন কর্ম্মকার, জামালপুর ১৲
বিমলা ভাণ্ডার, ডেমরা ৫৲
কুঞ্জবিহারি রায়, কলিকাতা ৫০।৴০
অরুণ দাস সরকার, ,, ১৲
জনৈক বন্ধু, ১৫৲
৺গোলাপ কুমারী দাসী, পৈত্রা,
মাঃ শ্রীভূষণ চন্দ্র পাল, কলিকাতা, ৩৫০
ডাঃ কে, জি, মুখার্জী, পোর্টব্লেয়ার ৫৲
ডাঃ বি, চক্রবর্ত্তী, ,, ৫৲
ডাঃ বি, মণ্ডল, ৲
শ্রীযুত আর, সি, ঘোষ, ৩৲
,, এন, এল, সান্যাল ২৲
,, এ, সি, রায়, ২৲
,, আবদুল ওয়াহিদ, ২৲
,, এস্ এন্, ডি, রায়, ২৲
,, রাম চরণ সাঁই ৪৲
এস্ ।০
মাঃ ডি, মণ্ডল, ১২৸১৫
শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অগস্তি, বাঁকুড়া ৬০৲
শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা দেবী, কলিকাতা ২৲
,, রাজলক্ষ্মী বসু, ১০৲
শ্রীযুত মোহিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, গোপালদি ২৲
,, সুরেন্দ্র লাল সেন, আয়ারিয়া ২।০

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী, বালিয়াটী ১৲
,, সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, রমণীমোহন রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, সুশীলকুমার রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, ব্রজবল্লভ রায় চৌধুরী ,, ১৲
,, রেবতীমোহন রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, অপূর্ব্বকুমার রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, মনীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ,, ১৲
,, হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, সুবোধকুমার রায় চৌধুরী, ,, ১৲
,, নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ,, ১৲
,, হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, ,, ১০৲
,, হরিপদ রায়, কলিকাতা ৫৲
মেম্বর ইয়ংমেনস্ ইউনিয়ন, ,, ২৯৶০
জনৈকবন্ধু, পটলডাঙ্গা এসোসিয়েসান ৫০৲
শ্রীযুত সিতিকণ্ঠ সাহা, পাবনা, ৫৲
,, সুশীল কুমার মিত্র, কলিকাতা ৩৲
,, জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী, পাটনা ৷৷০
মনোহরপুকুর অনাথ-ভাণ্ডার,
কলিকাতা ১১৫৶০
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, লাহোর ১০৲
,, সুরেশ চন্দ্র বেরা, হরিয়া ২৷৷০
,, দ্বারকা নাথ দাস, ,, ১৲
,, জানকী নাথ সাহা, কলিকাতা, ২৲
,, ঈশ্বর চন্দ্র সাহা, মেদিনীপুর, ১৲
রামকৃষ্ণ-ভক্ত, ইয়ংমেনস্ ইউনিয়ন,
কলিকাতা ১০৲
শ্রীযুত গৌরীকান্ত বিশ্বাস, পুনা ২৲
,, নৃসিংহ মিত্র, কলিকাতা ২৲
জনৈক বন্ধু, ,, ১৲
পি, চ্যাটার্জ্জী, ,, ৫০৲
শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর ও উমাকিঙ্কর,
পাহারতলী ৪৲
,, রাই মোহন চৌধুরী, বালিয়াটী ১৲
,, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ,, ২৲
ডাঃ মদন মোহন সাহা, ,, ১৲

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ ২৲
জনৈকবন্ধু, কালীবাটী, বর্দ্ধমান, ২৲
শ্রীযুত ব্রজলাল পাল, কলিকাতা ১০৲
,, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, হুগলী ২৷৷০
জনৈক হিতৈষী, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুত ভোলানাথ বড়াল ,, ১০৲
মাঃ গঙ্গারাম, পোর্টব্লেয়ার ৪৫৷০
লালা দৌলতরাম ,, ২৲
শ্রীযুত গোপাল দাস ,, ১৷০
,, এম্, আর, রায, ,, ২৲
নাথুমল, ডঙ্গ ,, ১৲
লালা হরগোপাল, পোর্টব্লেয়ার ২৲
শ্রীযুত রাম লাল, ,, ২৲
,, লালা সুখরাম ,, ২৲
,, গোলাপচাঁদ, ,, ১৷০
,, লালা ,, ২৲
মিঃ আহাম্মদ হাসন সাহেব ,, ১৲
,, ওযাজিরালি সাহেব, ,, ১৲
,, অমরসিং সাহেব ,, ১৲
শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দে, ৫৲
কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স, সোহাগপুর ২৲
শ্রীযুত মনোরঞ্জন ঠাকুর, রামগোপালপুর ১৲
শ্রীমতী ননীবালা, তাম্বাবিম্, ১৲
শ্রীযুত মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, চট্টগ্রাম ১০৲
মহাদেব ঠাকুর, মহম্মদবাজার ১৫৲
বেঙ্গলী পোষ্টেল ভলাণ্টিয়ার্,
মাঃ ইউ, এন্ চক্রবর্ত্তী, বসরা ২২৶০
৺দাক্ষায়ণী বসু, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণ দে, ,, ২৲
জনৈক বন্ধু ,, ১৲
জনৈক বন্ধু ,, ৫৲
মাঃ রামচরণ সাহেব, পোর্টব্লেয়ার ৬৭৲
শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ গুপ্ত, করম ১০৲
জমিদার বালিয়াটী ৪৯৷০
শ্রীযুত হরিভূষণ পাঁড়ে, তাম্রাবিম ১৷০
,, নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র, কলিকাতা, ১০
,, শরৎ চন্দ্র ঘোষ ,, ৫
জনৈক বন্ধু ,, ৫
মেম্বর, বঙ্গবাসী সম্মিলনী, ,, ১২

নিত্যানন্দ সাহা, ,, ২৫৷৷১৫
আবদুল হাকিম, সকরলি ১
শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার সমদ্দার, ,, ১
দুলু বিশ্বাস; ,, ১
শ্রীযুত মণিমোহন বিশ্বাস, জামসেদপুর ১২
,, ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ১০
,, নিত্যলাল মুখার্জ্জি ,, ১১ ১

১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বেলুড়-মঠে প্রাপ্ত

রামকৃষ্ণমিশন, বরিশাল, ১৫০
শ্রীযুত ফণীভূষণ দত্ত, পারাজ, ৭৷৵০
,, হরিপদ চৌধুরী, ওলপুর, ৭
,, নারায়ণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ১
,, তুলসী চরণ সরকার, খিদিরপুর, ৷০
,, এ, ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ১
,, নারায়ণ দাস বসু, ,, ১
,, দেবেন্দ্র নাথ ধাঙ্গ, সালকিয়া ১
,, পি, বি, মিত্র, গুরাই, ৫
,, মোহনলাল সাহা চৌধুরী, মায়াবতী ৩
এস, এন, ব্যানার্জ্জি, বাঁকুড়া, ১০
,, ভি, বিশ্বনাথ আয়ার, কারুর, ১
,, যজ্ঞেশ্বর চ্যাটার্জ্জি, ভাগলপুর, ৭
,, শরৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চলতাজলিয়া, ৫
,, দেবেন্দ্র লাল সাহা, কেদারপুর, ৫
,, কেদারনাথ ঘোষ, সুকচর, ৩০
,, পঙ্কজকুমার আইচ, ভবানীপুর, ৫
,, হরি পদ পাল, বালিয়াঘাটা ২
,, এ, আর, মজুমদার, নাটোর, ৬
,, এইচ, বি, মুখার্জ্জি, বসরা, ৫৭
,, হরিমোহন ঘোষ, ভবানীপুর, ২৫
,, মনোরঞ্জন সেন, কলিকাতা, ১
,, শশিচন্দ্র দে, বর্দ্ধমান, ৭৷৵০
,, কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল, বান্দা, ২
,, বরদাকান্ত সেনগুপ্ত, কাজিবাজার, ১
,, ডি, পি, ব্যানার্জ্জি, বাঁশজোড়া, ৫
,, এস, এন, বসু, ,, ৫
,, এস, বেঙ্কটাচেলাম চেটী, মান্দ্রাজ, ২৫
,, ফণীভূষণ পাল, উত্তরপাড়া, ৷০
,, হরিমোহন চ্যাটার্জ্জি, বালি, ৷৷০
,, ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত, ভবানীপুর, ৷৷০
,, নিয়ামত আলী, দত্তবাজার, ৷০
,, যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, সিঁথি, ৷০
,, তিনকড়ি সিংহ, কলিকাতা, ৫

শ্রীযুক্ত রামরুদ্র ব্যানার্জ্জি,
,, সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জি, শিবপুর, ১
,, এস, ভদ্রথালী, ৷০
,, এইচ রায়, ৷০
,, বি, কলিকাতা ৷৷০
,, আশুতোষ ঘোষাল, ১
,, আর, ঘোষ, ,, ৷০
,, সুশীল চন্দ্র নাগ, ঢাকা, ১৫
,, সুরেন্দ্র কুমার আইচ, ভবানীপুর, ১
,, নলিনীনাথ রায় চৌধুরী, কলিকাতা ৩
শ্রীমতী তরুবালা দেবী, মধুপুর, ১০
শ্রীযুত গোপালচন্দ্র শর্ম্মা, আজমির, ৫
,, দীনবন্ধু পইত, শেখরনগর, ৫
সিংহবাহিনী মাতা, কলিকাতা, ২৫
শ্রীযুত শ্যামবাহাদুর, জমেশেদপুরটাউন, ৫
,, বীরেন্দ্রলাল নাথ, আলীপুর, ১
,, জগবন্ধু রায়, বালীগঞ্জ, ৫
জনৈক বন্ধু, বোম্বাই, ৫০
শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাশ, কলিকাতা, ২
,, শৈলেন্দ্র কুমার বল, ,, ১
,, এন, বি, পাণ্ডা, সাহাপুর ২
,, এস, এন, চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা, ৫
,, শিব চন্দ্র মুখার্জ্জি, ,, ১০
,, এস, পি, নিয়োগী, পাউরী, ৩০
,, যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, কোকদাহরা, ২৷৵০
,, অবিনাশচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, খারীনপুর ১
,, ললিত মোহন ঘোষ, কলিকাতা, ৷৵১০
,, সি, সি, মিত্র, ,, ২০
মিসেস্ জে, এন, বসু, বালীগঞ্জ, ৪০
শান্তিপুর অরিয়েন্টেল একাডেমির ২য় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, ২৷৵০
শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, গৌহাটী ৫
,, ই বিজয়ান নাগলিঙ্গম, মান্দ্রাজ, ৩
,, ভি, এন, কুপরাও, ,, ২০

কুমারডুবি চ্যারিটী ফাণ্ড, বরাকর, ৫৲
শ্রীযুত ধ্রুবলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১৲
" হরিসেনা, " ১১৲
শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দাসী, কলিকাতা ১০
" উষাবতী দাসী, " ৪৲
শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, " ২৫
" এস, সি, দত্ত, বেহালা, ৫৲
" এম, এল, গোস্বামী, পেগু, ২০৲
জিতেন্দ্র নাথ মিত্র, কলিকাতা, ১৲
অতুলকৃষ্ণ দাস, " ২৲
জনৈক হিতৈষী, ২০০০৲
মিস্ বাওহাম, ক্রাইষ্টচার্চ্চ নিউজিল্যাণ্ড ৭১৸৴
শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য, নড়াইল, ১৲
জনৈক বন্ধু, বালী, ৫
শ্রীযুত পবাণ চাঁদ নাহতা, জিয়াগঞ্জ, ১০১
জনৈক বন্ধু " ২৲
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ ভবানীপুর, ২০৲
" তারিণীপ্রসাদ, মুঙ্গের, ১৲
ক্যাপ্টেন এম্ মুখার্জ্জি, ফিরোজপুর, ২৫৲
শ্রীযুত অখিলচন্দ্র লাহিড়ী, শালটোরা, ৭॥০
" ভগবতী প্রসাদ, নৈনী ১৲
" শীতল দাস রায়, নিশ্চিন্দিপুর, ৫
" অপর্ণা চরণ দাস, মেদিনীপুর, ৫
শ্রীমতী হরিমতী দাসী, কলিকাতা, ৫০০
শ্রীযুত উপেন্দ্র লাল মজুমদার, " ৫১
" সত্য কিশোর ব্যানার্জ্জি, " ২০৲
" ধীরেন্দ্র কুমার সরকার, রাঁচি, ১॥০
" অন্নদা চরণ বণিক, ফেণী, ৩
" এ, কে, ঘোষ, কায়েকটানা, ১০৲
" মনোমোহন বসু, হাবড়া, ১৪৲
" প্রভাস মিত্র, জামসেদপুর, ২৲
" সেখ মুখদুল মিঞা, " ১
জনৈক ভক্ত, কলিকাতা, ৫৲
শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ মজুমদার, মালয়, ৬৲
" বিশ্বনাথ দাস, " ৩॥০
ডাক্তার হৃদয় নাথ ঘোষ, ১॥০
আর, এন ঘোষ, গমডাস, ২৫
চণ্ড সিওয়ালী, ডিডাম্বি, ৫৲
এস, ডি, মুখার্জ্জি, পুনা ক্যাম্প, ১

শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, কলিকাতা ১
" ভোলা নাথ মল্লিক, " ১
প্লিডারস্ অ্যাসোসিয়েশন, হাবড়া ২০
শ্রীযুত এস্ গোস্বামী এলাহাবাদ, ২
মাঃ ননীগোপাল ঘোষ হাবড়া, ৩০
শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ সেন, সওন্দপ, ৪
" ননীগোপাল বসু, কলিকাতা, ১০৲
ক্যাপ্টেন এস, পি দাস গুপ্ত, কলিকাতা ৫
শ্রীযুত কালা চাঁদ গাঙ্গুলী, খান্দেশ, ১০
" কাশী নাথ দত্ত, নলডাঙ্গা, ৫০
" উষানাথ বসু, গোপালগ্রাম কাচারী ১
" পরেশ নাথ রায় চৌধুরী,
ডায়মণ্ডহারবার, ১০৲
দীননাথ চক্রবর্ত্তী, জামসেদপুর, ১৮০
" অবিনাশ চন্দ্র রায়, গয়া, ১০৲
" হরেন্দ্র নাথ সামন্ত, হাবড়া, ১০
লালকুঠী মেস, কুমিল্লা, ৩
শ্রীযুত মহাদেব চন্দ্র বিশ্বাস, মেচ পাড়া, ১
" কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ, বাহাদুর,
পাইকপাড়া রাজ, ১০০
" বিশ্বনাথ বালাজিগোখেল, পুনাসিটি ৫
" যতীন্দ্র লাল ঘোষ, বাঁশজোড়া, ৬৫॥০
কুমুদিনী বিশ্বাস, বরিশাল, ২
জনৈক ভক্ত ১০০০
শ্রীযুত বি, নারায়ণ, কলিকাতা, ১০
" সি, ঘোষ আলিপুর, ২৲
জনৈক বন্ধু, ২০০০
শ্রীযুত এ, ডি, মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১০
মাঃ শ্রীহরিপদ চৌধুরী, কুট, ৪৭॥০
শ্রীযুত রমাপতি চ্যাটার্জ্জি কার্সিয়াং, ১০
" জে, কে, রাও, বেলপাহাড়, ১
জনৈক দেশসেবক, ১০০০
শ্রীযুত এস, ও, বুনো, বোটি, ১৸৴০
" এম, ও, মাঙ্গহাও, " ৸৴০
" দুর্গাচরণ চাটার্জ্জি, বেনারস সিটি, ৩
" শ্যামা প্রসন্ন ব্যানার্জ্জি, খিদিরপুর ১
" রামাণিকলাল বেদীলাল পারেখা,
আহাম্মদাবাদ, ১০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

কাশীপুরে সেবাব্রত।

(স্বামী সারদানন্দ)

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, পৌষ মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঠাকুর অগ্রহায়ণ মাস সম্পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্ব্বে শ্যামপুকুর হইতে কাশীপুর উদ্যানে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় জনকোলাহলপূর্ণ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত শ্যামপুকুরের বাটী অপেক্ষা উদ্যানের বসত-বাটীখানি অনেক অধিক প্রশস্ত ও নির্জ্জন ছিল এবং উহার মধ্য হইতে যে দিকেই দেখ না কেন, বৃক্ষরাজির হরিৎপত্র, কুসুমের উজ্জ্বল বর্ণ এবং তৃণ ও শষ্প সকলের শ্যামলতাই নয়নগোচর হইত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় উদ্যানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চারি মাস কাল কলিকাতা বাসের পরে ঠাকুরের নিকটে উহা রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া ঐস্থান হইতে কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে যেরূপ রুদ্ধ, সঙ্কুচিতভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের সেবা পূর্ব্বের ন্যায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিতা হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের

উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মর্ম প্রফুল্ল হইয়াছিল একথাও বলা বাহুল্য।

উদ্যান-বাটীতে বাস করিতে উপস্থিত হইয়া যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়নগোচর হইতে লাগিল সেই সকল দূর করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ঐ সকলের আলোচনায় নরেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ও চিকিৎসকগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উদ্যান-বাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রথম হইতে ঐ দুই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর না হইলে সেবার ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা অর্থবলের কথা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ঐ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবল সংগ্রহে তাঁহাকেই ইতিপূর্ব্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐ জন্য কাশীপুর উদ্যানে এখন হইতে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি ঐরূপে পথ না দেখাইলে অভিভাবকদিগের অসন্তোষ এবং চাকরি ও পাঠহানির আশঙ্কায় যুবক ভক্তদিগের অনেকে ঐরূপ করিতে পারিবে না। কারণ, ঠাকুরের শ্যামপুকুরে থাকিবার কালে তাহারা যেরূপে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিয়া আসিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেছিল এখান হইতে সেইরূপ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

আইন (বি, এল্) পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র ঐ বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলেন। উক্ত পরীক্ষার ও জ্ঞাতিদিগের শত্রুতাচরণে বাস্তুভিটার বিভাগ লইয়া হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তদুভয়ের নিমিত্ত তাঁহার কলিকাতায় থাকা এখন একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও তিনি শ্রীগুরুর সেবার নিমিত্ত ঐ অভিপ্রায় মন হইতে এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক আইনসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কাশীপুর উদ্যানে আনয়ন ও অবসরকালে যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করিবেন, এইরূপ সংকল্প স্থির

করিলেন। ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরের সেবা করিবার সংকল্পের সহিত সুবিধামত ঐ বৎসর আইন পরীক্ষা দিবার সংকল্পও নরেন্দ্রনাথের মনে এখন পর্য্যন্ত দৃঢ় রহিল। কারণ, অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৎসরের পরিশ্রমে মাতা ও ভ্রাতাগণের জন্য মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের একটা সংস্থান করিয়া দিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বর-সাধনায় ডুবিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, ঐ রূপ শুভসংকল্প ত আমরা অনেকেই করিয়া থাকি—সংসারের পশ্চাদাকর্ষণে এতদূর মাত্র গাত্র ঢালিয়াই বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক সম্মুখে শ্রেয়ঃ-মার্গে অগ্রসর হইব এইরূপ ভাবিয়া কার্য্যারম্ভ আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আবর্ত্তে না পড়িয়া পরিণামে কয়জন ঐরূপ করিতে সমর্থ হই? উত্তমাধিকারিগণের অগ্রণী হইয়া ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভে সমর্থ হইলেও নরেন্দ্রনাথের ঐ সংকল্প সংসার-সংঘর্ষে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কালে অন্য আকার ধারণ করিবে না তং?—হে পাঠক ধৈর্য্য ধর, ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছাশক্তি নরেন্দ্রনাথকে কোথা দিয়া কি ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়াছিল তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

ঠাকুরের সেবার জন্য ভক্তগণ যাহা করিতেছিলেন সেই সকল কথাই আমরা এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে যাঁহাকে আমরা বেদ বেদান্তের পারের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাতার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ও একান্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লওয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ও তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত

একথা পূর্ব্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন। তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা বলিতে আমরা যতই অগ্রসর হইব ততই ঐ বিষয়ের পরিচয় পাইব।

আবার ভক্তগণকৃত যে সকল বন্দোবস্ত তাঁহার মনঃপূত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বুঝিতেন তাহারা মনে কষ্ট পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার কালে ঐজন্য বলরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখন ঐরূপ করি নাই। যদি বল, তবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে ঐরূপ করিতেছি কিরূপে, কর্ত্তৃপক্ষেরা ত এখন নানা সরিকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলে মিলিয়া দেবসেবা চালাইতেছে?—তাহাতে বলি এখানেও আমায় চাঁদায় খাইতে হইতেছে না; কারণ, রাসমণির সময় হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, পূজা করিবার কালে ৭৲ টাকা করিয়া মাসে মাসে যে মাহিনা পাইতাম তাহা এবং যতদিন এখানে থাকিব ততদিন দেবতার প্রসাদ আমাকে দেওয়া হইবে। সেজন্য এখানে আমি একরূপ পেন্সনে* খাইতেছি বলা যাইতে পারে। অতএব চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।" ঐরূপে কাশীপুরের উদ্যান বাটী যখন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা (৮০৲) জানিতে পারিয়া তাঁহার 'ছাপোষা' ভক্তগণ উহা কেমন করিয়া বহন করিবে এই কথা ভাবিতে লাগিলেন, পরিশেষে ডষ্ট্ কোম্পানির মুৎসুদ্দি পরম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরাণী মেরাণী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা চাঁদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও।" সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা

* পেন্সনে না বলিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন 'পেন্সিলে খাইতেছি'।

আজ্ঞা' বলিয়া ঐরূপ করিতে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। ঐরূপে পরে আবার একদিন তিনি দুর্ব্বলতার জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছলেন। যুবক ভক্ত লাটু * ঐদিন তাঁহার ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগম্ভীর ভাবে "যে আজ্ঞা, মশায়, হামি ত আপনকার মেস্তর (মেথর) হাজির আসি' বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে দুঃখের ভিতরেও হাসাইয়াছিল। যাহা হউক ঐরূপে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ে ঠাকুর নিজ বন্দোবস্ত যথাযোগ্য ভাবে নিজেই করিয়া লইয়া ভক্তগণের সুবিধা করিয়া দিতেন।

ক্রমে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল এবং যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ শাস্ত্রচর্চ্চা ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিত-কর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোন দিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐরূপে শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া যাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্যাপন

* স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে অধুনা ভক্তসংঘে সুপরিচিত। ইনি ছাপরা নিবাসী ছিলেন। বাঙ্গালা বুঝিতে সমর্থ হইলেও ঐ ভাষায় কথা কহিতে ইঁহার নানাপ্রকার বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া বালকের কথার ন্যায় সুমিষ্ট শুনাইত।

করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশ * জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ এবং অসামান্য কর্ম্মকুশল ছিল।

কাশীপুরে আসিবার কয়েক দিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। নিত্য ঐরূপ করিতে পারিলে শীঘ্র সুস্থ ও সবল হইবেন ভাবিয়া ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু বাহিরের শীতল বায়ুস্পর্শে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্ব্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্য্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুই তিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে কয়েক দিনেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা অনেকটা হ্রাস হইয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলালও এই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ বিষয় লক্ষ্য করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কার্য্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা হইতে

* পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা, নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (যুবক ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং (ছুটকো) গোপাল। সারদা পিতার নির্য্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই একদিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। হরিশ কয়েক দিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিত। তদ্ভিন্ন অন্য দুইজন অল্পদিন পরে মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বাটীতেই থাকিয়া গিয়াছিল।

দেখিয়া এখন হইতে নিয়ম করা হইয়াছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় ঐ দুই কার্য্যের জন্য দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ দুইজন ভিন্ন অপর একব্যক্তি যাইবে। তদ্ভিন্ন বাটী ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশ্যকীয় সকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্য পালাক্রমে যুবক ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল—এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যের তত্ত্বাবধানে এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল। সাধারণ পথ্য ভিন্ন বিশেষ কোনরূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদা প্রমুখ দুই একজন, যাহাদের সহিত তিনি নিঃসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিতেন তাহারা, যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। পথ্য প্রস্তুত করা ভিন্ন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং লইয়া যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন। রন্ধনাদি সকল কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাঁহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখন কখন দুই এক দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐরূপে কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।

গৃহী ভক্তেরাও ঐ কালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সুবিধামত সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবায় কে কোন বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। সকল মাসে সকলের সমভাবে সাহায্য প্রদান করা সুবিধাজনক না হইতে পারে ভাবিয়া তাঁহারা প্রতি মাসেই দুই একবার ঐরূপে একত্র মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতে স্থির করিবার সংকল্পও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

যুবক ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্য্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসন্নচিত্তে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন, ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিত করিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের ঐরূপ আচরণ কিছুদিন কোনরূপে সহ্য করিতে এবং তাহাদিগকে ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঐরূপে গৃহী এবং ব্রহ্মচারী ঠাকুরের উভয় প্রকারের ভক্ত সকলেই যখন একযোগে দৃঢ়নিষ্ঠায় সেবাব্রতে যোগদান করিল এবং সুবন্দোবস্ত হইয়া সকল কার্য্য যখন শৃঙ্খলার সহিত যন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায় নিত্য সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন নরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন এবং শীঘ্রই দুই একদিনের জন্য নিজ বাটীতে যাইবার সংকল্প করিলেন। রাত্রিকালে আমাদিগের সকলকে ঐ কথা জানাইয়া তিনি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং গোপাল প্রমুখ আমাদিগের দুই একজনকে জাগ্রত দেখিয়া

বলিলেন, 'চল্, বাহিরে উদ্যানপথে পাদচারণ ও তামাকু সেবন করি।' বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহরক্ষার সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান ভজন করিয়া যে যতটা পারিস্ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবান্‌কে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন ভজনে লাগিব, এইরূপেই ত দিনগুলা যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া' পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্ব্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।"

পৌষের শীতের রাত্রি নীরবতায় ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। উপরে অনন্ত নীলিমা শত সহস্র নক্ষত্রচক্ষে ধরার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। নীচে সূর্য্যের প্রখর কিরণ সম্পাতে উদ্যানের বৃক্ষতলসকল শুষ্ক এবং সম্প্রতি সুসংস্কৃত হওয়ায় উপবেশনযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপ্রবণ, ধ্যানপরায়ণ মন যেন বাহিরের ঐ নীরবতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আর পাদচারণ না করিয়া তিনি এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তৃণপল্লব ও ভগ্ন বৃক্ষশাখা-সমূহের একটি শুষ্ক স্তূপ নিকটেই রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, 'দে উহাতে অগ্নি লাগাইয়া, সাধুরা এই সময়ে বৃক্ষতলে ধুনি জ্বালাইয়া থাকে, আর আমরাও ঐরূপে ধুনি জ্বালাইয়া অন্তরের নিভৃত বাসনা সকল দগ্ধ করি'। অগ্নি প্রজ্বালিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক ইন্ধনস্তূপসমূহ টানিয়া আনিয়া আমরা উহাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তরের বাসনাসমূহ হোম করিতেছি এই চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয়া অপূর্ব্ব উল্লাস অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যেন সত্য সত্যই পার্থিব বাসনাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া মন প্রসন্ন নির্ম্মল হইতেছে ও শ্রীভগবানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি! ভাবিলাম তাই ত কেন পূর্ব্বে এইরূপ করি নাই, ইহাতে এত আনন্দ! এখন হইতে সুবিধা পাইলেই এইরূপে ধুনি জ্বালাইব। ঐরূপে দুই তিন ঘণ্টাকাল

কাটিবার পরে, যখন আর ইন্ধন পাওয়া গেল না তখন অগ্নিকে শান্ত করিয়া আমরা গৃহে ফিরিয়া পুনরায় শয়ন করিলাম। রাত্রি তখন ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা আমাদিগের ঐ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে নাই প্রভাতে উঠিয়া তাহারা যখন ঐ কথা শুনিল তখন তাহাদিগকে ডাকা হয় নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বলিলেন, আমরা ত পূর্ব্ব হইতে অভিপ্রায় করিয়া ঐ কার্য্য করি নাই এবং এত আনন্দ পাইব তাহাও জানিতাম না, এখন হইতে অবসর পাইলেই সকলে মিলিয়া ধুনি জ্বালাইব, ভাবনা কি।"

পূর্ব্বকথামত প্রাতেই নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া যাইলেন এবং একদিন পরেই কয়েকখানি আইনপুস্তক লইয়া পুনরায় কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

দেহাত্মবাদ।

এ সংসারে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা সকলেই 'আমি' 'আমি' করিয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু আমি যে কে তাহা আমরা কেহই ভাল করিয়া বুঝি না। আমাদের সকল ব্যবহারের মূল যে আমি, তাহার স্বরূপটা যে কি তাহা বুঝিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের শতকরা নিরানব্বই জনের মনে দীর্ঘকাল-ব্যাপী জীবনের মধ্যে একবারও উদিত হয় না; ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, আমাদের এই আত্মবিস্মৃতি বা

আত্মভ্রান্তিই আমাদের সকল দুঃখের নিদান, এই ভ্রান্তি দূর করিতে পারিলেই আমাদের সকল দুঃখ মিটিয়া যায়। দার্শনিক পণ্ডিতের এই সিদ্ধান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা তাহা লইয়া বিবাদ আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া যে এই অহংতত্ত্বের বিচার একেবারে নিষ্ফল একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না,—প্রত্যুত এই অহংতত্ত্বের বিচার দ্বারা আমরা প্রভূত লাভবান্ হইতে পারি, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে, সে কথা পরে বলা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাক, এই 'আমি কে' তাহা নিরূপণ করিতে যাইয়া ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ কে কি বলিয়াছেন। সর্ব্বাদৌ আসুর দেবগুরু বৃহস্পতি এই আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহাই চার্ব্বাক দর্শন নামে প্রথিত হইয়াছে। মহাভারতে চার্ব্বাক নামে একজন ঋষিরও খোঁজ পাওয়া যায়, তাঁহার মতই চার্ব্বাক মত, একথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। যাক সে কথা। সেই চার্ব্বাক মতটা কি এক্ষণে তাহাই দেখা যাক। চার্ব্বাক মতানুযায়ী দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে এই দেহই আমি—আমি বলিলে এ দেহটাই বুঝায়; জ্ঞানও এই দেহেরই ধর্ম্ম।

যেমন চূণ ও হলুদ এই দুইটী বস্তুর মধ্যে কাহারও ধর্ম্ম রক্ততা নহে, কিন্তু এই দুইটী বস্তু মিলিত হইলে রক্তবর্ণকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে ভূমি, জল ও তেজঃ প্রভৃতিতে পৃথক্ভাবে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ গুণ নাই, সেই পৃথিবী, জল ও তেজঃ প্রভৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেহ জড়প্রকৃতি হইলে পরস্পর সংযোগ বিশেষের বলে যে জ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় হইবে তাহাতে বাধা কি? এই চার্ব্বাক দার্শনিকগণ জন্মান্তর মানেন না, পাপ বা পুণ্য বলিয়া কোন অদৃষ্টগুণও ইঁহারা স্বীকার করেন না, স্বর্গ বা নরক ইঁহাদের মতে গগনকুসুমের ন্যায় অলীক। তাই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য ইঁহাদের মতের সারসঙ্কলন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

"আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্ত্তি-
র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাম্।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ
প্রথীয়সঃ স্বাদুফলাভিসন্ধৌ ॥"

"এই দেহ ব্যতীত একটী আত্মা আছে, সে আবার লোকান্তরে যাইয়া এইখানকার কর্ম্মফলের ভোক্তা হইবে—এই প্রকার আশা ঠিক গগনতরুর কুসুম হইতে উৎপন্ন যে ফল, তাহার ভোগের আশা ছাড়া আর কি হইতে পারে?"

ইঁহারা বলেন যাগ হোম সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যগুলি ব্রাহ্মণগণ নিজের প্রাধান্য ও ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া লোক ভুলাইবার জন্য সমাজে চালাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য করিয়া বৃথা "সময়ক্ষেপ করা" পণ্ডিতের উচিত নহে—কিসে দেহ সুস্থ থাকে এবং সুস্থ দেহে প্রাণ ভরিয়া মনের মতন ভোগ করিতে পারা যায় তাহারই জন্য লোকের চেষ্টা করা উচিত।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"

যতদিন বাঁচিবে স্ফূর্ত্তিতে কাটাইবে, অন্ততঃ ধার করিয়াও ঘি খাইবে। এই দেহ পুড়িয়া ছাই হইবার পর আবার এই প্রকার দেহ কোথা হইতে মিলিবে?

ইহাই হইল চার্ব্বাক দর্শনের সার সংক্ষেপ চার্ব্বাক দর্শনের আর একটী নাম লোকায়ত মত। লোকে অর্থাৎ সাধারণ জনগণে যাহা আয়ত অর্থাৎ প্রচলিত তাহাই লোকায়ত। এক কথায় বলিতে গেলে লোকপ্রচলিত বা সর্ব্বসাধারণে অঙ্গীকৃত যে মত তাহাই চার্ব্বাক মত। এই দার্শনিকগণের আর একটী নাম স্বভাববাদী। সকল কার্য্যই স্বভাবের বশে উৎপন্ন হয় এই বলিয়াই ইঁহারা কার্য্যকারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই অনন্ত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই বিচিত্র সৃষ্টি স্বভাববশেই হইয়া থাকে—সূক্ষ্মভাবে এই বিশ্বসৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, অনুসন্ধান

করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই বিশ্ব-সৃষ্টির ভার স্বভাবের উপর সমর্পণ করিয়া সে বিষয়ে বৃথা মাথা না ঘামাইয়া দৃষ্ট ও পরিচিত উপায়গুলির দ্বারা নিজের ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহ কর. আরামে বা স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতে চেষ্টা কর, তোমার জন্ম সার্থক হইবে। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি কল্পিত বস্তুগুলিকে লইয়া মিছামিছি শুষ্ক তর্ক করিয়া কাল কাটান মূর্খতার পরিচয় ছাড়া আর কি হইতে পারে?—ইহাই হইল চার্ব্বাক মতে আত্মতত্ত্বের পরিচয়। এক্ষণে দেখা যাক এই প্রকার মত বাস্তব-পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ কিনা?

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই মতটী যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন তাঁহারাই কি এই মতের উপর বিশ্বাস করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছেন? কখনই না। কেন তাহা বলি, এ সংসারে আমরা যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকি সেই কয় দিনের জন্য আমি যে এক ব্যক্তি এই জ্ঞান না থাকিলে আমাদের দ্বারা যে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমার শৈশবে আমি বিদ্যার্জ্জন করি কিসের জন্য? যে আমি এখন শিশু সেই আমি যুবা হইয়া সেই বিদ্যার সাহায্যে নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া সুখভোগ করিব বা ভাবী দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব, এই প্রকার বুদ্ধি বা বিশ্বাস না থাকিলে আমি কখনই শৈশবে বিদ্যার্জ্জন করিতে উদ্যত হই না ইহা স্থির। আজ মাথা ঘামাইয়া—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমি যে অর্থার্জ্জন করিয়াছি, সেই অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া এই যে আমি প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হই, এত প্রয়াস অঙ্গীকার করি কেন? আমি বৃদ্ধাবস্থায় এই বাটীতে থাকিয়া আরামে দিন কাটাইব এই বিশ্বাসই ত ইহার মূলীভূত কারণ, কিন্তু চার্ব্বাক দর্শনের প্রসাদে আমার এই বিশ্বাস টিকে কৈ? চার্ব্বাক বলেন, দেহই আত্মা—দেহ কিন্তু বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত একই থাকে, ইহা ত কখন সম্ভবপর নহে। বাল্যকালের ক্ষুদ্র পরিমাণের দেহ আর যুবাবস্থার প্রকাণ্ড

পরিমাণ দেহ যে এক বস্তু নহে তাহা কি আর যুক্তি দিয়া বুঝাইতে হইবে ?—প্রত্যক্ষ প্রমাণই ত বলিয়া দিতেছে আমার দশম বৎসরের দেহ আর পঞ্চাশত্তম বৎসরের দেহ পরস্পর ভিন্ন এক নহে।

এক হইবেই বা কিরূপে? অবয়বের উপচয় বা অপচয় ঘটিলে অবয়বী যে পৃথক্ হয় তাহা ত সকলেরই জানা কথা। দেহের অবয়ব ত অন্ন ও রসের দ্বারা গঠিত হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ন ও রস হইতে অবয়ব উৎপন্ন হইয়াছিল সে অবয়ব হইতে অদ্যকার ভুক্ত ও পীত অন্ন ও রস হইতে উৎপন্ন অবয়ব যে পৃথক্ তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাহাই যদি হইল, তবে দশ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী অবয়বসমূহ হইতে যে দেহরূপ অবয়বী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই দেহ ও অদ্যকার নূতন অবয়বসমূহ হইতে উৎপন্ন এই নূতন দেহ কখনই এক দেহ হইতে পারে না, ইহা ত স্থিরই আছে। সুতরাং দেহ যদি আমি হই, তবে দশ বৎসরের পূর্ব্বের আমি, আর অদ্যকার আমি, নিশ্চিতই এক ব্যক্তি নহে, অথচ আমার বিশ্বাস দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম এখনও সেই আমিই রহিয়াছি এবং দশ বৎসর পরেও সেই আমি থাকিব—এই বিশ্বাসই আমাদের সকলের সংসার-যাত্রার প্রধানতম অবলম্বন। এই বিশ্বাস কিন্তু চার্ব্বাক দর্শনকে সত্য বলিয়া মানিলে ভ্রান্তিমূলক হইয়া উঠে। ভ্রান্তিকে যদি আমরা ভ্রান্তি বলিয়া বুঝি তাহা হইলে তাহার বশে আমাদের কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হয় না, অথচ আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যবহার রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকি—এই বিশ্বাসকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া আমরা কেহই স্বীকার করি না। তাই বলিতেছিলাম, দেহকে কেহই আমরা আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করি না। এইরূপ বিশ্বাসই যদি করিতাম, তাহা হইলে, কেহই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতাম না, সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, দেহ আমি নহি, কিন্তু দেহ হইতে আমি ভিন্ন—দেহ আমার হইতে পারে আমি কিন্তু কিছুতেই দেহ হইতে পারি না। তাহাই যদি হইল, তবে সেই দেহ হইতে

ভিন্ন আমি কে? দেখা যাক, এইবার ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ববাদী আর একপ্রকার চার্ব্বাক দার্শনিকগণ এই বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চাহেন।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদ।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার -জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা আমরা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করি, তাহাদের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার যথা—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রবণ। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

ইন্দ্রিয়ই আমাদের আত্মা এই মতাবলম্বী দার্শনিকগণ বলেন যে, উক্ত দুই প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কয়টীকে আত্মা বলা যায়, অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা ও শ্রোত্র এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই আমাদের আত্মা। এই কয়টী ইন্দ্রিয় হইতেই আমাদের রূপরসাদির জ্ঞান হইয়া থাকে। সেই রূপরসাদির জ্ঞান এই ইন্দ্রিয় কয়টীরই ধর্ম্ম অর্থাৎ রূপজ্ঞান চক্ষুর ধর্ম্ম, রসজ্ঞান রসনার ধর্ম্ম, শব্দজ্ঞান শ্রবণের ধর্ম্ম, গন্ধজ্ঞান ঘ্রাণের ধর্ম্ম ও স্পর্শজ্ঞান ত্বগিন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। তাহার পর এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ছাড়া আমাদের আর একটী ইন্দ্রিয় আছে তাহার নাম মন বা অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা আমাদের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হয়। সেই সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ এই মনেরই ধর্ম্ম, সুখ দুঃখ প্রভৃতিও মনের ধর্ম্ম, সুতরাং মনও সুখদুঃখাদির আশ্রয় ও সুখদুঃখাদি বিষয়ক জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া তাহাকেও আত্মা বলিতে হইবে। ফলে দাড়াইল যে চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয় এবং মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় এই ছয়টী ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আত্মপদের অভিধেয় হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ কিনা? ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহের আত্মত্ব স্বীকার করিলে কতকগুলি

দোষ আসিয়া পড়ে। প্রথম দোষ এই যে ইন্দ্রিয়গুলি অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অবিষয়; আমি কিন্তু আমার নিকটে প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাই যদি হইল তবে ইন্দ্রিয় আমার আত্মা কি প্রকারে হইবে? অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মা কি প্রকারে হইবে। যদি বল যাহারা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া মানে, তাহাদের মতে ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় নহে—ইন্দ্রিয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও মনের দ্বারা তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়—ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, আত্মার প্রত্যক্ষ আত্মারই হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ কিন্তু এ স্থলে সে সিদ্ধান্ত টিকিল না—কারণ চক্ষুঃ প্রভৃতি আত্মার প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি দ্বারা হইল না, তাহাদের প্রত্যক্ষ তোমাদের মতে মনের দ্বারাই হয়; আর মনোরূপ আত্মার প্রত্যক্ষ মনের দ্বারাই হয়। তাহাই যদি হইল তবে দাঁড়াইল এই যে আমাদের পাঁচটী আত্মা অপর একটী আত্মার প্রত্যক্ষ দ্বারা, আর মনোরূপ আত্মাটী তাহার নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ হয়—সুতরাং এই প্রকার বৈষম্য এইরূপ ইন্দ্রিয়াত্মবাদে দুষ্পরিহরণীয় হইয়া পড়ে। এই প্রকার ইন্দ্রিয়াত্ম-বাদের আরও দোষ এই যে, এই মতে যাহার চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ যে, যে রূপ দেখে তাহারই সেই দৃষ্টরূপের স্মৃতি হয়, যে রূপ কখনও দেখে নাই তাহার কখনই রূপের স্মরণ হয় না—এই নিয়ম দেখিয়া আমরা কল্পনা করিতে সমর্থ হই যে যাহাতে রূপজ্ঞান হয় তাহাতেই রূপজ্ঞানের সংস্কার বা তাহার সূক্ষ্মাবস্থা থাকিয়া যায়। সময়বিশেষে সেই সংস্কার কোন কারণবিশেষ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে তাহাতেই স্মৃতির উৎপত্তি হয়। সকলকেই বাধ্য হইয়া এই প্রকার অনুভব ও স্মৃতির একটী আশ্রয় কল্পনা করিতে হয়। এখন দেখ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর মতানুসারে চক্ষুর ধর্ম্ম রূপ প্রত্যক্ষ সুতরাং রূপের স্মৃতিও চক্ষুরই ধর্ম্ম হওয়া উচিত। চক্ষুঃ যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহার সঙ্গে রূপ প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন যে রূপসংস্কার তাহাও নষ্ট হইতে বাধ্য। কারণ, আশ্রয় নষ্ট হইলে আশ্রিত ধর্ম্মের নাশ অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং যে ব্যক্তির চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপ স্মরণের কারণ যে রূপবিষয়ক সংস্কার তাহাও নষ্ট হইয়াছে; আর তাহাই যদি হইল তবে তাহার পক্ষে আর রূপস্মৃতি সম্ভবপর নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহারও চক্ষুঃ নষ্ট হইলেও সে যে তাহার পূর্ব্বানুভূত রূপের স্মরণ করিয়া থাকে ইহাকে কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং এইপ্রকার আপত্তি অখণ্ডনীয় হওয়ায় বলিতে হইবে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই যে আমাদের আত্মা এই মতটী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারিল না। এই আপত্তির পরিহার করিতে যাইয়া যদি ইন্দ্রিয়াত্মবাদী বলেন—আচ্ছা, বহিরিন্দ্রিয় আমাদের আত্মা নাই হইল, অন্তরিন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে ত এই দোষ পরিহৃত হইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে রূপাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ চক্ষুর ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা মনেরই ধর্ম্ম, অর্থাৎ মনেই আমাদের রূপাদিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, মনেই রূপাদিবিষয়ের সংস্কার জন্মে এবং সময়বিশেষে নির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ সেই মনেই রূপের স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপই যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে যাঁহার চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছে তাহার রূপের স্মরণ হইতে কোন বাধা রহিল না—মন ত তাহার নষ্ট হয় নাই।

এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে মনের আত্মত্ব যাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। কারণ, এই মতের প্রথম দোষ এই যে, এই ভাবে মনকে আত্মা বলিলে আমাদের নিকটে আমাদের আত্মা বা তদ্গত জ্ঞানাদিধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আমরা কিন্তু আমাদের আত্মাকে আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকি, এবং আত্মগত জ্ঞান, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্মেরও আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ইহাও আমাদের অভ্যুপগত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মনকে যদি আমাদের আত্মা বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বানুভবসিদ্ধ এই আত্মপ্রত্যক্ষ এবং আত্ম-জ্ঞানসুখাদিরূপ ধর্ম্মসমূহের প্রত্যক্ষ কিছুতেই সম্ভবপর হয় না,—

যদি বল কেন তাহা সম্ভবপর হয় না, তাহার উত্তর এই যে, মন যেহেতু অণুপরিমাণ সেই জন্যই মনের বা মনোগত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যে বস্তু অণুপরিমাণ তাহার বা তদ্গত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। পার্থিব পরমাণু আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে ইহা ত সকলেই স্বীকার করেন। যেহেতু পার্থিব পরমাণু মহত্ত্বরূপ গুণের আশ্রয় নহে সেই কারণেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, পার্থিব পরমাণুর রূপও আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না কারণ, সেই রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় হইলেও যেহেতু তাহার আশ্রয় মহৎ নহে সেই হেতু তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। যদি বল, মনকে অণুপরিমাণ বলিয়া কেন মানিব? প্রত্যক্ষের অনুরোধে মনকে না হয় অণুপরিমাণ বলিয়া নাই মানিলাম; যতটা মহত্ত্ব থাকিলে বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে পারে মনের ততটা মহত্ত্বই অঙ্গীকার করা যাক্, তাহা হইলেই ত উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। মনের আত্মত্ব ব্যবস্থাপন করিতে যাঁহারা চাহেন তাঁহাদের এই প্রকার উক্তিও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেন তাহা বলি—

এই যে মন বলিয়া একটী অন্তরিন্দ্রিয় আছে আমরা স্বীকার করি, বল দেখি তাহাতে প্রমাণ কি? প্রত্যক্ষ না অনুমান? প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা ইহার সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না কারণ রূপাদি বিষয়ের ন্যায় মনকে আমরা কেহই চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। মন যদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় হইত, তাহা হইলে গৌতম প্রভৃতি বড় বড় দার্শনিক আচার্য্যগণ মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য অনুমানরূপ প্রমাণের উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, মন সিদ্ধ করিতে হইলে অনুমানাদিরূপ পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে সেই অনুমান কিরূপ হইবে? এই যে আমরা দেখিতে পাই, সময় বিশেষে কোন রূপাদি বিষয়ের সহিত আমাদের চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আছে অথচ

সই বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হইল না—ইহা দ্বারা আমরা বুঝি যে, রূপের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চক্ষুঃই আমার পর্য্যাপ্ত কারণ নহে। তাহা যদি হইত, তবে যখনই যে রূপের সহিত আমার চক্ষুর সম্বন্ধ হয়, তখনই সেই রূপের জ্ঞান আমার চক্ষুর দ্বারা হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা হয় না। এই কারণে বলিতে হইবে চক্ষুর দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চক্ষু ছাড়া আর একটী চক্ষুর সহকারী কারণ আছে, সেই কারণটী যদি চক্ষুর সাহায্য করে, তবেই চক্ষুঃ রূপজ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়, নচেৎ নহে। এইরূপ অনুমানের সাহায্যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহকারী যে কারণ আছে বলিয়া অঙ্গীকৃত হয়, সেই কারণ বিশেষকেই দার্শনিকগণ মন বা অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া থাকেন। যদি বল এইরূপ অনুমানের সাহায্যে মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল, কিন্তু, সেই মন যে অণুপরিমাণ বা মহৎ তাহা ত ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে ইহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মনের কিরূপ পরিমাণ হওয়া আবশ্যক তাহা সিদ্ধ না হইলেও পরম্পরায় এই অনুমান দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে সে মন অণুপরিমাণই হওয়া উচিত। কেন তাহার পরিমাণ মহৎ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান।*

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

"Truth does not pay homage to any Society ancient or modern; Society has to pay homage to Truth or die."

Swami Vivekananda.

জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় কতকগুলি আধিভৌতিক শক্তি আয়ত্ত করিয়া, ক্ষমতামদগর্ব্বিত অষ্টাদশ শতাব্দীর মানব মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে চৈতন্যসত্তাকে অস্বীকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। অভিনব জড়োপাসনায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া ঐন্দ্রিয়িক সুখভোগকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা জগতে প্রচার করিয়াছিল। জড়বিজ্ঞানের ক্ষিপ্র উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের বহির্মুখ মন অন্তর্জগতের প্রতি ক্ষণকালের জন্যও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার অবসর পায় নাই। এ যুগের অগ্রদূতগণ যখন "আমি ও আমার" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বার্থের অনুসন্ধানে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন, তখন সমস্ত বিশ্বে একটা বিক্ষোভময় চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই স্বার্থ দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাতে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব অত্যাচার অবিচারের মধ্য দিয়া, মানব সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বারদেশে আসিয়া যখন উপস্থিত, তখন ঝটিকাবসানে মথিত সমুদ্রের মত সমস্ত পৃথিবীর বক্ষে একটা ত্রস্ত শান্তি একটা উদ্বিগ্ন আশঙ্কা!

এক শতাব্দী ধরিয়া স্বাধিকারপ্রমত্ত ইউরোপ ক্ষমতার মদিরা পান করিয়াছে। এখন তাহার শিরায় শিরায় মত্ততার পুলকনর্ত্তন। তাই আমরা দেখিতে পাই সে উন্মত্ত অন্ধবিক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জগৎবিজয়ে বহির্গত!

---

* বিগত ৩রা শ্রাবণ থিয়জফিক্যাল সোসাইটী হলে "বিবেকানন্দ সোসাইটির" সাপ্তাহিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

পাশ্চাত্যজগতের শতাব্দীব্যাপী গঠনের নামে এই ধ্বংসের চেষ্টা; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জ্ঞানী ও মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। গ্রীস ও রোমের দর্শন, কাব্য, নীতি ও সভ্যতার সহিত ভগবান্ যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব প্রেমের ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়া যে মহান্ আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল নব্য ইউরোপ তাহা পদদলিত করিয়াছে,—বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সে আত্মার রাজ্যকে উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করিয়াছে! মানুষ হইয়া মানুষকে দৈহিক শক্তিতে নিষ্পেষিত করিয়া দ্বিধাহীনচিত্তে তাহার উষ্ণ শোণিত পান করিতেছে! সভ্যতার নামে উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, স্বাধীনতার নামে ব্যক্তিগত অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোলুপতা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ড পাদ্রীগণের পরধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ, দর্শন-চর্চ্চার নামে নাস্তিক্যবাদ-প্রচার! নব্য ইউরোপের জ্ঞানিগণ এই উচ্ছৃঙ্খল জাতীয় জীবনের বহুমুখী চেষ্টার উদ্দেশ্যহীন উদ্যম দেখিয়া ভীত হইলেন। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতির সম্মুখে একটা উন্নততর আদর্শ স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের এই ব্যাকুলতা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির মধ্যে প্রশ্নপূর্ণ সমস্যার আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এ অভিনব আদর্শের জন্য তাঁহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন? রোম ও গ্রীসের সভ্যতাভাণ্ডারে দিবার যাহা ছিল সে তাহা দিয়াছে—তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া ইউরোপ লুটিয়া লইয়াছে। সে নিঃশেষিত ভাণ্ডের বিরাট শূন্যতা দিয়া জাতির পিপাসা দূর করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কোথায় এই আদর্শ পাওয়া যাইবে? কোথায় সে আদর্শ যাহা সমগ্র বিশ্বমানবকে এক অখণ্ড প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিবে, অথচ কাহারও জাতিগত ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন অথবা অসম্পূর্ণ করিবে না?

আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে ইউরোপের দৈহিক ও মানসিক বংশধর এক নব্যজাতি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই আদর্শ অনুসন্ধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। চিকাগো মহাপ্রদর্শনীর

অঙ্গীয় এক বিরাট্ ধর্ম্মসভায় তাঁহারা পৃথিবীর জাতিসমূহকে স্ব স্ব আদর্শ 'স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহসহকারে" নিমন্ত্রণ করিলেন। 'প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে যোগ্যতম' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া" ধর্ম্মমহাসভায় প্রেরিত হইল।

মহাসমারোহে বিশ্বসভার উদ্বোধন হইল—প্রতিনিধিবর্গ মানব-মিলন যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার জন্য স্ব স্ব সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করিয়া হবিহস্তে দণ্ডায়মান—এ 'মহাযজ্ঞের' পুরোহিত কে? জগৎ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল এক তরুণ সন্ন্যাসী গৈরিকউষ্ণীষ-মণ্ডিত শির ঊর্দ্ধে তুলিয়া গৌরব গর্ব্বে দণ্ডায়মান!

মহিমময় মূর্ত্তি, গৈরিকবসনভূষিত, চিকাগো সহরের ধূমমলিন ধূসরবক্ষে ভারতীয় সূর্য্যের মত ভাস্বর, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু, চঞ্চল ওষ্ঠাধর, মনোহর অঙ্গভঙ্গী, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে-সমুন্নত-শির স্বামী বিবেকানন্দ!

সমগ্র জগৎসভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ উৎকর্ণ হইয়া বিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিল:—

"সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি এবং তৎপ্রসূত ধর্ম্মোন্মত্ততা (fanaticism) বহুদিন হইতে এই সুন্দর পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা পাশবিক অত্যাচারে বহুবার নররক্তে ধরিত্রী প্লাবিত করিয়াছে—সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া সমগ্র জাতিকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছে। এই সমস্ত পাশবিক ভাবনিচয়ের উদ্ভব না হইলে আজিকার মানবসমাজ এতদপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হইতে সমর্থ হইত। কিন্তু সময় আসিয়াছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আশা করি, ধর্ম্মমহাসভার সম্মানার্থে অদ্যকার প্রভাতের এই ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত ধর্ম্মোন্মত্ততার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিবে এবং একলক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর বিভিন্ন মতাবলম্বী ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন মানবসম্প্রদায়ের অসি ও মসী যুদ্ধের অত্যাচারের শেষ হইবে।"

"Upon the banner of every religion will soon be written in spite of their resistance. 'Help and not

fight,' 'Assimilation and not Destruction,' "Harmony and Peace and not Dessension.'" ইহাই নবযুগের সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম ঘোষণা! বিশ্ব সভ্যতাভাণ্ডারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ যুগ সঞ্চিত অমূল্য রত্নরাশি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই বার্ত্তা ঘোষণা করিবার ভার স্বামী বিবেকানন্দের উপর অর্পিত হইয়াছিল। দ্রুত উন্নতিশীল উদ্ধত পাশ্চাত্যজগতে ভারতমাতা তাঁহার যোগ্যতম সন্তানকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছিলেন। এই দূত তাঁহার পুণ্য জন্মভূমির গৌরবকাহিনী বিস্মৃত না হইয়া পৃথিবীর মিলনপ্রয়াসী জাতিসমূহকে অদ্বৈত অনুভূতির অভ্রভেদী গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যে ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল, সেই মহাবিপ্লবের অবসানে আজ জড়বিজ্ঞানের অবিবেকী দম্ভ চূর্ণ হইয়াছে। অন্তরের দৈন্য ও বেদনা ঢাকিয়া যিনি বাহিরে যত আস্ফালনই করুন না কেন আজ সকলকেই নিঃস্ব ভিক্ষুকের মত ভারতের দ্বারে নবীন আদর্শের জন্য হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে—সেই বীর সন্ন্যাসীর অবিনশ্বর আহ্বানবাণী সত্য সত্যই তাহাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে।" এইবার অকাতরে দান করিতে হইবে—এই বুভুক্ষু, দরিদ্র, পদদলিত জাতিকে তাহার আসন গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

এই মহাকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সে দায়িত্বভার বাঙ্গালী যুবকগণের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ, আমার দেশের যুবকগণের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বর্ষ ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের

ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বলে উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত, এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমি ত এখনও কিছুই করিতে পারি নাই, তোমাদিগকেই সব করিতে হইবে।"

আজ এই নবযুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী যুবক আমরা শ্রদ্ধার সহিত একবার কি ভাবিয়া দেখিব না যে বীর সন্ন্যাসীর সে পরিপূর্ণ উদাত্ত আহ্বান আমরা গৌরবানুভূতি-পুলকিত হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছি কিনা? যদি এখনও না পারিয়া থাকি তাহা হইলেই বা লজ্জা কি? হয়তো আমরা অনেকে চেষ্টা করিয়াছি, এখনও পরাজয় নির্য্যাতন বাধাবিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তবে কেন বলিব যে তাঁহার আহ্বান বিফল হইয়া গিয়াছে। জনকতক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের জঘন্য বিলাস, বিজাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অন্ধ অনুরাগ, হেয়ভাবে জীবনযাপন প্রণালী দেখিয়া কেন বলিব যে সমগ্র যুবকসমাজ হীনতার কলুষপঙ্কে আবক্ষ নিমজ্জমান? যাঁহারা উদীয়মান জাতীয় নির্ম্মল ললাটে এই সব কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে আমাদের বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির চক্ষে প্রথম সূর্য্যকিরণ বেদনাময়ই বটে।

কথায় কথা উঠিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ নাকি আমাদের বুঝিবার ভুলে সর্ব্বথা বিফল হইতে বসিয়াছে! আমরা নাকি কাজের কথাকে কথার কথা করিয়া কেবলমাত্র নির্লজ্জ আস্ফালন সহায়ে দৈন্যের পরিচয় দিতেছি। কথাটা সত্য কি? সত্যই কি স্বামিজীর প্রাণময় আহ্বান আমাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎকম্প প্রবাহিত করিয়া নবীন আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই?

সত্য হউক মিথ্যা হউক, আমরা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিব না—বিবেকানন্দের নিকট দায়স্বরূপ আমরা কি কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছি? সমগ্র জাতি কিসের আশায় আমাদের মুখ চাহিয়া আছে?

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সভ্যতার ক্রোড়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যুগে যুগে কত কত বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া—কত বাধা বিপত্তির বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া—কত অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় নিষ্পীড়ন সহ্য করিয়া আজ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। মানবসভ্যতার দ্বিতীয় যুগে যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত কিরণ দিতেছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকোণে আর এক দিব্যপ্রতিভাশালী, শক্তিমান্ জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল—আজ তাহারা কোথায়? তাহাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আর এক মহাজাতি বিধাতার মঙ্গলাশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া সমগ্র ইউরোপে সভ্যতা প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এ জাতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রোমকগণ। আজ তাঁহারাই বা কোথায়? কালচক্রের রিবর্ত্তনে এইরূপ আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতি তাহাদের ক্ষণিক অভিনয় সমাপ্ত করিয়া বিশ্বরঙ্গমঞ্চ হইতে চিরদিনের মত সরিয়া পড়িয়াছে। আছে কেবল এক মহিমময় ইতিবৃত্ত—অতীতের অন্ধকারে আপনাকে আবৃত করিয়া ধ্বংসাবশেষের উপর অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে! কিন্তু এই সনাতন হিন্দুজাতি, এই চিরসহিষ্ণু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি আজও যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তখন বুঝিতে হইবে এখনও ইহার অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। তাই আমরা অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, যখনই আমরা জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বিপথে চলিবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছি, তখনই শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—আশার বাণী শুনাইয়াছেন!

ভারতের অতীত ইতিহাসের যাহা কিছু গৌরবময় উপাদান—যাহা লইয়া চেষ্টা করিলে আজও এই অধঃপতিত জাতি বিশ্বের

জাতিসমাজে শ্রেষ্ঠতম আসন গ্রহণ করিতে পারে—সে সমস্তই এই সকল মহাপুরুষগণের দান। ইঁহাদিগের কল্যাণময় আত্মোৎসর্গই শত শত শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় জীবনীশক্তিকে অব্যাহত ও ক্রীয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার শ্রীবৃন্দাবন নদীয়া নগরে একদিন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যা ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর হৃদয় প্লাবিত করিয়া বৈকুণ্ঠের পথে উজান বহিয়াছিল। সে প্লাবনের ধারায় বাঙ্গালী জীবনের অনেক আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া গিয়াছিল—বাঙ্গালীর প্রেমের ধর্ম্ম সেদিন বিপুল আবেগে বরবাহু বিস্তার করিয়া অস্পৃশ্য চণ্ডাল, এমন কি, মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিয়াছিল। আচার, নিয়ম ও জাতিভেদের কঠোর গণ্ডীর মধ্যেও এ যে একটা কত বড় সংস্কার তাহা আধুনিক বিশ্বপ্রেমিক "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী" সংস্কারকগণ কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীর জীবনে সে এক জাগরণের যুগ! বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন-নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনের অন্তরালে অনার্য্য বর্ব্বরজাতিসমূহের নিকট দায়স্বরূপ প্রাপ্ত যে সমস্ত জঘন্য পৈশাচিক আচার লুক্কায়িত ছিল, এই জাগরণে তাহা সমূলে ধ্বংস না হউক, আর জাতীয় জীবনের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এই অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস অসার ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। কামের উৎকট মোহ প্রেমের ধর্ম্মকে অল্পে অল্পে বিকৃত করিয়া তুলিল! সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী-জীবনে এই আদিরসের প্রভাব যে কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল ইতিহাস ও সাহিত্য তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

একটা স্থবির মুমূর্ষু জাতি যেন স্তব্ধ জড়ত্বের উপর জরাগ্রস্ত দেহভার নিক্ষেপ করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে—ভারতের, বাঙ্গালার যখন প্রায় এইরূপ অবস্থা—চারিদিকে বিশৃঙ্খল চাঞ্চল্য অসহায় চেষ্টা, তখন ভারতরঙ্গমঞ্চে বৈশ্যশক্তির নূতন অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে

এক নবীন সভ্যতার দৃপ্ত সংঘাতে আমাদের বহুদিনের অভ্যস্ত তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; পাশ্চাত্য সভ্যতার খরবিদ্যুতালোকে প্রতিহত চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম যে আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে যেমন করিয়া ঠিক এ জাতির সমকক্ষ হইতে হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হবে? আমরা শুনিলাম যে, আমরা অসভ্য, অভিশপ্ত মানবজাতি, আমাদের সমাজ জঘন্য পৈশাচিকতা, আমাদের ধর্ম্ম অন্ধ কুসংস্কার। পাশ্চাত্য শিক্ষার নব উন্মাদনায়, ফরাসীবিপ্লবসমুদ্রমথিত হলাহল পান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা যে চপলতার পরিচয় দিয়াছি, তাহা এক আত্মবিস্মৃত জাতির ব্যর্থপ্রয়াসের লজ্জাকর ইতিহাস।

সত্যই সেদিন আমাদের অধঃপতনের চরম সীমা, যেদিন আমরা আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকট করিয়া অসংযতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম একটা সংস্কারের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেরণায় আমরা প্রথমেই জাতীয় স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্মসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। মহামনীষী রাজা রামমোহন এ কার্য্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। এই মহাপুরুষ আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যেই মুক্তির পথ -উন্নতির পথ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় রামমোহনের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে না পারিয়া বা ভুল করিয়া বুঝিয়া এই সংস্কার কার্য্যকে এমনভাবে পরিচালিত করিলাম যে ত্রিংশবর্ষ যাইতে না যাইতে উহার উদ্দেশ্য দাঁড়াইল—স্বধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বসমাজের প্রতি প্রবল ঘৃণা, স্বজাতির মস্তকে অগ্নিময় অভিশাপ বর্ষণ—অপর দিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ, অযথা স্ত্রী-স্বাধীনতাবাদ ও যেন-তেন-প্রকারেণ গৌরাঙ্গের ছন্দানুবর্ত্তন!

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন আমরা সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম; জাতির

সম্মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সন্দেহের পর সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিজাতীয় পথে 'স্বজাতির সংস্কাররথ যখন' আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়াছিলাম, কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই—তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে, আলোড়িত ও মথিত বাঙ্গালী সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—স্বামী বিবেকানন্দ!" *

সত্যই সেদিন নবযুগের প্রথম প্রভাত—যেদিন দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে সর্ব্বত্যাগী শ্রীনরেন্দ্রনাথ আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রাচীন ও নবীনের সেই অপূর্ব্ব মিলনের ফলস্বরূপ নব্যভারতের আদর্শ বিবেকানন্দরূপে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিল। বিগত শতাব্দীর সংস্কারযুগের অন্তে এক প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগের (Synthetic reactionary movement) সূচনা করিয়া দিয়া তিনি সংস্কারকগণকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"মূর্খ অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?"

সংস্কারযুগের ধ্বংসনীতিমূলক কার্য্যপ্রণালীর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় সংস্কারপ্রস্তাব ও উদ্যমের মধ্যে তিনি কতকগুলি মারাত্মক ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সংস্কারযুগ মুহূর্ত্তের জন্যও পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া নিজেদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। আমাদিগেরও যে একটা সভ্যতা আছে, জাতীয় জীবনের আদর্শ আছে, ইহা একরূপ জ্ঞাতসারেই বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে সমাজ ও ধর্ম্মগঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। জাতিগত, জন্মগত গৌরববুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া যাহা কিছু হিন্দুর- যাহা কিছু হিন্দুত্ব তাহার বিরুদ্ধেই সংস্কার—যুগবিদ্রোহ

* শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' হইতে।

ঘোষণা করিয়াছে! সর্ব্বোপরি এ যুগের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ সংস্কার-প্রভাবগুলি কেবলমাত্র জনকতক শিক্ষিত ব্যক্তি ও দুই একটী উচ্চবর্ণের সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধানকল্পে রচিত হইয়াছিল—সমগ্র জাতির উন্নতির সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। বিশাল জাতিসঙ্ঘের সহিত নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার মত উদারতা সংস্কারকগণের ছিল না বলিয়াই তাঁহারা স্বজন, স্বসমাজ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কারকগণের এই শোচনীয় সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্যদেব গায়ের জোরে কোনপ্রকার সংস্কার চালাইবার প্রত্যেক চেষ্টাকেই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজের ভুল, ত্রুটী ও অন্যায়গুলি সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না; বরং সংস্কারকগণের সহিত অনেকাংশে একমতাবলম্বী ছিলেন। সংস্কারের প্রয়োজনও তিনি অস্বীকার করেন নাই—তাঁহার ঘোরতর আপত্তি কেবল তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালীর উপর। এই পার্থক্যটুকু তলাইয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য বা ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা অসঙ্কোচে আচার্য্যদেবকে পূর্ব্ব সংস্কারকগণের সহিত সমশ্রেণীর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হন। আচার্য্যদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংস্কারক বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং সংস্কার অপেক্ষা আমূল পরিবর্ত্তনেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, সমস্ত সমাজ-সংস্কার-সমস্যাটী তাঁহার নিকট একটী প্রশ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—"সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ?" সংস্কারপ্রার্থী লোক বলিতে তিনি ভারতের বিশাল জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়াছেন—"প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থাপ্রণয়নে সমর্থ একটী দল গঠন কর, বিধান আপনা আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে, যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহা সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই। যে নূতন শক্তিতে, যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোকশক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোক-

শক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য—লোক শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইবে।" ইহাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের উদীয়মান জাতির প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য। আমাদের এই কার্য্যের সাফল্যের উপরই ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সেই জন্যই তিনি ইহাকে জাতি গঠনের যুগ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—সমাজ বা সম্প্রদায় গঠনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি মনুষ্য গঠন করিবার জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং ভাবাবেগে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "I want to preach a man-making religion."—আমি এমন এক ধর্ম্মপ্রচার করিতে চাই যাহাতে মানুষ তৈরী হয়। তিনি বিশ্বাস করিতেন শ্রদ্ধাবান্, মেধাবী, পরকল্যাণকামনায় সর্ব্বত্যাগী কয়েকটী মানুষ পাইলে তিনি সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দিতে পারেন।

যে শক্তিসহায়ে এই প্রবুদ্ধ জাতি প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবা পুনরায় বিশ্বসমাজে বরণীয় হইতে পারিবে, সে শক্তি বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে,—ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া আচার্য্যদেব নবীন ভারতকে চাষার কুটীর, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ি, মুদির দোকান, হাট, বাজার, কারখানা, ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বতের মধ্য হইতে আহ্বান করিয়াছেন। এত গভীর ও ব্যাপক ভাবে, ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়া বর্ত্তমান যুগে আর কেহ সমগ্র জাতিকে আহ্বান করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। আমরা দেখিয়াছি একদিন শ্রীচৈতন্য গভীর প্রেমে আচণ্ডালকে কোল দিয়াছিলেন, আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর এক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শ্রীগুরুকৃপা সম্বল করিয়া গভীর শ্রদ্ধায় "নারায়ণ" জ্ঞানে বিশ্বমানবের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন!

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উচ্চবর্ণগণ কল্পিত আভিজাত্যের অহঙ্কারে পতিত, অজ্ঞ, দরিদ্র, নিম্ন জাতিকে পদদলিত করিয়াছেন—আর সেই অন্যায়ের ফলস্বরূপ আজ তাহারা তমোভাবাপন্ন শূদ্র পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। জাতির এই পাপ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা

প্রাপ্ত হইয়াছি। যতদিন না ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব—ততদিন আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না। অতএব এই শূদ্রগণকে প্রথমতঃ স্ববর্ণোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই এবারকার যুগাবতার আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন—সেবা। এই সেবাব্রতকে আত্মোৎসর্গের দিক্ দিয়া জাতির কল্যাণকামনায় গ্রহণ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছেন—আমরা সেই উদীয়মান যুবক সম্প্রদায়কে সাদরে আহ্বান করিতেছি। যদি বাস্তবিকই এই বিগতভাগ্য, লুপ্তগৌরব জাতির জন্য কাহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়া থাকে, তবে এসো এই নবনির্ম্মিত প্রশস্ত রাজবর্ত্মে আমরা দৃঢ় অথচ ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হই। বিবিধ প্রকার বিকৃত পথে গিয়া আমরা অনেক শক্তিক্ষয় করিয়াছি। আমাদের শক্তি অল্প, অতএব অপব্যয় নিবারণ করিতেই হইবে।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য—আশে পাশে এই যে ম্রিয়মাণ মনুষ্যগুলি ব্যর্থতার উপর নিজের সমস্ত চেষ্টাকে নিক্ষেপ করিয়া গভীর নৈরাশ্যে মৃত্যুর আয়োজন করিতেছে—ইহাদিগকে খাদ্য দিয়া, বিদ্যা দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য আচার্য্যদেব চাহিয়াছিলেন এক সহস্র অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক যাহারা "ভগবানে বিশ্বাসিরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিবে—মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করিবে।"

আচার্য্যদেব জানিতেন, বর্ত্তমান সমাজ তাহার কতকগুলি অর্থহীন আচার নিয়ম লইয়া এই কার্য্যের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান হইবে। অজ্ঞ, ভণ্ড, আত্মাভিমানিগণ স্ব স্ব কল্পিত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য এই উদারহৃদয় সেবাব্রতিগণকে উপহাস করিবে, নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিবে। সেইজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ পথের সাধকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। ছুঁৎমার্গী গোঁড়াগণের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্কোচে উন্নত বক্ষেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে। আদর্শকে খাটো করিয়া কোন প্রকার আপোষের ভাব যেন বিন্দুমাত্রও

না থাকে। কারণ, সত্য ও লোকাচারের সহিত কোন প্রকার আপোষের চেষ্টাকেই তিনি কাপুরুষতা বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন।

অতএব একদিকে পাশ্চাত্যের বিচারশূন্য অন্ধ অনুকরণ, অপরদিকে কতকগুলি প্রাণহীন আচার নিয়মের বন্ধনে জড়িত হইয়া গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন—এতদুভয় পন্থাকে পরিহার করিয়া এক উন্নততর, স্বতন্ত্র আদর্শকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই আদর্শ আচার্য্যদেব পাইয়াছিলেন স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে—আর পাইয়াছিলেন যে সুপ্রাচীন সভ্যতার ক্রোড়ে তাঁহার জন্ম—যাহা একদিন অদ্বৈতসিংহনাদে সমস্ত প্রকার গণ্ডীর শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া মানবাত্মার অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল।

সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া হিন্দু সমাজকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ, তর্কযুক্তির দিক্ দিয়া দিব্যজ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রসমূহকে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ব্যায়ামভূমিতে পরিণত করিয়াছে। অধিকারবাদের দোহাই দিয়া উন্নত, উদার, জ্ঞানপ্রদ, বলপ্রদ তত্ত্বসমূহ মুষ্টিমেয় ব্যক্তি করায়ত্ত করিয়া সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছে। ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষকে পদদলিত করিয়াছে ও করিতেছে। এই জঘন্য হৃদয়হীনতার ফলস্বরূপ আজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ কোটী মনুষ্য আত্মবিশ্বাস হারাইয়া অজ্ঞতার গভীর পঙ্কে আবক্ষ নিমজ্জমান! জাতির এই মহাসঙ্কটকালে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

আর না—পঙ্গুর মত বসিয়া বসিয়া গিরিলঙ্ঘনের সোণার স্বপন আমরা বহুদিন দেখিতেছি, এবার সত্যই উঠিতে হইবে। পথ তো চিরদিনই ক্ষুরধার, দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ! উহাকে কুসুমাস্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র।

সমাজের সে শক্তি আর নাই। সমাজের চালক ব্রাহ্মণজাতি বহুদিন লুপ্ত হইয়াছেন—যাঁহারা ত্যাগ ও তপস্যার বলে সমাজকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জমাট কুসংস্কারের দুর্ব্বহভারপীড়িত সমাজের

অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অন্যায়রূপে বর্ত্তমান কালেও আপনাদিগকে সমাজের নেতা বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা এই হতভাগ্য জাতির পায়ে দেশাচার ও লোকাচারের শৃঙ্খলগুলি আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত! ধর্ম্মের আবরণে এই দুর্নীতি দেশের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে আমরা চাহি না। যাহা হইবার হইয়াছে, এবার সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই মানবাধিকারের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, যে নীতিসহায়ে এই নূতন সমাজ গঠিত হইবে তাহা যেন কোন প্রকার ধ্বংসমূলক না হয়; ইহা গড়িবার যুগ—ভাঙ্গিবার নয়! সাময়িক উত্তেজনায় যাঁহারা ধৈর্য্য হারাইয়া সমাজ ভাঙ্গিতে চাহেন, এবং স্বামিজীকেও উহার অনুমোদক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কার্য্যকালে বোধ হয় ভুলিয়া যান যে স্বামিজী পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"I have come to fulfil not to destroy."

গড়া কঠিন—ভাঙ্গা সহজ। সাম্যের নাম করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির নিন্দা করা সহজ—কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা আয়ত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ হওয়া কঠিন। এই সুকঠিন ব্রতকেই স্বামিজী নবযুগের কার্য্যপ্রণালী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। একদিকে আদর্শ ব্রাহ্মণ—অপর দিকে চণ্ডাল! এই চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে সমাজসংস্কার বা সমাজের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য অভিশাপবর্ষণকারী সংস্কারকের প্রয়োজন নাই। গালাগালি, পরস্পরের দোষ প্রদর্শন, নিন্দাবাদ যথেষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি সহায়ে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইয়া বিগত শতাব্দীর সংস্কার-যুগ মহাভ্রম করিয়াছিল। উহা আত্মকলহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পরবর্ত্তী বংশধরগণের জন্য এক লজ্জাকর পণ্ডশ্রমের অপবাদমলিন ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে, যাহা এখনও সময়ে সময়ে নবযুগের কর্ম্মীগণকে বিস্মিত সংশয়ে আকুল করিয়া তোলে! তবুও বিগত শতাব্দীর

সংস্কারকগণ ধন্য—কারণ তাঁহারা সত্যকে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরাজয় ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়াও তাহা অকুণ্ঠিত-চিত্তে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।* তাঁহারা নিশ্চিতই সাধু উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে গভীর দূরদৃষ্টি তাঁহাদিগের ছিল না বলিয়াই তাঁহারা ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই যে সমুদ্র-মন্থনে কেবল অমৃতই উঠে না—গরলও উঠে। গরল উঠিল! নব্য ভারতের সেই মহাদুর্দ্দিনে, জাতির কাতর ক্রন্দনে বিগলিতহৃদয় সমাধিব্যুত্থিত মহাযোগী দ্বিতীয় নীলকণ্ঠের মত "অভীঃ" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে গরলরাশি পান করিলেন! সঙ্গে সঙ্গে আসিল—নূতন তত্ত্ব, নূতন নীতি; আর মুষ্টিমেয় নূতনের দল। আসিল ত্যাগ ও তপস্যার শক্তি, আসিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন নিঃস্বার্থহৃদয় সেবকের দল।

সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতা বোধ হইতেছে। সূর্য্য উঠিয়াছে। হে নবযুগের মানব! হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া আর কতদিন আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? হে কূটবুদ্ধি রাজনৈতিক! স্তব্ধ হও। দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় উচ্চাধিকারলাভের স্বপ্ন দেখিয়া জাতিকে আর আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিবার জন্য আহ্বান করিও না। দাম্ভিক সমাজ সংস্কারক! তোমার জরাজীর্ণ সংস্কারপ্রস্তাবরূপ মলিন কন্থাখানি নাড়াচাড়া করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে তোমার লজ্জা হয় না! তুমি কি তোমার অতীত ইতিহাস পাঠ কর নাই—করিয়া বুঝ নাই, অথবা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই যে রাজনীতি বা সমাজনীতি সহায়ে ভারতবর্ষ উঠিবে না? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই ভারত আধ্যাত্মিকতাকেই জাতীয় জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছে—উহার পরিবর্ত্তে আপাতমনোরম রাজনীতি বা সমাজনীতিকে জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডরূপে নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র! তোমরা যথেষ্ট করিয়াছ, আর অনর্থক উত্তেজনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়া জাতীয় জীবন বিক্ষোভিত করিও না।

"ওঠো ভারত! তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়া সমস্ত জগৎ জয়

করিয়া ফেল—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি জগৎ জয় করিবে।" বীর সন্ন্যাসীর এ আহ্বান ও ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইবে না। তোমার আমার মত দুই চারি জনের ইহা ভাল লাগুক আর নাই লাগুক—ইহাই আদর্শ! কাহারও জন্য এই কার্য্য আটকাইয়া থাকিবে না ইহাও নিশ্চয়! এই যুগচক্রবিবর্ত্তনের অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

এই আধ্যাত্মিক জগৎ বিজয়ের জন্য আজ ভারতকে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। জাতির সর্ব্বাঙ্গে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য আমাদিগকে ত্রিশকোটী মানবের দৈহিক ও মানসিক অভাব পূরণ করিবার ভার লইতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য পাঠশালা, কারখানা, বক্তৃতা, পুস্তক, উদ্যম, উৎসাহ সব চাই—কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই একদল মানুষ—চাই একদল ত্যাগী সন্ন্যাসী। এই নবীন সন্ন্যাসিগণের আদর্শ থাকিবে ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শ—অদ্বৈতানুভূতি। কেবল উহা উপলব্ধি করিবার পন্থা হইবে স্বতন্ত্র! সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে অথবা সংসারের মধ্যেই কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতীত মহিমা স্মরণ করিয়া মৃত গরিমার ধ্বংসাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধাবিমিশ্র সম্ভ্রমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। অতীতকে আবার নূতন করিয়া বর্ত্তমানের বক্ষে গড়িয়া তুলিতে হইবে। লইয়া আইস প্রাচীনের গর্ভ হইতে সেই সাধকের ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা—সেই সংযমের শক্তি ও ত্যাগের মহিমা। এসো শত শত সংযতমনা ব্রহ্মচারি—ভারতের এই আধ্যাত্মিক আদর্শকে জীবনে পরিণত করিবার ব্রত গ্রহণ কর। তোমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠুক এক অসীম শ্রদ্ধায়—শ্রদ্ধা, যাহা একদিন দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে মৃত্যুর সম্মুখে নির্ভীক বিশ্বাসে দণ্ডায়মান হইবার প্রেরণা দিয়াছিল—শ্রদ্ধা, যাহা একদিন বেশ্যাপুত্রকেও প্রশংসনীয় আত্মচেতনায় দৃপ্ত করিয়া ঋষির পুণ্যাশ্রমে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিল! আজ সেই শ্রদ্ধাকে আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে।

এই শ্রদ্ধা ভাগ্যের ধিক্কার দলিত করিয়া একটা গৌরবময় ভবিষ্যতের সূচনা করিয়া দিবে।'

আমরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছি। দুর্ভিক্ষ ব্যাধিমড়কে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। পেটে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই! কোটী কোটী দেবঋষির বংশধরগণ পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে! কেন এমন হইল? ইহা কি বিধাতার ইচ্ছা? ক্ষমতামদগর্ব্বিত অহঙ্কারী অভিজাত-সম্প্রদায়! ভগবানের ইচ্ছার দোহাই দিয়া এই দুর্ব্বল জাতিকে পিষিয়া মারিতে চাও—পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিতে চাও! কেন তোমার এত ধৃষ্টতা? প্রজার শোণিতপুষ্ট জমীদার! তুমি সহরে বসিয়া জঘন্য বিলাসে কালযাপন করিবে—আর বলিবে যে প্রজা-রক্ষার ভার রাজা লইয়াছেন—আমরা কেবল শোষণ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিব! ম্রিয়মাণ ক্ষুধিত কৃষকের প্রাঙ্গণে ঋণপত্রহস্তে মহাজন দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অপমান করিবে—তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে—আর তুমি তাহার বিরুদ্ধে একটী অঙ্গুলীও তুলিবে না! তিল তিল করিয়া জাতি মরিতেছে—মরিবে! রক্ষা করিবেন গবর্ণমেণ্ট—আর তুমি লালসার অনলে মনুষ্যত্ব ও হৃদয় আহুতি দিয়া বিলাসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে? দ্বারদেশে জোড়করে দণ্ডায়মান আশ্রয়ভিখারী ঐ যে নারায়ণ—তাহাকে তুমি কুক্কুর শৃগালের মত অবজ্ঞাভরে তাড়াইয়া দিবে? কেহ কি একবার মুখ তুলিয়া ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না?

হে ধর্ম্ম প্রচারক! কোথায় ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবে? জাতিকে বাঁচাইয়া তোলো! সভা করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ, সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে মামুলী উচ্ছ্বাস বা অবজ্ঞাভরে দুই টাকা চাঁদা দিয়া এ মহাসমস্যার মীমাংসা হইবে না। ঐগুলির যে প্রয়োজন নাই তাহা আমরা বলিতেছি না—ও সমস্ত মামুলী ব্যাপার চলিতে থাকুক—এসো অপরদিকে নীরব কর্ম্মী—নির্ভীক সন্ন্যাসিগণ! এসো পদমর্য্যাদাহীন, স্বজাতিপ্রেমমাত্রসম্বল, উদারহৃদয় নবযুগের অগ্রগামী "নিরাশ সেনাদল"! দলে দলে বাঙ্গালার পল্লীশ্মশানে

বসিয়া শবসাধনা আরম্ভ কর। জাতির সম্মুখে এক দিব্য আদর্শ শত সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া জাগিয়া উঠুক। তমঃসমুদ্রে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারী শতাব্দীর জড়ত্বপাশ ছিন্ন করিয়া রজঃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক। খাদ্য, পানীয়, বসন, ভূষণ বিচিত্র বিলাস তাহারা নিজেরাই সৃষ্টি করিয়া লইবে। সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি লুপ্ত হয় নাই—তাহা জাগিয়া উঠিয়া নূতন সমাজ নবীন ভাবে গঠন করিয়া লইবে।

সাবধান সেবকগণ! সমাজে বিপ্লবের বহ্নি আর জ্বালাইয়া তুলও না। ঐ যে তোমাদের কার্য্যের পরিপন্থী স্বরূপ জনকয়েক পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুকে জড়ত্বের উপর সমাসীন দেখিতেছ—উহাদিগকে আঘাত করিও না! চলচ্ছক্তিহীন খঞ্জের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে সে কেবল আর্ত্তনাদ করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবে মাত্র—দণ্ডায়মান হইয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। থাকুক তাহার তাহদের সঙ্কীর্ণ কুসংস্কার লইয়া জড়পিণ্ডের মত অচল—তোমরা অগ্রসর হও। রজঃশক্তিদৃপ্ত বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপঃপ্রভাবে নূতন সৃষ্টিকে গড়িয়া তোল। ক্ষত্র-বীর্য্য ও ব্রহ্মতেজের সম্মিলনে গঠিতচরিত্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণ—যাও, গ্রামে গ্রামে গিয়া আচণ্ডালকে উপনিষদের অভয়বাণী শুনাও—তোমরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। শুনাও—হে মহাশক্তির সন্তান, হে প্রসুপ্ত সিংহ, জাগরিত হও। জাতির জীবনে আশার আকাঙ্ক্ষা, আত্মনির্ভরতা ফিরিয়া আসুক!

কালচক্রের বিবর্ত্তনে পৌরোহিত্য শক্তি ও অভিজাতসম্প্রদায়ের সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে—ইংরেজের আইন সমস্ত প্রকার বিশেষ অধিকারীর দাবী পিষিয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছে। এই শুভক্ষণে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে অনধিকারী বলিয়া ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষকে শাস্ত্রালোচনায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা! সমাজপতিগণের স্বার্থপরতায় চিরদিনের মত তাঁহাদের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছে। অন্তঃসারশূন্য বৃথা আস্ফালনে জাতিকে পদতলে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা! এখন দারিদ্র্য

আর্ত্ত, অস্পৃশ্য "নারায়ণ" জাগিবে—সমস্ত প্রকার গণ্ডীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া, সে আজ বিশ্বের জাতিসমাজে বরণীয় হইবে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ! হে নবযুগের মানব। বৃথা সন্দেহ, দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ইহা বিশ্বাস কর। মহা উদ্বোধনের আহ্বানদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে জাগরণের সুস্পষ্ট চাঞ্চল্য—এই পুণ্যলগ্নে বিলাসের ভিক্ষাভূষণ পদদলিত করিয়া, লইয়া আইস বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা—উগ্র, উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন সূর্য্যরশ্মির মত সরল ও নির্ম্মমভাবে সমাজের উপর পতিত হও। জ্ঞানের রুদ্রদণ্ড উদ্যত করিয়া দুর্নীতিকে তাড়না কর। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এমন এক চক্র প্রবর্ত্তন কর—যাহা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতের, সকল জাতির নরনারীর নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসকল বহন করিয়া লইয়া যাউক। বিবেকানন্দের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের কেন্দ্রীভূত জীবনগুলির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠুক! এসো কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া ব্রহ্মরুদ্রতালে, ভৈরবমন্ত্রে আমরাও গাহিয়া উঠি—

হে স্বামিন্ তুলে লও তোমার উদার জয় ভেরী
করহ আহ্বান!
আমরা দাড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ!
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার
উদ্দাম পথিক!
মুহূর্ত্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি;—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি!

শ্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ।

(শ্রীগোকুলদাস দে এম-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রমুখ শাক্যনারীদিগের সংঘে প্রবেশ করিবার প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর পরে সকলেই অর্হত্ব লাভ করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইলে এক দিন প্রজাবতী ভাবিলেন, আমি অতঃপর তথাগত বা তাঁহার কোন শিষ্যের পরিনির্ব্বাণ দেখিতে পারিব না। এক্ষণে সেই নরসারথির নিকট বিদায় লইয়া এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যশোধরা ও শাক্যবধূগণেরও তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুরূপ সংকল্প জন্মিল। অনন্তর তাঁহারা সকলে ভগবৎদর্শনে বিহার হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। পথিমধ্যে সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেই সংকল্প জ্ঞাত হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করিলে মহাপ্রজাবতী তাহাদের অশেষ ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজাবতী বলিলেন, "হে সুগত, সত্য বটে আমি তোমার মাতা তুমি আমার পুত্র, কিন্তু এক্ষণে তুমি পিতা হইয়াছ, আমি তোমার নিকট নবজীবন লাভ করিয়া তোমার কন্যা হইয়াছি। যেমন এক সময় আমি তোমায় স্তনপান করাইয়াছিলাম, তুমিও তেমন আমায় তদপেক্ষা অমূল্য ধর্ম্মামৃত পান করাইয়াছ। হে মহর্ষে, এক্ষণে তুমি মাতৃঋণ হইতে মুক্ত। রাজমাতা হওয়া বিশেষ দুর্লভ নহে কিন্তু বুদ্ধমাতা হওয়া বড়ই দুর্লভ। আমি সেই সুদুর্লভ মাতৃত্বলাভে ধন্য হইয়াছি। অর্হত্ব লাভ করিয়া আমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত। সর্ব্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া এক্ষণে তোমার আদেশে পরিনির্ব্বাণ কামনায় আমি এই শাক্যবধূদিগের সহিত তোমার নিকট উপস্থিত। হে মহাবীর, একবার তোমার পদপ্রান্তে নমস্কার করিব।" তথাগত সেই চক্রাঙ্কশোভিত পদযুগল অগ্রসর করিয়া দিলেন; প্রজাবতী

তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আদিত্য-পূর্ব্ব-কুলধ্বজ, হে নরসারথি, এই আমার শেষ জীবন। আর তোমায় নমস্কার করিবার অবসর পাইব না। স্ত্রীগণ চিরকালই অন্যায় করিয়া থাকে। করুণাময়, যদি আমার কিছু অন্যায় হইয়া থাকে এক্ষণে তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমার নিকট স্ত্রীজাতির প্রব্রজ্যা ভিক্ষা করিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি; আমার সেই দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমারই আজ্ঞায় ভিক্ষুণীদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছি; যদি তাঁহাতে কিছু ত্রুটি হইয়াথাকে আমায় ক্ষমা করিবে।" ভগবান্ কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "মাতঃ আপনি কি বলিতেছেন? যাহারা অন্যায় করিয়া ক্ষমা চাহে না তাহাদিগকেও ক্ষমা করা উচিত। পরিনির্ব্বাণোন্মুখা মহাগুণবতী আপনাকে আমি কি উত্তর প্রদান করিব। আপনি চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রভাতের দুর্য্যোগ কল্পনা করিয়া তারাগণের সহিত চলিয়া যাইতেছেন, আমার বলিবার কিছুই নাই।" প্রজাবতীর প্রণামের পর অপর শাক্যবধূগণও সেই হিমাচলসদৃশ ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। আবার প্রজাবতী বলিলেন, "হে লোকপাল, আমার চিত্ত তোমার ধর্ম্ম পান করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে কিন্তু তোমার দর্শনে ও মধুর বাক্য শ্রবণে আমার চক্ষু ও শ্রোত্রের পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে না। যাহারা তোমায় দেখিবে, তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিবে, তোমার ধর্ম্ম শুনিয়া শান্তিলাভ করিবে তাহারা ধন্য।"—তারপর তিনি আনন্দ প্রমুখ ভিক্ষুদিগের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে আনন্দ নিরানন্দ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোতমী আনন্দকে বুঝাইতে লাগিলেন, "হে বুদ্ধসেবী শ্রুতিসাগরগম্ভীর আনন্দ, আমার এই মহা সুদিনে তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যে আচার্য্যকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ দেখিতে পায় নাই তোমরা তাঁহার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেছ। তিনি তোমাদিগকে জরা, ব্যাধি মরণরূপ মহাদুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমিও সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া এক্ষণে

সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে গমন করিব যেখানে চক্ষু গমন করিতে পারে না। এক সময় আমি তথাগতকে অনুকম্পাপ্রযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলাম, "হে মহাবীর ঋষিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোকের হিতের জন্য তুমি অজর অমর হইয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাক।" তিনি আমায় উত্তর দিয়াছিলেন; "মাতঃ বুদ্ধদিগকে এরূপ বাক্যে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন না, ইহা তাঁহাদের স্তুতিবাক্য নহে।" তাহা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন,

"আরদ্ধবিরিয়ে পহিততে নিচ্চং দলপরক্কমে।
সমগ্‌গে সাবকে পস্‌স এসা বুদ্ধান বন্দনা॥"

"বীর্য্যমান্ সংযতাত্মা স্বকার্য্যসাধনে দৃঢ়পরাক্রমশালী সমস্ত শিষ্য-মণ্ডলীকে ধর্ম্মমার্গে সহায়তা কর ইহাই বুদ্ধের একমাত্র বন্দনা।" গৌতমী এইরূপে আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া তথাগতের নিকট পরি-নির্ব্বাণের অনুমতি লইলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে তিনি নিজ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অন্য অন্য শাক্য নারীগণও তথাগতের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পরিনির্ব্বাণের অনুমতি লইলেন। বিদায়কালে গৌতমী অশ্রুপূর্ণনেত্রে করুণাকরকে বলিলেন, 'হে লোকনাথ, তোমায় এই শেষ দেখা দেখিলাম। হে অমৃতাকার, আজ আমার সকল সংস্কার পরিনির্ব্বাণে সমাপ্ত হইবে, আর তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব না!' ভগবান্ বলিলেন, 'মাতঃ, আপনার সত্য উপলব্ধি হইয়াছে, রূপ দর্শন করিবার জন্য কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন? যাহা কিছু গঠিত হইয়াছে তৎ সমস্তই অনিত্য জানিবেন।' অনন্তর গৌতমী সেই শাক্য নারীদিগের সহিত কুটাগারে গমন করিয়া ধ্যানযোগে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহারাও সেই চন্দ্রের সহিত তারাগণের ন্যায় অস্তগমন করিলেন। মাতা ও শাক্য নারীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তথাগত শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার স্বল্পকাল পরে কপিলবস্তুতে আর এক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। বুদ্ধশিষ্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতের বংশের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য এক শাক্য-কন্যার পাণিপ্রার্থনা করেন। শাক্যরাজ মহানাম জন্মতত্ত্ব গোপন করিয়া দাসী-গর্ভজাত স্বীয় কন্যা বাসবক্ষত্রিয়াকে রাজসন্নিধানে পাঠাইয়া দেন। কৌশলরাজ তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করেন। এই পরিণয় ফলে কুমার বৈদূর্য্যের জন্ম হয়। রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মাতুলালয় কপিলভূমি দর্শন করিতে গমন করিলে মাতার জন্মতত্ত্ব সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ে। দারুণ লজ্জায় ও ক্ষোভে রাজা বাসবক্ষত্রিয়া এবং বৈদূর্য্যকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রাবস্তীতে। তিনি পরম ভক্ত রাজার মানসিক দুরবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া অনাহূতভাবে তাঁহার প্রাসাদে অতিথি হইলেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের উদাহরণ দিয়া রাজাকে বুঝাইয়া পুনরায় পরিত্যক্ত পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করাইলেন।

কিছুদিন পরে প্রসেনজিৎ বৈদূর্য্যের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া কপিলবস্তু দর্শনে যাত্রা করেন। তখন লব্ধসুযোগ বৈদূর্য্য পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া শাক্যদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যখন তিনি সসৈন্যে কপিলবস্তুর দিকে আসিতেছিলেন, তখন দেখিলেন তথাগত তাঁহার রাজ্যান্তর্গত সুশীতল ছায়াময় বৃহৎ বটবৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অদূরে কপিলবস্তুর সীমায় আতপে একাকী বসিয়া আছেন। বৈদূর্য্য নিঃসঙ্গ হইয়া তথাগতের নিকট আসিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তথাগত উত্তর দিলেন, 'তোমার রাজ্যের বৃক্ষের অপেক্ষা আমার জ্ঞাতিগণের ছায়া সুশীতল, তাই আমি সেই ছায়ায় বসিয়া আছি।' জ্ঞাতিগণের উপর যোগীবরের অপূর্ব্ব ভালবাসা দেখিয়া বৈদূর্য্য তখনি কোশলে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ তিন বার সসৈন্যে অভিযান করিয়া তিন বারই তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বৈদূর্য্য ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। প্রসেনজিৎ কুমারের সেই আচরণে যারপরনাই ভীত হইয়া অজাতশত্রুর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে মগধে আসেন কিন্তু পীড়িত হইয়া অচিরে দেহত্যাগ করেন।

যখন ভগবান্ এইরূপে তাঁহার শাক্যদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বার বার রক্ষা করিতে যত্নবান্ ছিলেন তখন সেই শাক্যগণ কর্ম্ম-বিপাকে নীচপ্রবৃত্তিক হইয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মজগৎ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করতঃ তাঁহার রক্ষণশক্তির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। শাক্যদিগের কৌমার-বৈরাগ্যবান্ যুবকগণ সকলেই ইতিপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়া অমৃতরাজ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লইয়াছেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণও মহাপ্রজাবতীর সহিত ভিক্ষুণী হইয়া এক্ষণে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত। কুলে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্রমে স্বার্থান্ধ ও হিংসাদ্বেষপূর্ণ হইয়া পাপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ দেখিলেন শাক্যগণ পূর্ব্ব সংস্কার বশে নদীতে বিষ নিক্ষেপ করিয়া আপনা আপনি সমূলে ধ্বংস হইবার চরম উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তাঁহাদের সেই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল কর্ম্মবাদী তথাগত কিছুতেই অপসারিত করিতে পারিলেন না এবং দূরত্ব হেতু বৈদূর্য্যকে ক্ষান্ত করিতে তাঁহার যাওয়া হইল না। বৈদূর্য্য চতুর্থবার সসৈন্যে কপিলবস্তুর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তথাগতকে পূর্ব্ববৎ দেখিতে না পাইয়া শাক্যস্থানে প্রবেশ করিলেন এবং মাতামহ মহানাম ও যাঁহারা শাক্যনাম ত্যাগ করিয়া তৃণ বা নলশাক্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়া সমস্ত শাক্যবংশ ধ্বংস করিলেন। কিন্তু এই মহাপাপের ফল বৈদূর্য্য এড়াইতে পারিলেন না। ফিরিয়া আসিবার সময় অচিরবতীর প্রবল বন্যায় তিনি সসৈন্যে বিনষ্ট হইলেন।

শাক্যবংশ ধ্বংসের পর তথাগতের কোমল হৃদয় কি বিষম আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এতদিন ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছিলেন ঐ ঘটনার অল্পকাল পরেই তিনি আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, যেরূপ জীর্ণশকট বহু সংস্কার করিয়া অতি সন্তর্পণে চালাইতে হয়, সেইরূপ তথাগত তাঁহার জরাগ্রস্ত দেহশকটকেও সমধিক চেষ্টায় চালিত করিতেছেন।" সত্য বটে, তাঁহার এক্ষণে অশীতি বৎসর বয়স হইয়াছিল। কিন্তু

সেকালের পক্ষে তাহা বেশী বয়স নহে। তখন লোকে সাধারণতঃ শত বা শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিত। রাজা শুদ্ধোদন শত বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মহা প্রজাবতী গোতমীও শতাধিক বর্ষ জীবিতা ছিলেন। ভিক্ষুগণের মধ্যে অনেকেই নিরতিশয় দীর্ঘায়ু। সুতরাং তথাগতের পক্ষে অশীতি বৎসর বেশী নহে। তাঁহার মন যতই দৃঢ় হউক না কেন তাঁহার স্নেহপূর্ণ প্রাণ কুসুমাপেক্ষাও কোমল ছিল। পিতা গত, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি শাক্যনারীগণও পূর্ব্বে নির্ব্বাণ গতা, তাহার পর আত্মীয়গণও সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত, শাক্যবংশ ধ্বংসপ্রায় এ সকল কারণ অলক্ষ্যে তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে বেদনা সঞ্চার করিতেছিল। বোধ হয় তিনিও স্ববংশ নাশের পর যদু-কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লীলাসংবরণের চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় সেই ক্রুর ব্যাধের ন্যায়ই অন্তক মার আসিয়া একদিন তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিল, "ভগবন্, এখন আপনার ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকাগণ সকলেই ধর্ম্মদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম হইয়া আপনার ধর্ম্মকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ, কার্য্যও সমাপ্ত। এক্ষণে আপনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউন।" ভগবান্ বলিলেন, "হে পাপাত্মক, তুমি নিশ্চিন্ত হও, অদ্য হইতে তিন মাসের পর তথাগতের পরিনির্ব্বাণ ঘটিবে।" মার আনন্দে প্রস্থান করিল।

উহার ঠিক তিন মাস পরে চুন্দ কর্ম্মকারের শেষ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ জন্মভূমির সন্নিকটস্থ কুশী নগরীতে মল্লদিগের যমজ শালবৃক্ষান্তরে তদীয় জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় উপাধিহীন পরি-নির্ব্বাণলাভ করিলেন। পাছে ভবিষ্যতে চুন্দের অখ্যাতি হয় এইজন্য করুণাময় দেহত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, আনন্দ, দুইটী ভোজ অন্যগুলি অপেক্ষা মহা পুণ্যতর ও মহা ফলদায়ক জানিবে। প্রথম সুজাতার দত্ত পায়সান্ন—যাহা ভক্ষণ করিয়া তথাগত বহুকালবাঞ্ছিত বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় চুন্দের প্রদত্ত ভোজ্য—যাহা গ্রহণান্তে আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠবস্তু পরিনির্ব্বাণ লাভে তাঁহার

নশ্বর জীবন গত হইবে।" এই বাক্যের দ্বারা আরও বোধ হয়, তথাগত তাঁহার পরিনির্ব্বাণান্তে শোক না করিয়া সকলকে আনন্দিত হইতেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। অতঃপর মল্লেরা আসিয়া তাঁহার পূত দেহের চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত সহকারে সপ্তাহকাল উৎসব করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় মহা সমারোহে উহার সৎকার করিল। সসংঘ মহাকাশ্যপ আসিয়া তাঁহার পাদমূলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলে চিতা আপনি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে দেবগণ বারিবর্ষণে সেই প্রজ্জ্বলিত চিতা নির্ব্বাপিত করিলেন। তথাগতের শেষ বাণী—

'বয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।'

—জগতের সমস্ত বস্তু অনিত্য, অতএব অপ্রমত্ত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ লাভ করিবে।'

দীপ নির্ব্বাণ হইতে দেখিয়া নির্ব্বাণ শব্দ শ্রবণ মাত্রে আমরা শিহরিয়া উঠি। কিন্তু তথাগতের নির্ব্বাণ আত্মার নির্ব্বাণ নহে—তাহা কামকাঞ্চনাসক্তির নির্ব্বাণ, অশেষবিধ অমঙ্গলজননী বাসনার নির্ব্বাণ, যাহা কিছু হীন হেয় ইতরজনসুলভ সেই বিলাসতৃষ্ণার নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই হিন্দুর জীবন্মুক্তি। মহাপ্রাণ তথাগত স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সেই পরমপদপ্রাপ্তির যে চরম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা কঠোর আত্মনির্য্যাতন ও নিরতিশয় বিলাস-ভোগের মধ্যপথ। এই নির্ব্বাণ কি নিরীশ্বর নাস্তিকের নিঃশেষ নিরস্তিত্ব অবস্থা? তথাগত নাস্তিক নহেন, তিনি উদানগাথায় উজ্জ্বল অবিনশ্বর বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, এমন এক বস্তু আছে যাহা অজাত, অভূত, অকৃত ও অসংস্কৃত, এবং চরমে এই পরম বস্তু আছে বলিয়াই মানবের মুক্তির পরিকল্পনা ও সম্ভাবনা। এই পরি-নির্ব্বাণ-মুক্তির অবস্থা কিরূপ তথাগত তৎসম্বন্ধে আভাস দিয়া বলিয়াছেন—

'যত্থ আপো চ পঠবী তেজো বায়ো ন গাধতি।'

যথায় পৃথিবী অপ্ তেজ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না।

'ন তথ সুরিয়া জোতন্তি আদিচ্চো ন প্রকাসতি
ন তথ চন্দিমা ভাতি তমো তথ ন বিজ্জতি ;
যদা চ অত্তনা বেদি মুনি মোনেন ব্রাহ্মণো
অথ রূপা অরূপা চ সুখ দুক্খা পমুচ্চতি।'

তথায় সূর্য্যের জ্যোতি নাই, চন্দ্রের দীপ্তি নাই, বহ্নির ভাতি নাই এবং অন্ধকারেরও একান্ত অভাব। নিরালোক, নিরন্ধকার, রূপ, অরূপ, সুখ, দুঃখ বিরহিত অবস্থা একমাত্র 'মুনিগণেরই' ধ্যানগম্য।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যমুনি-বিরচিত

জীবন্মুক্তি বিবেক।

প্রথম প্রকরণ।

জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ।

পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

...বেদসমূহ যাঁহার নিশ্বাস স্বরূপ (১), যিনি বেদসমূহ হইতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন (২), আমি সেই বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরকে (৩) বন্দনা করিতেছি।

(১) "আর্দ্রকাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম, (অর্থাৎ ধূম স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি) নির্গত হয়, হে মৈত্রেয়ি, তদ্রূপ এই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মেরও ইহা নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় তাঁহা হইতে অযত্নপ্রসূত—'ইহা' অর্থাৎ যাহা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদি শাস্ত্র), উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান বা অর্থবাদ বাক্য—এ সমস্ত নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত।" (বৃ—২।৪।১)

(২) "তিনি 'ভূঃ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি।' (তৈ-ব্রা, ২।২।৪।২)। মনু বলিতেছেন—(১।২১) তিনি আদিতে এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদ শব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য—১।৩।২৮)

(৩) সকল বিদ্যার উপদেষ্টা পরমেশ্বরকে এবং স্বকীয় গুরু 'বিদ্যাতীর্থ'কে।

২। বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ সন্ন্যাস এই দুয়ের প্রভেদ দেখাইয়া আমি উভয়ের বর্ণনা করিব। এই দুই (সন্ন্যাস) যথাক্রমে বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তির কারণ।

৩। সন্ন্যাসের কারণ বৈরাগ্য। "যে দিনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিনই গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। ("যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"—জাবাল উপ, ৪) এই বেদবাক্য হইতে (তাহা জানা যাইতেছে)। কিন্তু বৈরাগ্যের বিভাগ পুরাণ (৪) হইতে পাওয়া যায়।

৪। বৈরাগ্য দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা তীব্র এবং তীব্রতর। তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী (গৃহস্থাদি অধিকারী) "কুটীচক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে (তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিবেন অথবা যদি সামর্থ্য থাকে তবে "বহূদক" নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে তাহাই করিবেন। আর তীব্রতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে সন্ন্যাসপূর্ব্বক, হংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে, (বিরুদ্ধ কর্ম্মাদি) ত্যাগ করিবেন। কিন্তু যিনি মোক্ষকামী তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাক্ষাৎ উপায়স্বরূপ পরমহংস নামক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে (তদ্বিরুদ্ধাচরণ) পরিত্যাগ করিবেন।

৬। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে "সংসারকে ধিক্" এই প্রকার যে চিত্তের সাময়িক (অস্থায়ী) অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাই মন্দ বৈরাগ্য।

বিদ্যাতীর্থ ইঁহার গুরু এবং ভারতীতীর্থ ইঁহার পরম গুরু—ইহার ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম-বিরচিত 'পারাশর মাধব' হইতে জানা যায়। যথা—

"লক্ত্বামাকলয়ন্ প্রভাবলহরীঃ শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্।"

(৪) যথা মহাভারতে—

"চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ।"

৭। এই জন্মে (৫) যেন আমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি না হয়, এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় যুক্ত যে বুদ্ধি তাহাই তীব্র বৈরাগ্য।

৮। যে লোকে গমন করিলে এই সংসারে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এই প্রকার বুদ্ধির (দৃঢ় ইচ্ছার) নাম তীব্রতর বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্যে কোন প্রকার সন্ন্যাসের বিধান নাই।

৯। তীব্র বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে, ভ্রমণাদির (৬) সামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা, এবং তাহার সামর্থ্য থাকিলে বহূদক সন্ন্যাসের ব্যবস্থা। এই উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডধারী।

১০। তীব্রতর বৈরাগ্যে যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও মোক্ষপ্রাপ্তি এই দুই প্রকার ফলভেদমূলক। হংস সন্ন্যাসী ব্রহ্ম লোকে যাইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন (কিন্তু) পরমহংস সন্ন্যাসী ইহলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন।

১১। এই সকল সন্ন্যাসের আচার ব্যবহার পারাশর স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। ব্যাখ্যান গ্রন্থে আমরা (কেবল) পরমহংসের অবস্থার বিচার করিতেছি।

১২। (ঋষিগণ) বলেন, পরমহংস দুই প্রকারের হয়; এক জিজ্ঞাসু, অপর জ্ঞানবান্। বাজসনেয়িগণ (শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকপাঠিগণ) বলেন, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাস করিতে পারেন। (যথা, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি")।

১৩। এই (আত্ম) লোক ইচ্ছা করিয়াই (লাভ করিবার জন্য) সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(৫) এই তীব্র বৈরাগ্য নিত্যানিত্যবিচারজনিত নহে। কেননা তাহা হইলে বলিতেন, 'আর কখনও অর্থাৎ ইহজন্মে বা জন্মান্তরে'।

(৬) তীর্থযাত্রা, স্বজন ভিন্ন অপরের নিকট ভিক্ষা করা ইত্যাদি।

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। যাঁহাদের বুদ্ধি দুর্ব্বল তাঁহাদের (বুঝিবার সুবিধার) জন্য আমরা এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ গদ্যে বলিব।

লোক দুই প্রকার; আত্মলোক ও অনাত্মলোক। তন্মধ্যে অনাত্ম (৭) লোক তিন প্রকার; ইহা বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। যথা—

"অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি। সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্ম্মণা কর্ম্মণা পিতৃ-লোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।"

অথ শব্দের দ্বারা বাক্যারম্ভ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১।৫।১৬) বলিতেছেন, লোক তিনটী, বৈ নহে, যথা—মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। তন্মধ্যে এই মনুষ্যলোক পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়, অন্য কর্ম্মের দ্বারা নহে, কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক (জয় করা যায়), বিদ্যা (উপাসনা দ্বারা দেবলোক জয় করা যায়। সেই স্থলেই (বৃহ ; ১।৪।১৫ আত্মলোকের কথা শুনা যায়, যথা—

"যো হ বা অস্মাল্লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি"—যে কেহ আত্মলোক দর্শন না করিয়া এই লোক হইতে গমন করেন (মরেন), এই আত্মলোক (পরমাত্মা) (তাহার নিকট) অবিদিত থাকিয়া তাঁহাকে (শোক মোহাদি হইতে) রক্ষা করেন না।

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে"—(বৃহ ১।৪।১৫, আত্মলোকেরই উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি আত্মলোকেরই উপাসনা করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

[(প্রথম শ্রুতি বাক্যের অর্থ এই)—যে ব্যক্তি মাংসাদির পিণ্ড স্বরূপ এই লোক হইতে পরমাত্মা নামক আত্মলোক (অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ) না জানিয়া দেহ ত্যাগ করে, আত্মলোক বা পরমাত্মা অবিদিত অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা ব্যবহিত (অন্তর্হিত) থাকিয়া সেই আত্মলোক-জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে মরণান্তর শোক

(৭) আনন্দাশ্রমের দুই প্রকার সংস্করণেই এস্থলে পাঠের ভুল আছে।

মোহাদি দোষ দুরীকরণ দ্বারা রক্ষা করেন না। (দ্বিতীয় শ্রুতি বাক্যের অর্থ বলিতেছেন যে) তাহার অর্থাৎ সেই উপাসকের কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ একটী মাত্র ফল দান করিয়া বিনাশোন্মুখ হয় না অর্থাৎ বাঞ্ছিত সমস্ত ফল এবং মোক্ষও প্রদান করিয়া থাকে।]* (৮) (উক্ত ব্রাহ্মণের) ষষ্ঠাধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে—"কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থং বয়ং যক্ষ্যামহে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি" (বৃহ ৪।৪।২২) "যে প্রজামীষিরে তে শ্মশানানি ভেজিরে। যে প্রজা নেষিরে তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে"—কোন্ প্রয়োজনে আমরা বেদাধ্যায়ন করিব? কোন প্রয়োজনে আমরা যজ্ঞ করিব? যে আমাদিগের এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই লোক বা পুরুষার্থ, সেই আমরা পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যাহারা পুত্রলাভের ইচ্ছা করে তাহারাই শ্মশান (পুনর্জন্মনিবন্ধন মরণযন্ত্রনা) ভোগ করে। যাহারা পুত্র ইচ্ছা করে না তাহারা নিশ্চয়ই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে (উল্লিখিত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪'৪ ২২ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি") "এই লোক ইচ্ছা করিয়াই সন্ন্যাসিগণ গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন" এই বাক্যে "এই লোক' দ্বারা আত্মলোক উদ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝা যায়। কারণ, (তথায় বৃহদারণ্যকের জ্যোতির্ব্রাহ্মণে) 'স বাএষ মহানজ আত্মা"—"সেই জীবই এই জন্মরহিত পরমাত্মা" এই সকল শব্দের দ্বারা কথার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাঁর মধ্যে "এই" এই শব্দের দ্বারা আত্মাই সূচিত হইয়াছে। যাহা লোকিত বা অনুভূত হয় 'লোক' শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ("আত্মানুভবমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি") "আত্মানুভব ইচ্ছা করিয়াই তাহারা প্রব্রজ্যা বা গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন" ইহাই পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিয়া নির্ণীত হইল। স্মৃতিতেও আছে—

* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

(৮) ভাষ্যকার বলেন—তাহার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, কারণ, তাহার এমন কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, যাহার ক্ষয় হইবে। "কর্ম্মক্ষয় হয় না" কথাটি সিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র।

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায় পরমহংসসমাহ্বয়ঃ।
শান্তিদান্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতো ভবেৎ॥"

"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের নিমিত্ত পরমহংস নামক (সন্ন্যাসী) শম (মানসিক স্থৈর্য্য), দম (ইন্দ্রিয়সংযম) প্রভৃতি সকল সাধন সম্পন্ন হইবেন।"

বিবিদিষা সন্ন্যাস।

এ জন্মে বা জন্মান্তরে বেদাধ্যয়নাদি (কর্ম্ম) যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে যে আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মে তাহার নাম বিবিদিষা। সেই বিবিদিষা বশতঃ যে সন্ন্যাস সম্পাদিত হয় তাহাকে বিবিদিষা সন্ন্যাস বলে। এই বিবিদিষা সন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের হেতু। সন্ন্যাস দুই প্রকার। (১) যে সকল কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিলে জন্মান্তর লাভ করিতে হয়, সেই সকল কাম্যকর্ম্মের ত্যাগমাত্রই এক প্রকার সন্ন্যাস। আর প্রৈষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাস।

["পুংজন্ম লভতে মাতা পত্নী চ প্রেষমাত্রতঃ।
ব্রহ্ম নষ্টং সুশীলশ্চ জ্ঞানং চৈতৎপ্রভাবতঃ॥"

(সন্ন্যাসীকৃত) কেবলমাত্র প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ করিবার প্রভাবে তাহার জননী ও পত্নী পুরুষ হইয়া জন্মলাভ করেন। এবং সেই সুশীল ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী (তৎপ্রভাবে) যে ব্রহ্ম এতদিন তাহার নিকট অদৃশ্য অর্থাৎ অবিজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহার দর্শনলাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করেন]*

তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে ত্যাগের কথা শুনা যায় (ত্যাগের ব্যবস্থা আছে) যথা কৈবল্য উপনিষদে, ৪র্থ কণ্ডিকায় এবং মহা-নারায়ণোপনিষদে ১৬।৫—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ" ইতি। "মহাত্মগণ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—কর্ম্মের দ্বারা বা পুত্রাদি দ্বারা বা ধন দ্বারা নহে"। এই প্রকার ত্যাগ করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগেরও আছে। (মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের যে চতুর্ধরীকৃত টীকা আছে,

* এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

তাহাতে সুলভা-জনক-সংবাদে লিখিত আছে—মোক্ষধর্ম্ম (৩২০।৭) টীকা—["ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাগ্বিবাহাদ্বা বৈধব্যাদূর্দ্ধং সন্ন্যাসেঽধিকারোঽস্তি।" "ভিক্ষুকী" এ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পূর্ব্বে এবং বৈধব্যের পরে সন্ন্যাসে অধিকার আছে। সেই সন্ন্যাসানুসারে ভিক্ষাচর্য্য, মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ, এবং একান্তে আত্মধ্যান করা তাহাদের কর্ত্তব্য, এবং ত্রিদণ্ডাদির ধারণও কর্ত্তব্য। শারীরক ভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদে (১) (৩৬ সংখ্যক সূত্র হইতে পরবর্ত্তী কয়েক সূত্র পর্য্যন্ত) দেবারাধনায় অধিকার থাকা হেতু, বিধুরের (ব্রহ্মবিদ্যায়ও) অধিকার প্রতিপাদন প্রসঙ্গে বাচক্নবী ইত্যাদির নাম শুনা যায়।] + অতএব (নিম্নলিখিত) মৈত্রেয়ীবাক্য পঠিত হইযা থাকে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহি।" (বৃহ,২।৪।৩) "যে বিত্ত অথবা বিত্তসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা আমার অমৃতা হওয়া সম্ভবে না, তাহা দ্বারা আমি কি করিব? ভগবন্ আপনি যাহা (অমৃতত্বসাধন বলিয়া) জানেন, তাহাই আমাকে বলুন "

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিগণ কোনও কারণ বশতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অসমর্থ হইলে তাঁহাদের পক্ষে স্বকীয় আশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগ করিবার পক্ষেও কোন বাধা নাই। যেহেতু শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ সমূহে এবং ইহ সংসারেও সেই প্রকার অনেক তত্ত্ববিদ্ বা জ্ঞানী দেখিতে

(১) শারীরক ভাষ্য (৩।৪।৩৬)

"বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাং চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাম্"।

"সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্যাপন করিয়াছে, অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই, কি বনব্রজ্যাদি করে নাই এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে।" (৺কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত টীকা, ৪৭৭ পৃঃ বেদান্তদর্শন)

+ এই অংশ কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করেন।

পাওয়া যায়। দণ্ডধারণাদিরূপ যে পরমহংসাশ্রম তত্ত্বজ্ঞানলাভের কারণ; তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিবিধপ্রকারে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু তাহার বর্ণনা করিতে বিরত হইলাম।

ইতি বিবিদিষা সন্ন্যাস।

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের

কার্য্যবিবরণী (১৯১৬-১৯১৮ খৃঃ)।

ভারত ও পাশ্চাত্যের বিদ্যা সমূহের একত্র সমাবেশে অভিনব জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষাদানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগের মধ্যে চিন্তাশীলতা ও সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন বৃদ্ধি করাই বর্ত্তমান কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। আচার, সংযম, সদাচার, ধ্যানপরতা প্রভৃতি জাতীয় সদ্‌গুণ সমূহ না হারাইয়া ছাত্রীগণ যাহাতে কর্ম্মতৎপর এবং নরনারীর সেবাতে আত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করে এই ভাবে তাহাদিগকে গঠন করা এই কার্য্যের অন্যতম লক্ষ্য।

ভারতের এবং পাশ্চাত্যের বিদ্যাসকলের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা-সম্পন্ন থাকিয়া উভয়ের একত্র সমাবেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ভাবে কলিকাতায় ১৭ নং বসুপাড়া লেনস্থ বিবেকানন্দ-পুরস্ত্রী-শিক্ষা ও নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয় পঞ্চদশ বর্ষেরও অধিককাল বঙ্গীয় মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করিয়া আসিয়াছে। মাতৃমন্দির নামধেয় ঐ কার্য্যের এক নূতন বিভাগও চারি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাপ্রাণ স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের প্রেরণা ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ কার্য্যের প্রতিষ্ঠাত্রীদ্বয় স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীমতী ক্রিষ্টিনা দীর্ঘকাল কঠোর আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় প্রদর্শনপূর্ব্বক যেরূপে একজন পরলোকে এবং অন্যজন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কিয়ৎকালের জন্য আমেরিকায় গমন করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছি। অতএব বিগত তিন বৎসরে

(১৯১৬—১৯১৮ খৃঃ) ঐ কার্য্য উহার প্রত্যেক বিভাগে কিরূপ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাই সম্প্রতি আলোচনা করা যাইতেছে।

বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রীশিক্ষা বিভাগদ্বয়ের উদ্দেশ্য—

(১ম) ভারত ও পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত বিদ্যা সকলের একত্র সমাবেশপূর্ব্বক আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির উপযোগী নবীন প্রণালীতে ছাত্রীদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাহাতে তাহারা প্রয়োজনীয় বিদ্যা সকলের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে সুসংযতা ও চরিত্রবতী হইয়া উঠিবে এবং চিন্তাশীলতা দ্বারা সর্ব্বদা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা বিধানে স্বয়ং সমর্থা হইবে।

(২য়) ছাত্রীদিগের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পদ্ রক্ষাপূর্ব্বক এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা নিজ জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়া উহার সেবায় আত্মনিবেদনে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে।

উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরিচালনা—

শ্রীমতী সুধীরা বসু প্রমুখা যে সকল শিক্ষয়িত্রীর হস্তে কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক ভগিনী ক্রিষ্টিনা গত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রষ্টিবর্গের সহযোগে গত তিন বৎসর এই কার্য্যবিভাগদ্বয় চালাইয়া আসিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা—

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় বিভাগে ১৫০ জন ছাত্রী এবং তাহাদের দৈনিক উপস্থিতি গড়পড়তায় ১৩০ ছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঐ সংখ্যা ২০০ পরিণত হয়। তদবধি এখন পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা প্রায় ঐরূপই রহিয়াছে। কারণ, বর্ত্তমান বাটীতে উহার অধিক একজন ছাত্রী লওয়াও সম্ভবপর নহে।

ছাত্রীসংখ্যার ঐরূপ বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অর্থাভাবে নিকটবর্ত্তী অন্য একখানি বাটী ভাড়া লইবারও কর্ত্তৃপক্ষগণের সামর্থ্য না থাকায় ছাত্রীগণকে বিভাগপূর্ব্বক প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত, প্রতিদিন দুইবার বিদ্যালয়

করার পরামর্শ পরিণামে স্থির হয়; এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে এখন পর্য্যন্ত ঐরূপ করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর এক বিভাগের ছাত্রীগণ উহার প্রাতের অধিবেশনে এবং তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় বিভাগ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণ বিদ্যালয়ের অপরাহ্ণের অধিবেশনে শিক্ষালাভ করিতেছে।

পুরস্ত্রী-শিক্ষাকার্য্যের শ্রেণী বিভাগ।

উক্ত কার্য্যের দুইটি শ্রেণী বিভাগের কথা আমরা পূর্ব্ব-বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আবশ্যক হওয়ায় ১৯১৬ খ্রীঃ হইতে উহাতেও একটি শ্রেণী বাড়াইতে হইয়াছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার প্রথম শ্রেণীতে ৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৮ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ছাত্রী সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ জন।

পুরস্ত্রী শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে বিদ্যালয়ের শ্রেণী সকলে বালিকাগণের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পাঠ্য বিষয় ঐ শ্রেণী সকলের পাঠ্য বিষয়ের সহিত সমসমান। উহার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীগণ ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রী হইবার উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন। এই শ্রেণীতে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জীবনবিদ্যা, চিত্রকলা ও শিক্ষাদান প্রণালী শিখান হইয়া থাকে। এই বিভাগেরই ১০ জন ছাত্রী পাঠন প্রণালীতে অভ্যস্ত হইবার জন্য নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শ্রেণী সকলের দৈনন্দিন শিক্ষা প্রদান কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। পুরস্ত্রী শিক্ষার তৃতীয় শ্রেণীতে কেবলমাত্র জীবনবিদ্যা ও সূচীশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আট জন মহিলা এই শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন।

শিক্ষাকার্য্যের অর্থাগমের উপায় সমূহ—

(১ম) আমেরিকার যুক্তরাজ্য নিবাসী জনৈক বন্ধু প্রেরিত সাহায্য

(২য়) ভারতবাসী বন্ধুবর্গের নিকট সংগৃহীত চাঁদা।

(৩য়) শিক্ষাকার্য্যের জন্য প্রদত্ত এবং উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রমুখ কয়েক জন গ্রন্থকার লিখিত পুস্তিকা সকলের এবং সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত কয়েকখানি পুস্তিকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(৪র্থ) ভারত ও ভারতেতর দেশ হইতে প্রাপ্ত এককালীন দান।

(৫) চিরস্থায়ী ফণ্ডের সুদ স্বরূপে লব্ধ অর্থ।

বিদ্যালয়ের আলোচ্য তিন বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব।

১৯১৬ হইতে ১৯১৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরের মোট আয় ৯০৫৫৮৵০ টাকা এবং ঐ ৩ বৎসরের মোট ব্যয় ৮১৩৩।৶ টাকা। মজুদ ৯২২॥৶ টাকা। বিদ্যালয়ের উপস্থিত মাসিক খরচ ২২৫৲ টাকার উপর করিয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমাদিগকে অতি কষ্টে স্কুল চালাইতে হইতেছে। আমরা এই কার্য্যে সহৃদয় দেশবাসীর অধিকতর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, বিদ্যালয়টী অবৈতনিক হওয়ায় আমাদিগকে তাঁহাদের সহানুভূতির উপরেই নির্ভর করিতে হইতেছে।

মাতৃমন্দির।

শিক্ষা কার্য্যের এই বিভাগের উন্নতি গত তিন বৎসরে আশাতীত ভাবে সাধিত হইয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা ও ক্রিষ্টিনা যে অপূর্ব্ব আদর্শ জীবন তাঁহাদিগের ছাত্রীদের সম্মুখে এতকাল ধরিয়া যাপন করিয়াছেন তাহার প্রেরণায় কতকগুলি ছাত্রীর প্রাণে ঐরূপ করিবার প্রবল উৎসাহ ইতিপূর্ব্বে উদিত হইয়াছিল। শিক্ষাদানরূপ কার্য্য তাঁহারা ব্রতস্বরূপে গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুরমণীগণের সেবাতে জীবন নিয়োজিত করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন। উহা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে পারিবারিক সম্বন্ধ অনেকাংশে ছাড়িয়া কোন এক স্থানে একত্রে থাকিতে হইবে একথা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শ্রীমতী সুধীরা বসু ঐ বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ভাবে একটি ছাত্রীদিগের আবাস খুলিয়া দিলেন এবং ঐরূপ ব্রতধারিণী হইতে কৃতসংকল্প অন্য কয়েক

জনও ঐ সময়ে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এ পর্য্যন্ত এমন ভাবে তাঁহারা ঐ কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন যে এই অল্প কালের মধ্যেই উহার সুনাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া সাধারণকে উহার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থান হইতে অভিভাবকগণ উহাতে বালিকাগণকে প্রেরণ করিতেছেন। সুদূর মহীশূর প্রদেশের বাঙ্গালোর সহর হইতেও দুইজন ছাত্রী কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল উহাতে যোগদান করিয়াছে। বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্য্যের সহায়তায় কেবল মাত্র বাটীভাড়া জোগাড় করিয়া দিতেছেন। বাকি সমস্ত ব্যয়ভার উহার পরিচালিকাগণ নানাবিধ উপায়ে উপার্জ্জনপূর্ব্বক আপনারাই বহন করিয়া আসিতেছেন। অতএব স্বাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগই যে ইঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র একথা বলিতে হইবে না।

উদ্দেশ্যের চারি বিভাগ।

(১ম) শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এইরূপ হিন্দুরমণীগণের বাসভবনরূপে ইহা প্রধানতঃ পরিগণিত হইবে।

(২য়) পূর্ব্বোক্ত ব্রতস্বয়ধারণে অভিলাষিণী হইয়া যে সকল হিন্দুরমণী উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, আশ্রম তাঁহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া ঐ উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করিবার এবং শিক্ষাদান ও সেবা করিবার বর্ত্তমান কালের প্রকৃষ্টপ্রণালী সকল শিখিবার সুবিধা বিধান করিবে।

(৩য়) কলিকাতায় থাকিবার সুবিধা না থাকায় দূরবর্ত্তী স্থানের যে সকল ছাত্রী সিষ্টার ক্রিষ্টিনা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে অভিলাষিণী হইয়াও আশা পূরণ করিতে পারিতেছে না, মাসিক খরচা লইয়া আশ্রম তাহাদিগের ঐ বিষয়ে সুযোগ করিয়া দিবে।

(৪র্থ) সীবনবিদ্যা, সূচীশিল্প প্রভৃতি শিখাইয়া এবং লেখাপড়া জানিলে ভদ্রপরিবারে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আশ্রম অসহায়া দরিদ্রা পুরস্ত্রীদিগকে জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা প্রদান করিবে।

মাতৃমন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থান।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আশ্রম ৫৩।১নং বসুপাড়া লেনস্থ

ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। উক্ত বাটীর ভাড়া মাসিক ৫০৲ টাকা জনৈক সদাশয় বন্ধু এ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আশ্রমবাসিনীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। মন্দিরনিবাসিনীগণের সংখ্যা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ১১, ১৯১৬ খৃঃ ১৬, ১৯১৭ খৃঃ ২৩ ও ১৯১৮ খৃঃ ৩২ ছিল। বর্ত্তমানে আশ্রম বাটীতে উহা অপেক্ষা অধিক আর এক জনেরও স্থান হওয়া অসম্ভব বলিয়া অনেক ছাত্রীর আবেদন নিত্য ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

মাতৃমন্দিরের আয়।

বাহিরের ছাত্রীগণকে পড়াইয়া আশ্রমপরিচালিকাগণ ১৯১৬ খৃঃ মাসিক ১৭৲, ১৯১৭ খৃঃ মাসিক ২৭৲ এবং ১৯১৮ খৃঃ মাসিক ৪০৲ টাকা হিসাবে গড়পড়তায় উপার্জ্জন করিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যা পারদর্শিনী জনৈক পরিচালিকা ১৯১৭ ও ১৯১৮ খৃঃ ২০২৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সমস্ত উপার্জ্জিত অর্থ মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহে প্রদানপূর্ব্বক মন্দিরবাসিনীদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাগিনী হইয়াছেন।

সীবন ও সূচীশিল্প দ্বারা আশ্রমবাসিনীগণ ১৯১৬ খৃঃ ১১৮॥৶১৫, ১৯১৭ খৃঃ ২৫০৲ এবং ১৯১৮ খৃঃ ৩২১৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

জনৈক বন্ধু ও শ্রীমতী রাধারাণী বিশ্বাস প্রত্যেকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ২জন দরিদ্রা ছাত্রীর মাসিক ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আশ্রম ইঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিল।

মন্দির পরিচালিকাগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণ্ড।

পরিচালিকাগণের নিঃস্বার্থ উদ্যম ও অধ্যবসায় দর্শনে প্রসন্ন হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গভর্ণিং বডি ২০০০৲ টাকার কোম্পানি কাগজের সুদ প্রতি বৎসর ঔষধাদি ক্রয়ে ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মন্দিরনিবাসিনী দরিদ্রা ছাত্রীগণের সাহায্যার্থ চিরস্থায়ী ফণ্ড।

মৃণালিনী স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড ও স্বর্ণময়ী-ইন্দুবালা স্মৃতিরক্ষা ফণ্ড।

শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া মৃণালিনী ঘোষের পিতা শ্রীযুত ভূপাল চন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ

নগদ ২০০০৲ টাকা আন্দাজ এবং শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া জননী ও পত্নীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য ২১০০৲ টাকার (নমিন্যাল ভ্যালু) কোম্পানির কাগজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের গভর্ণিং বডির হস্তে এই অভিপ্রায়ে সমর্পণ করিতেছেন যে, উক্ত টাকা মিশনের নিকটে চিরকাল জমা থাকিবে ও উহার সুদ মন্দিরনিবাসিনী কোন তিনটী দরিদ্রা নারীর শিক্ষার সাহায্যার্থ ব্যয় করা হইবে এবং প্রতি তিন বৎসরের অন্তে ঐ সাহায্য এক এক জন নূতন ছাত্রীকে দেওয়া হইবে।

শ্রীযুত ভূপাল চন্দ্র বসু ও শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটে মন্দিরনিবাসিনীগণ ঐ জন্য চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

কাশীধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগে শাখা কার্য্য।

কাশীধামের লাক্ষা নামক পল্লীতে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রায় এক বৎসর হইল একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ভার মাতৃমন্দিরের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। পরিচালিকাগণ ঐ জন্য আপনাদের ভিতর হইতে দুই জনকে তথায় প্রেরণপূর্ব্বক ঐ কার্য্য এই কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া আসিতেছেন। উক্ত আশ্রমের ব্যয়ভার অবশ্য স্থানীয় মিশনই বহন করিতেছেন। বর্ত্তমানে উহাতে ৭ জন অসহায়া রমণী ও ১ জন পিতৃমাতৃহীন বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। রমণীগণের মধ্যে ২ জন সধবা ও ৫ জন বিধবা।

বালি-শাখা বিদ্যালয়

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের যে শাখা কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী বালি নামক পল্লীগ্রামে অবস্থিত বলিয়া আমরা পূর্ব্ব বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কার্য্য বিগত তিন বৎসর সমভাবেই চলিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় উহা বাগবাজার বিদ্যালয়ের পদানুসরণ করিয়াই শিক্ষা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছে। উহাতে ৩৫ জন ছাত্রী বর্ত্তমানে শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং ছাত্রীগণের দৈনন্দিন উপস্থিতির সংখ্যা গড়পড়তায় ৩০ জন করিয়া হইতেছে।

জমি ক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ ফণ্ড।

শিক্ষাকার্য্যের উপযোগী কয়েকখানি বাটী নির্ম্মাণ বর্ত্তমানে একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণ এই কার্য্যের স্থানাভাব দূর করা একান্ত প্রয়োজন বুঝিয়া বাগবাজারস্থ নিবেদিতা লেনে ১৫ কাঠা ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট পরিমিত একখণ্ড ভূমি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে ২৪,৬৪১৸৶৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করিয়াছেন। দেশ ও দশের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে এই কাল পর্য্যন্ত সাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। ঐজন্য সাহসে বুক বাঁধিয়া তাঁহারা এই হিতকর শিক্ষানুষ্ঠানের জন্য ঐ টাকা বর্ত্তমানে কর্জ্জ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় উহার কতকাংশ পরিশোধ হইলেও ১২,২৫৬৸৶২ পরিশোধ হইতে এখনও বাকি রহিয়াছে। তাহার পর উক্ত জমার উপরে প্রশস্ত বিদ্যালয়গৃহ এবং মাতৃমন্দিরের ছাত্রীআবাসের জন্য অন্ততঃ ৫০ জন বালিকার থাকিবার মত অন্য একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্যও অনেক অর্থের প্রয়োজন। আবার কার্য্যের স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এমন একটি ফণ্ডের প্রয়োজন যাহার সুদ হইতে উহার মাসিক ব্যয় চিরকাল নির্ব্বাহ হইতে পারে। কারণ স্বর্গীয়া ভগিনী নিবেদিতা ঐ উদ্দেশ্যে যে টাকা বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যৎসামান্য এবং কেবলমাত্র এই কার্য্যের বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রী শিক্ষা বিভাগদ্বয়ের জন্য। এই কার্য্যের অন্যতম বিভাগ মাতৃমন্দিরের জন্য ঐ উদ্দেশ্যে কিছুমাত্র টাকা এখনও পাওয়া যায় নাই। অতএব হে সদাশয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, অগ্রসর হও—এই সদনুষ্ঠানের যে কোন বিভাগের অভাব মোচনে তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহাতেই যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদানপূর্ব্বক দেশের রমণীকুলের স্থায়ী কল্যাণ বিধান কর—শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তিমতী প্রকাশ স্বরূপা নারীগণের সেবা করিয়া দেশকে উন্নত কর এবং স্বয়ং কৃতার্থ হও। যাঁহার করুণা ও কৃপা ভিন্ন জগতে কোন কার্য্যই সম্ভবপর

হয় না, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তম তোমাদিগের হৃদয়ে শুভ প্রেরণা আনয়ন করিয়া এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে দান করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য প্রদান করুন!

সংবাদ ও মন্তব্য।

১৯১৩ হইতে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চারি বৎসরের কার্য্যবিবরণী ও মিশন সংক্রান্ত অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় সাধারণ কার্য্যবিবরণী বেলুড়মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠে জনসাধারণ মিশন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কোয়ালালামপুর নামক স্থানে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে "বিবেকানন্দ আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ প্রায় প্রতিবৎসর ঐস্থানে গমন করিয়া ঐ কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিগত জুন মাসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি পুনরায় ঐ স্থানে গমন করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ মাসে আশ্রম হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেনঃ—

'হিন্দুমতে জীবনের আদর্শ', 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত', 'আত্মা বা মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'কর্ম্ম ও পুনর্জ্জন্মবাদ', 'হিন্দুমতে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ', এবং 'বেদান্ত ও সিদ্ধান্তমতের সমন্বয়'। শীঘ্রই মান্দ্রাজ মঠ হইতে জনৈক সন্ন্যাসী তথায় গমন করিয়া আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ঠাকুরের ভাব দেশে যতই ছড়ায় ততই মঙ্গল।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সবডিভিসনের অন্তর্গত হরিনগর গ্রামে গত এপ্রিল মাসে কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে একটী নৈশ শ্রমজীবী বিদ্যালয় ও একটী স্ত্রীশিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই

বিদ্যালয়দ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইতেছে। শিক্ষার অভাবই ভারতের একটী প্রধান সমস্যা। উহা দূর করিবার জন্য দেশের যুবকবৃন্দ সচেষ্ট হইলেই উহার সাফল্য অচিরে সম্ভবপর। মিশনের যুবকবৃন্দের ঐ বিষয়ের উৎসাহের সহিত অর্থেরও নিতান্ত প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসীর মুখ চাহিয়াই স্থানীয় যুবকবৃন্দ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বিদ্যালয় দুইটী নিয়মিত ভাবে পরিচালিত করিতে হইলে মাসিক অন্ততঃ ৩০৲ টাকার প্রয়োজন। এই মহৎকার্য্যে মাসিক চাঁদা হিসাবে অথবা এককালীন দান হিসাবে, যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা (১) ম্যানেজার, উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) শ্রীকেদারনাথ হাজারিবর্ম্মা, সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ নৈশ ও স্ত্রী বিদ্যালয়, হরিনগর, পোঃ রাধানগর, জেলা মেদিনীপুর—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(বাঙ্গালা ও বিহার)

আমাদের দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য পূর্ব্ববৎ সমভাবেই চলিতেছে। নিম্নে ২৬শে জুন হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের হিসাব প্রদত্ত হইল।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	বাগদা (মানভূম)	
৪৯	১৩৩৯	৬৮/
৪৭	১০১২	৫২/৪
৩৭	৭১৮	৩৬/৬৸
৩৮	৬২	৩১৸৶

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	ইঁদপুর (বাঁকুড়া)	
৩২	৫৫৩	২৮।৩
৩১	৫১১	২৬।০
২৮	৩৩২	১৭/৫
২৬	২২৬	১১॥৪
	কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)	
১৯	১৬৬	৮॥৮
১৯	১৬৩	৮॥২
১৯	১৭৬	৯।৪
১৯	১৮১	৯॥৮
	গঙ্গাজলঘাটী (বাঁকুড়া)	
১০	১৫৫	৮॥০
১০	১২৬	৭/২
১০	১১৯	৬।৭
১০	৮০	৬॥৪
	বাঁকুড়া	
৪	৪৮	২॥০
	কুণ্ডা (সাঁওতাল পরগণা)	
২৭	৩১১	১৬/
২৭	৩১১	১৬/

এই কেন্দ্র হইতে ২৭॥০ মণ বীজ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	সরমা (সাঁওতাল পরগণা)	
৩৪	৩৩০	১৯/
৩১	৩০২	১৮/

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
	ব্রাহ্মণবেড়িয়া (ত্রিপুরা)	
৩২	৫৯০	৩০/৬
৩২	৬৪২	৩২/৬৫
৬২	৬৬৪	৩৪/১।
৩২	৭২৬	৩৭/৫
	বিটঘর (ত্রিপুরা)	
৯	২০	৩০/
৯	৮৪০	৩০/

বিটঘরকেন্দ্রে প্রত্যেক সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ২ সপ্তাহে /১ সের করিয়া ৬০/ মণ সর্করকন্দ আলু দেওয়া হইয়াছে।

	ভারুকাটী (বরিশাল)	
২৮	৫৪৪	১৩/৬

গৃহদাহের সাহায্যার্থে ভুবনেশ্বরে ৯০৲ ও মেদিনীপুরে ৫০৲, আর্থিক সাহায্যার্থে লতাবদীতে ২৫৲ এবং চাউল বিতরণের জন্য ভারুকাটীতে ৩০০৲ টাকা ও দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে নূতন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে—

বেলুড় (হাবড়া) ৪৬, বাগবাজার (কলিকাতা) ৪, বাগদা (মানভূম) ৩৬৪, ইঁদপুর (বাঁকুড়া) ৩৮০, দত্তখোলা ত্রিপুরা) ৬৬, বিটঘর (ঐ) ৩৬ কুণ্ডা ১১২, সরমা ৯৪, মিহিজাম ৩৪, ভারুকাটী (বরিশাল) ১১৮, গুঠিয়া (ঐ) ৪০, বাসন্তী (ফরিদপুর) ২০, কোটালীপাড়া (ঐ) ৮০, ঢাকা ৫২, কলমা (ঐ) ৪০, লতাবদী (ঐ) ৫২, জয়নগর (২৪ পরগণা) ৪৮।

এতদ্ব্যতীত ইনফ্লুয়েঞ্জার সময়ে পীড়িতব্যক্তিগণকে ঔষধ ও পথ্যাদি দান করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে বীজধান্য দান ও তাহাদের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে চাউলের দোকান খুলিয়া সস্তাদরে চাউল বিক্রয় করায় অনেকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান।

(স্বামী সারদানন্দ)

কাশীপুরের উদ্যানে আসিবার কয়েক দিন পরে ঠাকুর যেরূপে একদিন নিজ কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানপথে স্বল্পক্ষণের জন্য পাদচারণা করিয়াছিলেন তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহাতে দুর্ব্বল বোধ করায় প্রায় এক পক্ষকাল তিনি আর ঐরূপ করিতে সাহস করেন নাই। ঐ কালের মধ্যে তাঁহার চিকিৎসার না হইলেও চিকিৎসকের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কলিকাতার বহুবাজার পল্লীনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী অক্রূর দত্তের বংশে জাত রাজেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা সহরে প্রচলনে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ইঁহার সহিত মিলিত হইয়াই হোমিও-মতের সাফল্য ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ব্যাধির কথা রাজেন্দ্রবাবু লোকমুখে শ্রবণ করিয়া, এবং তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির সুনাম অনেকের নিকটে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া চিন্তা ও অধ্যয়নাদি সহায়ে ঐ ব্যাধির ঔষধও নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, অতুলকৃষ্ণকে একদিন এই সময়ে কোন স্থানে দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং বলেন, "মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একটা ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাঁহার মত থাকিলে সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।" অতুলকৃষ্ণ ভক্তগণকে এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে ঐ বিষয় জানাইলে উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায় কয়েকদিন পরেই রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং ব্যাধির আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক লাইকোপোডিয়ম (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে এক পক্ষেরও অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন।

ক্রমে পৌষমাসের অর্দ্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী উপস্থিত হইল। ঠাকুর ঐ দিন বিশেষ সুস্থ বোধ করায় কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবকাশের দিন বলিয়া সেদিন গৃহস্থ ভক্তগণ মধ্যাহ্ন অতীত হইবার কিছু পরেই একে একে অথবা দলবদ্ধ হইয়া উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপে অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঠাকুর যখন উদ্যানে বেড়াইবার জন্য উপর হইতে নীচে নামিলেন তখন ত্রিশ জনেরও অধিক ব্যক্তি গৃহ মধ্যে অথবা উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের তলে বসিয়া পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি নিম্নের হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যানপথে নামিয়া দক্ষিণ মুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ঐরূপে বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া ঠাকুর গিরিশ, রাম, অতুল প্রভৃতি কয়েক জনকে পথের পশ্চিমের বৃক্ষতলে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই ঠাকুর সহসা গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ,

তুমি যে সকলকে এত কথা (আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) বলিয়া বেড়াও তুমি (আমার সম্বন্ধে) কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ?" গিরিশ উহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ভূমিতে জানুসংলগ্ন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাসবাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি!" গিরিশের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতি কথায় ব্যক্ত হওয়ায় ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া সমবেত ভক্তগণকে বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হউক্!" ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি ঐ কথাগুলি মাত্র বলিয়াই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্ব্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্ব্বক আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল। তাহারা দেশ কাল ভুলিল, ঠাকুরের ব্যাধি ভুলিল, ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ না করিবার তাহাদের ইতিপূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভুলিল এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণপূর্ব্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন! তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণের জন্য তাহারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং জয়রবে দিক্ মুখরিত করিয়া একে একে আসিয়া প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। ঐরূপে প্রণাম করিবার কালে ঠাকুরের করুণাব্ধি আজি বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার উপস্থিত করিল। কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্য শক্তিপূতস্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম, অদ্য অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে

স্পর্শ করিতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য, তাঁহার ঐরূপ আচরণে ভক্তগণের আনন্দের অবধি রহিল না। তাহারা বুঝিল আজি হইতে তিনি নিজ দেবত্বের কথা শুদ্ধ তাহাদিগের নিকটে নহে কিন্তু সংসারে কাহারও নিকটে আর লুক্কায়িত রাখিবেন না, এবং পাপী তাপী সকলে এখন হইতে সমভাবে তাঁহার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করিবে—নিজ নিজ ত্রুটি, অভাব ও অসামর্থ্য বোধ হইতে তদ্বিষয়েও তাহাদিগের বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং ঐ অপূর্ব ঘটনায় কেহবা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাঁহাকে কেবলমাত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহবা গৃহমধ্যস্থ সকলকে ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইবার জন্য চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, আবার কেহবা পুষ্পচয়নপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের অঙ্গে উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঐরূপ হইবার পরে ঠাকুরের ভাব শান্ত হইতে দেখিয়া ভক্তগণও পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইল এবং অদ্যকার 'উদ্যান-ভ্রমণ' ঐরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি বাটীর মধ্যে নিজ কক্ষে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অদ্যকার এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্ম-প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে অভয় প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর ত ঐরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্ব্বিচারে অভয়াশ্রয় প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনায় সুব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যে সকল ব্যক্তি অদ্য তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল তাহাদিগের ভিতর হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপে কৃপা করিতে

আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি। * ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—'ইতিপূর্ব্বে ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান করিতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কতকটা মাত্র মানস নয়নে দেখিতে পাইতাম, যখন পাদপদ্ম দেখিতেছি তখন মুখখানি দেখিতে পাইতাম না—আবার মুখ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্তই হয় ত দেখিতে পাইতাম, শ্রীচরণ দেখিতে পাইতাম না—ঐরূপে যাহা দেখিতাম তাহাকে সজীব বলিয়াও মনে হইত না—অদ্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইষ্টমূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল!'

অদ্যকার ঘটনাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগের আট দশ জনের নাম মাত্রই আমাদিগের স্মরণ হইতেছে। যথা—গিরিশ, অতুল, রাম, নবগোপাল, হরমোহন, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী (রায়) হারাণ, রামলাল, অক্ষয়। কথামৃত লেখক মহেন্দ্রনাথও বোধ হয় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একজনও ঐদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহাদিগের অনেকে ঠাকুরের সেবাদি ভিন্ন পূর্ব্বরাত্রে অধিকক্ষণ সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকায় ক্লান্ত হইয়া গৃহমধ্যে নিদ্রা যাইতেছিলেন। লাটু ও শরৎ জাগ্রত থাকিলেও এবং ঠাকুরের কক্ষের দক্ষিণে অবস্থিত দ্বিতলের ছাদ হইতে ঐ ঘটনা দেখিতে পাইলেও স্বেচ্ছায় ঘটনাস্থলে গমন করে নাই। কারণ, ঠাকুর উদ্যানে পদচারণ করিতে নীচে নামিবামাত্র তাহারা ঐ অবকাশে তাঁহার শয্যাদি রৌদ্রে দিয়া ঘরখানির সংস্কারে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং কর্ত্তব্য কার্য্য অর্দ্ধ নিষ্পন্ন

* বেলিয়াঘাটা নিবাসী হারাণচন্দ্র কলিকাতার ফিন্‌লে মিওর কোম্পানীর আফিসে কর্ম্ম করিতেন। ঠাকুরের কৃপার স্মরণার্থ তিনি ইদানীং প্রতি বৎসর মহোৎসব করিতেন। অল্পদিন হইল দেহ রক্ষাপূর্ব্বক তিনি অভয়ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

করিয়া ফেলিয়া যাইলে ঠাকুরের অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তাহাদিগের ঘটনাস্থলে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও কয়েক জনকে আমরা অদ্যকার অনুভবের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ নাথ আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই বিষয়ের উপসংহার করিব। বৈকুণ্ঠনাথ আমাদিগের সমসাময়িক কালে ঠাকুরের পুণ্য-দর্শন লাভ করিয়াছিল। তদবধি ঠাকুর তাহাকে উপদেশাদি প্রদানপূর্ব্বক যে ভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন তদ্বিষয়ের কোন্ কোন কথা আমরা লীলাপ্রসঙ্গের স্থলে স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। মন্ত্রদীক্ষা প্রদানে ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথের জীবন ধন্য করিয়াছিলেন। তদবধি সে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। ঠাকুরের কৃপাভিন্ন ঐ বিষয়ে সফলকাম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া সে তাঁহার নিকটেও মধ্যে মধ্যে কাতর প্রার্থনা করিতেছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন এবং পরে কাশীপুরে গমনরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল। ঐ কালের মধ্যেও বৈকুণ্ঠনাথ অবসর পাইয়া দুই তিনবার ঠাকুরকে নিজ মনোগত বাসনা নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাতে প্রসন্নহাস্যে তাহাকে শান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "রোস্ না, আমার অসুখটা ভাল হউক, তাহার পর তোর সব করিয়া দিব।"

অদ্যকার ঘটনাস্থলে বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিল। ঠাকুর ভক্তদিগের মধ্যে দুই তিন জনকে দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে কৃতার্থ করিবামাত্র সে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম পুরঃসর বলিল, "মহাশয়, আমায় কৃপা করুন্।" ঠাকুর বলিলেন, "তোমার ত সব হইয়া গিয়াছে।" বৈকুণ্ঠ বলিল, "আপনি যখন বলিতেছেন হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যাহাতে উহা অল্পবিস্তর বুঝিতে পারি তাহা করিয়া দিন্। ঠাকুর তাহাতে 'আচ্ছা' বলিয়া ক্ষণেকের জন্য সামান্য ভাবে আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন মাত্র।

উহার প্রভাবে কিন্তু আমার অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আকাশ, বাড়ী, গাছপালা, মানুষ ইত্যাদি যেদিকে যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম তাহারই ভিতরে ঠাকুরের প্রসন্ন হাস্য-দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। প্রবল আনন্দে এককালে উল্লাসিত হইয়া উঠিলাম এবং ঐ সময়ে তোমাদের ছাদে দেখিতে পাইয়া 'কে কোথায় আছিস্ এই বেলা চলে আয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকিলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত আমার ঐরূপ ভাব ও দর্শন জাগ্রত কালের সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত রহিল। সকল পদার্থের ভিতর ঠাকুরের পুণ্য দর্শন লাভে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। আফিসে বা কর্ম্মান্তরে অন্যত্র যথায় যাইতে লাগিলাম তথায়ই ঐরূপ হইতে থাকিল। উহাতে উপস্থিত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে না পারায় ক্ষতি হইতে লাগিল এবং কর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া উক্ত দর্শনকে কিছু কালের জন্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ করিতে পারিলাম না। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়া কেন উহা প্রতিসংহারের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিদাভাষ হৃদয়ঙ্গম হইল। মুক্ত পুরুষেরা সর্ব্বদা একরস হইয়া থাকেন ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হওয়ায় কতটা নির্ব্বাসনা হইলে মন উক্ত একরসাবস্থায় থাকিবার সামর্থ্য লাভ করে তাহার কিঞ্চিদাভাষও এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম। কারণ, কয়েক দিন যাইতে না যাইতে ঐরূপে একই ভাবে একই দর্শন ও চিন্তাপ্রবাহ লইয়া থাকা কষ্টকর বোধ হইল। কখন কখন মনে হইতে লাগিল, পাগল হইব না কি? তখন ঠাকুরের নিকটে আবার সভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, 'প্রভু আমি এই ভাব ধারণে সক্ষম হইতেছি না, যাহাতে ইহার উপশম হয় তাহা করিয়া দাও।' হায় মানবের দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধিহীনতা, এখন ভাবি কেন ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কেন তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐ ভাবের চরম পরিণতি দেখিবার জন্য ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি নাই?—না হয় উন্মাদ হইতাম, অথবা দেহের পতন হইত। কিন্তু

ঐরূপ প্রার্থনা করিবার পরেই উক্ত দর্শন ও ভাবের সহসা এক দিবস বিরাম হইয়া গেল! আমার দৃঢ় ধারণা, যাঁহা হইতে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই উহা শান্ত হইল। তবে ঐ দর্শনের একান্ত বিলয়ের কথা আমার মনে উদিত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃপা করিয়া উহার এইটুকু অবশেষ মাত্র রাখিয়াছিলেন যে, দিবসের মধ্যে যখন তখন কয়েকবার তাঁহার সেই দিব্যভাবোদ্দীপ্ত প্রসন্ন মূর্ত্তির অহেতুক দর্শন লাভে আনন্দে স্তম্ভিত ও কৃতকৃতার্থ হইতাম।"

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন বা অন্তরিন্দ্রিয় যদি অণুপরিমাণ না হইয়া আমাদের দেহের ন্যায় মহৎ বা বড় হইত, তাহা হইলে একই সময়ে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না। মনোনিবেশ করিয়া আমরা যখন রূপ দেখি, তখন আমাদের স্পর্শ, গন্ধ, রস বা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় না ইহার কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইহার কারণ মন নিতান্ত ক্ষুদ্র পরিমাণের বস্তু বলিয়া এককালে দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিতে পারে না; এই কারণে এক্ষণে একটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একপ্রকার বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, মনের সহিত যোগ না ঘটিলে কোন ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয় তখন সেই ইন্দ্রিয়ই জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়। মনের পরিমাণ নিতান্ত ছোট বলিয়া একই

সময়ে মন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই জন্য একই সময়ে দুইটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দুইপ্রকার বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সেই অণুপরিমাণ মন আত্মা হইতে পারে না; কারণ, আত্মা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ যে দ্রব্যের হয় তাহা মহৎ হওয়া আবশ্যক, না হইলে পার্থিব পরমাণুরও প্রত্যক্ষ হইতে পারিত।

কিন্তু মনের এই প্রকার অণুত্ব সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ মনকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে যুক্তির সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ মনকে অণুপরিমাণ বলিয়া সিদ্ধ করিতে চাহেন তাহা যুক্তিসহ নহে। কারণ একই সময়ে আমাদের দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বজনসম্মত নহে। সময় বিশেষে একই সময়ে আমাদের একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহু বিষয়ের ও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা সুশীতল সুরভিত সুমিষ্ট জল পান করি, তখন একই সময়ে সেই জলের শৈত্য, সৌরভ ও মিষ্টতার প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিবে। সেই একই সময়ে রসনার সাহায্যে আমরা জলের, মধুর রসের আস্বাদ করি, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জলের শৈত্যের অনুভব করি, আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সৌরভের আঘ্রাণ করি। সুতরাং একই সময়ে ত্বগিন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আমাদের তিন প্রকার গুণের অর্থাৎ স্পর্শ, গন্ধ ও রসের প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া দেয়। তাহাই যদি হইল, তবে মনের অণুত্ব সিদ্ধ হইল কিরূপে? মন যদি অণু হইত, তাহা হইলে একই সময়ে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহা মিলিত হইত কিরূপে? সুতরাং মন অণুপরিমাণ হয় বলিয়া তাহা আমাদের আত্মা হইতে পারে না—এই প্রকার যুক্তি দ্বারা মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইতে পারে না। এই

কারণ মনের আত্মত্ব খণ্ডন করিতে হইলে অন্য প্রকারের যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে, সে যুক্তি কি তাহাই এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

কোন কার্য্য হইতে গেলে তাহা করণ ও কর্ত্তা এই দুইপ্রকার কারণের অপেক্ষা করিয়া থাকে, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই অঙ্গীকার্য্য। দেখ, বৃক্ষের ছেদনরূপ কার্য্য তাহার করণ কুঠারের অপেক্ষা যেমন করে, সেইরূপ কুঠারের চালয়িতা একজন কর্ত্তারও অপেক্ষা করে, কেবল কুঠার বা কেবল কর্ত্তার দ্বারা ছেদন রূপ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় না—ইহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। প্রকৃত স্থলেও আমাদের সুখ দুঃখ প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ ও কার্য্য, কার্য্য হইলেই তাহার করণ ও কর্ত্তা এই দুইটী পরস্পর বিভিন্নস্বভাবযুক্ত কারণ থাকা চাই বলিয়া, এই সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতিরূপ কার্য্য একটী করণ ও তাহা হইতে ভিন্ন একটী কর্ত্তার অপেক্ষা করিবেই ইহা স্থির—মন হইতেছে সেই অনুভূতির করণ, সুতরাং তাহার কর্ত্তা যে মন হইতে ভিন্ন তাহাও স্থির—সেই কর্ত্তাকেই আত্মা বলা উচিত। আমাদের সর্ব্বসাধারণ অনুভবও আমাদিগকে ইহাই বুঝাইয়া দেয়। কারণ আমরা সকলেই বুঝি ও বলিয়া থাকি যে, আমি মনের দ্বারা সুখ বা দুঃখের অনুভব করিতেছি। এই প্রকার অনুভব আমাদিগকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে, আমি ও মন এক বস্তু নহি; মন আমার অনুভূতিরূপ কার্য্যের করণ, আর সেই অনুভূতিরূপ কার্য্যের যে কর্ত্তা তাহা আমি। সুতরাং যুক্তি ও অনুভব মিলিত হইয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমি মন নহি, কিন্তু মন আমার অনুভূতিরূপ কার্য্যের সহায় মাত্র। এই কারণে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, মন বা অন্তরিন্দ্রিয় কখনই আত্মা হইতে পারে না। তাহাই যদি হইল তবে সে আত্মার স্বরূপ কি? তাহা মনের আত্মত্ববাদী নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক্ষণে দেখা যাক্ অপর দার্শনিকগণ সেই আত্মার তত্ত্ব নিরূপণ কি ভাবে করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধমতে আত্মতত্ত্ব

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে,—

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মতের প্রচার করিয়াছিলেন সাক্ষাদ্ভাবে তাহা এখন জানিবার উপায় নাই; কারণ, তিনি নিজমত প্রচার করিবার জন্য কোন গ্রন্থ নিজে রচনা করেন নাই। তাঁহার শিষ্য সন্ন্যাসী বিরক্ত ভিক্ষুগণ তাঁহারই মুখে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই আবার নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু কোন প্রকার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। এই ভাবে প্রায় একশত বৎসর কাটিয়া যাইবার পর, যখন বৌদ্ধসম্প্রদায়ে বুদ্ধদেবের প্রশিষ্যগণের মধ্যে নানাকারণে কোন্‌টী বুদ্ধদেবের প্রকৃত উক্তি আর কোন্‌টী নহে তাহা লইয়া সংশয় ও তর্ক উঠিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় বৌদ্ধস্থবিরগণ মিলিত হইয়া একটী সঙ্গীতি বা মহাসম্মিলনী করিয়াছিলেন। সেই মহাসম্মিলনীতে কতিপয় নির্ব্বাচিত বৌদ্ধস্থবির মিলিত হইয়া ঐকমত্যসহকারে কতকগুলি ভগবান্ বুদ্ধদেবের বচন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থই বর্ত্তমান বৌদ্ধত্রিপিটক নামক বিরাট মহাগ্রন্থসমূহের মূলগ্রন্থ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ একশতবৎসর পরে উত্তরোত্তর আরও দুইটী সঙ্গীতি বা বৌদ্ধ মহাসম্মিলন আহূত হইয়াছিল। ঐ দুইটী সম্মিলনীতে এইভাবে বৌদ্ধভিক্ষুগণ মিলিত হইয়া শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলিত বৌদ্ধমতগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাই পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক পালি বা তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল; সংস্কৃত ভাষায় একখানিও রচিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বপর্য্যন্ত এইরূপে প্রাকৃতভাষায়

ভারতে বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল। পরে মহাযান নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। এই মহাযান সম্প্রদায়ের আচার্য্য অসঙ্গ, নাগার্জ্জুন, ধর্ম্মকীর্ত্তি ও দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভিক্ষুগণ ক্রমে সংস্কৃত ভাষায় এই নবোদিত বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ দার্শনিক-গ্রন্থগুলি এখনও অধিকাংশভাবে অনাবিষ্কৃত বা বিলুপ্ত হইয়াছে। আচার্য্য কুমারিলভট্ট, গৌড়পাদ ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পুনরুদীয়মান সনাতনধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ যে সময়ে ভারতের দার্শনিক সাম্রাজ্যের বরণীয় সিংহাসনে চক্রবর্ত্তীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে ঐ সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থসমূহের যে বিশেষ ভাবে প্রচার ছিল, তাহার বহুতর প্রমাণ ঐ সকল মহাত্মাগণের রচিত গ্রন্থসমূহে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল প্রমাণের সাহায্যে বৌদ্ধগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইবে,—

সংস্কৃত দার্শনিকগণ বৌদ্ধমতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই দুই মতে বাহ্য ঘটপটাদি বস্তুর সত্তাও অঙ্গীকৃত হইয়াছে; এই কারণে, এই দুইটী মতকে সর্ব্বাস্তিত্ব বাদীর মত বলিয়া আচার্য্যশঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এই দুইটী মতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য এই যে, সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যপদার্থের সত্তা অঙ্গীকৃত হইলেও তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গোচর নহে, কিন্তু অনুমেয় ইহাই সিদ্ধান্ত। যোগাচার মতে কিন্তু বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও গোচর হইয়া থাকে ইহাই বিশেষ। বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে কিনা এই বিষয়ে এই উভয় মতে পরস্পর বিরোধ থাকিলেও উভয় মতেই আত্মস্বরূপ-নির্ণয় একই প্রকার। এই জন্যই প্রথমে এই দুইমতে আত্মস্বরূপ কি ভাবে নির্ণীত হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে—

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতে জীবতত্ত্ব

এই মত-দ্বয়ে বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে পদার্থ দুইপ্রকার। বাহ্য বস্তুও দুই প্রকার, ভূত ও ভৌতিক। ভূত কিন্তু চারি প্রকার, যথা ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু। এই চারিপ্রকার ভূতের গুণ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ প্রভৃতি এবং এই ভূতসমূহ হইতে সমুৎপন্ন বহিরিন্দ্রিয়-গুলিই ভৌতিক। ইঁহারা আকাশ বলিয়া একটী পৃথক্ ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আকাশকে ইঁহারা অভাব স্বরূপই বলিয়া থাকেন। মোটের উপর বাহ্য প্রপঞ্চ বলিলে, এই ভূত ও ভৌতিক দ্বিবিধ বস্তুকে বুঝা যায়। আভ্যন্তর বস্তুও দুইপ্রকার যথা, চিত্ত ও চৈত্ত—চিত্ত শব্দের অর্থ বিজ্ঞান স্কন্ধ বা বিজ্ঞান প্রবাহ; চৈত্ত শব্দের অর্থ রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ—স্কন্ধশব্দের অর্থ ধারা, প্রবাহ বা সন্ততি কিম্বা সমষ্টি। রূপস্কন্ধ শব্দের অর্থ -নিজ নিজ বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান যে চক্ষুরাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়, তাহাই। অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণামযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহই রূপস্কন্ধ শব্দের অর্থ। সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতিই বেদনাস্কন্ধ। এইটী গোরু, এইটী অশ্ব এই প্রকার নাম শুনিলে যে বিশেষ্য ও বিশেষণের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক প্রতীতি হয় অর্থাৎ এইটী গোরু, এইটী অশ্ব, এইপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিবার পর আমাদিগের যে প্রতীতি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। আসক্তি, বিদ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম বা পুণ্য এবং অধর্ম্ম বা পাপ প্রভৃতি গুণগুলিই সংস্কারস্কন্ধ। এবং আমি আমি এইরূপ জ্ঞান প্রবাহগুলিই বিজ্ঞানস্কন্ধ—এই বিজ্ঞানস্কন্ধের আর একটী নাম আলয়-বিজ্ঞান।

এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধের মধ্যে আলয়-বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-স্কন্ধই চিত্ত বা আত্মা এবং অন্য চারিটী স্কন্ধকে চৈত্ত বলে। এই চিত্ত ও চৈত্তের যে সংঘাত বা সমষ্টি তাহাই আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরতত্ত্ব—ইহা ছাড়া সকল বস্তুই বাহ্য বলিয়া স্বীকৃত।

এই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমতে কোন বস্তুই স্থায়ী নহে; সকল বস্তুই এই মতে ক্ষণিক, সকল বস্তুই

উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, কোন বস্তুই এক ক্ষণের অধিক থাকে না, এইরূপে সকল বস্তুকেই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনাশী বলায় বৌদ্ধগণের নাম হইয়াছে 'বৈনাশিক।

যে প্রকার যুক্তিদ্বারা বৌদ্ধগণ সকল বস্তুকেই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বৌদ্ধদার্শনিক বলেন যে, কোন বস্তুই এক ক্ষণের অধিক থাকিতে পারে না। কারণ স্থায়ী বস্তু কখনই সৎ বা সত্তাযুক্ত হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সত্তা বা অস্তিত্ব কাহাকে বলে অগ্রে তাহাই বুঝিতে হইবে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি স্থিরবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে, সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের ধর্ম্ম। বস্তু উৎপন্ন হইলে তাহার সহিত সত্তার সম্বন্ধ হয় বলিয়া তাহারা সৎ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তাঁহাদের মতে দ্রব্যগুণ প্রভৃতি ধর্ম্মী বা আশ্রয়; সত্তা তাহাদের ধর্ম্ম—এই ভাবে অতিরিক্ত সত্তারূপ একটী নিত্য সিদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারা কোন বস্তুকে সৎ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, দ্রব্য বা গুণ প্রভৃতির সহিত ঐরূপ সত্তার সম্বন্ধ কি তাহাই নিরূপণ করা যায় না; যখন সম্বন্ধই বুঝা যায় না তখন সেই সম্বন্ধে সত্তা-যুক্ত হইলে বস্তু সৎ হয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত কিরূপে যুক্তিসহ হইতে পারে? দেখ সম্বন্ধ সেই দুইটী বস্তুরই মধ্যে সম্ভবপর, যে দুইটী বস্তু পরস্পর পৃথক্‌ভাবে থাকিয়া পরে মিলিত হইয়া থাকে। আমার হস্তের সহিত এই লেখনীর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এই লেখনী ও হস্তের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে লেখনী ও হস্ত এই দুইটী বস্তুই পরস্পর পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে সম্বন্ধও হইয়াছে; যে বস্তু সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে থাকে না তাহার সহিত কোন বস্তুরই সম্বন্ধ হইতে পারে ইহা কখনও সম্ভবপর নহে—ইহাই যদি প্রমাণ সিদ্ধ নিয়ম হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি ঘটের সহিত সত্তার সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘট ছিল কি না? যদি বল ছিল,

তাহা হইলে বলিব, সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘট যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব ত সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গেল, তবে আবার তাহাকে সৎ বলিয়া বুঝাইবার জন্য সত্তার সম্বন্ধের ভার তাহার উপর চাপাইয়া লাভ কি? আর যদি বল সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে ঘটের অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে বলিব ঘটের যখন অস্তিত্ব নাই, তখন, তাহা অসৎ বা গগনকুসুম-কল্প অর্থাৎ অলীক। দুইটী সদ্ বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে; অসতের সহিত অর্থাৎ অলীকের সহিত কোন সদ্ বস্তুর কোন প্রকার সম্বন্ধই হইতে পারে না—ইহা ত সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং সত্তার সহিত সম্বন্ধ হইলে ঘটাদি বস্তু সৎ হয় এই প্রকার অতিরিক্ত সত্তাবাদীর মত কোন প্রকারেই যুক্তিসহ হইতেছে না। এই কারণে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে যে ভাবে বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে তাহা কিছুতেই প্রমাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহার উপর নৈয়ায়িকগণ একটী কথা বলিযা থাকেন তাহাও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাই এইক্ষণে দেখান যাইতেছে—নৈয়ায়িকগণ বলেন যে সম্বন্ধ যদি সকল স্থানে একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের উল্লিখিত যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিযা অঙ্গীকৃত হইতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক সকল সম্বন্ধই যে একই প্রকারের হইবে তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ, সম্বন্ধ দ্বিবিধ হইয়া থাকে যথা, যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। যে বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর, সেই বস্তু দুইটীর যে পরস্পর সম্বন্ধ, তাহারই নাম যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ -যেমন পূর্ব্বোক্ত লেখনী ও হস্তের সম্বন্ধ যুতসিদ্ধই হইয়া থাকে। আর যে বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে, সেই বস্তু দুইটীর যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাই অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যেমন দ্রব্যের সহিত গুণের বা ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ, তাহা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ। কারণ, দ্রব্য ও গুণ অথবা দ্রব্য বা ক্রিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না;

অর্থাৎ লেখনী ও হস্ত এই দুইটী বস্তু যেমন সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পর পৃথক্‌ভাবে দুইটী বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় সেইরূপ দ্রব্য ও তাহার গুণ বা ক্রিয়া সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে পৃথক্‌ভাবে আমাদের নিকট স্বতন্ত্র বা পৃথক্ দুইটী বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় না; এই কারণে দ্রব্যের সহিত তদীয় গুণ বা ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ তাহাকে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সত্তার সহিত ঘটাদি দ্রব্যের সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া যে দোষের উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই দোষ তবেই সম্ভবপর হইত, যদি সত্তা ও ঘটাদির সম্বন্ধ যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হইত। বাস্তবপক্ষে, কিন্তু তাহা নহে; কারণ, সত্তার সহিত ঘটাদি দ্রব্যের যে সম্বন্ধ আছে তাহা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ, যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ নহে, তাঁহারা যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটাদি বস্তুর সহিত সত্তার যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে, আমরাও বলিতেছি না, ঘটাদি দ্রব্যের সহিত সত্তার যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ আমরাও মানি না। তাহাদের মধ্যে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধই হইয়া থাকে, সুতরাং যুতসিদ্ধ সম্বন্ধের অঙ্গীকার করিলে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার দ্বারা অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধবাদীর মত কিছুতেই খণ্ডিত হইতে পারে না।

এইক্ষণে দেখা যাক নৈয়ায়িক দার্শনিকগণের এই প্রকার যুক্তির খণ্ডন করিতে যাইয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ কিরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শঙ্করের কুলপরিচয় ও জন্ম।

(শ্রীমতী—)

শিবগুরু গুরুগৃহে এক মনে বিদ্যাভ্যাসে রত, তাঁহার বিদ্যানুরাগ দর্শনে অধ্যাপক মহাশয় পরম পরিতুষ্ট। পিতা বিদ্যাধিরাজ পুত্রের পাঠপ্রিয়তা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত। এইরূপে অবাধে বহু বর্ষ অতীত হইয়া গেল। শিবগুরু যৌবনে পদার্পণ করিলেন ও গুরু-গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে, তাঁহার সঙ্গে বেদাধ্যয়ন শেষ হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য লোকমুখে নানাদিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের কৃতিত্ব শ্রবণে অপার আনন্দ লাভ করিলেন, বিদ্যার যাহা ফল, তাহা ক্রমে শিবগুরুতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা নিত্য নিয়মিত পূজার্চ্চনা গুরুসেবা এবং অবকাশ পাইলেই নিভৃতে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। লোক সমাগম তাঁহার ভাল লাগিত না, গুরুগৃহে আগন্তুক দেখিলেই তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার সদাচার, নিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় যারপর নাই প্রীত। স্বরোপিত অমৃতবৃক্ষ ফলবান্ হইলে কাহার না আনন্দ হয়?

বিদ্যাধিরাজ লোক মুখে পুত্রের যশঃ শ্রবণে যেমন সুখী হইয়াছিলেন, পুত্রের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সংবাদে কিন্তু তেমনি চিন্তিতও হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইয়া গেল, তথাপি পুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। ইহাই তাঁহার বিশেষ চিন্তার বিষয়।

পুত্র সৎ হউক, পিতামাতার যেরূপ কামনা, কন্যা সৎপাত্রে

সমর্পিত হয ইহাও তদ্রূপ কামনার বিষয। বিদ্যাধিরাজের আদর্শ-পুত্রের আদর্শ চরিত্রের কথা শুনিয়া অনেক জনক জননী শিবগুরুর জন্য লালায়িত হইলেন। বহু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন। বিদ্যাধিরাজ সকলকেই মিষ্টবাক্যে জানাইলেন যে, পুত্র গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি শীঘ্রই পুত্রকে আনযন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

এইরূপে অধিক দিন অতীত হইতে না হইতেই বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুর অধ্যাপক মহাশযকে একখানি পত্র লিখিলেন ও পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিবার আদেশ ভিক্ষা করিলেন।

শিবগুরুর আচার্য্য পত্রোত্তরে বিদ্যাধিরাজকে জানাইলেন যে, শিবগুরুর শিক্ষা সমাপ্ত হইযাছে, অতএব তিনি এক্ষণে গৃহে গমন করিয়া সংসারী হউন ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুর অধ্যাপক মহাশযের পত্র পাইয়া অবিলম্বে যথাশক্তি নানাবিধ উপঢৌকনাদি সংগ্রহ করিযা পুত্রের গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। উপহারদ্রব্য-সম্ভার অধ্যাপক চরণে অর্পণ করিয়া পুত্রকে গৃহে লইযা যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

অধ্যাপক মহাশয শিবগুরুকে আহ্বান করিলেন ও আনন্দে গদগদভাবে বলিলেন, "বৎস! অধ্যযন শেষ হইযাছে, অধ্যাপনাতেও পারদর্শিতা লাভ করিযাছ, চরিত্রে তুমি সহাধ্যায়িগণকে পরাজিত করিযাছ, এক্ষণে তোমার পিতা তোমায গৃহে লইযা যাইবার জন্য আসিযাছেন, তুমি তাঁহার অনুগমন কর আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘজীবী হইযা স্বধর্ম্মপালনে সমর্থ হইবে।" গুরুবাক্য শ্রবণে শিবগুরু বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায বিচলিত হইলেন, তিনি করজোড়ে গুরুচরণে নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না, আচার্য্যের আদেশ পাইলে আজীবন গুরু সন্নিধানেই বাস করিবেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিদ্যাধিরাজ মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত

হইলেন। তিনি পুত্রকে যথোচিত উপদেশ-বাক্যে গৃহে ফিরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ও শিবগুরুকে বুঝাইলেন ও পুনঃ পুনঃ গৃহে ফিরিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শিবগুরু বুঝিলেন তাঁহার অভীষ্ট সহজে সিদ্ধ হইবার নহে। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বিদ্যাধিরাজ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করিলেন, কিন্তু শিবগুরু গৃহে আসিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধিরাজ পুত্রের আচরণ দেখিয়া মনে মনে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু পুত্র যদি ক্রমে সংসারবিরাগী হয়, এই চিন্তায় ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন।

এদিকে শিবগুরু গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন। একদিন বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুকে কহিলেন "বৎস, তোমাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ বহুদিন হইতে আমার নিকট যাতায়াত করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার কন্যা আমাদের মনোনীত হইবে তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিব ভাবিতেছি। আমাদের ইচ্ছা তুমি এইবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও।"

পিতৃবাক্যে শিবগুরু এবার আর চমকিত হইলেন না, কিন্তু, বিমর্ষের ছায়া তাঁহার মুখচন্দ্রমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তিনি সবিনয়ে পিতাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সংসার আশ্রমে কোনরূপ স্পৃহা নাই, তিনি আজীবন অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই নিরত থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। অতএব বিবাহ তিনি করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাধিরাজ বহুদিন হইতে এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন এবং তজ্জন্য পুত্রকে গৃহে আনিয়াও এতদিন এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। এক্ষণে তিনি পুত্রের কথায় মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মায়ার বন্ধন অতি দৃঢ়, তিনি সুযোগ পাইলেই পুত্রকে বিবাহের জন্য অনুরোধ

করিতে লাগিলেন এবং শিবগুরুও কিছুতেই সম্মত হন না। পুত্রের ঔদাসীন্যে জননী যত ব্যাকুলা হয়েন, পিতা তত নহেন, তাই শিবগুরুর ঔদাসীন্যে বিদ্যাধিরাজ মনে মনে দুঃখিত হইলেও ততবেশী ব্যস্ত বা কাতর নাই। কিন্তু তাঁহার পত্নী পুত্রের এই ভাব দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তিনি বিদ্যাধিরাজের নিকট পুত্রের বিবাহের জন্য কখনও বা অনুযোগ করেন কখনও বা অবলার বল ক্রন্দনের শরণাপন্ন হন।

বিদ্যাধিরাজও এবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—পুত্র সংসারী না হইলে পিতৃকুলের পিণ্ড লোপ, বংশ লোপ, পিতৃপুরুষের জলতর্পণ লোপ হইবে এই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। তদ্ভিন্ন কন্যাদায়-গ্রস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সানুনয় অনুরোধ, অথচ সে অনুরোধ রক্ষায় তিনি অসমর্থ বলিয়া তাঁহাদের নিকট লজ্জিত হইতেছিলেন। এক্ষণে পত্নীর ব্যাকুলতায় তিনি যেন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে দিনের পর দিন যাইতেছে, সহসা একদিন শিবগুরুর আচার্য্য বিদ্যাধিরাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যকে দেখিয়া বিদ্যাধিরাজ যেন অকূলে কূল পাইলেন। শিবগুরুও স্বীয় আচার্য্যকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পিতাপুত্রে আচার্য্যের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

আচার্য্য তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক শিবগুরুকে নিকটে বসাইলেন এবং শিবগুরুর মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক বলিলেন,—"বৎস, আমি লোকমুখে শুনিলাম তুমি বিবাহে অনিচ্ছুক। তুমি সংসার-আশ্রম গ্রহণ করিবে না, সন্ন্যাসী হইবে ইহাই তোমার ইচ্ছা। কয়েকটী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, তাঁহারা তোমার পিতার নিকট আসিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি বিবাহে অসম্মত জানিয়া তাঁহারা দুঃখিতচিত্তে আমার নিকট গমন করিয়াছিলেন। বৎস! আমি তাঁহাদের অনুরোধে আজ তোমার পিতৃগৃহে আসিয়াছি। এক্ষণে আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও। জগতে সদ্ব্রাহ্মণ অতি দুর্লভ, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের অলঙ্কার। তোমার বংশ

রক্ষা পাইলে জগতে সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশ বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যাদান যেরূপ শ্রেষ্ঠ, জগতকে একটি সৎপুত্র প্রদান করাও তেমনি শ্রেষ্ঠ। তুমি তাহা হইতে জগতকে বঞ্চিত করিও না। আমার আদেশে তুমি বিবাহ কর, তোমার কোনও ভয়ের কারণ নাই। শাস্ত্রানুসারে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিলে তুমি মোক্ষমার্গ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তুমি আমার বাক্যপালন কর, তোমার উত্তম গতি লাভ হইবে"।

গুরুভক্ত শিবগুরু গুরুর আদেশ শ্রবণে নতশিরে মৌন হইয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন গুরুবাক্য পালনই প্রধান ধর্ম্ম, গুরু বাক্যের প্রতিবাদ করা শিষ্যের অকর্ত্তব্য। সুতরাং তিনি নিরুত্তর রহিলেন। আচার্য্যও "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" বুঝিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সুযোগে বিদ্যাধিরাজও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনিও পুত্রকে মিষ্টবাক্যে অনেক বুঝাইলেন। শিবগুরুর জননী সাশ্রুনয়নে পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—"বাবা তুমি বিবাহ না করিলে আমার শ্বশুরবংশ নির্ব্বংশ হইবেন, লোকে অভিশাপ দিয়া থাকে যে 'তুমি নির্ব্বংশ হও' নির্ব্বংশের তুল্য কষ্ট আর কি আছে?" অতএব তুমি বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা কর।

এইবার শিবগুরু নিরুপায়, তিনি বুঝিলেন—প্রবল প্রারব্ধেরই ইহা সূচক। সুতরাং "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি বিবাহে সম্মত হইলেন।

পুত্রের সম্মতি পাইয়া বিদ্যাধিরাজদম্পতী সানন্দে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন।

শিবগুরু বিবাহে সম্মত, এ কথা ক্ষণকাল মধ্যেই আত্মীয়জন মধ্যে প্রচারিত হইল। যে সকল ব্রাহ্মণেরা এতদিন শিবগুরুকে কন্যাদানের জন্য উৎসুক ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে দলে দলে বিদ্যাধিরাজের নিকটে আসিতে লাগিলেন।

ফালটী গ্রামের অদূরে মঘপণ্ডিতের বাস। তিনি মনে মনে শিবগুরুকে জামাতা করিবার ইচ্ছা করিলেও এপর্য্যন্ত বিদ্যাধিরাজের

নিকট আসেন নাই। শিবগুরুর বিবাহে সম্মতির কথা অবগত হইয়া আজ তিনিও বিদ্যাধিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজ সুন্দরী ও সুশীলা কন্যার গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া বিদ্যাধিরাজকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাধিরাজ সকলকেই যেমন বলেন তদ্রূপ তাঁহাকেও আশা দিয়া বলিলেন,- "মহাশয় পাত্রী সুলক্ষণাক্রান্ত হইলে বিবাহ বিষয়ে কোনও আপত্তি নাই।" আপনি কন্যা প্রদর্শনের দিন স্থির করুন।"

ব্রাহ্মণকে বিদায় প্রদান করিয়া বিদ্যাধিরাজ পাত্রীর গুণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

তিনি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলেন, মঘপণ্ডিতের এই কন্যাটী রূপেগুণে অনুপমা। কন্যার নাম বিশিষ্টা। বিশিষ্টা অতি সুশীলা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, ধর্ম্মাচরণে সর্ব্বদাই উৎসুকা, পূজনীয়জনের সেবাপরায়ণা, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহশীলা, এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী বালিকা। কন্যার বিষয় অবগত হইয়া বিদ্যাধিরাজ পরম সুখী হইলেন এবং মনে মনে এই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের স্থির করিলেন। কন্যার কুল-পরিচয় তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মঘপণ্ডিত অতি সদ্‌বংশীয় সদাচারসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং বিবাহে আর আপত্তি কি হইতে পারে।

যথাসময়ে উভয় পক্ষেরই পাত্রপাত্রী দেখা হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে যাহা কিছু করণীয় তাহাও করা হইল। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শিবগুরু বিশিষ্টা দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিদ্যাধিরাজ পত্নীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি পুত্রসহ নববধূ বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং বধূর অনুপম রূপমাধুর্য্য দেখিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। সমাগত আত্মীয় কুটুম্বজনও নববধূর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সকলেই একবাক্যে বধূর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাধিরাজ পত্নীর আনন্দ আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ক্রমে যথাবিধি শুভ-বিবাহের সমুদয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। সমাগত কুটুম্ববর্গ বিদায় গ্রহণ করিলেন। নববধূও পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

বিদ্যাধিরাজদম্পতীও পুত্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহাদের অস্থির মন সুস্থির হইল।

বৎসরান্তে শুভদিনে নববধূ শ্বশুরালয়ে দ্বিরাগমন করিলেন এবং শ্বশুরঘর করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল বিশিষ্টা দেবীর মধুর প্রকৃতি, বিনয়নম্র আচরণ এবং শান্তস্বভাবে বিদ্যাধিরাজ-দম্পতী বড়ই সুখী হইলেন। শিবগুরু মনোমত পত্নীলাভে মনে মনে সন্তুষ্ট। গুরুর আদেশে শাস্ত্রমত গাহস্থ্য-ধর্ম্ম পালনই এখন তাঁহার লক্ষ্য হইল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল। বিশিষ্টা দেবী যৌবনে পদার্পণ করিলেন। শিবগুরুর পিতামাতা সর্ব্বদাই বধূর সন্তান সম্ভাবনার আশায় আশান্বিত থাকেন। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিল, বিশিষ্টা দেবীর পুত্র সম্ভাবনার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

বৃদ্ধ বিদ্যাধিরাজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি বধূব পুত্রাকাঙ্ক্ষায় নানারূপ ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর উপদেশমত বিশিষ্টা দেবী কত বার, ব্রত, উপবাস, পূজার্চ্চনা, করিতে লাগিলেন, কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণেব চরণে কতবারই ধন্না দেওয়া হইল, ঔষধ সেবন, মাদুলী ধারণ কিছুরই ত্রুটি হইল না। কিন্তু বিধাতাব নির্ব্বন্ধ, তাঁহার প্রতি ষষ্ঠীদেবীর কৃপা হইল না।

এইবার শিবগুরুর পিতামাতা, বধূর পুত্রসম্বন্ধে বিষম সন্দিহান হইলেন। এমন রূপগুণবতী বধূ শেষে বন্ধ্যা হইল, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি আছে? বংশরক্ষার জন্য বহু অনুনয় বিনয়ে পুত্রকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলেন, এক্ষণে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল ইহা কি অল্প পরিতাপের কথা! ওদিকে তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, আর কতদিনই বা জীবিত থাকিবেন। এখনও যদি বধূর পুত্র না হইল, তবে আর পৌত্রমুখ সন্দর্শন কিরূপে করিবেন? এই সব চিন্তায় বৃদ্ধদম্পতী বড়ই মনকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

শিবগুরু পিতামাতার মনকষ্ট বুঝিয়া মনে মনে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরাধীন কর্ম্মে মনুষ্যের কি হাত আছে? তাঁহাদের চিন্তা ও অশান্তিই সার হইল।

দুঃখের উপর দুঃখ। অল্পদিনের মধ্যেই একে একে বৃদ্ধ বিদ্যাধিরাজ দম্পতীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। যদিও তাঁহাদের বয়স যথেষ্ট হইয়াছিল তথাপি পিতামাতার অভাবে শিবগুরু যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। কারণ, তিনি পিতৃমাতৃ আদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রমতেই সংসারধর্ম্ম পালন করিতেন, সংসারের কোনরূপ ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইত না, তাঁহাকে সংসারের কোনও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ কখন করিতে হইত না, শাস্ত্রচর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতেন। কেবল ইহাই নহে, পিতামাতার শোকেও তিনি কাতর হইলেন, কারণ তাঁহারা পৌত্রমুখ দর্শন করিতে পারিলেন না, বংশ রক্ষাও হইল না। পণ্ডিত শিবগুরু এই সকল চিন্তায় বড়ই কাতর হইলেন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এসময় আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না।

যথা সময়ে যথারীতি শিবগুরু পিতামাতার আদ্যকৃত সম্পন্ন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শিবগুরুর যৌবনকালের ন্যায় পুনরায় যেন ঔদাসীন্য দেখা দিল। তিনি সদাই চিন্তামগ্ন প্রায়ই নির্জ্জনে থাকেন, অধ্যয়নাধ্যাপনাতেও আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ নাই, কাহারও সহিত বড় দেখাশুনা করেন না। তিনি এখন কেবলই ভাবেন বংশ রক্ষার জন্যই গুরু-আদেশে বিবাহ করিলাম, কিন্তু তাহা ত হইল না, তবে আর সংসারে প্রয়োজন কি? পিতামাতাও গত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্যই সংসারী হইয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কেন, এক্ষণে আমার সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যখন পতিব্রতা বিশিষ্টা দেবীর মলিন মুখচন্দ্রমা দর্শন করিতেন তখনই তাঁহার সে বাসনা যেন কোথায় চলিয়া যাইত।

এ দিকে বিশিষ্টা দেবী পতির উদাসীন ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ই ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একে ত তিনি

পরম স্নেহপরায়ণ পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুতে সাতিশয় ব্যথিতা, তদুপরি পতির এই সংসার-ঔদাসীন্য। তিনি যে কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র অভাবে বংশরক্ষায় নিরাশ হইয়াই যে পতির এই ভাবান্তর, বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবীর তাহা অজ্ঞাত ছিল না। তিনি একান্ত মনে ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে সহসা একদিন তিনি শিবগুরুকে বলিলেন, "দেব! বংশরক্ষা বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি বটে, তথাপি আমার ইচ্ছা একবার দেবাদিদেব মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিব। শুনিযাছি, আশু তুষ্ট হয়েন বলিযা তাঁহার নাম আশুতোষ, অতএব তাঁহারি চরণে আশ্রয় লইলে তিনি কি নিরাশ করিবেন? তিনি দয়াময় তাঁহার দয়াতে আমাদের মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। অতএব আসুন আমরা এইবার ভগবান্ শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হই!"

পত্নী-বাক্যে শিবগুরু যেন সহসা চমকিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, সত্যই ত আমরা পুত্রাকাঙ্ক্ষায় অনেক কর্ম্ম করিযাছি, কিন্তু কই শিবের আরাধনা ত সেরূপ ভাবে করা হয় নাই। অতএব একবার শিবের তপস্যা করা যাউক।

শিবগুরু এই ভাবিয়া পত্নী-বাক্যে সম্মত হইলেন এবং কোথায় গমন করিয়া কিরূপে শিবের তপস্যা করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে পড়িল, গ্রামের অনতিদূরে বৃষ পর্ব্বত। তথায় কেরলরাজ রাজশেখর স্থাপিত একটী শিবমন্দির আছে। তথায় জ্যোতির্লিঙ্গ জাগ্রত মহাদেব বিরাজিত আছেন। তিনি ভাবিলেন এই বৃষ পর্ব্বতেই গমন করিয়া শিবারাধনা করিবেন এবং পত্নীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। বিশিষ্টাদেবীর হৃদয়ে যেন আশার সঞ্চার হইল; তিনি তখনই যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

শিবগুরু ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ, তিনি কি কোন কর্ম্ম দিনক্ষণ

না দেখিয়া করিবেন? তিনি শুভদিনে শুভক্ষণে বিশিষ্টাদেবীকে সঙ্গে লইয়া আত্মীয়গণকে গৃহরক্ষা এবং কুলদেবতা পূজার ভার অর্পণ করিয়া বৃষ পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে বৃষপর্ব্বতে গমন করিতেছেন, তাহা সকলকে না বলিলেও সকলেই বুঝিলেন যে পুত্রাকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণদম্পতীর এই আয়োজন। কেননা ব্রাহ্মণ-দম্পতীর মনঃকষ্টের কথা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। শিবগুরু সকলেরই প্রিয়। সুতরাং সকলেই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

যথাসময়ে শিবগুরু বৃষপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং পুরোহিত মহাশয়কে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা বলিলেন। শিবগুরু সস্ত্রীক সম্বৎসর শিবের আরাধনা করিবেন জানিয়া পুরোহিত মহাশয়ের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি তাঁহাদের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং যথাসাধ্য সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবার আশ্বাস প্রদান করিলেন।

এতদিনে শিবগুরুর অভীষ্ট সিদ্ধির যথার্থ সূচনা হইল—তিনি তথায় সস্ত্রীক, কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। বৃষপর্ব্বতের নিম্নে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। শিবগুরু পত্নীসহ প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তথায় অবগাহন স্নান করিতেন এবং স্নানান্তে মন্দির মধ্যে শিবের পূজা সমাপন করিয়া শিবধ্যান, শিবহোম ও শিবনাম জপেই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সারাদিন অনশনে থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবচরণামৃত পান এবং যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।

নিদ্রা একরূপ পরিত্যক্ত হইল, প্রায় সারারাত্রিই তাঁহারা জপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাদর্শনে পুরোহিত মহাশয় চমৎকৃত হইলেন। তপঃ প্রভাবে তাঁহাদের ক্ষীণ দেহে যেন দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল। মুখশ্রী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল; সহসা দেখিলে লোকে মনে করিত যেন তপোলোক হইতে একজন ঋষি ও ঋষিপত্নী চন্দ্রশেখরেশ্বরের পূজা করিতে আসিয়াছেন।

ক্রমে সম্বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। শিবগুরু ভাবিলেন, বৎসর শেষপ্রায়, কিন্তু কৈ এখনও ত আশুতোষের দয়া হইল না! ভগবান্ আর কতদিন আমাদের প্রতি বিরূপ থাকিবেন? আমাদের বাসনা কি পূর্ণ হইবে না? এইরূপে তিনি মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশিষ্টাদেবীর কিন্তু কোন ব্যাকুলতা নাই। আশুতোষের দয়ার প্রতি, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস। নিত্য কার্য্যে তাঁহার কোনরূপ শৈথিল্যই পরিদৃষ্ট হইল না। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত সকল ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দেবতাগণের স্বভাব; আশুতোষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিলেও শিবগুরুর ভাগ্যে ব্যতিক্রম হইল না। বৎসরান্তে একদিন নিশাশেষে শিবগুরু স্বপ্ন দেখিলেন।

যেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শিবগুরু স্বপ্নেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে প্রণিপাতপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বৎস শিবগুরু। আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি, তুমি কি বর চাও, আমাকে বল"।

শিবগুরু তখন ব্রাহ্মণবেশী দেবাদিদেব মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিবের চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, আপনার অবিদিত কি আছে? তথাপি আপনার আদেশে আমি বলিতেছি, আমি পুত্রাকাঙ্ক্ষী, আমায় একটী পুত্র প্রদান করুন"।

আশুতোষ বলিলেন, "বৎস! তুমি কিরূপ পুত্র কামনা কর? মূর্খ শতায়ু পুত্র চাও, কিম্বা অল্পায়ু সর্ব্বজ্ঞ পুত্র চাও? তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপবশে এজন্মে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় পুত্র পাইতে পার না"।

শিবগুরু নতশিরে কহিলেন, "ভগবন্, তাহাই যদি হয়, তবে আমি অল্পায়ু সর্ব্বজ্ঞ পুত্রই কামনা করি। মূর্খ শতায়ু পুত্রে আমার কাজ নাই"। শিবগুরুর পরীক্ষা শেষ হইল, তাঁহার কথা শেষ

হইতে না হইতেই আশুতোষ বলিলেন, "বৎস! তাহাই হইবে, তোমরা অচিরে আমাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে। জগতের হিতার্থ আমাকেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে; তোমাদের তপস্যায় আমি সাতিশয় তুষ্ট হইয়াছি, আমিই তোমাদের পুত্র হইলাম।" কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবগুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শিবগুরু আনন্দ ও বিস্ময়ে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

সমাজসংস্কারে নারীর কর্ত্তব্য।

(শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী)

সেদিন দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তটী বাল্যবিবাহের কুফল হৃদয়ঙ্গমকারী কোন শিক্ষিত বঙ্গ সন্তানের একটী সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে অতিবাহিত করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ লইয়া ভ্রাতৃজায়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। শুনিলাম, তাঁহার পিত্রালয়ের এক প্রতিবেশী কন্যা বিধবা হইয়াছে, এই মাত্র পত্র পাইয়াছেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, বিধবা বালিকা—সম্ভ্রান্ত ধনিগৃহের শিক্ষিত পিতার দশমবর্ষীয়া কন্যা! বালিকার স্বামী বি, এ, পাস করিয়া আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

স্নেহাস্পদা প্রতিবেশীকন্যার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া ভ্রাতৃজায়া অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন। আমি যদিও বালিকাকে কখনও দেখি নাই তথাপি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা শ্রবণ করিয়া ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অশ্রুসম্বরণ করা আমার পক্ষেও অসম্ভব হইল। প্রবন্ধ পাঠে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আনন্দটুকু লাভ করিয়াছিলাম এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ নিরানন্দে অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বালিকার দুঃখকাহিনী স্মৃতিপথে উদিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিচিতা জনৈকা মহিলার একমাত্র দৌহিত্রটীর অকালমৃত্যুতে একটী মাত্র কন্যা-সম্বল এক অভাগিনী বিধবার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা, বিধবা হইয়াছে শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছিলাম, সেই বিধবার কন্যা অলক্ষণা বধূই পুত্রের অকাল-মৃত্যুর কারণ,—শ্বশ্রূর মনে এই ধারণা দৃঢ় হওয়ায় বালিকা চিরদিনের জন্য শ্বশ্রূর স্নেহবিচ্যুতা হইয়াছে। কোন অসম্ভাবিত কারণ ব্যতীত আর যে কোনদিন অভাগী বধূ শ্বশ্রূর স্নেহ লাভে সমর্থা হইবে, আত্মীয়স্বজনের মনে এরূপ ভরসা নাই। আত্মীয়-বন্ধুর উপদেশ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে তিনি পুত্রবধূকে বর্জ্জন করিয়াছেন। তদবধি আর তাহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। একদিন শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া "ছোট্ট ছেলেটীর বিবাহ দিয়া" "ছোট্ট একটী টুকটুকে বউ" আনিয়া ঘর আলো করিবেন বলিয়া বড় সাধেই তিনি দরিদ্র-গৃহের এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দশমবর্ষীয়া কন্যা মনোনীত করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল!

ঘর আলো হওয়া দূরে থাকুক, বিবাহের পর দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি সম্বৎসরের মধ্যেই পুত্রের জীবনান্ত করিয়া জননীর সুখ-সাধের অবসান করিল। বড় দুঃখেই অকল্যাণময়ী বধূ শ্বশ্রূর পরিত্যাজ্যা হইল। পুত্র-শোকাতুরা জননী অলক্ষণার সংস্পর্শে পুত্রের নিধন কল্পনা করিয়া ঘৃণাভরে বধূকে জন্মের মত বর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সেই জামাতৃ-বিয়োগ বিধুরা চিরঅভাগিনী বিধবা আজ তাঁহার শূন্য হৃদয়ের পূর্ণ সুখ অলক্ষণা বলিয়া কোথায় বিসর্জ্জন দিবেন?

জননীর বিদীর্ণপ্রায় বক্ষের উপর অনাদৃতা দুঃখিনী বালার অশ্রুকাতর কচিমুখখানির একটী করুণ চিত্র আমার মানস নয়নে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ব্যথিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলাম,—কেন এমন হয়?

প্রবীণা গৃহিণীরা বলেন, ইহা অদৃষ্টের ফল, বিধির বিধান, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

আমরা বলি, বৈধব্য বিধির বিধান, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু এরূপ বালবৈধব্য অদৃষ্টের ফল বা বিধির বিধান নয়। বাস্তবিক যিনি বিধি তিনি দয়াময়। স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ শিশুহৃদয় যাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, সেই বিশ্ববিধাতার বিধান এমন নিষ্ঠুর শিশু-প্রাণঘাতী হইতে পারে না। বিশ্বের মঙ্গলই যাঁহার ইচ্ছা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা এমন উচ্ছৃঙ্খল নহে। ইহা আমাদেরই দুর্বুদ্ধি ও অদূরদর্শিতার ফল, আমাদেরই সহানুভূতিশূন্যতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয়।

নতুবা গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতের নানাস্থানে বালবৈধব্যের প্রধান ও প্রথম কারণ বাল্যবিবাহপ্রথা নিবারণকল্পে বহু উদ্যোগ, আন্দোলন চলিতেছে। সমাজের নানা অকল্যাণপ্রসূ কুপ্রথাটীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রবন্ধাদিতে 'শিক্ষিত' সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। সমাজহিতৈষী সমাজের হিতের নিমিত্ত বহু শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রভৃতি প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, অনেকেই ইহার কুফল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বিবিধমত চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ্য সভায় মুক্তকণ্ঠে সকলে ইহার বিরুদ্ধমত ঘোষণা করিয়া সামাজিকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন কিন্তু তথাপি ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে ইহার প্রচলন সম্পূর্ণ রহিত হইতেছে না। সত্যের অনুরোধে অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে ভারতের সুসন্তানগণের প্রবল ইচ্ছা, ঐকান্তিক চেষ্টাযত্ন সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ বঙ্গে অব্যাহত রহিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেই বৎসরের পর বৎসর আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা বালিকা অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া শ্বশুর ভবন উজ্জ্বল করিতে যাইতেছে, সেই শত শত

বালিকা জনকজননীর প্রাণে শেল বিদ্ধ করিয়া চিরজীবনের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। এখনও বালিকা-মাতার দৈহিক অপুষ্টতা ও সন্তানপালনে অনভিজ্ঞতা শত সহস্র শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ হইতেছে; নানা অমঙ্গলে বঙ্গ সংসার প্রতিনিয়তই অশান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। দীর্ঘকালের অসংস্কৃত সমাজের সংস্কারে সহায়তা করিবার নিমিত্ত দেশনায়কগণের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া এখনও সামাজিকগণ দশম, একাদশ, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়া, অথবা বালিকা পুত্রবধুকে গৃহে আনিয়া দেশাচারের সম্মান রক্ষা করিতেছেন। দেশাচারের শাসনাধীন হইয়া আজিও কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অপেক্ষাকৃত বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে।

ইহাতে কি বুঝিতে হইবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এই দেশব্যাপী আন্দোলন বৃথা হইতেছে? বালিকার দুঃখ-মোচনে, তাহাদের জীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধনে সদাযত্নশীল বঙ্গের পরদুঃখকাতর সুসন্তানগণের এত চেষ্টা কি তবে নিষ্ফল হইতেছে? না—তাহা অসম্ভব। সামান্য একটা সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের নিমিত্ত এত যত্ন, এরূপ চেষ্টা কখন সম্পূর্ণ বিফল হইতে পারে না, তবে এ চেষ্টার যতদূর সফলতা লাভ করা উচিত দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই, এতদিনের এত আন্দোলন উদ্যমের ফলে বাল্যবিবাহ নিবারিত না হউক, শিশুবিবাহ একরূপ রহিত হইয়াছে। বঙ্গের জনকজননীর অন্তর হইতে গৌরী, পৃথিবী বা রোহিণীদানের সদিচ্ছাটুকু বোধ হয় যেন চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ স্থলে এক দুই অথবা তিন চারি বৎসরের বিধবার সংখ্যাও হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বহুবর্ষব্যাপী আন্দোলনের ফলে বঙ্গবালার ভাগ্যের আংশিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের জীবনব্যাপী দুঃখ দুর্দ্দশার মূলোচ্ছেদ হয় নাই, এখনও তাহাদের জীবন সুন্দর ও শান্তিময় করিবার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। যে ভাবে সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে শত

বৎসরেও যে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশায় অবসান হইবে সে আশা করা যায় না।

অভাগিনী বঙ্গবালার দুঃখে সহৃদয় পুরুষের প্রাণ কাঁদিয়াছে। পুরুষের হৃদয় ইহাদের দুঃখ মোচনে উন্মুখ হইয়াছে। দেশের সন্তানগণের ভবিষ্যজননী বালিকাদের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ পুরুষের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু রমণীকে এখনও এ কার্য্যে উৎসাহিত করে নাই। আমাদের প্রাণ বোধ হয় যেন আমাদের পরম স্নেহাস্পদা কোমলপ্রাণা বালিকাদের দুঃখে এখনও যথার্থ কাঁদে নাই। বঙ্গবালার দুঃখমোচনে, সমাজের উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য সহায়তা করিবার প্রকৃত ইচ্ছা এখনও আমাদের অন্তরকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও শক্তিশালী করে নাই। দেশাচারের অন্যায় শাসন উপেক্ষা করিয়া কল্যাণকর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার মত মানসিক বল জন্মে নাই। তাই, শুধু বালিকাদের নহে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতির কল্যাণকর এ সংস্কারচেষ্টা রমণীর সহানুভূতি ও সাহায্য অভাবে সফল হইতেছে না। সমাজে নারীর শক্তি পুরুষের অপেক্ষা কোন কোন অংশে স্বল্প ও সীমাবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু গৃহসংস্কার ও গৃহস্থালীর সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত রমণীর সাহায্য যেমন একান্ত প্রার্থনীয়, সমাজসংস্কার ও সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিতে হইলেও রমণীর সহায়তা অত্যাবশ্যক। এ সাহায্য ব্যতীত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন সামাজিক সংস্কারকার্য্যে সফলতা লাভ করা একরূপ অসম্ভব।

গৃহ বা সমাজসংস্কারে নিযুক্ত হইয়া রমণীগণ সকলে একমত হইয়া যাহা এক বৎসরে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, পুরুষের শত চেষ্টায় তাহা দশ বৎসরেও সম্পন্ন হইবে কি না সন্দেহ। সমাজসংস্কারে নারীর শক্তি আশ্চর্য্যফলপ্রদ হইলে কি হয়, অদূরদর্শিতা ও রক্ষণশীলতা আমাদিগকে পুরুষের কার্য্যে সহায়তা-বিমুখ করিয়াছে আমরা সকলই দেখিতেছি, সকলই বুঝিতেছি, তথাপি কোন বিষয়ে কোন একটা বিধি নামীয় অবিধির পরিবর্ত্তনে উৎসাহ নাই, কোন

একটা হিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা নাই। সেই একই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া রোদন! সেই একই পিতৃপিতামহের নিরয়গমনের অহেতুক আশঙ্কায় বালিকার জীবন অশান্তিময় করিবার আয়োজন!

বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটাইতেছে সকলই আমাদের দোষে। আমরাই বালিকাদের দুঃখ দুর্দ্দশার পথ প্রশস্ত রাখিয়াছি। আমাদেরই নির্ব্বুদ্ধিতা বহু শিশুর অকালমৃত্যুর কারণ। বহু সংসার অশান্তিময় হইবার হেতু।

আমরা—কন্যা ও বধূদিগের জননী ও শ্বশ্রূগণ—যদি অষ্টাদশ, ঊনবিংশ বর্ষের পূর্ব্বে (বিংশ লিখিতে সাহস হয় না, কেননা যে দেশের মেয়েরা কুড়ি হইলেই বুড়ি বিশেষণে বিশেষিত হইতে বাধ্য, সেখানে কুড়ি বৎসর বয়সের বধূ গৃহে আনিতে পরামর্শ দেওয়ার মত দুঃসাহস না রাখাই ভাল)—সংসারের গুরুভার-বহনোপযোগী শিক্ষা ও সামর্থ্য লাভের পূর্ব্বে, কন্যার বিবাহ না দিই, পুত্রবধূ গৃহে না আনি—একাদশ দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ সুতরাং বিবাহের উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অতিরিক্ত পণ আদায় করিয়া বধূর পিতাকে স্থলবিশেষে সর্ব্বস্বান্ত বা গৃহহীন না করি, কন্যাদায়গ্রস্তকে তাঁহার কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া রূপ অপরাধের দণ্ডস্বরূপ বরপণের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নগদ টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধিদ্বারা ঋণভারে প্রপীড়িত করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ না হই, তাহা হইলে যে বাল্য-বিবাহ রহিতকরণের জন্য পুরুষেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেন না তাহা কি অচির কালের মধ্যেই রহিত হইয়া যায় না? বিধাতার দান কুমারী-জীবনের নির্দ্দিষ্ট সুখটুকুও ঐ বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পায় না? ভবিষ্যতে সুখের সংসার স্থাপন করিবার জন্য আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা ও আদর্শ গৃহিণী হইবার জন্য শিক্ষালাভের যথেষ্ট সময় পায় না? অবশ্যই পায়, কিন্তু সে সুযোগ দেয় কে? সংসারে

আমরা ভয়ের শাসনেই ত সদা ব্যস্ত। দেশাচারের ভয়, সমাজের ভয়, নরকের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, কতদিকের কতবিধ ভয়ের শাসনে আমাদের মনের স্বাধীনতা নষ্ট; আমাদের স্বদোষ স্বীকারের সাহসটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও কোন প্রতিবিধান না করিয়া শুধু অদৃষ্টকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকি কেন? আমাদের চোখের উপর আমাদেরই ননীর পুতুলি মেয়েগুলি, বৌগুলি অসময়ে সংসারে প্রবেশ করিয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছে দেখিয়াও এই অকল্যাণপ্রসূ বাল্যবিবাহপ্রথা রহিত করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই না কেন?

এ পর্য্যন্ত অনেক প্রবীণা ও নবীনা গৃহিণীর সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার সংস্কার সাধন যে অতি কর্ত্তব্য, সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু যৌবন-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না, ইহাতে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে পাপস্পর্শ করিবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহাদের বিষম সন্দেহ আছে। তারপর শাস্ত্রবচনাদি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া নানা দোষাদোষের আলোচনা করিয়া যদি এ সন্দেহ ভঞ্জন করা যায়, তথাপি অবশিষ্ট থাকে সমাজের ভয়। ইহা ত দেখি ধর্ম্মভয় অপেক্ষা প্রবল। ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনে ইঁহারা অধিক সন্ত্রস্ত। সত্যের, ধর্ম্মের বা মঙ্গলের অনুরোধে, স্নেহ বা প্রীতির আকর্ষণে দেশাচার বা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিবার সাহস নাই! অনেক সময় অনেক কোমলহৃদয়া সৎবুদ্ধিসম্পন্না গৃহিণীকে দুঃখিতভাবে সেই অতি পুরাতন কথাটী বলিতে শুনিয়াছি—"বুঝি ত মা সব কিন্তু কি ক'রব, সমাজের নিয়মে আবদ্ধ ত আমরা, সে নিয়ম কি আর রদ্ ক'রতে পারি। চিরকাল যা' হয়ে আসচে, বাপ পিতামহ যা' করে গিয়েছেন তোমার আমার মতে তা কি আর উল্টে যাবে?"

কথাটা নেহাত মিথ্যা নয়, সমাজশাসন অথবা দেশাচারকে লঙ্ঘন করা বড় সহজ কথা নয়। দু'দশ জনের কাজ নয়। কিন্তু

এই সমাজ—বাধ্য প্রজার মত নিরন্তর আমরা যাহার নিয়মের অধীন, যাহার ভয়ে সদা সশঙ্কিত—এই অদ্ভুতকর্ম্মা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পদার্থটী কি ?

বাস্তবিক ইহা কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষ নহে এবং অনেক সময় অনেক বিষয়ে ইহার প্রাণহীনতার পরিচয় পাইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাণহীন জড় নহে। দেশের ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সৎ অসৎ, উচ্চ নীচ, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীকে লইয়াই একটী সমাজ এবং ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধি বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ও ক্ষমতাবান্, তাঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত নিয়মসমূহ সামাজিক নিয়ম নামে উক্ত। সমাজভুক্ত বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রত্যেক নরনারী সেই সামাজিক নিয়ম, সমাজশাসন মান্য করিতে বাধ্য। সে বিধি সে শাসন সমাজের হিতের নিমিত্ত। প্রাচীন ঋষিগণ যাহা প্রজাকুলের হিতের নিমিত্তই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা হইতে অমঙ্গল প্রসূত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি সেই বিধিই মানিয়া চলিতাম তাহা হইলে আজ ভারতে এক বৎসর বয়স্কা হিন্দুবিধবা থাকিত না, দশ এগার বৎসরের বালবিধবাকে দারুণ গ্রীষ্মে একাদশীর দিন একবিন্দু তৃষ্ণার জলে বঞ্চিত হইয়া নয়নজল ফেলিতে হইত না। ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাকে সন্তানশোকে কাতর হইতে বা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা বধূকে গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সে বিধি এখন সম্রাট্, সামাজিকগণ তাহার অনুগত প্রজা এবং দেশাচার সেই সম্রাটের প্রতিনিধি। সম্রাট্ অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত বিধি—তিনি তাঁহার সিংহাসনেই থাকেন, তাঁহার দেখা বড় সহজে কেহ পায় না, সুতরাং প্রতিনিধি দেশাচারেরই এখানে প্রাধান্য ; তাহারই প্রবল প্রতাপে সকলে সন্ত্রস্ত। দেশাচারের বিধিই সকলের সুবিদিত, তাহাই সমাজ-বিধি, তাহার পালনেই সকলে বাধ্য। যে ইহা নির্ব্বিচারে পালন করিতে সমর্থ সেই উত্তম সামাজিক বা বাধ্য প্রজা, সুতরাং সমাজপতির প্রসন্নতা লাভে সমর্থ। কিন্তু যে মন্দভাগ্য ইহার ন্যায়ান্যায় বিচারে উদ্যত, বিধি নামীয়

অবিধির উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প, কুপ্রথার বশবর্ত্ত হইতে অসম্মত, দেশাচারের নিকট তাহার শাস্তি অনিবার্য্য, সমাজে তাহার নির্য্যাতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করা সহজ-সাধ্য নয়, এই বোধেই কেহ ইহার ধর্ম্মানুমোদিত শাস্ত্রসম্মত পরিবর্ত্তনেও সাহসী হয় না বুঝিলাম। কিন্তু শত শত নরনারী লইয়া যে সমাজ, শত মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রসূত যে সামাজিক নিয়ম দু' একজন যদি তাহার বিরুদ্ধবাদী হয়েন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে পারা যায় না, কিন্তু, যখন কোন বিশেষ নিয়মের বিরুদ্ধে শত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, শত লেখনী তাহার অন্যায় ঘোষণা করে, সহস্র হস্ত তাহা নিবারণে উত্থিত হয়, শত শত চিত্ত ব্যথিত হইয়া তাহার উচ্ছেদ কামনা করে, তথাপি কেন সে প্রথা রহিত হয় না? আপন ভ্রম বুঝিয়াও কেন সমাজ অবিলম্বে তাহা সংশোধন করে না; অথবা স্থল বিশেষে সংশোধন চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে না? সমাজ যদি প্রাণহীন নয়, যদি কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মৃন্ময় স্তূপ নয়, বাস্তবিক জ্ঞানধর্ম্মবিশিষ্ট সদসৎবুদ্ধিসম্পন্ন সজীব মানবের সমষ্টি, তবে কেন, কোন্ কারণে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়?

মনে হয়, পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবই ইহার অন্তরায়। স্ত্রী এবং পুরুষ লইয়া সমাজ, স্ত্রীলোক সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ, একথা আমরা প্রত্যেকেই স্বীকার করি এবং আমরা যে পুরুষের সৎকার্য্যের সঙ্গিনী, সংসার পালনে সহায়তাকারিণী সহধর্ম্মিণী ইহা স্পষ্ট বলিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা তাঁহাদের সৎকার্য্যের, তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সাধনের কতটুকু সাহায্য করি তাহা একটু ভাবিয়া দেখি না।

ইহার প্রমাণ এই বাল্যবিবাহ রহিতকরণ চেষ্টায়। সহধর্ম্মিণী যদি সত্যই সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইতেন, যথাসাধ্য চেষ্টায় স্বামীর সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন, তাহা হইলে আর এমন হইত না যে, স্বামী প্রকাশ্য সভায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে অপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে

ফিরিলেন; গৃহে সহধর্ম্মিণী দেশাচারের ভয়-ভীতা বঙ্গের কন্যাদায়-গ্রস্তা জননী, হয়ত তখন তাঁহারই অবিবেচনার সমালোচনায় ব্যস্ত—"ওগো ঘরে যাঁর এগার বার বছরের আইবুড়ো মেয়ে তাঁর কি এ সভাসমিতিতে ঘুরে অনর্থক সময় নষ্ট করা শোভা পায়?" স্ত্রী হয়ত জানেনই না যে তাঁহার স্বামী সভায় কোন্ বিষয়ের আলোচনায় নিজের অবিবাহিতা কন্যাটীর বিবাহের চিন্তায় বিরত ছিলেন। স্বামী গৃহ প্রবেশের স্বল্পক্ষণ পরেই গৃহিণী পাখা হস্তে বাতাস করিতে করিতে নানা অনুরোধ উপরোধ যুক্তি পরামর্শে বাল্যবিবাহ বিরোধীর উৎসাহ ঠাণ্ডা করিতে বসিলেন। কিন্তু সে জলন্ত উৎসাহ কি সহজে ঠাণ্ডা হয়, একদিনে না হয় দুদিনে দশদিনে, বহুযত্নে বহুচেষ্টায় অবশেষে অবলার মহাস্ত্র অশ্রুপাতের দ্বারা তিনি সে অসাধ্য সাধনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইলেন। বাকী যেটুকু রহিল, আত্মীয় স্বজন ও কন্যার ভাবী শ্বশুর মহাশয় তাহা পূরণ করিয়া লইলেন, অর্থাৎ দশচক্রে মিলিয়া বাল্যবিবাহ বিরোধীর দ্বারাই তাঁহার স্বীয় বালিকা কন্যার শুভবিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। নহিলে সমাজবিধি যে শক্তিহীন হইয়া পড়ে, দেশাচারের মান রক্ষা হয় না; আর হিন্দুঘরের ছেলে মেয়ের জননীদের ছোট্ট মেয়েটীর বিবাহ দিয়া ছোট্ট একটী জামাই আনিবার এবং ছোট্ট একটী টুকটুকে বউ ঘরে আনিয়া ঘর আলো করিবার সাধ যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

আবার, নানা অবশ্যম্ভাবী কারণে কন্যার জননীকে অনেক সময় উদার ভাবাপন্না দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কন্যার শ্বশ্রূঠাকুরাণীদের প্রায়ই প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিতে দেখা যায়, এবং বাধ্য হইয়া সকলকে তাঁহাদের মতই শিরোধার্য্য করিতে হয়, যেহেতু সকলেই জানেন, বিবাহিত জীবনের আরম্ভে অধিকাংশ স্থলে শ্বশ্রূবর্গের সুদৃষ্টি কুদৃষ্টির উপরই নববধূর শুভাশুভ, আনন্দ নিরানন্দ নির্ভর করে।

যাহা হউক, সকল দিক দেখিয়া বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, হিন্দু সমাজের বিবাহ-সংস্কার শুধু পুরুষের নয়, স্ত্রীপুরুষে মিলিত

সাহায্য ও সামর্থ্য ব্যতীত সুসম্পন্ন হইবে না। সমস্ত হিন্দুনারীর সহানুভূতি, একতা ও মিলিত 'চেষ্টার' উপর ইহার সফলতা নির্ভর করিতেছে। মানব জীবনের যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল হয় মানব মাত্রেরই যেমন তাহা করা কর্ত্তব্য, নারীর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব হয় নারী মাত্রেরই তাহা করা কর্ত্তব্য, ইহাই ভাবিয়া, একবার আমার দেশের জননী ও ভগিনিগণ সকলে একমত হইয়া এই কুপ্রথাটির উচ্ছেদ সাধন করুন। এক্ষণে দেশে অতি অল্পই পুরুষ আছেন যাঁহারা বাল্যবিবাহের কুফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার উচ্ছেদ কামনা না করেন। শুধু আপনাদের ইচ্ছা হইলেই অতি সহজে ও অতি অল্পকালের মধ্যেই ইহা রহিত হইয়া যাইবে। জগতে অকাল মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী, এখনও যদি এই বাল্যবিবাহের প্রচলন রহিত করা না হয়, আজ না হয় দশ বৎসর পরে, দশ বৎসর না হয় শত বৎসর পরে য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতির ন্যায় এদেশেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবে। সতীর দেশে, সীতা সাবিত্রীর দেশে তাহা কি রমণীকুলের গৌরবজনক হইবে? না তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বর্গগমনের পথ প্রশস্ত হইবে? বাল্যবিবাহ রহিত করুন, বিধবাবিবাহ কথাটির অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

আর শুধু যে বালিকাদের বিবাহের সময় পিছাইয়া দিলেই হইল তাহা নহে, এই অবসরে তাহাদের এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রত্যেকে আপনাপন কর্ত্তব্য সুন্দর ভাবে বুঝিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। এ শিক্ষা শুধু বর্ত্তমান স্কুলের পরীক্ষা পাশ ও অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম শিল্প বা দুই একটা সাংসারিক কাজেই সমাপ্ত না হয়। এ সেই শিক্ষা যাহাতে হিন্দুর আদর্শ-নারী চরিত্রের আলোকপাতে হিন্দুবালাদের হৃদয় উজ্জ্বল, চিন্তা নির্ম্মল, আকাঙ্ক্ষা বিলাস-বাসনা-শূন্য ও পবিত্র হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে পতি ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অর্থ কি তাহাও যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

এ শিক্ষা শুধু গৃহে বা শুধু স্কুলে হইলে সম্পূর্ণ ও সুন্দর

হইবার আশা করা যায় না। প্রত্যেক হিন্দু নারী প্রত্যেক জননী এবং শিক্ষয়িত্রী আত্মপর নির্ব্বিশেষে যদি এ শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তবেই ধীরে ধীরে সমাজের এক মহান্ সুমঙ্গল সাধিত হইবে। হিন্দুমহিলাগণ ব্রতের ন্যায় ইহা পালন করিলে পবিত্র অনন্ত-ব্রতের ফল লাভ করিবেন। বঙ্গবালার জীবন সুন্দর, সংসার সুখের হইবে।*

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস্-সি)

পল্লীগ্রামই অন্তর্ম্মুখী হিন্দুজাতির সভ্যতার কেন্দ্র। এই স্থানেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সৌন্দর্য্যের মহান্ আকর-স্বরূপ সুন্দরের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই পল্লীগ্রামের শান্তিময় নিস্তব্ধতায় তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইত—এবং তখন তাঁহারা সেই অতীন্দ্রিয় চিদ্‌ঘন সুন্দরের আভাস পাইয়া ধন্য হইতেন। এই পল্লীগ্রামের অনতিদূরে বৃক্ষলতাসুশোভিত নিভৃত তপোবনমধ্যস্থ ঋষিদের আশ্রমগুলি চতুর্দ্দিকে আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গ প্রেরণ করিত, এবং পল্লীবাসিগণ ঐ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার রূপ মহান্ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া যথার্থ আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলির

---

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধটীতে নারী নারীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন; সুতরাং তাহা প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই হেতু আমরা ইহা পত্রস্থ করিলাম। (উদ্বোধন সং)

যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে, ধূপ ধূনা পুষ্পচন্দনের সৌরভে প্রত্যেক গৃহে পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিত।

আজও পল্লীগ্রামে প্রাকৃতিক সুষমার অভাব নাই, কিন্তু আমরা সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম—উহার স্রষ্টার অন্বেষণ ত দূরের কথা। আজও প্রভাত-তপন বর্ণচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শীর্ষদেশে আবির্ভূত হন, আজও বিহগকুল সুললিত কণ্ঠে পল্লীগ্রাম মুখরিত করে, কিন্তু ইহাতে আমাদের মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না। দিগন্ত-বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রের শ্যামল বক্ষে পবনচালিত তরঙ্গগুলি দর্শনে আমাদের হৃদয়ে আনন্দলহরী উত্থিত হয় না। পল্লীগ্রামের শান্তিময় নিস্তব্ধতা এখনও বিদ্যমান, কিন্তু আমাদের চিত্ত বিক্ষেপ-শূন্য হইয়া গভীরধ্যানে লীন হয় না।

ইহার কারণ আমরা আমাদের মহান্ আদর্শ হারাইতে বসিয়াছি। ভগবৎলাভের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করাই যে মানবের মহান্ আদর্শ তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। সেইজন্যই পল্লীগ্রামের বিশেষ প্রয়োজ-নীয়তাটী আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। যদি আমাদের জীবন-সাধনায় ঐ প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুভব করি তাহা হইলে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ঐ কারণগুলি দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইব কিছুতেই স্থান ত্যাগ করিব না।

পল্লীগ্রামের অধুনাতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে উহার দুরবস্থার জন্য আমরাই অনেকটা দায়ী। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যাভাবই একটী প্রধান অভাব। প্রত্যেক বাড়ীতেই অন্ততঃ একজন প্লীহা যকৃত ও ম্যালেরিয়ায় বার মাস ভুগিতেছে, এতদ্ব্যতীত পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ বৎসরে দুই তিন মাস শয্যাশায়ী থাকেন। অনেকেরই শরীর শীর্ণ ও নিস্তেজ, জীবনীশক্তি

হ্রাসপ্রাপ্ত। এতদ্ব্যতীত কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপে মাঝে মাঝে পল্লীগ্রাম বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যপালনের অতি সাধারণ, সহজ এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ নিয়মগুলি পালন করিতেও নারাজ।

কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির বীজ অপরিষ্কার জলের ভিতরে বৃদ্ধি পায় এবং উহা ঐ জলের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। এই কথাটী অতি সহজ হইলেও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না—আমরা স্বেচ্ছায় পুষ্করিণীর জল অপরিষ্কার করি।

পল্লী-রমণীগণ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে প্রস্রাব ও শৌচাদি করেন এবং বিষ্ঠাযুক্ত কন্থা প্রভৃতি ধৌত করেন। অধিক কি, পল্লীবাসী পুরুষগণও অনেক সময় ঘটি কিম্বা গাড়ু বহন করা অসুবিধাজনক বোধ করিয়া শৌচাদি পানীয় জলের পুষ্করিণীতে সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয়তঃ, যে স্থানে কূপ খনন করা যাইতে পারে সেই স্থানে যাঁহাদের অর্থবল আছে তাঁহারাও কূপ খনন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। পুষ্করিণী অপেক্ষা কূপের জল সমধিক পরিষ্কার এবং উহাতে প্রস্রাব শৌচাদি অসম্ভব বলিয়া ঐ জল পরিষ্কার রাখা আদৌ শক্ত নহে।

তৃতীয়তঃ, অপরিষ্কার জল যদি ফুটাইয়া ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ঐ জল শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। পল্লীগ্রামে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব নাই এবং তিনটী কলসী ক্রয় করিয়া কয়লা ও বালির ফিল্টার তৈয়ারী করিতে কিছু ব্যয় হয় না বলিলেও চলে। তথাপি আমরা এইরূপ ভাবে পানীয় জল পরিষ্কৃত করিয়া সেবন করিতে নারাজ।

অনেক বাটীর চতুর্দ্দিকে আগাছা বৃদ্ধি পাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন হইয়া উঠিতেছে; পাঁশকুড়গুলি হিমালয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হইতেছে। হয় ত বাড়ীর মধ্যেই প্রাচীরের এক কোণে একটী

ডাবায় অকারণ মাসাবধি জল জমিয়া পোকা মাকড়ের বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। পল্লীরমণীগণের এবং বালকবালিকাদিগের পরিধেয় বসনের মলিনতা রক্ষা করা যেন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লীরমণীগণ এক অদ্ভুত শুচি-জ্ঞানের প্রেরণায় অনেক সময়ে বিনা কারণে দিনে তিন চারিবার স্নান করিতে বাধ্য হন। সিক্ত বসনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া তাঁহারা শুচি রক্ষা করেন। আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু-মৃত্যুর জন্য যে আমরা দায়ী তাহা 'স্বাস্থ্য সমাচারের' নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—

"আমাদের শিশুরা কিরূপ উপেক্ষিত হয় তাহা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই দেশের ভীষণ আঁতুড়ঘরকে যমের ঘরও বলা যায়। উহার মধ্যে আলো ও বায়ু প্রবেশ নিষেধ। এই ঘরে সন্তানকে যে ধাত্রী ধারণ করিয়া থাকে সে কিরূপ অজ্ঞ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই নাই। সেই অশিক্ষিতা নারী তাহার অপরিচ্ছন্ন হস্তে যেমন তেমন ছুরী বা বাঁশের চটা দিয়া শিশুর নাড়ী ছেদন করে। এমন অবস্থায় যদি শিশু ধনুষ্টঙ্কারে না মরে ত কে মরিবে?"

পল্লীগ্রামের দ্বিতীয় অভাব অর্থাভাব। ক্বচিৎ দুই এক গ্রামে এক আধ জন জমীদারের বাস। সাধারণতঃ, পল্লীগ্রামে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়—মধ্যবিত্ত, দীনমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী। প্রথম শ্রেণীর লোকসংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর অনুপাতে অতি নগণ্য। এক্ষণে দেখা যাউক শ্রমজীবী ও দীনমধ্যবিত্ত ব্যক্তিদিগের অবস্থা কিরূপ। এই বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জানা উচিত যে, যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত অধিক অংশ অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয়িত হয়। এই তথ্য অনুসারে দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গণনায় বিভিন্ন বিষয়ে এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পারিবারিক ব্যয়ের যে অনুপাত জানা যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মজুর		কৃষক		সূত্রধর		কর্ম্মকার		দোকানদার		দীনমধ্যবিত্ত	
১। খাদ্য	৯৫.৪	} ৯৯.৪	৯৪.০	} ৯৭.০	৮৪.৫০	} ৯৬.৫	৭৯.০০	} ৯০	৭৭.৭	} ৮৬.৭	৭৪	} ৭৮.৭
২। বসন	৪.০		৩.০		১২		১১		৯.০		৪.৭	
৩। চিকিৎসা	০		১		১		৫.০		৫.৯		৮.০	
৪। শিক্ষা	০		০		০		০.০		১.০		৩.৩	
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	৬		২		২.৫		৪.৫		৫.০		৮.০	
৬। বিলাসের সামগ্রী	০		০		১.০		১.০		১.৭		২.০	
	১০০.০		১০০.০		১০০.০		১০০.০		১০০.০		১০০.০	

এই তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রমজীবী ও দীনমধ্যবিত্ত ব্যক্তির খাদ্য ও বসনের ব্যবস্থা করিয়া উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকে না। বিলাত ও আমেরিকার শ্রমজীবিগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীই সঞ্চয় করিতে সক্ষম। আমেরিকায় গড়ে শতকরা .৪ হইতে ৪০ ডলার পর্য্যন্ত ও ইউরোপে ১৬ হইতে ২২ ডলার পর্য্যন্ত সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই দুই স্থানের শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থার তুলনায় আমাদের শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থা কত হীন তাহা উপরোক্ত গণনা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যত্র আয় তত্র ব্যয় করিয়াই যদি আমাদের শ্রমজীবিগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত তাহা হইলেও ক্ষোভ হইত না। অনেক সময়ে সামাজিক ক্রিযাকলাপ, উৎকট পীড়ার চিকিৎসা অথবা আকালের জন্য শ্রমজীবিগণকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়।

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষিকার্য্যের অবনতি, অল্প মুল্যে শস্য বিক্রয়, উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ এবং বহুমূল্যে ব্যবহার সামগ্রী ক্রয়—এই চারিটীই প্রধান।

কৃষিকার্য্যের অবনতি নিবন্ধন ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষকগণ উপযুক্ত সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার

জানে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরিজীবী হওয়ায় জমীজমার খবর রাখেন না। বৎসরান্তে নিজের ভাগের শস্য বুঝিয়া লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, আর যাঁহারা গ্রামে থাকেন শস্য বৃদ্ধি করিবার কোন চিন্তা তাঁহাদের মস্তিষ্কে স্থান পায় না।

উপযুক্ত সার ও যন্ত্রের ব্যবহার দূরের কথা, ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থাও যথাযথ হইয়া উঠে না। আমেরিকায় কৃষকগণ বলে, বৃষ্টির জল ত আকস্মিক ঘটনা, উহার উপরে কৃষিকার্য্য কেন নির্ভর করিবে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষকগণ চাতকের মত বৃষ্টির জলের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। যথা সময়ে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। যে দেশে ১০।১২ হাত খনন করিলেই জল নির্গত হয় সেই দেশে কৃষিক্ষেত্রে জলের অভাব। ২০৲ ২৫৲ টাকা ব্যয় করিলে কৃষি-ক্ষেত্রের উপযোগী কূপ খনন করা যাইতে পারে, তথাপি পল্লী-বাসী মধ্যবিত্ত, এমন কি, ধনীব্যক্তিগণও এইরূপ কূপের ব্যবস্থা করেন না। তবে আমাদের দেশের তালুকদারের জমী টুকরা টুকরা অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। এমত অবস্থায় পাশা পাশি জমীগুলির স্বত্বাধিকারিগণ চাঁদা তুলিয়া কূপখননের ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ করেন না। আমরা রেলের লাইনের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত আছি। অবশ্য রেলের জন্য জলসরবরাহ অনেক কমিয়াছে, অনেক নদী খাল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও কূপ বা পুষ্করিণী খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা করা আমাদের সাধ্যাতীত নহে।

আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষকগণ কৃষির ক্রমোন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর। শুনিয়াছি, আমাদের দেশের এক জাতীয় অম্লরসযুক্ত লেবুর বীজ আমেরিকায় লইয়া গিয়া এমন বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে যে, সেই বৃক্ষে বার মাস অতি সুমিষ্ট বহুলরসযুক্ত বীজ-বিহীন কমলালেবু ফলিতেছে। আমাদের দেশের কণ্টকময় মনসা গাছ সেখানে কণ্টকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এই গাছ অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ভূমিতে বৃদ্ধি পাইয়া গো মহিষাদির উৎকৃষ্ট

খাদ্য যোগাইতেছে। আমেরিকার একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ নানা প্রকার ফলের কলমের সংমিশ্রনে প্রায় দুইশত নূতন ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষি-বিদ্যা অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ঠিক তখনই আমরা বলিতেছি কলিকাল পড়িয়াছে—মাতা বসুন্ধরা আর ফসল প্রসব করিতে পারিতেছেন না!

কৃষি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমরা দুর্ভিক্ষের কারণ সৃজন করিতেছি। যদিও ধান্য-শস্য নষ্ট হইবার বহু কারণ বিদ্যমান, তথাপি আমরা সমুদয় ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ধান্যের বীজ রোপণ করিয়া থাকি। যে বৎসর ধান্য শস্য নষ্ট হয় সে বৎসর আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য, কারণ, অন্য কোন প্রকার শ্বেত-সার-প্রধান খাদ্যশস্যের চাষ বিরল। ক্যাসাভা, চিনাবাদাম প্রভৃতি কতকগুলি শ্বেতসারপ্রধান ফসল আছে যাহা আমাদের দেশের মাটীতে সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে অথচ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে নষ্ট হয় না। ক্ষেত্রের এক অংশে যদি এইরূপ ফসলের চাষ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের সময় কুলের আঁটি খাইয়া জীবন ধারণের বৃথা চেষ্টা করিতে হয় না।

আমরা অনেক সময়ে লাভের আশায় খাদ্যশস্যের চাষ কমাইয়া, "যে সকল ফসল বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই সকল ফসলই অধিক পরিমাণে" উৎপাদন করিতেছি। পাটের চাষ ১৮২৯ সাল হইতে ("যখন কলিকাতার কাষ্টম হাউস্ পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন") ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া খাদ্যশস্য চাষের উত্তরোত্তর হ্রাস সাধন করিয়া আসিতেছে। আমরা ইচ্ছা করিয়া দুর্ভিক্ষের এই কারণটী সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছি।

দারিদ্র্যের দ্বিতীয় কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়। বৎসরের যে সময়ে কৃষকদিগের আর্থিকাবস্থা হীন হয়, সেই সময়ে তাহারা দাদন লইয়া মহাজনের নিকট অতি অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। "পাট চাষের জন্য কৃষকেরা আষাঢ় মাসে ৫৲

অথবা ৫।০ টাকা দাদন লইয়া আশ্বিন মাসে দালালকে এক মণ পাট দিয়া থাকে। এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া দালালেরা ১০ টাকা পাইয়া থাকে। তিসি অথবা বুট চাষের জন্য দালালেরা কৃষককে ৫ অথবা ১।০ টাকা দাদন দিয়া থাকে। তিন চারি মাস পরে দালালেরা কৃষকের নিকট এক মণ তিসি অথবা বুট পাইয়া উহা ৭ অথবা ২।।০ টাকা দরে সহরের হাটে বিক্রয় করে।"

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে নূতন শস্যের আমদানি হয়—অর্থাৎ যখন শস্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, কৃষকগণ ঠিক সেই সময়ে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অধিকন্তু তাহারা তাহাদের পরিমিত ফসল বড় বড় মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া দালালের নিকট অধিকতর অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

এই নিদারুণ দারিদ্র্যের তৃতীয় কারণ উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ। যদি কোন কারণে নিঃস্ব কৃষকের এক কালীন ২০।২৫ টাকা আবশ্যক হয় এবং যদি ফসল বিক্রয়ের দ্বারা ঐ টাকা সংগ্রহ করিবার সামর্থ্য না থাকে তাহা হইলে সে পল্লীবাসী কোনও কুশিদজীবীর ঋণজালে আবদ্ধ হয়। এ ঋণজাল কৃতান্তের পাশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। টাকাপ্রতি মাসিক চারি পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত সুদ পল্লীগ্রামে সাধারণ ব্যবস্থা। যে ব্যক্তি চারি পয়সা সুদে ২০ টাকা ধার করিবে তাহাকে বৎসরে প্রায় ১৫ টাকা সুদ দিতে হইবে। পূর্ব্বে কৃষকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ পর্য্যালোচনা করিয়াছি তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, খাদ্য ও বসনে ব্যয় বিশেষ সঙ্কুচিত না করিলে তাহার সঞ্চয় করিবার সংস্থান কিছুই নাই। সুতরাং ঋণবদ্ধ কৃষক কেবল মাত্র বাৎসরিক সুদ পরিশোধ করিবার নিমিত্তই অর্দ্ধোপবাস করিতে বাধ্য।

শুধু ইহাই নহে, ঋণবদ্ধ কৃষক উত্তমর্ণের নিকট একপ্রকার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। সুদভার লাঘব করিবার আশায় কৃষক শারীরিক পরিশ্রম এবং উৎপন্ন শস্যাদি বিনামূল্যে দান করিয়া উত্তমর্ণের প্রীতি উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হয়। অনেক সময়

উত্তমর্ণ মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া দরিদ্র কৃষককে ঐরূপ আচরণ করিতে বাধ্য করেন।

কুশিদজীবীদিগের ব্যবসায় অর্থশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। অর্থের ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা কেবল মাত্র একব্যক্তি লাভবান্ হয়, অর্থের সে ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট; সমাজের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। পল্লীবাসী ধনী ও মধ্যবিত্তগণ যদি ঋণদান ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মূলধন কৃষি ও শিল্পে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও অনেক লাভবান্ হইতে পারেন এবং সমাজেরও যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা ইচ্ছা করিলেই দারিদ্র্যের তৃতীয় কারণটী দূর করিতে পারি।

বহুমূল্যে ব্যবহার-সামগ্রী ক্রয় আমাদের পল্লীগ্রামের দারিদ্র্যের চতুর্থ কারণ। পল্লীগ্রামে উৎপন্ন শস্যাদি ও নানাপ্রকার গব্য দ্রব্য অল্প মূল্যে হইয়া থাকে বটে কিন্তু নুন, তেল, মশলা, চিনি বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ, পল্লীগ্রামের দোকানদারগণ অতি সামান্য মূলধনে ব্যবসায় করে বলিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের মহাজনদিগের নিকট পাইকিরী দরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, পল্লীবাসী দোকানদারগণ সামান্য একখানি দোকান হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে বলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে লাভাংশ রাখিয়া থাকে। অবশ্য ধারে বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া লাভাংশের হার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে তাহারা বাধ্য হয়। যদিও দারিদ্র্যের এই চতুর্থ কারণটী অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, তথাপি, আমাদের পল্লীগ্রামের ন্যায় নিঃস্ব স্থানে ইহা কিছুতেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বিদ্বৎসন্ন্যাস।

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বি এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অনন্তর আমরা বিদ্বৎসন্ন্যাস বর্ণনা করিব। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা পরম-তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারাই বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য সেই বিদ্বৎসন্ন্যাস সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বিষয় (এইরূপ বেদে শুনা যায়) যে জ্ঞানীদিগের শিরোমণি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য "বিজিগীষুকথায়" (বৃহদারণ্যক, তৃতীয় অধ্যায়) বহুবিধ তত্ত্বনিরূপণের দ্বারা আশ্বলায়ন প্রভৃতি বিপ্রগণকে জয় করিয়া "বীতরাগকথায়" (বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অধ্যায়) সংক্ষেপে ও সবিস্তর অনেক প্রকারে জনককে বুঝাইয়াছিলেন। তদনন্তর মৈত্রেয়ীকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে (নিজের অনুভূত) তত্ত্বের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য স্বয়ং যে সন্ন্যাস সম্পাদন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহার প্রস্তাব করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে বুঝাইয়া সন্ন্যাস সম্পাদন করিলেন। এই দুই (সন্ন্যাস প্রস্তাব ও সন্ন্যাস সম্পাদন) মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণের (বৃহ, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের) আদিতে ও অন্তে পঠিত হইয়া থাকে। যথা—"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যো ঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি" (বৃহ, ৪।৫।২) (তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কহিলেন, "হে মৈত্রেয়ি, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই স্থান হইতে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি") এবং "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" (বৃ—৪।৫।১৫। [অরে, ইহাই (সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ) নিশ্চয় অমৃতত্ব (অর্থাৎ

অমৃতত্ব সাধনের উপায়) এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন]।

কহোল ব্রাহ্মণেও বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা' এইরূপ পঠিত হইয়া থাকে। যথা, "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি, (বৃহ, ৩।৫।১) [সেই আত্মাকে এইরূপ জানিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ পুত্রকামনা বিত্তকামনা এবং লোককামনা (অর্থাৎ ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা) পরিত্যাগ করিয়া (পরিশেষে) ভিক্ষাচর্য্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন]।

এ স্থলে কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন যে বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদন করাই বাক্যের তাৎপর্য্য। কেননা তাহা হইলে বিদিত্বা এই শব্দের 'ত্বা' প্রত্যযের (অর্থাৎ উক্ত বাক্যান্তর্গত "জানিয়া" শব্দের "ইয়া' প্রত্যযের) পূর্ব্বকালবাচিত্বের (অর্থাৎ জানবার পর এই অর্থের) ব্যাঘাত ঘটে, এবং ব্রাহ্মণ শব্দের ব্রহ্মবিদ্ অর্থেরও ব্যাঘাত ঘটে। এস্থলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি বুঝাইতে পারে না, কেননা, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের * শেষে যে "অথ ব্রাহ্মণঃ' (অনন্তর ব্রাহ্মণ) এইরূপ শব্দ প্রযোগ আছে, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ "পাণ্ডিত্য, বাল্য, ও মৌন" এই শব্দত্রযের দ্বারা সংসূচিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন উল্লিখিত হইয়াছে।

(শঙ্কা)—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সেই স্থলে বিবিদিষা সন্ন্যাসযুক্ত এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি 'ব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে, যথা, 'সেই হেতু 'ব্রাহ্মণ' পাণ্ডিত্য (বেদান্তবাক্য বিচাররূপ শ্রবণ) পরিসমাপ্ত করিয়া বাল্যের সহিত

* শ্রুতি বাক্যটী এইরূপ— (বৃহ, ৩।৫।১) '...ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি...তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ"।

(অর্থাৎ অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণ সামর্থ্যরূপ জ্ঞানবলে যুক্ত হইয়া) অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন।"

(সমাধান)—(তবে তদুত্তরে বলা যাইবে) এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা তথায় "ভবিষ্যদ্বৃত্তি" অর্থাৎ পরে যিনি 'ব্রহ্মবিদ্' হইবেন এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাহা না হইলে এস্থলে যে "অথ" শব্দের অর্থ 'অনন্তর' অর্থাৎ সাধনানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী কালে সেই 'অথ' শব্দের "অথ ব্রাহ্মণঃ" এইরূপে কেন প্রয়োগ করা হইল ?

শারীর ব্রাহ্মণেও (বৃহ, ৪,৪,২২) বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাস এই দুই সন্ন্যাস স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—"এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি—[এই আত্মাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল যোগী) হয়েন, এই আত্মলোক পাইবার ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজনশীল (মুমুক্ষুগণ) প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।] 'মুনি' শব্দে 'মননশীল' বুঝায়। অন্য কোনও প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না থাকিলেই এই মননশীলতা সম্ভবপর হয় সুতরাং ইহা দ্বারা সন্ন্যাসই সূচিত হইতেছে। (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতিবাক্যের শেষে এই কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলা হইয়াছে। "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি ইতি"। [সেই এই (সন্ন্যাসাবলম্বনের স্পষ্ট কারণ) এইরূপে (স্মৃত হইয়া থাকে)—প্রাচীন আত্মজ্ঞগণ প্রজা (সন্ততি, বিত্ত, কর্ম্ম ইত্যাদি) কামনা করিতেন না ; (তাঁহারা বলিতেন) আমরা—যাহাদের এই (নিত্য সন্নিহিত) আত্মাই এই লোক সেই আমরা—প্রজা লইয়া কি করিব ? এই হেতু তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও স্বর্গাদি লোক কামনা পরিত্যাগ করিয়া, তদনন্তর ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতেন। এই আত্মাই এই লোক—এই স্থলে "এই লোক" অর্থে যে লোক বা পুরুষার্থ তাঁহারা অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন।

(শঙ্কা)—এস্থলে যদি আশঙ্কা করেন যে এস্থলে মুনিত্বরূপ ফলের দ্বারা (অর্থাৎ মুনি হইবার) প্রলোভন দেখাইয়া বিবিদিষা সন্ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে, এবং বাক্যশেষে তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে; এই হেতু বিবিদিষা সন্ন্যাস ব্যতীত অন্য সন্ন্যাস কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

(সমাধান) তবে আমরা বলি, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'বেদন' অর্থাৎ আত্মাকে জানা; বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল। যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে আত্মাকে জানা ও মুনি হওয়া একই কথা, তবে বলি, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কেননা, "(আত্মাকে) জানিয়া মুনি হয়েন" এস্থলে আত্মাকে জানা হইবার পর মুনি হওয়া যায় এইরূপ বলায় পূর্ব্বকালীন আত্মজ্ঞানের সহিত উত্তরকালীন মুনিত্বের সাধন ও সাধ্য (উপায় ও উপেয়) সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
৫।৬।১৬।

পরম স্নেহভাজনেষু—

কয়েক দিন হল তোমার পত্র পেয়েছি। গতকল্য রাত্র হতে এখানে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। বোধ হয় তোমাদের ওখানেও এ বৃষ্টি বাদ যাবে না। বিশ্ববিধাতা ভগবান্ না দিলে মানুষের দানে লোকের অভাব কখনই মিটে না। এই সব দুঃখ কষ্ট রোগ শোকের মধ্যেও প্রভুর লীলা দেখ্‌বার চেষ্টা কর। তিনি পরম কল্যাণময়। আমরা মাটীর খেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনী কাঞ্চন মান-যশ

পেয়ে সব বিস্মরণ। তাই কৃপানিধান দয়া করে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে 'বহুজনহিতায়' আনেন। শেখ দেখে দেখে—কেবল শিক্ষা কর। 'কেবল মাত্র দুমুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই—মহত্ত্ব দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন উদার হৃদয় কেমন করে লাভ কত্তে হয় শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এ যুগের অবতার বলেছেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"। এ ভাব প্রত্যক্ষ কর, মানব জীবন ধন্য কর, স্বামিজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর। বুঝ্ছ না, আমরা কি এখানকার কর্ত্তা? ভগবৎ শক্তির বিকাশ এখানে, সেই শক্তিবলে তোমরা ঐসব কাজ কর্ত্তে সমর্থ, জান না কি স্বামিজী লিখে গেছেন, "তিনি সূক্ষ্ম দেহে এই সঙ্ঘের মধ্যে বর্ত্তমান"? বিশ্বাস কর, সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের আদেশবাণী। বিশ্বাস কর—তোমাদের কর্ম্মপাশ কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিহে! তোমরা কি সাধারণ লোক? ভুলে গেছ কি যে আদ্যাশক্তির কৃপা লাভ করেছ? জগতের কটা লোকের এ সুযোগ সৌভাগ্য হয় বল? আমার খুব ভাল লাগে 'নাহং নাহং' ভাব। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী। কৃপাময় কেবল এইটী বোঝাচ্ছেন রোজ রোজ। মহারাজ বলেন, তোমাদের কোটী কোটী জন্মের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে ঐ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্ম্মে—এ কেবল স্তোকবাণী নয়, সত্য কথা জানবে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে হরির সেবা কচ্ছ। ঐ মূর্খ জড়প্রায় গণ্ডগ্রামে ঠাকুরের লীলা দেখে অবাক্ হচ্ছ! এ কার ঐশ্বর্য্য মনে কর? এর মধ্যে কি কিছু শিখ্বার নাই? বলি তুমি কে মাধাইদাস যে লোকে তোমার মুখে ঠাকুরের কথা শুন্বার জন্য উদ্গ্রীব? এইখানেই প্রভু-শক্তির বিকাশ। তুমিও সেই দেববাণী শুনাতে যেতে যাও নাকি? সাধন ভজন কার নাম? অনন্ত আকাশে লম্বা লম্বা কল্পনা জল্পনা নিয়ে থাক্লেই কি বড় হওয়া চলে? কবিত্ব ছেড়ে কাজে লেগে যাও,

জীবন দেখাও, আদর্শ ত রয়েছে সাম্‌নে—ভয় কি? হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। মহারাজ, মহাপুরুষ প্রভৃতি ভাল আছেন। তোমরা তাঁদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা ভাল আছি। তোমাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিবে। ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করিতেছেন সর্ব্বদা মনে রাখিবে। দেখ্‌তে পাচ্ছ ত সব, এতেও অবিশ্বাস আন কেন? নিঃস্ব চাষাদের যদি বীজধান্য কিম্বা হাল দরকার, বৃন্দাবন প্রেমানন্দের কর্ত্তাকে লিখিলে পাইবে। * * * তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। * * * ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
১০।৭।১৬।

কল্যাণবরেষু—

হাঁসপাতাল খোলা সম্বন্ধে কে—তোমাদের জানাইয়াছে, আমারও সেই মত। যদি উহার অভাব না থাকে তবে হাঁসপাতাল হতে বিরত হওয়াই উচিত। ও এক ত নটখটে ব্যাপার। এই সাময়িক দুর্ভিক্ষে লোক পাঠানই বেজায় মুস্কিল, তার উপর বহুদিনের জন্য সেবা কার্য্যে পাঠান মহা হাঙ্গামার কাজ।

স্বামিজীরও ইচ্ছা ছিল বিদ্যাদান। ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প। কেবল সেবাশ্রম আর সেবাশ্রম! ও এক হুজুক উঠেছে কেন নূতন কি কিছু কর্‌বার নাই? স্বামিজী শেষ দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কাছে কেবল বিদ্যা প্রচারের কথা বলেছিলেন। ইহাতে তোমাদের ও দেশের মহা কল্যাণ হবে, ইহা ধ্রুব সত্য, ইহা ধ্রুব সত্য। তোমাদের আদর্শ জীবন দেখ্‌লে ছেলেরা এক অপূর্ব্ব নবজীবন লাভ কর্ব্বে। হও তোমরা এই বিদ্যাপ্রচারের পথ প্রদর্শক। সাধুসঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা কর্‌লে দেশের শ্রী ফিরে যাবে,

লক্ষ্য স্থির হয়ে যাবে ছেলেদের। তবেই ছেলেরা শুধু মানুষ কেন দেবতা হবে—ঋষি হবে। * * *

মহারাজ মান্দ্রাজে ভাল আছেন। এখানকার কুশল। তোমরা আমার স্নেহসম্ভাষণ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।
৭।৮।১৬

স্নেহভাজনেষু—

তোমার পত্র পড়িলাম। দীক্ষা গ্রহণ খুব দরকার। যেখানে তোমার শ্রদ্ধা সেইখানেই মন্ত্র নিতে পার। কথায় শুনেছি ঠাকুরের কাছে "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল।" অর্থাৎ মনের দয়ার বিশেষ প্রয়োজন। চাই শুদ্ধ মন। 'মন চাঙ্গা ত কঠোরে যে গঙ্গা'। পাব পাব—এই মন নিয়েই ভগবান্ লাভ কর্ব্বো, চাই এই দৃঢ় বিশ্বাস। হবে হবে, আমার হবেই হবে, চাই এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। ক্ষেত্র তৈয়ার হয়ে থাক, ভাল বীজ পড়লেই অমনি গাছ। দেখা দেখি দীক্ষা নিলে কি হবে? অনুরাগ বাড়াও, তীব্র বৈরাগ্য ব্যাকুলতা আসুক, তবেই ত কৃপা অনুভব কর্ব্বে—শান্তি লাভ কর্ব্বে। গোপনে গোপনে ডেকে যাও ভগবান্‌কে, মনে মনে প্রাণে প্রাণে টান্‌তে হবে তবেই উপস্থিত হবেন ঠাকুর। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

তর্কামৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীজগদীশ তর্কালঙ্কার বিরচিত। অনুবাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—লোটাস লাইব্রেরী, ২৮।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন ৬৪ পৃঃ, মূল্য ॥০ আনা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় অনুবাদটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় গ্রন্থের একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গদেশ একসময়ে নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল—এক্ষণে নানা কারণে এই চর্চ্চার প্রসার খুব কমিয়া গিয়াছে। যাহাতে এই চর্চ্চা আবার বাড়ে, রাজেন্দ্রবাবু তদুদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই 'ব্যাপ্তিপঞ্চকে'র বিস্তারিত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাহাতে প্রথমশিক্ষার্থিগণও এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইতে পারেন তদুদ্দেশ্যেই ইঁহার এই বর্ত্তমান প্রয়াস। এতদুদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বঙ্গদেশে 'ভাষাপরিচ্ছেদ' ও পশ্চিমাঞ্চলে 'তর্কসংগ্রহ' অধীত হয় বটে কিন্তু নৈয়ায়িকশিরোমণি জগদীশ বিরচিত এই গ্রন্থখানি এই বিষয়ে অনেকের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ন্যায় শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ আচার্য্যসমূহের মধ্যে একমাত্র ইনিই উক্ত শাস্ত্রে প্রথম-প্রবেশার্থিগণের জন্য এই একখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহার অনুবাদ প্রচার করিয়া রাজেন্দ্রবাবু অতি প্রশংসনীয় কার্য্যই করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সাতটী পদার্থের লক্ষণ ও উহাদের অবান্তর বিভাগাদির বর্ণনা এবং জ্ঞানের উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাঁহারা বেদান্তের 'অদ্বৈতসিদ্ধি' আদি প্রকরণগ্রন্থগুলি পড়িতে চান তাঁহাদের পক্ষে নব্যন্যায়ের জ্ঞান অপরিহার্য্য। এতদ্ব্যতীত আধুনিক

অধিকাংশ সংস্কৃত দার্শনিকগ্রন্থ নব্যন্যায়ের পরিভাষাবহুল ভাষায় রচিত হওয়ায় সেগুলির আলোচনায়ও নব্যন্যায়ের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

আমরা মূলের সহিত অনুবাদ স্থানে স্থানে মিলাইয়া দেখিলাম, উহা মূলানুযায়ী ও আক্ষরিক হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে আর একটু প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে কঠিন বিষয়গুলি বুঝাইবার জন্য ২।৪টী ফুটনোট দিলেও ভাল হইত। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদক মহাশয় এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

অনুবাদক মহাশয় তাঁহার 'নিবেদনে' বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যারূপে যথাসম্ভব সরল বঙ্গভাষায় আধুনিক রুচির অনুরূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। আমরা ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। আশা করি, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং উহা পাঠ করিয়া আমাদের মত ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং উহার মোটামুটি কতকটা তত্ত্ব জানিয়া উহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অন্বেষণের দিকে আপনিই আগ্রহে আসিবে। ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায় নীরস শুষ্ক বিষয়কে সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করা খুব কঠিন কার্য্য। শ্রীযুত রাজেন্দ্র বাবু তর্কতীর্থ মহাশয় ও তর্কভূষণ মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতবর্গের সাহায্য পাইয়া এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন—আশা করি, পরে আরও অধিক কৃতকার্য্য হইবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটী নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়াছে—(১) প্রতি শনিবারে ১টী করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে ৪১টী ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান, (২) সহরের বিভিন্ন অংশে সভ্যদের বাটীতে প্রতি মাসে ১টী করিয়া ১২টী ধর্ম্মালোচনাসভার

অধিবেশন। (৩) সোসাইটী-গৃহে ৪০টী সাপ্তাহিক ক্লাসে উপনিষদ্, কর্ম্মযোগ ও কথামৃত পাঠ। (৪) শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য পূজা ও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম ইত্যাদি। (৫) ১৬৬৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দান। (৬) উত্তরবঙ্গে বন্যা নিবারণকল্পে ৬২৬৫ সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণমিশনের সহযোগে নন্দনালী থানায় বস্ত্র ও চাউল বিতরণ। (৭) ২৫ জন ছাত্রকে মাসিক ১ টাকা হিসাবে ২৫৯১ টাকা এবং ৯ জন ছাত্রকে পরীক্ষা দিবার ও কলেজে ভর্ত্তি হইবার আংশিক 'ফি' হিসাবে ৩৯।০ টাকা দান। (৮) মেম্বরগণের জন্য লাইব্রেরী ও সাধারণের জন্য পাঠাগার স্থাপন। (৯) ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময়ে কলিকাতা-করপোরেশনের সহযোগে শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যাদি দান। আলোচ্য বর্ষে সোসাইটীর মোট আয় ৪৩০২৸৶০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৩১৬৮৸৶৫ ; মজুদ—১১৩৩৸৶১৫ টাকা। সোসাইটীর কার্য্য বর্ত্তমানে ৭৮।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটী ভাড়া বাড়ী হইতে চলিতেছে। উহাতে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থ কোন মন্দির আজও নির্ম্মিত হইল না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ ইচ্ছা যে ঐ উদ্দেশ্যটী শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য তাঁহারা দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছেন। উক্ত গৃহনির্ম্মাণকল্পে বা অন্যান্য কার্য্যে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, সেক্রেটারী, ১নং লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

শ্যামবাজার ১২।১নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে অবস্থিত কলিকাতা অনাথাশ্রমের সপ্তবিংশতি বার্ষিক কার্য্যবিবরণীও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী অতি সুন্দররূপে চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে অনাথের সংখ্যা বৎসরের প্রারম্ভে ১১৫ জন ছিল। কিন্তু পরে

ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৪৭ হয়, ইহার মধ্যে ৯০ জন বালক ও ৫৭ জন বালিকা। ইহাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য আশ্রম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ৫টী অনাথা বালিকাকে সুযোগ্য পাত্রে পরিণীতা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। অনাথের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় আশ্রমের পরিসর বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষগণ পার্শ্ববর্ত্তী জমী ও বাড়ী ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

আশ্রমের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত চুনীলাল বসু মহাশয় এই দুর্গোৎসবের সময় অনাথ বালকবালিকাগুলির জন্য সাধারণের নিকট নববস্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন। নিম্নে বস্ত্রের তালিকা পদত্ত হইল।

১০	হাত	ধুতি	৯	সাটি	৪	৭	হাত ধুতি	১৪	সাটি ৭
৯	”	”	৭	”	১০	৬	” ”	১৯	” ৬
৮	”	”	২১	”	১০				

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

বিগত ৩রা আগষ্ট, ১৯১৯ খৃঃ বাঙ্গালোরস্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্টস হোমে'র প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বামী নির্ম্মলানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল, সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালোর মঠ হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ছাত্রাবাস পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। ৯টী ছাত্র লইয়া এই 'হোম' খোলা হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সমান প্রবেশিকাধিকার রহিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

(বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা)

দেশের অন্নসমস্যা দিন দিন কিরূপ জটিল হইয়া উঠিতেছে তাহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। দীনহীনের ত কথাই নাই মধ্যবিত্তগণও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। চাল, ডাল, ঘি, নুন, তেল, আটা সবই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আজ সর্ব্বত্রই "হা অন্ন" "হা অন্ন" রব। সুতরাং দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে লোকদের অবস্থা যে ইহাপেক্ষা শতগুণ খারাপ তাহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না।

বিগত আটমাস ধরিয়া আমরা পাঠকবর্গকে দুর্ভিক্ষের কথা শুনাইয়া আসিতেছি। মনে হইয়াছিল, আশু ধান্য হ'লে বুঝি এই দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু দেশের অবস্থা দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে কোথাও অতিবৃষ্টিতে কোথাও বা অনাবৃষ্টিতে, কোথাও ঝড়ে কোথাও বা বন্যায় সেই আশু ধান্যও নষ্টপ্রায়! তাই দুর্ভিক্ষানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শত সহস্র ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, কঙ্কালসার, কোটরগতচক্ষু পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে আজ পাষাণও গলিয়া যাইতেছে।

আমরা ৭টী জেলায় প্রতি মাসে প্রায় ৮০০/০ মণ চাউল বিতরণ করিতেছি। কিন্তু অভাবের তুলনায় ইহা কিছুই নয় বলিলেও চলে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেশবাসীর নিকট হইতে সেরূপ সহানুভূতি পাইতেছি না। দাতাকর্ণ, শিবি, দধীচি, হরিশ্চন্দ্রের দেশে লোকসকল একমুষ্টি অন্নাভাবে না খাইয়া মরিবে? যতদিন না দেশে স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত হয় ততদিন কি দেশবাসী তাঁহাদের দুঃস্থ ভ্রাতাভগিনীগণকে দুটী দুটী অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন না? দেশের যে কৃষককুল সারাজীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস্য

উৎপাদন করিয়া এতদিন তাঁহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আজ তাহাদের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের সেই নীরব উপকার স্মরণ করিয়া কেহ কি তাহাদের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না? আজ গৃহে গৃহে দুর্গোৎসব—সকলেই মহামায়ীর পূজায় রত। তাই আমরা তাঁহাদিগকে উপনিষদের সেই মহতী বাণী স্মরণ করাইয়া জগজ্জননীর নররূপী বিরাট পূজায় আহ্বান করিতেছি।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ"॥

এই মহদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা (১) ম্যানেজার উদ্বোধন, ১নং মুখার্জ্জী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা, অথবা (২) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া, এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

নিম্নে সংক্ষেপে ২৩শে জুলাই হইতে ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

বাগদা (মানভূম)

গ্রামের সংখ্যা.	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
৩৯	৬৩৪	৩২৴৪
৩৯	৬৩৯	৩২।৪
৩৯	৬৫৯	৩৩৸৮
৩৮	৬৭৪	৩৫৴০
৩৮	৬৭১	৩৪।০

ইন্দপুর (বাঁকুড়া)

গ্রামের সংখ্যা.	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
২৬	১৯৯	১০॥৫
২৭	১৯৮	১০।২
২৭	১৭৩	৮৸৬
২৬	১৯১	১০৴৫
২৩	১৭৪	৯৴৩

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া)

গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
১৯	১৮২	৯৸০
১৯	১৮৭	৯৸৮
১৯	১৬৫	৮৸৪
১৭	১১৯	৬৷৬/
১৭	১২৫	৭/২
	গঙ্গাজলঘাটি (বাঁকুড়া	
১০	১১৬	৬।৮
১০	১২০	৭/১
১২	১৪২	৮৶৫
১২	১২৮	৬৸৪
১২	১৩৯	৮/০
	বাঁকুড়া	
১৫	২০৪	০০৷৬
১৫	১৭৮	৷/১
১৮	৩১২	৭৸৫
	দত্তখোলা (ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ত্রিপুরা)	
৩২	৭৩১	৩৬/০
৩২	৫৮৮	২৯৸৬।/
৩৩	৫৬৪	২৮/৮
	বিটঘর (নবিনগর, ত্রিপুরা)	
৯	৮০০	৬৮/০
৯	৬৬৭	৫৬/০
৯	৬৪৩	৫৪।৫
৯	৬১৬	৪৪॥০
৯	৫৭১	৩২।৬

গ্রামের সংখ্যা।	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা।	চাউলের পরিমা
	ভারুকাঠি (বরিশাল)	
৫	১৩০	৬॥০
৫	১৩০	৬॥০
৫	১৩০	৬॥০
৫	১৩০	৬॥০
	গুঠিয়া (বরিশাল)	
১৪	১৯৩	৪৸৫
১৭	১৮৯	৪/৮
১৭	১৮৭	৩/৪
১৬	১৮৭	২৸৭
	মিহিজাম (সাঁওতাল পরগণা)	
৯	১৫৩	৯/০
১৮	২৯২	১১॥০
২০	৩৪১	১২।৫
২০	৩৪৫	১২॥০
২৩	৩৬৮	১২৸০
২৩	৩৮৫	১২/০
	ভুবনেশ্বর (পুরী)	
১	১৯	॥৮
২	৪৪	২।৮
৪	১২৭	৮॥০
১৫	২৩৭	১৪॥৩
১৯	১৭৩	১৩/

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্য

(ইং ১৯১৮-১৯১৯ খ্রীঃ)

বস্ত্রাভাবমোচন কার্য্য (১৯১৮ আগষ্ট হইতে ১৯১৯ মার্চ্চ)

যুদ্ধের জন্য বস্ত্রের আমদানী কমিয়া যায়, ঐ হেতু এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ বস্ত্রের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলতঃ বঙ্গের সর্ব্বত্রই মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকেন। ঐ অভাব মোচনের জন্য মিশন সহৃদয় সাধারণের নিকট হইতে বস্ত্র এবং অর্থ ভিক্ষা করিয়া বঙ্গ এবং বেহারের ৪৩টী বিভিন্ন স্থান হইতে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বস্ত্র বিতরণ করেন।

রাজসাহী জেলার বন্যাপ্লাবিত স্থানে সাহায্য কার্য্য।

(ইং ১৯১৮ সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত)

ইং ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমা এবং বগুড়া জেলার কতক অংশ আত্রেয়ী নদীর বন্যায় ভাসিয়া যায়। উহাতে উক্ত স্থানসমূহের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী গৃহশূন্য হইয়া পড়ে। প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, সঞ্চিত খাদ্য শস্য এবং গরুর জন্য রক্ষিত খড় নষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে অধিবাসিগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন। রামকৃষ্ণমিশন নওগাঁ মহকুমার সদর এবং রাণীনগর থানায় ৯টী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে চাউল, গরুর খড় দান করেন; এবং যাঁহারা জমীজমা শূন্য হওয়ায় সরকারের নিকট হইতে কৃষিঋণ প্রভৃতি পাইবার অনুপযুক্ত তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য এবং ভানাকুটা করিয়া খাইবার জন্য ধান ক্রয় করিতে অর্থ সাহায্য করেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় বেনারস জেলায় কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম গত আগষ্ট মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত উক্ত

জেলার বিভিন্ন স্থানে ৫টী কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক ৩১৩১ জনকে ঔষধ পথ্য এবং শীত নিবারণের জন্য কম্বলাদি দান করিয়া সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত বালেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং রামগঞ্জ (নোয়াখালী) মিশনের সেবকগণ যথাক্রমে ৮৫০, ৪৯৭ এবং ৫৬ জন রোগীর সেবা করেন।

মথুরা জেলায় বন্যাকালীন সেবাকার্য্য।

আলোয়ারের একটী বৃহৎ জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মথুরা জেলার অনেকস্থান প্লাবিত হইয়া যায় এবং ঐ সকল স্থান অনেক দিন ধরিয়া জলমগ্ন থাকে। ফলে ঐ সকল স্থানে নানাবিধ ব্যাধি প্রাদুর্ভূত হয় এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রামবাসীর ঐরূপ দুরবস্থায় বৃন্দাবন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেবাকেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক ঔষধ পথ্য ও কম্বলাদি দিয়া ১০২১ জনকে সেবা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন।

গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্য।

গত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর স্নানের সময় মিশন ৩১ জন সেবককে যাত্রিগণের সেবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা মেলার তিন দিনে এবং ষ্টীমারে ১১২ জন কলেরা রোগীর সেবা করেন।

উপরোক্ত সেবানুষ্ঠানে—যে সকল সহৃদয় দেশবাসী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ অর্থ দান করিয়া এবং অন্যবিধ উপায়ে মিশনকে সাহায্য করিয়াছেন মিশন তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতিপূর্ব্বে 'উদ্বোধনে' এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রাদিতে কোথায় কিভাবে কিরূপ সাহায্য করা হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদের নিকটে মিশনের রসিদ পাঠাইয়া উহাদের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের নাম উদ্বোধনে প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ঐ সকল সেবাকার্য্যে মোট কত টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং কি কি বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

স্বাঃ শ্রী

শ্রী সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(ইংরাজীর অনুবাদ)

লস এঞ্জেলিস।
নং ৪২১ ; ২১ নং রাস্তা।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

প্রিয় নিবেদিতা,

সত্যই আমি বৈদ্যুতিক চিকিৎসা প্রণালীতে (Magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন কালেই বিগড়ায় নাই—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যাহা কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাক্‌ব।

এখন চাকা ঘুরে গেছে—মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কায যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায় যেতে দিচ্ছেন না—এইটাই হচ্ছে আসল ভিতরকার কথা।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক এই লড়াই, লড়াই, লড়াইয়ের চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাব্‌বার সময় পাবে। এই আমাদের সুযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধোর্‌বো * * তার পর ভারতীয় কার্য্যটাকেও পুরা দমে চালিয়ে দেব। * * চারিদিকের অবস্থা বেশ

আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে অতএব প্রস্তুত হও। চারিটী ভগিনী এবং তুমি আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

C/o মিস মিড,
৪৪৭, ডগলাস বিল্ডিং,
লস এঞ্জেলিস, কালিফোর্ণিয়া।
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার—তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছিল। দেখছি, জো চিকাগোয় গিয়া তথায় তোমায় পায় নাই, তাদের কাছ থেকেও নিউইয়র্ক হতে এপর্য্যন্ত কোন খবর পাই নাই।

ইংলণ্ড থেকে একরাশ ইংরাজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর একলাইন লেখা—তাতে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও—সই আছে। অবশ্য উহাদের মধ্যে দরকারি বিশেষ কিছু ছিল না। আমি তাকে একখানা চিঠি লিখতাম কিন্তু আমি ত ঠিকানা জানি না, আরও ভয় হল, চিঠি লিখলে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন।

* * * আমি মিসেস সে—র কাছে খবর পেলাম যে, নিরঞ্জন কলকেতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছেন—জানি না, তাঁর শরীর ছুটে গেছে কিনা। যাই হক্, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মানসিক দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এক্ষণে সন্ন্যাসজীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সা—র কাছ থেকে কোন খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুসী হলাম। ভাল বিবেচনা কর ত তুমি নিজে ওগুলিকে আবার নূতন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি

পাও, তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও আর যদি বিক্রী করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাযের জন্য নাও। আমার দরকার নাই। * * আমি আসছে হপ্তায় স্যানফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি—তথায় সুবিধা করতে পারব—আশা করি। * *

ভয় কোরো না, তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আসবে। আসতেই হবে—আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক্ দিয়ে নিয়ে যান, সব রাস্তাই সমান। জানি না, আমি শীঘ্র পূবে * যাচ্ছি কি না। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাবো।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও—আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ওতে যোগ দেওয়াতে পার তবে আরও ভাল হয়।

* * *

কুচপরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, আমরা অমনি ইংলণ্ডে যাব ও তথায় খুব চুটিয়ে কায করবার চেষ্টা করব—কি বল? স্থির-মাতাকে লিখব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তার পর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক—সবাই ঠিক ঘুরে আসবে। এই যে নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে তাতে তোমার বেশ শিক্ষা হচ্ছে—আর আমি সেইটুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাছে টাকা আর লোক উড়ে আসবে। এখন আমার বায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে

* কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিস হইতে স্বামীজি এই পত্র লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূর্ব্ব অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়া যাইতে হয়।

সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই মা আমার বায়ু একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন আর তোমারও মাথা ঠাণ্ডা করে আনছেন। তার পর আমরা—যাচ্ছি, আর কি। এইবার আর একটু আধটু ছোটখাট নয়, রাশরাশ ভাল কায হবে, নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীন দেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত তোলপাড় করে ফেলবো। * * * আমি ক্রমশঃ ধীর, স্থির শান্ত প্রকৃতি হয়ে আসছি—যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাযে লাগা যাবে প্রত্যেক ঘায়ে কায হবে—একটাও বৃথা যাবে না —এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখবে। ইতি

বি—

জীবনসমস্যা ও উহার সমাধান।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

জগতের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা একজন ঈশ্বর আছেন কি না, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না, ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, আমাদের চরম লক্ষ্য কি—এই সকল বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলে চিন্তাশীল জিজ্ঞাসু মানবের জীবনধারণই অসম্ভব হয়। কিন্তু ইহাদের সুমীমাংসা কি সম্ভবপর? কখনও কি মানব ইহাদের নিশ্চিত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছে অথবা করিতে পারিবে? জগতে কত জ্ঞানী জন্মিলেন, কত গ্রন্থ প্রণীত হইল, কিন্তু বাদ বিবাদ ত মিটিল না। মতমতান্তরে জগৎ আচ্ছন্ন, দার্শনিক ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ে জগৎ ভরা। কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টী ধরিব? সকলেই ত নিজের মত সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে ও পরের মত ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে অগ্রসর! যুক্তিতর্ক অবলম্বন করিয়া ত দেখি, কিছুই নির্ণয়

হয় না। যুক্তি সব দিকেই দেওয়া চলে। তুমি যে যুক্তিবলে একটা বিষয় প্রমাণ করিতে যাইতেছ, তাহার ঠিক বিপরীত যুক্তিবলে ঠিক বিপরীত বিষয়টা সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায়। শাস্ত্রজালে প্রবেশ করিয়া কি সত্য নির্ণয়ের উপায় আছে? শাস্ত্রের নাম শুনিলেই ত আমাদের আতঙ্কের উদয় হয়। কোন্ শাস্ত্র বলিব? হিন্দুশাস্ত্র?—বেদ বেদান্ত দর্শন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র—সে যে সুবৃহৎ ব্যাপার! চতুর্ব্বেদ,—তার আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাদি বিভাগ, দর্শন—শুধু ত ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্ব্ব উত্তর মীমাংসা নয়—মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে আরও কত কত দর্শনের উল্লেখ ও বর্ণনা করিয়াছেন, ঊনবিংশ স্মৃতি, অষ্টাদশ পুরাণ আবার কত উপপুরাণ—অসংখ্য তন্ত্র। এ ছাড়া—শিক্ষা কল্পাদি বেদাঙ্গ, কল্পসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্রাদি—শত শত গ্রন্থ। আবার ইহাদের ভাষ্য, তস্য টীকা, তস্য টিপ্পনী। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, তস্য টীকা ভামতী, তস্য টীকা কল্পতরু, আবার তার টীকা পরিমল। আবার কোন পণ্ডিত পরিমলেরও বা টীকা করিয়া বসেন!

এ ত হল হিন্দুশাস্ত্র। তার পর হিন্দুসম্প্রদায় আছে কত? স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া দেখ—কত কত বিচিত্র নানামতাবলম্বী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাইবে—তা ছাড়া আধুনিক কালে কত কত নূতন সম্প্রদায় উঠিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ ছাড়া বৌদ্ধ আছেন, খ্রীষ্টিয়ান আছেন, মুসলমান আছেন, জরতুষ্ট্রমতাবলম্বী আছেন, কুংফুছী আছেন, 'তাও' উপাসক আছেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের রাশি রাশি গ্রন্থ, উহাদের টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি আছে। কত পড়িবে?

পড়িতে গেলে ভাষার দুর্ভেদ্য দুর্গ অনেক সময় অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—তার পর বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের পারিভাষিক শব্দজাল উহাকে আরও দুর্ভেদ্য করিয়াছে—উহাদের ভিতর দন্তস্ফুট করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা অনেক সময় বিড়ম্বনা মাত্র।

এই জন্য অনেকে বলেন, শাস্ত্র ছাড়িয়া, বরং শিক্ষকের নিকট যাও,

গুরুর নিকট যাও, আচার্য্যের নিকট যাও—তবেই সত্য নির্ণয় হইবে। কিন্তু আমার ন্যায় দুহাত দুপাওয়ালা মানুষ এই সকল গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অনেকেরই এ বিষয়ে বিশ্বাস হওয়া ত কঠিন। তার পর সেরূপ লোক কোথায়? তিব্বতের উচ্চ নীলভূমিতে, না, হিমালয়ের গভীর গিরিগহ্বরে? যদি তাহাই হয়, তবে আর তাঁহাদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করিব কিরূপে? লোকালয়ে যদি কেহ থাকেন? কিন্তু কই, সেরূপ ত দেখিতে পাই না। কেহ বলেন, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কর, কেহ বলেন, আমার কথা বিশ্বাস কর। কিন্তু শাস্ত্রের কথা বা তোমার কথার প্রমাণ কি? তুমি না হয় ধমক দিয়া বলিবে, যদি বিশ্বাস না কর, তোমার ঘোর নরক। কিন্তু নরকই হউক আর যাই হউক, বিশ্বাস না হইলে আর উপায় কি?

যাঁহারা শুধু বিশ্বাস করিতে বলেন বা যাঁহারা কেবল তর্কযুক্তি বিচারে নিযুক্ত ও শিষ্যগণকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, ইঁহাদের হইতে বিভিন্ন আর একদল শিক্ষক আছেন—তাঁহারা বলেন আমরা ঐ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি—তোমাদিগকেও উপলব্ধি করিবার পথ দেখাইয়া দিতে পারি। ঐ সকল উপায় অবলম্বনে একদিন তোমরাও আমাদের মত সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন তোমাদিগকে ঐটুকু বুঝাইয়া দিতে পারি যে, এই পথ অবলম্বন করিলেই তোমাদের ঐ তত্ত্ব উপলব্ধির সম্ভাবনা। কি উপায়? উপায়—মনের একাগ্রতা সাধন। তুমি ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে পারিতেছ না কেন? কারণ, তুমি মনকে একমুখী, একাগ্র করিতে পার না। মনকে একাগ্র করিবার অভ্যাস করিতে হইবে—তোমাকে আর কোন বিশ্বাস বা কোন কল্পনার আশ্রয় করিতে হইবে না। মনকে স্থির করিয়া সেই মনের সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয়ের চেষ্টা কর, তবেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

যদি কখনও আমাদের প্রবন্ধের প্রথমেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা সম্ভবপর হয়, তবে এই উপায়েই হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমাদের মাথায় বালককাল হইতেই কতকগুলি তত্ত্বের বোঝা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। আমরা বাল্যকালে ভূগোল পড়িতে গিয়া এই সকল সিদ্ধান্তবাক্য গলাধঃকরণ করি—যথা, পৃথিবী গোল—সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড়, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে ইত্যাদি। ঐরূপ আমরা যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাই, তাহাতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা। ইহার ফল বুদ্ধিবৃত্তির অবনতি এবং সমুদয় বিষয়ে ক্রমশঃ অবিশ্বাস। ইহার পরিবর্ত্তে আমাদের জ্ঞানসাধনের যে যন্ত্র—অর্থাৎ মনকে এমন ভাবে তৈয়ারি করিবার চেষ্টা আবশ্যক, যাহাতে সে কি লৌকিক, কি অলৌকিক সমুদয় বিষয়ই নিজের শক্তিতে হৃদয়ঙ্গম ও উপলব্ধি করিতে পারে। নতুবা জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া বৃথা মাত্র।

এখনকার সামান্য বালকে পর্য্যন্ত মুখে 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' বাক্য আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু উপনিষদাদি গ্রন্থ পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই, অত সহজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তখনকার কালের ধারা ছিল না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই—ভৃগু নিজ পিতা বরুণের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে অতি সংক্ষিপ্ত দুএকটী উপদেশ দিয়া বলিলেন—যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাহাতে উহা অবস্থিত আছে ও অন্তে যাহাতে প্রবেশ করিবে, তাহাকে জানিবার চেষ্টা কর। কিরূপে জানিব?—তপস্যা দ্বারা। তপস্যা কি? তপস্যা শব্দটী 'তপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তমোহিমকে সত্ত্বের উত্তাপ সংযোগে গলাইতে হইবে—একাগ্রতাই সেই তপস্যা। যেমন আতসি কাচের সাহায্যে সূর্য্যকিরণকে একত্রিত করিয়া তাহা দ্বারা যে কোন বস্তুকে দগ্ধ করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মন বিক্ষিপ্ত বলিয়া তাহার জ্ঞানশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে—একাগ্রতা সাধনসহায়ে উহাকে সূক্ষ্মজ্ঞান-সাধনার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, ভৃগু এই একাগ্রতারূপ তপস্যা দ্বারা ক্রমে অন্ন, প্রাণ, মন বিজ্ঞান ও সর্ব্বশেষে আনন্দকে জগতের মূলতত্ত্বরূপে অবগত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন।

ছান্দোগ্যের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদেও এইরূপ দেখিতে পাই—আচার্য্যের উপদেশ অতি অল্প, একরূপ সাঙ্কেতিক বাক্যমাত্র—কিন্তু জিজ্ঞাসুর মনের পর্দা যেমন যেমন খুলিয়া যাইতেছে, তেমনি তেমনি সে উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতেছে।

অতএব বুঝিতে হইবে, আমরা যেমন এই জগৎকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি বলিয়া ইহার সত্যতায় কোন সংশয় করি না, ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্ম তত্ত্ব প্রভৃতিও যদি তদ্রূপ নিঃসংশয় প্রত্যক্ষ হয়, তবেই সেই গুলির উপর যথার্থ আস্থা স্থাপন করা হইতে পারে, অন্যথা নহে। শাস্ত্র, যুক্তি আদি গৌণ—এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুখ্য।

যদি কেহ বলে, এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, তবে আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসাধনা বালির উপর সেতুনির্ম্মাণের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা ধর্ম্মের একটা নিশ্চিত ভিত্তি পাইতে চায়, তাহাদিগকে এই প্রত্যক্ষানুভূতির সম্ভবনীয়তা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রকৃত পক্ষে সকল ধর্ম্মই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির দাবি করিয়া থাকে। হিন্দুরা বলেন, ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা বা যথাবিহিতসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, বৌদ্ধেরা বলেন, বুদ্ধ কঠোর সাধনার পর সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। এইরূপ যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদেরও শুনা যায়। কিন্তু ইঁহারা ত সাক্ষাৎকার করিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী লোককে ইঁহাদের কথা মানিয়া চলিতে হইবে! অনেকেরই মত দেখা যায়, ঋষি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, নূতন ঋষি আর হইবার সম্ভাবনা নাই! ঈশ্বরের অবতার একমাত্র যীশুখ্রীষ্ট—সুতরাং তাঁহার কথা মানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই! এইরূপ মত যেমন একদিকের চূড়ান্ত গোঁড়ামত, অপর দিকের গোঁড়ামত তেমনি যে, ধর্ম্ম সাক্ষাৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। সত্য এইটিই বোধ হয় যে, প্রাচীন কালে অনেকে সত্য সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এখনও অনেকে করিতেছেন এবং আমরাও ইঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলে একদিন সত্য সাক্ষাৎকার করিতে পারি।

যতদিন না এইরূপ প্রত্যক্ষ নিজে করিতে পারিতেছি, ততদিন

কি করিব? ততদিন তর্কযুক্তি-পরিশোধিত বিশ্বাস ও শাস্ত্র অবলম্বন ব্যতীত আর উপায় কি? যাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহারা যে সর্ব্বদাই সরল সহজ সিধা পথেই ঐ দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহার নিশ্চয় কি? কেহ কেহ হয়ত পারেন, কিন্তু যদি নানারূপ ভুল ভ্রান্তির ভিতর দিয়া, নানারূপ গোলমালের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেবল এইটুকু দেখিতে হইবে যে, ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া, অকপট ভাবে, মনমুখ এক করিয়া যেন আমরা নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হই।

মানুষের যেমন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তেমনি তাহার সুখলাভের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক—জ্ঞানলাভের উপায় যেমন একাগ্রতা, সুখলাভের উপায়ও তদ্রূপ সংযম, তাহাতে কি কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? নিত্য সুখ আছে কি না এই সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হইতে গেলে পূর্ব্বোক্ত মত সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু এটী নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ প্রাণ কিছুতেই মানিতেছে না। এই আনন্দ ও জ্ঞান—নিত্য আনন্দ ও নিত্য জ্ঞান আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এ বিষয় নিঃসন্দেহ। আর অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ব্যক্তি যখন আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, তোমাদের ভিতর ঐ নিত্য জ্ঞান ও আনন্দের খনি রহিয়াছে, তোমরা আমাদের প্রদর্শিত একাগ্রতা সাধনের উপায় অবলম্বন করিয়া গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, তখন আমরা কেন না তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিব ও কেন না তাঁহাদের পথের অনুসরণ করিব?

অনেকে বলেন, বিশ্বাস কর, 'বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু, তর্কে বহুদূর', আর এইরূপ সকলেই যদি নিজে নিজে বিচার করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তবে প্রত্যেকে বিভিন্ন মতে উপস্থিত হইয়া সমাজে একরূপ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে, অতএব অবিচারিতচিত্তে একজনের কথায় বা একটা শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেই লোকের বেশী কল্যাণ। এ যে তমোগুণ আশ্রয়ের উপদেশ।

যখন আমার ভিতর বিচার শক্তি—ভাল-মন্দ বুঝিবার শক্তি রহিয়াছে, তখন আমি উহা ত্যাগ করিব কেন? তর্ক যুক্তি বিচার দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে না, বরং উহাতে বিশ্বাসের ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া থাকে—শাস্ত্রেই আছে, গুরুকে বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহার সমুদয় ব্যবহার তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া যদি দেখা যায়, তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, লৌকিক কোন বিষয়ে আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা নাই, তবে তাঁহার উপর কেন না বিশ্বাস হইবে? যদি তিনি বলেন, আমি কোন অলৌকিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি আর তুমিও যদি এই এই উপায় অবলম্বন কর, তবে তুমিও সাক্ষাৎকার করিবে, তবে কেন না তাঁহার কথায় অন্ততঃ পরীক্ষা স্বরূপে আমি সেই সাধনায় অগ্রসর হইব?

তর্ক বিচার দুই উদ্দেশ্যে করিতে পারা যায়, এক নিজে বুঝিবার জন্য, দ্বিতীয়—অপরকে বুঝাইবার জন্য। ন্যায়শাস্ত্রকারেরা চরমোদ্দেশ্য লাভের জন্য এই উভয় প্রকার তর্কের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজে বুঝিবার জন্য যে বিচার, উহাই মুখ্য; কিন্তু তোমাকে যদি এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করিতে হয় যাহা তোমার প্রতিকূল, তবে তোমাকে বাধ্য হইয়াই কতকটা পরপক্ষ নিরাসের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, নতুবা তোমার টেঁকা অসম্ভব হইবে। ন্যায়শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই কারণেই ন্যায়শাস্ত্র রচিত হইয়াছে—যাহাতে আমাদের চিন্তাপ্রণালী ও বিচারপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। যাহা হউক, আমরা ইঁহাদের কথা আংশিক স্বীকার করিলেও একথা কখনই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে, এই মনন প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্য সকলের পক্ষেই পরিভাষাবহুল ন্যায়শাস্ত্র—বিশেষ নব্যন্যায় আয়ত্ত করা আবশ্যক। ইহাতে অধিকাংশ সময়েই মূল লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শব্দজালরূপ মহারণ্যে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া থাকে। এই তর্ক বিচার করিবার সময় সত্য-নিরূপণের দিকেই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে—আমরা যেন লক্ষ্যকে ভুলিয়া অবান্তর

গোলযোগের ভিতর না গিয়া পড়ি। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করিয়াছেন, এই যুক্তিতর্ক আমাদের অনেকটা পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায়স্বরূপ একাগ্রতা সাধনেই প্রবৃত্ত করে।

এই ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে প্রথম চাই অধিককক্ষণ এক ভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস—বেদান্তসূত্রে সেই জন্যই বলিয়াছেন, "আসীনঃ সম্ভবাৎ।" অর্থাৎ ধ্যানাভ্যাস বসিয়াই করিতে হইবে, কারণ, বসিয়াই উহা সম্ভব হয়। শয়ন করিয়া অথবা বেড়াইতে বেড়াইতে উহার চেষ্টা করিলে নিদ্রা চিত্তবিক্ষেপাদি নানা বিঘ্ন আসিয়া ঐ অভ্যাসে প্রবল বাধা উৎপাদন করিবে।

সুতরাং আসন করিয়া বসিয়া কোন একটী বিষয় ক্রমাগত চিন্তার অভ্যাস করিতে হইবে। এই ধ্যানযোগের প্রণালী উপায়াদি গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান দেশকালের পক্ষে সাধারণতঃ কোন উন্নত মহাপুরুষের উপদিষ্ট সিদ্ধ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা আশু ফলপ্রদ। যদি আমার অদৃষ্টে তদ্রূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় না মিলে, তবে আমাদের সমাজের সাধারণ নিয়মানুসারে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া দৃঢ়ভাবে উহার সাধনা করিলে তাহাও নিষ্ফল নহে। মোট কথা, এই অভ্যাস সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে যে উপদেশ আছে,

"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"

তাহাই খাঁটি কথা। এই অভ্যাস অশ্রদ্ধার সহিত বেগার ঠেলা ভাবে করিলে হইবে না, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময় নিদ্রা ও চিত্তবিক্ষেপকর নানা সদসৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সকাল সন্ধ্যায় একটু নিয়ম রক্ষার মত বসিলেও হইবে না, আবার দু চার মাস এরূপ অভ্যাস করিয়া ছাড়িয়া দিলেও হইবে না। উৎসাহের সহিত দীর্ঘ কাল ধরিয়া ইহাতে নিযুক্ত থাকিতে হইবে—তবেই সিদ্ধি একদিন—এমন কি এই জীবনেই একদিন করতলগতা হইবে।

কিন্তু তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য এইরূপ ধ্যানাভ্যাস যদি ঠিক ঠিক

ভাবে করিয়া কৃতকার্য্যতার আশা করিতে হয়, তবে সমগ্র জীবনটাকে উহার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। জীবনকে এইরূপে প্রস্তুত করার নামই কর্ম্মযোগ। কর্ম্মগুলিকে এরূপ নিয়মিত করিতে হইবে যেন সেগুলি পরিণামে এই ধ্যানযোগের সহায়ক হয়। সাধুসঙ্গ উপনিষদ্ গীতা ভাগবতাদি সিদ্ধান্তশাস্ত্রচর্চ্চা, পূজা, সেবা, সৎকর্ম্মাদি ইহার অনুকূল। এইগুলি ইহার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ধীরে ধীরে ধ্যানের সময় বৃদ্ধি করিতে হইবে। সদা সর্ব্বদা মনে বিচার রাখিতে হইবে, আমাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি। সেইটী যদি অন্ততঃ মধ্যে মধ্যেও মনে পড়ে, তবে আমাদের জীবন কখনই উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর কর্ম্ম করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে না বলিয়া আমাদের শক্তি অনেক সময়ে বৃথা অপচিত হয়। এই শক্তিক্ষয় নিবারণের জন্য জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তদনুসারে কর্ম্মগুলিকে সুনিয়মিত করিতে হইবে।

কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, তত্ত্বসাক্ষাৎকার এবং তদুপায় স্বরূপ ধ্যান ধারণাই যদি জীবনের মুখ্য কার্য্য বলিয়া ধারণা হয়, তবে জড়তা ও আলস্য আমাদিগকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিবে এবং আমরা এখন যেমন হইয়াছি, ক্রমে সম্পূর্ণ হতশ্রী ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িব। কিন্তু এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। মূল লক্ষ্য উহা হইলেও আমাদিগকে অধিকারভেদ স্বীকার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—শুদ্ধ সত্ত্বগুণসাধ্য ধ্যানধারণা তমোগুণী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। তমোগুণকে প্রবল রজোগুণের দ্বারা প্রতিহত করিতে না পারিলে এবং ঐ রজোগুণকে ক্রমে সত্ত্বমুখী না করিতে পারিলে কখনও ধ্যানধারণা হইতেই পারে না। রজোগুণের লক্ষণ কর্ম্মশীলতা। কর্ম্মশীলতা ব্যতীত কেহ কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থার কল্পনাও করিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নাই। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও স্বামিজীর 'কর্ম্মযোগ' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে প্রায় সমুদয় আশঙ্কার সমাধান করা হইয়াছে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য ইহাই। হিন্দুর চরমোদ্দেশ্য মুক্তি হইলেও সাধকের পক্ষে—উক্তপথযাত্রী অধিকারীর পক্ষে—উহাতে প্রবল কর্ম্মশীলতার স্থান আছে। কিন্তু কর্ম্মই আমাদের চরম লক্ষ্য নহে—জীবন সমস্যার সমাধানই যদি না হইল, তবে উন্মত্তবৎ কর্ম্মচেষ্টার কি ফল? যাঁহারা এই সমস্যা সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যাঁহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া তাঁহার লীলার সহায়ক হইয়া জগতে প্রবল সাত্ত্বিক কর্ম্মের উদ্দীপনার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন, কিন্তু অপর সকলকেই এই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণ পণ করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে, উহার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ সাধনা—ধ্যানধারণা ও বহিরঙ্গ বা গৌণসাধনা—কর্ম্ম। অধিকারিবিশেষে বাহুল্যভাবে কাহাকেও কাহাকেও কর্ম্ম, কাহাকেও কাহাকেও বা ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে মাত্র, কিন্তু চেষ্টা সকলেরই থাকিবে ধ্যানধারণা ও তল্লক্ষ্যীভূত তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দিকে।

আমরা এই প্রবন্ধে তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ মূল লক্ষ্যের দিকে একটু বেশী ঝোঁক দিয়াছি বলিয়া কেহ যেন অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমাবস্থায় অনিবার্য্য কর্ম্মযোগ বা সেবাধর্ম্মকে আমরা খর্ব্ব করিয়াছি বলিয়া মনে না করেন। আমি যতদিন কোন না কোন আকারে অপরের সেবা লইতেছি, ততদিন আমাকেও রোগীর শুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নবস্ত্রদান, অশিক্ষিতের ভিতর শিক্ষাবিস্তার, নানারূপ সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রভৃতি উপায় দ্বারা সতত নরনারায়ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্ম যেন আমরা যন্ত্রের ন্যায় না করি। কর্ম্মাবসরে আমাদিগকে কিছু কিছু ভাবনাশীল হইতে হইবে কর্ম্মের মূল লক্ষ্য কি, মাঝে মাঝে স্মরণ করিতে হইবে আর মুখে 'নরনারায়ণ' শব্দ কেবল উচ্চারণ না করিয়া যাহাতে আমরা পতিত, দরিদ্র, রোগক্লিষ্ট নরনারীর ভিতর বাস্তবিকই নারায়ণকে দেখিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই কর্ম্মযোগ হইবে। নতুবা উহা যোগ নহে—শুধুই কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। উহাতেও ফল

আছে। কিন্তু হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা কি এতটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে? একাগ্রতা ও ধ্যানধারণার সহায়ে আত্মার ভিতর গূঢ়ভাবে নিহিত অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দকে অভিব্যক্ত করিয়া অপরের ভিতরও তাহার অভিব্যক্তির চেষ্টারূপ উচ্চতর সেবায় দীক্ষিত হইবে না?—কর্ম্মযোগের উর্দ্ধ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া শেষে ধ্যানযোগের অধিকারী হইয়া উপলব্ধি করিবে না—

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিং॥

শঙ্করের জন্ম।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে শিবগুরুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অজ্ঞাননিদ্রাও ভঙ্গ হইল। তিনি চারিদিকেই যেন শিবমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সকলই যেন শিবময়—সকলই যেন শিবেরই শরীর। সেই শেষ যামিনীর মধুর সমীরণ, সেই অসীম অন্তরীক্ষব্যাপী অরুণকিরণসমুজ্জ্বল মেঘমালা, পর্ব্বত, কানন, চত্বর, দেবমন্দির সকলই যেন শিবের শরীর। শিবগুরু যেন আর সে শিবগুরু নাই, তিনি যেন এখন অন্য ব্যক্তি। ইহা স্বপ্নে প্রকৃত দেবতার দর্শন, ইহা ত সাধারণ স্বপ্নদর্শন নহে। মনঃকল্পিত দেবদর্শন এবং প্রকৃত দেবদর্শনে অনেক প্রভেদ। তাই শিবগুরু আজ সকলই শিবময় দেখিতেছেন। ক্রমে তিনি যেন আর শুধু দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাই জোড়হস্তে জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে

নমঃ, ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ"।

সহসা বিশিষ্টাদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শয্যোপরি শিবগুরুকে ঐ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

বিশিষ্টাদেবীকে জাগরিত দেখিয়া শিবগুরু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আর্য্যে। চল গৃহে চল, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলাম, চল গৃহে চল। আজ আমরা ধন্য হইলাম। বল একবার জয় আশুতোষের জয়, জয় ভগবান্ জ্যোতির্লিঙ্গের জয়"।

শিবগুরুর কথা শুনিয়া বিশিষ্টাদেবী পাগলিনীপ্রায় হইয়া স্বপ্নকথা জানিতে চাহিলেন। শিবগুরু তখন একে একে সমুদয় বলিলেন, কিন্তু পুত্র যে অল্পায়ু হইবেন কেবল তাহাই গোপন রাখিলেন।

স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বিশিষ্টাদেবী কিয়ৎক্ষণ যেন স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। তাঁহারও অবস্থা যেন কতকটা শিবগুরুর মত হইয়া পড়িল। তিনি করযোড়ে কখন ভগবান্ শিবের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন, কখন বা শিব শিব বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, আবার কখন বা আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে থাকিল।

বাস্তবিক তাঁহাদের আনন্দ কি আজ বর্ণনা করা যায়? পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা কত না কষ্ট করিয়াছিলেন। আজি সেই সকল কষ্টের অবসান—জীবনব্যাপী পুত্রকামনা, আজ তাহাই আশুতোষ-কৃপায় সিদ্ধ হইতে চলিল। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা তাঁহাকেই পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। ইহা কি স্বপ্নাতীত, আশাতীত অভাবনীয় ঘটনা নহে?

বিশিষ্টাদেবী ও শিবগুরুর এ ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, প্রভাতালোক তাঁহাদের এই ভাবাশ্রুতে বাধা প্রদান করিল। বিশিষ্টাদেবী বলিলেন, "দেব! আজি আমাদের সম্বৎসরের তপস্যা সার্থক হইল, আজি আমাদের অতি শুভদিন। যাঁহার কৃপায় আমাদের এই ভাগ্যোদয় আজি আমরা তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিব এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণসজ্জনকে যথাসাধ্য দান করিব।"

বিশিষ্টার কথা শেষ হইতে না হইতেই শিবগুরু বলিলেন, "আর্য্যে! আমিও এক্ষণে ইহাই ভাবিতেছি। শিবগুরু এই বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দেবমন্দিরের রাজপুরোহিতকে আহ্বান করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাত্মন্! আজ আমরা কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে ভগবানের পূজা করিব মনে করিতেছি, সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে আমরা অদ্য গৃহে ফিরিব ভাবিতেছি। আপনি পরিচিত কতকগুলি ব্রাহ্মণ সজ্জনকে আনয়ন করুন। আমরা পূজান্তে তাঁহাদের যথাসাধ্য সৎকার করিব"।

শিবগুরুকে প্রফুল্ল দেখিয়া পুরোহিত বুঝিলেন যে তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; নচেৎ, প্রভাতেই এ ব্যবস্থা কেন? তিনি শিবগুরুকে বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া শিবমাহাত্ম্য স্মরণপূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং অনুচরদিগকে পূজার আয়োজন করিতে বলিয়া দিলেন।

এইরূপে পূজা, পাঠ, হোম, জপ, এবং দানধ্যানে সে দিবস অতিবাহিত করিয়া পরদিন তাঁহারা স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবগুরু সম্বৎসর পরে স্বগৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া আত্মীয়জন ও বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শিবগুরু যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন।

এ দিকে অন্তঃপুরে বিশিষ্টাদেবীর সকাশে বহু মহিলা সমাগম। যেন বাটীতে কোনও ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত। মহিলাগণ মধ্যে

সধবা, বিধবা, যুবতী, কুমারী, বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া কাহারও অভাব নাই। বিধবা রমণীদের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র রেখা; গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, মস্তকের কেশ চূড়াকারে বদ্ধ। রমণীরা কেহ বা দণ্ডায়মানা, কেহ উপবিষ্টা, কেহ বা শিশু ক্রোড়ে, কেহ বা রোদনরত শিশুকে স্তন্য দিতেছেন, আবার কেহ নিদ্রিত শিশুকে বস্ত্রাঞ্চলে শয়ান করাইয়া নিজেও শিশুর পার্শ্বে অর্দ্ধশয়ানা।

ভামিনীরা এক কথায় তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা নানা জনে নানা প্রশ্নোত্তরে গৃহ মুখরিত করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "হ্যাঁ ভাই বিশিষ্টা, এতদিন তীর্থস্থানে ছিলে, সেখানে কি কিছু ঠাকুরের আদেশ পাইলে?" বিশিষ্টার উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই অপরে কহিলেন, "হ্যাঁ বাছা, দেবতার স্থানে ত সাধু সন্ন্যাসীর অভাব নাই; কোনও ওষুধ বিষুধ কি পেলে না?" তদুত্তরে কেহ বলিলেন, "তা দিদি সেই কপালই যদি হবে তবে ছেলে ছেলে করে এত কষ্ট পায়।" আবার কেহ বলিলেন, "আচ্ছা বিশিষ্টা ঠাকরুণ, স্বপ্ন টপ্ন কিছু পাও নি কি? তাও—ত হয়, আমার অমুক স্বপ্নে একেবারে সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিল, আহা"—বলিয়া তিনি করযোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রমণীকে কহিলেন, "তোমার সে কথা মনে পড়ে দিদি?" দিদি তখন সাহ্লাদে কহিলেন, "তা আব মনে নেই বোন, আমারও ত মেয়ের স্বপ্ন হয়েছিল।" ইত্যাদিরূপে যিনি দেবতার স্থান হইতে যেরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, পরস্পরে তাহারই ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; ফলে বিশিষ্টাদেবীরও প্রকৃত কথা প্রকাশ না করিবার জন্য বিশেষ কোনও কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি কাহাকেও মাতৃ সম্বোধনে, কাহাকেও বা বাছা, কাহাকেও দিদি, বোন ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে সুমিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন—অভীষ্টসিদ্ধের কথা কাহাকেও বলিলেন না।

সম্বৎসর গৃহে না থাকাতে বিশিষ্টাদেবীর গৃহগুলি বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। কয়েকদিবস পরে তাঁহার গৃহসংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপিত

হইলে, একদিন শিবগুরু বিশিষ্টাদেবীকে বলিলেন, "আর্য্যে! স্বপ্নকথা স্মরণ আছে ত? এ সময় আমাদের অতি পবিত্রভাবে থাকা একান্ত প্রয়োজন। আহার বিহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোক যেরূপ অনুষ্ঠান করিবে সন্তানও তদ্রূপ হইবে। পুত্র হইতেই মানুষের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারা যায়; পুত্র দেখিয়াই লোকে পিতামাতার পাপপুণ্যের নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে ভাবে যে বস্তুর চিন্তায় সময়ক্ষেপ করিবে, পুত্রও সেই ভাবে সেইরূপে গঠিত হইবে। তুমি এ সময় সর্ব্বদা দেবভাবাপন্ন হইয়া না থাকিলে ভগবান্ তোমারি গর্ভে কি ফরিয়া আসিবেন? তুমি যদি এ সময় সর্ব্বদা শিবের ধ্যানে শিবমহিমা চিন্তায় চিত্তকে নিয়োজিত রাখ, তবে তোমার পুত্র ত সাক্ষাৎ শিবই হইবেন। তুমি যদি এ সময় সর্ব্ববিধ দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদি নীচপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সমূলে পরিত্যাগ করিয়া জীবের কল্যাণকামনায়, সকলের হিতচিন্তায় এবং জগতের দুঃখনাশের চিন্তায় একান্ত নিরত থাক তবেই শিব তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। অবশ্য তিনি যখন স্বপ্ন দিয়াছেন তখন তুমিও তাহাই করিবে এবং তিনিও আসিবেন ইহা আমার বিশ্বাস। তথাপি তোমায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। অথবা তিনিই আমায় তোমাকে এই সমস্ত বলিতে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। অতএব আমরা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুসারে তদনুমোদিত আচারের অনুষ্ঠান করিব"। পতিব্রতা বিশিষ্টাদেবীকে এ সব কথা বলাই বাহুল্য। তিনি পতির সেই স্বপ্নপ্রদর্শনের দিন হইতেই আর যেন ইহজগতের রমণী ছিলেন না। বিধাতাই তাঁহাকে অজ্ঞাতসারে শঙ্কর-জননীর উপযোগিনী করিয়া তুলিতেছেন। দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশি স্বভাবতঃই বিশিষ্টাদেবীতে পূর্ণমাত্রায় ছিল, এক্ষণে তাহা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

লীলাময়ের অসীম লীলায় কিছুই অসম্ভব নহে। প্রৌঢ়া

বিশিষ্টাদেবীর দিনে দিনে যেন আবার যৌবন ফিরিয়া আসিল, এবং অচিরে তাঁহার দেহে গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল।

দুই তিন মাস অতীত হইতে না হইতেই পল্লীরমণীরা বিশিষ্টা-দেবীকে গর্ভবতী বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তখন সকলেই বুঝিলেন যে ইহা বাবা জ্যোতির্লিঙ্গের মহিমা।

ক্রমে ইহা শিবগুরুর কর্ণগোচর হইল। তিনি তৃতীয়মাসে অতি সাবধানে পুংসবন সংস্কার সম্পন্ন করিলেন এবং এখন হইতে পুত্রজন্ম পর্য্যন্ত শিবনামজপরূপ ব্রতগ্রহণ করিলেন। বিশিষ্টাদেবীও নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, তিনিও পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। শিবগুরুর সংসার যেন কৈলাসবাসী নন্দীর সংসার হইয়া উঠিল।

বিশিষ্টাদেবীর গৃহে আত্মীয়া স্ত্রীলোক কেহ না থাকায় পল্লীরমণীরা তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন রমণী বা স্বহস্তপ্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য অতি যত্নসহকারে বিশিষ্টাদেবীর জন্য আনয়ন করিতেন।

এইরূপে চতুর্থ মাসে শিবগুরু বিশিষ্টাদেবীর সীমন্তোন্নয়ন এবং পঞ্চমে পঞ্চামৃত সংস্কার করিলেন। বিশিষ্টার বন্ধুগণ দেশীয় রীতি অনুসারে বিশিষ্টাদেবীকে বহু সদনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার আত্মীয় জনের অভাবে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটী হইল না।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, বিশিষ্টাদেবীর দেহে অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশিত হইল। তাঁহার প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় মুখশ্রী, দেহে দিব্য জ্যোতি, সর্ব্বাঙ্গে যেন পদ্মগন্ধ সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিত। বিশিষ্টাদেবীকে যেই দেখিত সেই যেন ক্ষণকালের জন্য কেমন একটা শান্তি, আনন্দ ও চিত্তপ্রসাদ অনুভব করিত। হৃদয়ের দ্বেষ, হিংসা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দূর হইয়া মনে যেন এক মহান্ ভাবের উদয় হইত। প্রতিবেশিনীরা পরস্পরে বলিতেন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; নচেৎ বিশিষ্টার ত কই এরূপ পরিবর্ত্তন কখন দেখি নাই।

ক্রমে নবম মাস উত্তীর্ণ হইয়া দশম মাস সমাগত হইল। রমণীরা এক্ষণে সর্ব্বদাই একটী নব শিশুর আগমন প্রতীক্ষায় উৎসুক হইলেন। শিশুর সম্বর্দ্ধনার জন্য যেন সকলেই ব্যাকুল। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন ঐ বুঝি শিবগুরুর গৃহ হইতে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

বৈশাখ মাস। বসন্ত অবসান। বসন্ত অবসান হইলেও বসন্তের স্বভাবসৌন্দর্য্য এখনও কালাচিগ্রাম হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও রুদ্রের রৌদ্রতেজ গ্রামবাসীকে তাপিত করিতে পারে নাই। মলয় সমীরণ এখনও হিল্লোল তুলিয়া পল্লীবাসীকে ঋতুরাজের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বসন্তসখা কোকিল এখনও নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া পঞ্চম তানে গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করিতেছে। নবকিশলয়ে সজ্জিত পুষ্পপাদপ পুষ্পসম্ভারে আনতদেহ হইয়া রহিয়াছে। অলিকুল গুণ গুণ রবে পুষ্পমধু আহরণ করিতেছে। চ্যুত মুকুলের সুগন্ধে বৃক্ষতল আমোদিত। পল্লীপ্রান্তবাহিনী চূর্ণানদী যেন গ্রীষ্মের আগমনভয়ে ভীত হইয়াই শীর্ণকায়ে মন্দ গমনে প্রবাহিতা।

আজি অক্ষয় তৃতীয়া। অনেকেরই বাটীতে ব্রত নিয়ম পুণ্যাহ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকলেই আজ নানা কার্য্যে সমধিক ব্যস্ত, পুণ্য দিনে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আজ সকলেরই চিত্ত যেন প্রফুল্লিত, সকলেরই হাস্যবদন, কোথাও বিবাদ কলহ নাই, অশান্তি নাই, যেন সকলেরই চিত্তে শান্তি বিরাজিত। নিরানন্দ মনঃকষ্ট ক্রোধ হিংসা সেদিন যেন জগৎ হইতে অন্তর্হিত। প্রকৃতির মাধুর্য্যে সকলেই যেন বিমোহিত। সকলেরই মনে হইতেছে যেন আজ কত সুখের কত শান্তির দিন।

দিবা দ্বিপ্রহর। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। পল্লীপথ প্রায় নির্জ্জন। জনহীন পল্লীপথে কচিৎ দুই একটী পথিক, ভিক্ষুক, স্নানার্থী, অথবা বিষ্ণুপূজান্তে যজমানগৃহ হইতে প্রত্যাগত পুরোহিত সোপকরণ নৈবেদ্যাদি হস্তে দ্রুতবেগে স্বগৃহে গমন

করিতেছেন। পথিপার্শ্বে অবস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় রোমন্থনরত সবৎস ধেনু। কোথাও আম্রবৃক্ষতলে দুই একটী বালক আম্রমুকুল সংগ্রহে ব্যস্ত। কোথাও গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার্থী বুভুক্ষিত কুকুর ও মার্জ্জারকুল আহার্য্যচেষ্টায় গৃহস্থের অঙ্গনে সাগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

এমন সময় সহসা শিবগুরুর গৃহস্থিত পরিচারিকাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। গৃহকর্ম্মরত প্রতিবেশিনী রমণীগণ এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে শশব্যস্তে শিবগুরুর গৃহাভিমুখে ধাবিতা হইলেন, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদের পুত্রকন্যারাও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, কোনও শিশু গমনে অক্ষম হইয়া সরোদনে মাতাকে আহ্বান করিতে লাগিল—মাতা ততক্ষণে শিবগুরুর গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত, সুতরাং শিশুর রোদনই সার হইল।

সহরে কেহ কাহার সংবাদ বড় রাখে না, কিন্তু পল্লীগ্রামে স্থানের অল্পতাপ্রযুক্ত সকলেই সকলের সংবাদ রাখে, এজন্য পরস্পরে সদ্ভাবও যথেষ্ট থাকে। তাই আজ শিবগুরুর পুত্রভূমিষ্ঠের সংবাদ অচিরে সারাগ্রামে প্রচারিত হইল।

দেখিতে দেখিতে শিবগুরুর গৃহে অনেক লোকের সমাগম হইল। বিশিষ্টাদেবীর সন্তান দর্শনের আশায় রমণীরা সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা সর্ব্বাগ্রে তিনিই নবকুমার দর্শন করিবেন।

ক্রমে একে একে সকলে বিশিষ্টাদেবীর নব কুমারকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলেন। শিশুর রূপে সূতিকাগৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে। কেহ কেহ বিশিষ্টাদেবীর পুত্র-ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ বা সানন্দে শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করিলেন। আবার কেহ বা এ সময় বিদ্যাধরদম্পতীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টাদেবীর আনন্দের কথা আজ কে বর্ণন করিবে? তিনি পুত্রকে যেন আর পুত্র বলিয়া ভাবিতে পারিতেছেন না, তিনি যেন

সেই সাক্ষাৎ আশুতোষকেই দর্শন করিতেছেন। পূর্ব্ব জন্মের কোন্ সুকৃতিবলে তিনি আজ সাক্ষাৎ শুভঙ্করজননী। কত শত যুগের মহা তপস্যার ফলে তিনি আজ ভগবান্ শঙ্করকে বক্ষে পাইয়াছেন, এ সৌভাগ্য যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত।

তিনি ভক্তি ও আনন্দের আবেগে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুনয়নে শতধারা প্রবাহিত করিতেছেন। তিনি যেন তন্ময়চিত্তে সেই শঙ্করকেই অনুধ্যান করিতেছেন।

অন্তঃপুরে যেমন আনন্দ কোলাহল, বহির্দ্দেশেও তেমনি শিবগুরুর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীবর্গ আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শিবগুরু সকলকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক একান্তমনে সেই ভগবান্ শঙ্করকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। শঙ্করের অপূর্ব্বলীলা স্মরণ করিয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

শিবগুরুর ভবনে সে দিন সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব চলিল। রমণীরা যেন আর নব কুমারটীকে ফেলিয়া স্বগৃহে ফিরিতে পারিতেছেন না। শিশুর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সূতিকাগৃহ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হইবে নাই বা কেন? এ শিশু ত সাধারণ শিশু নয় এ যে সাক্ষাৎ শঙ্কর। তাই আজ সমস্ত পল্লীতে এত আনন্দের ঘটা—যেন এই শিশুর জন্মগ্রহণে শুধু শিবগুরুরই বংশরক্ষা হইল না, সকলের কুলরক্ষা, বংশরক্ষা হইল।

অতঃপর শিবগুরু জ্যোতির্ব্বিদগণকে আনাইয়া পুত্রের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইলেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ গ্রহসংস্থান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন শিশুর জন্ম কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতি প্রায় স্বচ্যস্থ, দ্বিতীয়ে মঙ্গল ও কেতু, চতুর্থে শনি উচ্যস্থ, অষ্টমে রাহু, দশমে রবি বুধ শুক্র এবং একাদশে চন্দ্রমা বিরাজমান।

জ্যোতিষীরা শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্ শিবগুরো! এ পুত্র তোমার সাধারণ মানব নহে। এই পুত্রের

যখন চর লগ্নে জন্ম, বৃহস্পতি শুক্র যখন কেন্দ্রগত, এবং শনি যখন উচ্চস্থ, তখন ইনি কোনও অবতার।" তাঁহারা শিবগুরুকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমার এই পুত্র শাস্ত্রকার হইবে, এই পুত্রের খ্যাতি চন্দ্র সূর্য্য যাবৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দেখ শাস্ত্রে আছে—

কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্যৌ
স্বোচ্চে কেন্দ্রগতেঽর্কজে,
চরলগ্নে যদা জন্ম
যোগোঽয়মবতারজঃ॥"

('আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ হইতে' গৃহীত)

শিবগুরু বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া পুত্রের আয়ু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা শিশু যে অল্পায়ু তাহা বুঝিয়াছিলেন। এজন্য যদি শিবগুরু এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেন এই ভয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "মহাত্মন্! অদ্য আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অন্য একদিন আসিয়া আপনার পুত্রের কোষ্ঠী উত্তমরূপে গণনা করিব।" এই বলিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

শিবগুরু দেশের প্রথামত স্নানান্তে আভ্যুদয়িক সমাপনপূর্ব্বক পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। দশমদিনে নামকরণ উপলক্ষে পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন। ষোড়শোপচারে ভগবান্ জ্যোতির্লিঙ্গের এবং কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রদান করিয়া সপুত্রা বিশিষ্টাদেবীকে গৃহে আনিলেন এবং দীনদরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দানে পরিতুষ্ট করিলেন। শঙ্করপ্রসাদে পুত্রের জন্ম হওয়াতে পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবাধর্ম্ম।

(শ্রী—)

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন তাঁহার অনন্ত জ্ঞানসম্ভার ও অহেতুকী স্বদেশপ্রীতি লইয়া দীনা বৃদ্ধমাতার ক্রোড়ে অবতীর্ণ হন তখন ভারতবাসী তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন তিনি জলদগম্ভীর স্বরে স্বর্গীয় ভাষায় প্রচার করিলেন—

"ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেইদিন সমগ্র জগৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া প্রেমিকপ্রবরের চরণে আত্মবিক্রয় করিল। জগৎবাসী স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল, কে যেন তাঁহাদের অতি নিকটে গুরুগম্ভীর ভাষায় বলিতেছে—'বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসীর মোক্ষলাভ করিতে হইলে পরের সেবায় নিজকে উৎসর্গ করিতে হইবে, আত্মপর ভেদ ভুলিয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে নারায়ণজ্ঞানে সকলকে সেবা করিতে হইবে, শরীরপাত করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।'

সেবা করা মানুষের জন্মগত সংস্কার। আর্ত্তের উদ্ধার চেষ্টা, প্রবলের অত্যাচার হইতে নিপ্পীড়িতকে রক্ষা করিবার স্পৃহা, তাহার সাহায্যের জন্য স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিবার আকাঙ্ক্ষা মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার। মানবহৃদয়ে জন্ম হইতেই যে ভালবাসার বীজ নিহিত রহিয়াছে তাহা তাহাকে নিজের আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলের চেষ্টায় উৎসাহিত করিতেছে—স্বার্থপরের মত শুধু নিজ জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। সকলের

সঙ্গে এক হইয়া অন্যের সুখ দুঃখের সহিত নিজের সুখ দুঃখ মিশ্রিত করিয়া বাস করিতে পারিলেই মানবজন্মের সম্পূর্ণ বিকাশ। এই যে পরস্পর মিলন ও সাহায্যের ভাব ইহাকেই এক কথায় বলা হয় সেবা। এই প্রবৃত্তি যেমন জন্মগত তেমনই ইহা মানবজীবনের মহাসম্পদ্।

ভোগবিলাসিতারূপ জীবনসংগ্রামের এই ঘোর দুর্দ্দিনে জপ, তপ, যোগসাধন, বিবেকবৈরাগ্যাদি সহায়ে জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়া কিম্বা ইষ্টচিন্তায় তন্ময়তা আনা বড়ই দুঃসাধ্য বলিয়া স্বামীজী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরোপকারাদি লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে সেবাধর্ম্মরূপে পরমার্থসাধনে পরিণত করিয়া কর্ম্মপ্রবণ মুমুক্ষু জীবের মুক্তিলাভের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর প্রদর্শিত এই সেবাধর্ম্ম ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভালবাসা ভগবৎপ্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। লোকহিতসাধন এবং সেবাধর্ম্ম এই উভয়ের অনুষ্ঠান-গুলি এক হইলেও ভাবের তারতম্যানুসারে উভয়ের ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটী কর্ত্তৃত্বাভিমান হেতু অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী, অপরটী উহার অভাব হেতু অদ্বৈতজ্ঞান বিকাশের তপনস্বরূপ। "আমি করিব", "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমান অজ্ঞানপ্রসূত। তুমি আমি জগতের কি উপকার করিব?—ভগবানই একমাত্র জগতের মঙ্গল-বিধায়ী। আমাদের কাজ জীবজগতের সেবা করা। আমরা যখন জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে কিম্বা ইষ্টচিন্তায় তন্ময় হইতে পারিতেছি না তখন আমাদের পরমার্থসাধনের একমাত্র উপায় জীবসেবা। এই জীবসেবা তাঁহারই সেবা। জীব সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন, ভগবান্‌কে ভালবাসা, তাঁহার সেবা করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভবপর, কিন্তু মানুষে ঐরূপ কিরূপে সম্ভবে? তবে শাস্ত্রে আছে, ব্যক্তিবিশেষের সেবা, যেমন গুরুসেবা, করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়—"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি। কিন্তু জীব মাত্রেরই সেবা করিলে যে ভগবানেরই

সেবা করা হইবে ইহা কি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অবান্তর কথা নহে? —না। পুরাণে আছে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ স্ফটিকস্তম্ভে সেই প্রেমময় ভগবানের ভাবঘনমূর্ত্তি সন্দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সেদিনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রস্তরময়ী ভবতারিণীর সেবা করিতে করিতে সেই অদ্বৈতরূপিণী মা আনন্দময়ীর সাক্ষাৎলাভে মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুমূর্ত্তির সেবা করিয়া ব্রহ্মোপলব্ধি হয় তবে এই জীবন্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া উহাতে সেই প্রেমময় ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবে না কেন? শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"তোর ভিতরে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখ্‌তে পাচ্ছি।" আবার বলিতেন—"স্ত্রীমাত্রেই, এমন কি ঘৃণ্য বেশ্যাতে পর্য্যন্ত, সচ্চিদানন্দরূপিণী সেই জগজ্জননীকে দেখ্‌তে পাই।" জ্ঞানোন্মীলিত নয়নসমক্ষেই ভগবান্ এইরূপে প্রকাশিত হন। আমরা অজ্ঞ—অজ্ঞতাবশতঃই আমরা জগতের সহিত ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না। "মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্"। ব্রহ্ম হইতে নীরস কীট পর্য্যন্ত সকলের ভিতরেই সেই প্রেমময় ভগবান্ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব"। "বিশ্বময় বিশ্বনাথে", "জগৎ ভরা জগন্নাথে"। ভিতরে, বাহিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দূরে, নিকটে সর্ব্বত্রই জগন্নাথ। সুতরাং মানবমাত্রেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের প্রকট বিগ্রহ। এই জীবসেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হইবে—ইহা সত্য, অতি সত্য। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া কেবল চাই ঠিক্ ঠিক্ ভাবে সেবা করিবার চেষ্টা—শিবজ্ঞানে জীবসেবা। এইরূপে সেবা করিতে করিতে সেই অদ্বৈতজ্ঞানের চরম পরিণতি বিশ্বপ্রেমের আনন্দধারা শতধারে প্রবাহিত হইবে—তখন নিজেও ভাসিবে অপরকেও ভাসাইয়া সেই ব্রহ্মসাগরে লইয়া যাইবে।

স্বামীজী শিখাইলেন, শুধু এক পরিবারভুক্ত আত্মীয় স্বজনের

সেবায় দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে না। কারণ, তাহার মূল ভিত্তি মায়া। দেশের কল্যাণসাধন করিতে হইলে আত্মপরভেদ ভুলিয়া সকলকেই সেবা করিতে হইবে। এ সেবার অধিকারী শুধু উচ্চ বর্ণের লোকেরাই নয়, এ সেবার অধিকারী সকলেই। সকলেই তোমার ভাই—কাজেই, সকলেই সমভাবে ইহার অধিকারী। তাই তিনি ভারতবাসীকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—"হে ভারত, ভুলিও না নীচজাতি—মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর—তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" স্বামীজীর এই মহাবাণী দিবারাত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক!

এখন দেখা যাক কি প্রকারে এই সেবাধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই এই জীবরূপী ভগবানের মায়া-রূপগুলি তিন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছে। দরিদ্র নারায়ণ, অজ্ঞ বা মূর্খ নারায়ণ এবং অবিদ্যামোহগ্রস্ত নারায়ণ। এই ত্রিবিধ নররূপী নারায়ণের সেবার প্রণালীও ত্রিবিধ হইবে। কিন্তু এই দরিদ্রনারায়ণ সেবায় পুষ্প বিল্বপত্র ধূপ দীপাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু অকাতরে ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুখশান্তির বিধানই এই নররূপী নারায়ণের পূজার একমাত্র অনুষ্ঠান। শক্তি-পূজার উপচারে বিষ্ণুপূজা চলে না, আবার বিষ্ণুপূজার উপকরণে শক্তিপূজা হয় না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর পূজায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন উপচারের প্রয়োজন সেইরূপ প্রকৃতি বা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নর-নারায়ণ সেবায়ও বিভিন্ন প্রকার উপকরণের প্রয়োজন। দৈহিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধপথ্যাদি, মানসিক অভাবগ্রস্ত অজ্ঞ নারায়ণকে বিদ্যাশিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণকে পরমার্থ-জ্ঞান-দানরূপ উপকরণে পূজা করিতে হইবে।

দারিদ্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের অভাব নাই। প্রতিবৎসর কতশত লোক যে চিকিৎসাভাবে ও অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত ব্যাধি-

গ্রস্তদের ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করিয়া ও, দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের অন্নবস্ত্র সাহায্য করিয়া প্রাণরক্ষা করা দেশবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

রোগীর সেবা ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানের ন্যায় শিক্ষাদানের প্রতিও স্বামীজীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দেশের দরিদ্রকুলকে তুলিতে—তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য যাহারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান করিবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবে, এবং যাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে পশুপদবীতে উপনীত হইয়াছে তাহাদের মানুষ করিবার জন্য আমরণ চেষ্টা করিবে—স্বামীজী এরূপ একটী নিঃস্বার্থ যুবকসম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে আমাদের দরিদ্র নীচজাতিদের ভিতর শিক্ষাদানের একান্ত প্রয়োজন। জাতীয়তা হিসাবে আমরা যে বাংক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট তাহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের নীচজাতি মোটেই উন্নত নয়—শিক্ষার আলোক তাহারা মোটেই পায় নাই। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন—

"আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতি বিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। পুরোহিতগণ ও বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া পদদলিত করিয়াছে। অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ।"..."প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর, বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত।"..."যদি পুনরায় আমাদের উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।"

সুতরাং আমাদিগকে এখন শিক্ষা বিস্তার করিয়া দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করিতে হইবে। শিক্ষা দ্বারা তাহাদের শক্তি

জাগ্রত করিয়া দিতে পারিলে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেশ ছাড়িয়া পালাইবে।

এই সেবাব্রত বর্ণ, আশ্রম কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না। যখন যে অবস্থায়ই থাক না কেন, সর্ব্বত্রই সকলের জীবনে এই সাধনার সুযোগ রহিয়াছে। তবে কাহারও পক্ষে ঐরূপ সেবাই মুখ্য সাধনা, কাহারও পক্ষে বা উহা গৌণ। রোগ শোক দারিদ্র্য-যন্ত্রণায় প্রপীড়িত নরনারীরূপে ভগবান্ তোমার সেবা গ্রহণ করিতে সর্ব্বত্রই তোমার দ্বারস্থ! হে সাধক, এই সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের প্রকট বিগ্রহ মানব মানবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পারলৌকিক কল্যাণসাধনে তৎপর হও। আজ এই সেবা ব্রতটী মহান্ আদর্শরূপে তোমার সাধন পথে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিক। এই সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মই ভগবানের পূজা বলিয়া মনে হইতে থাকিবে এবং ভক্তের ইষ্টচিন্তায় তন্ময়তার ন্যায় তোমারও ভগবানে তন্ময়তা আনিয়া দিবে। তখন মানুষ আর মানুষ বলিয়া বোধ হইবে না, তখন দেখিতে পাইবে সেই প্রেমময় ভগবানই একমাত্র সর্ব্বত্র বিরাজিত।

ভগবৎজ্ঞানে জীবসেবায় শুধু যে পারলৌকিক কল্যাণই সংসাধিত হয় তাহা নহে, ইহাতে প্রকারান্তরে জাগতিক কল্যাণও সংসাধিত হইয়া থাকে। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-নিচয়, রাজদণ্ডের ভয়প্রদর্শন, সামাজিক কঠোর শাসন এবং নীতিবাদাদি উপায় অবলম্বনে সমূলে বিনষ্ট করিয়া অনেকেই শান্তি স্থাপনে যত্নবান্; কিন্তু উহার ফলে অধিকাংশ স্থলই শান্তি স্থাপনের পরিবর্ত্তে দ্বন্দ্ব কোলাহল মিথ্যা শঠতা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির পৈশাচিক লীলাভূমিতে পরিণত হইয়া থাকে। জীবসেবা—নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবার ভাব—যতদিন না হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া মানব নির্ম্মল ও পবিত্র হইতে পারিবে ততদিন জগতে শান্তিলাভের আশা আকাশকুসুমের ন্যায় সুদূরপরাহত।

ঐরূপে সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই ভালবাসা ও পবিত্রতার উজ্জ্বল আলোকে হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতারূপ অজ্ঞানান্ধকার অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং তখনই এই জগৎ শান্তিময় স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হে মানব, ওঠ জাগ, সেই মহাপুরুষের প্রদর্শিত সেবাধর্ম্মরূপ মহান্ আদর্শে জীবন গড়িয়া ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণসাধনে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান কর। যে স্বামীজী দেশের সেবায় নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন—যে স্বামীজী বিলাসের উপবন ঐশ্বর্য্যের অমরাবতী সুদূর আমেরিকায় অবস্থান কালেও দেশের দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়া মনের দুঃখে অসহনীয় যাতনায় দুগ্ধফেননিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পাপোঁষের উপর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি আরাধ্যদেবতার চরণে দেশের উন্নতির জন্য বেদনাতুর হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, ঐ শুন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"আমি এমন একদল যুবক চাই যাহাদের আদর্শ ত্যাগ, যাহারা পরের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে সততই প্রস্তুত, জগতের কল্যাণ করা—আচণ্ডালের কল্যাণ করাই যাহাদের ব্রত—তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে, যাহাদের মূল মন্ত্র 'পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ', যাহারা নিজের মুক্তি ইচ্ছা করে না, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাটাই যাহাদের মোক্ষ, যাহাদের শরীরের পেশী সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত ও যাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটি মন বাস করে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত।"

"কতকগুলি চেলা চাই—fiery young men, বুঝ্‌তে পার্‌লে? intelligent and brave—যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ্‌লে?"

আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে স্বামীজীর অভীপ্সিত সেই যুবক-সম্প্রদায় কোথায়? তাঁহার এই প্রেমের ডাক কি তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিতেছে না?

দরিদ্র নারায়ণদের সেবা করিতে হইলে—তাহাদের ভিতর শিক্ষা প্রচার করিতে হইলে—আমাদের আদর্শ ত্যাগী হইতে হইবে। এমন জীবন গঠন করিতে হইবে যে, সমস্ত জগৎ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমাদের পথ অনুসরণ করিবে। এক মহাপ্রেমের ভাবে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে—সমস্ত বিদ্বেষ হিংসা বিদূরিত করিতে হইবে—জাত্যভিমানের সামান্য বীজটুকুও হৃদয় হইতে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যেখানে দুঃখ, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে অজ্ঞান, তাহা দূর করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি' এই বৈষম্যজ্ঞান থাকিবে না—সকলের প্রতি সমভাবে প্রেমবারি বর্ষিত হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে। আসুন, আমরা উপসংহারে স্বামীজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মা জগদম্বার শ্রীচরণে মনুষ্যত্ব ভিক্ষা করি—

"হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর—আমায় মানুষ কর।

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এস্-সি)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পল্লীগ্রামে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের অভাবও বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। যদিও অনেক গ্রামে হরিসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই, তথাপি যথার্থ ভাব, ভক্তি, সরলতা, পবিত্রতা সেখানে কচিৎ দৃষ্ট হয়।

দলাদলি, মোকদ্দমা, পরস্পর হিংসা, স্বার্থপরতা, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা, এমন কি, ব্যভিচার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণ পল্লীগ্রামের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক সনাতন ধর্ম্মকে নিরক্ষর পল্লীবাসীর নিকট অতি বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া উপস্থিত করিতেছেন। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই ধারণা, যে ব্রাহ্মণ শিখা ধারণ করিয়া দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণীই যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ। তাঁহারা জানেন না যে, পাণ্ডিত্যে ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতায় কতদূর প্রভেদ। শ্রুতি এ বিষয়ে বলিতেছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

অর্থাৎ অবিবেকরূপ অবিদ্যার অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়াও যাহারা আপনাদিগকে ধীর এবং পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধপরিচালিত অন্ধের ন্যায় বিপথে (নানালোকে) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।"

অনেক পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহে নিত্যপূজা হওয়া ত দূরের কথা, উহারা অশ্বত্থ বট ও সরীসৃপাদির আশ্রয়স্থল হইয়াছে। যেখানে এখনও নিত্যপূজা চলিতেছে সেখানকার দেবালয় ও পূজার অবস্থা দেখিলে মনে হয় অধিকাংশস্থলে বিগ্রহ গলগ্রহে পরিণত হইয়াছে।

অবশ্য দুই একটি গ্রামে দুই একজন যথার্থ ভক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ এই অবস্থা। যে বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন সেখানে রমণীগণের যত্নে ঠাকুরঘরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলেও পূজা যথাযথ হইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ, পূজারী ব্রাহ্মণের হৃদয় যে কারণেই হউক শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোনও কারণে যজমানের বাটীতে যাইতে অক্ষম হইলে যে কোনও মন্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালক বা যুবককে যজমানের ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দেন। এমন কি, অনেক সময়ে ঠোঁট নাড়িতে, মাঝে মাঝে জল ছিটাইতে ও যথেচ্ছা পুষ্পচন্দনের ব্যবহার করিতে শিখাইয়া দিয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ যজমানকে প্রতারণা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কোথায় তাঁহারা যজমানদিগকে সকাম উপাসনা ছাড়াইয়া নিষ্কাম উপাসনার দিকে লইয়া যাইবেন, তা না হইয়া তাঁহারা কেবল চালকলা বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত!

পল্লীগ্রামে আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর ব্যক্তি অধিকাংশই নাস্তিক বা অল্প বিশ্বাসী। "বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখিল তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ, তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ, প্রাচীন আর্য্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না' এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।" পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিগুলি বর্ণে বর্ণে এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সত্য।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য, অর্থ, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের অভাব সম্বন্ধে স্থূল ভাবে আলোচনা করা হইল। আমরা দেখিয়াছি যে ইচ্ছা করিলেই অধিকাংশ অভাব মোচন করিতে পারি, তথাপি কেন আমাদের এইরূপ শুভেচ্ছা হয় না?

ধর্ম্মই আমাদের জীবনীশক্তি। আমরা যতই ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছি ততই আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা জড়বৎ হইয়া পড়িতেছি। সেই জন্যই কোন কার্য্য বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া প্রতীত হইলেও আমরা ঐ কার্য্যে আমাদের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারি না। আমরা বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিয়াও অঙ্গ সঞ্চালনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি।

অনেকে বলেন যে, শিক্ষার অভাবই পল্লীগ্রামের দুরবস্থার প্রধান

কারণ। কিন্তু এ শিক্ষা কোন্ শিক্ষা? যে শিক্ষার দ্বারা আমরা নাস্তিক-কল্প ও মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া পড়িয়াছি সেই শিক্ষার প্রচলনেই কি পল্লীসমাজের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে? যতক্ষণ ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত না হইবে, ততক্ষণ যতই আমরা জ্ঞানলাভ করি না কেন আমাদের জ্ঞান কিছুতেই কার্য্যকরী হইবে না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও লৌকিক বিদ্যাশিক্ষার অভাব আমাদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই. কিন্তু ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ ধর্ম্মভাবের অভাব।

ধর্ম্মহীন হওয়ায় জড়তা, নৈরাশ্য, বিকৃতরুচি, পরনির্ভরশীলতা, পরানুকরণপ্রিয়তা, অকপটতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে ইতরসাধারণের মধ্যে মাদক দ্রব্যের বহুল ব্যবহার, শিক্ষিত পল্লীবাসী কর্ত্তৃক অভিনীত বাৎসরিক থিয়েটার, ঝুমের নাচ প্রভৃতি আমাদের বিকৃত রুচির জলন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহ কেহ শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ যাবতীয় কার্য্যকেই হেয় বলিয়া মনে করেন। নিজের ছোট খাট মোট বহন করিতে, নিজের বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে কাটারি বা কোদাল স্পর্শ করিতে দ্বিধা বোধ করেন। ইহাও আমাদের বিকৃত রুচির পরিচায়ক। কোন প্রকার শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে এরূপ আশা আমরা সহজে করিতে পারি না—ইহা হইতে আমাদের নৈরাশ্যের গভীরতা বুঝিতে পারা যায়। স্বাধীন কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য চাকরীর জন্য ধনীর পদলেহন, পরান্নভোজন, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধাহীনতা বা নিজের উপর অবিশ্বাস সূচিত হয়। আর আহার বিহার সাজ সজ্জায় আমরা এতদূর পরানুকরণ করিতেছি যে, মহামান্য জষ্টীস্ উড্রফের ন্যায় নিরপেক্ষ পাশ্চাত্যবাসীও আমাদিগকে জাতীয় আচার রক্ষা করিবার নিমিত্ত সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছেন।

যাহা হউক, আমাদের পল্লীসমাজের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক উহার সম্পূর্ণ প্রতিকারের ব্যবস্থা আমাদের সাধ্যাতীত

নহে। আমাদের কর্ম্মহীনতা ও তন্নিবন্ধন নানাবিধ মানসিক ব্যাধি যতই ক্ষীণ হইবে ততই আমরা শুভকর্ম্মের প্রেরণা অনুভব করিব এবং আমাদের কার্য্যকরী শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, ও সংকর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মহীনতার হ্রাস সাধন করা যায়। সৎসঙ্গ ও সংচিন্তা দ্বারা সাধু ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা ঐ ইচ্ছা ফলবতী হইয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি বিধান করিয়া থাকে। নিঃস্বার্থ সেবাই সৎকর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক রাজ্যের অতি উচ্চস্থান লাভ করিবার অধিকারী হইতে পারি। আমরা যদি পল্লীগ্রামে নিঃস্বার্থ সেবা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে আমাদের পল্লীসমস্যা সমাহিত হইবার অনেক সম্ভাবনা।

কিরূপে পল্লীসেবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে একটি বিষয় জানিতে হইবে। আমাদের জানিতে হইবে যে, যে কারণেই হউক আমাদের ক্রমোন্নতির একটি যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। এই কথাটি অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিতে হইবে না—চতুর্দ্দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই এই বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমাদের দেশের ধর্ম্মাচার্য্য বৈদেশিক বিদ্বৎ-মণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে আমাদের বেদান্তের ধর্ম্ম সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্ম। এ যাবৎ যাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুসমাজ পৌত্তলিক এবং বর্ব্বর—এ যাবৎ যাঁহাদের অভিমান ছিল যে তাঁহারাই জগতে সভ্যতা এবং জ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন এই ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহাদের ধারণা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের কবি জগতের সাহিত্যিক সভায় সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক চৈতন্যতত্ত্বের অদ্ভুত বিস্তার দেখাইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিল্প ব্যবসায়ী সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন ও পরিচালন করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত বহুমুখী শক্তির পরিচয় দিতেছেন। আজ ভারতের নানা স্থানে অনাথাশ্রম,

সেবাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীন দুঃখী, অনাথের দুঃখনিবারণ করিতেছে,. আজ হিন্দু ব্রাহ্ম বৈষ্ণব আর্য্যসমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনার সময়ে প্রাণ দিয়া দেশের সেবা করিতেছেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজে এরূপ আশাপ্রদ কোনও লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। আজকাল আমাদের যুবকদের মধ্যে স্বার্থশূন্য শুভকর্ম্মের প্রবল প্রেরণা পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের মাননীয় গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য ২৪শ পরগণা, যশোহর ও নদীয়ায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং বক্রকীট ব্যাধি নিরাকরণের নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। ইহাতে কি মনে হয় না সত্যই ভগবান্ আজ এই দেশের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছেন? দুই একটি নিঃস্বার্থ ব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টায় কাশীর সেবাশ্রমের ন্যায় সুবৃহৎ অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ হইতে পারে, এই কথা স্মরণ রাখিলে মনে হয় যেন এ পতিত জাতির উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে—ভারতের সুপ্ত সমষ্টিচৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই কার্য্য করিবার শুভ অবসর। মহাপুরুষ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিয়া আমাদের আহ্বান করিয়াছেন, আমাদিগকে সে আহ্বান শুনিতেই হইবে।

এক্ষণে আমাদিগকে কি ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। যদি কোন পল্লীগ্রামে একজন ব্যক্তিও আত্মবিশ্বাস ও ভগবৎকৃপার বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বীয় জড়তা ও নৈরাশ্য দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গ্রামের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি সংগৃহীত হয়, সেইরূপ একব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে তাঁহার সঙ্গলাভে বহু ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। এইরূপে গ্রামের মধ্যে একদল স্বার্থশূন্য সেবকের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যথার্থ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যমাত্র শ্রবণ করিয়া কাহারও জড়ভাব লোপ হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং যে ব্যক্তির জড়তা কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বৃথা বাক্যব্যয় দ্বারা স্বীয় শক্তির অপচয় না করিয়া তাঁহার সাধ্যানুযায়ী কোন শুভকার্য্যে ব্রতী হইবেন—অপর কাহারও সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবেন না। তিনি নিজে যদি যথার্থ অকপট হন তবে এইরূপ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহার নিজেরও ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং তাঁহার কার্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরাপর ব্যক্তিগণও একে একে তাঁহার সহযোগী হইয়া দাঁড়াইবেন। অবশ্য প্রথমে বহুপ্রকার বাধা বিঘ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এইগুলিকে নিজের কর্ম্মক্ষমতার পরীক্ষা মাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অবিচলিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তিনি যদি এইরূপে তাঁহার স্বার্থশূন্যতা ও সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ কামনা স্বীয় ব্যবহারের দ্বারা ধীরে ধীরে জনসাধারণকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনতিবিলম্বে সমস্ত পল্লীবাসীর বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি পাইতে থাকিবেন। আমরা এখন অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় থাকিলেও যথার্থ আধ্যাত্মিকতার সম্মান করিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই নাই। ধর্ম্মহীন বা অবিশ্বাসী হইলেও যথার্থ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রভাবে আমাদের হৃদয় এখনও স্পন্দিত হয়, কারণ, আমাদের হৃদয়ের নিম্নস্তরে সংস্কারগত ধর্ম্মভাব এখনও বিদ্যমান। শুধু আমাদের কেন, মনুষ্য মাত্রেরই মানসিক গঠন অনেকটা এইরূপ—যথার্থ নিঃস্বার্থ শুভকর্ম্ম দেখিলে, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক প্রায় সকলেই ঐ কর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তবে ধর্ম্মহীনতার গভীরতা অনুযায়ী আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত হইতে বিলম্ব হয়। এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া উপস্থিত কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া শুভানুষ্ঠানটি নিষ্ঠার সহিত পরিচালন করিয়া যাইতে হইবে—যাঁহার যখন সময় হইবে তিনি তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

প্রথমে এমন একটি কার্য্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে যাহা বহুব্যক্তির সাহায্য ব্যতীতও অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অথচ যাহা দ্বারা

সর্ব্বসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় এই প্রকারের একটি অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। খুব সামান্য অর্থ সংগ্রহ (৮।১০৲ টাকা) করিলেই এই অনুষ্ঠানটি স্থাপন করা যায়, এবং ইহার পরিচালনা করিতেও মাসিক ব্যয় খুব সামান্যই, ২।১৲ টাকা মাত্র। ইতিপূর্ব্বে দারিদ্র্যের বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিয়াছি যে পল্লীগ্রামে অধিকাংশ ব্যক্তিই দীনমধ্যবিত্ত বা শ্রমজীবী এবং তাহাদের রোগের চিকিৎসা করাইবার অর্থ নাই। সুতরাং পল্লীগ্রামে দাতব্য ঔষধালয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণকেও এই ঔষধালয় হইতে সাহায্য দান করা যাইতে পারে। এইরূপ করিলে তাঁহাদের সহানুভূতি অতি সত্বরই এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমেই চাঁদার খাতা খুলিয়া গ্রামবাসিগণের দ্বারে দ্বারে অর্থ সংগ্রহ করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমরা জানি, কোন একটী গণ্ডগ্রামে কয়েকটি মাত্র যুবক নিজেদের মধ্যে মাত্র দুই টাকা বার আনা সংগ্রহ করিয়া "দাতব্য ঔষধালয়" স্থাপন করেন। আর এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামস্থ অনেক মধ্যবিত্ত বা দীন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাসিক চাঁদা দান করিতে আরম্ভ করেন। ঔষধালয়টির মাসিক চাঁদা ৩।৪ টাকা হইয়া পড়ে। ইহাই এইরূপ ঔষধালয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

এই অনুষ্ঠানটিতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সেবকদিগকে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কার্য্য অতি নিষ্ঠার সহিত করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ কার্য্যই যে স্থায়ী হয় না তাহার এ প্রধান কারণ এই নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব। এই সময়ে সেবকগণ তাহাদের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে ঔষধালয়ের কার্য্য করা, কাহারও নিকট কিছু প্রতিশ্রুতি করিলে তাহ

ঠিক ঠিক পালন করা, রোগীর নাম, ধাম, রোগ ও ঔষধের নাম নিয়মিত ভাবে লিখিয়া রাখা এবং জমা খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা সেবকদিগের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, কর্ম্মতৎপরতা, স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণাবলী ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে এবং এই সকল গুণ যতই তাঁহাদের পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে ততই তাঁহারা সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে থাকিবেন এবং সেবকদিগের দলও পুষ্ট হইতে থাকিবে। এইস্থানে একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক—এইরূপ একটি ঔষধালয় একজন মাত্র সেবক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং বহুদিন পরিচালিত হইতে পারে, এবং ক্রমশঃ সাধারণের চিত্তাকর্ষণ হইতে হইতে দলপুষ্টি হইয়া এই সামান্য অনুষ্ঠানটি বৃহদনুষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বিদ্বৎসন্ন্যাস।

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শঙ্কা)—যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে আত্মজ্ঞান সম্যক্ পরিপক্ক হইলে তাহার সেই অবস্থান্তরকেই মুনিত্ব বলে, অতএব আত্মজ্ঞান দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত (অর্থাৎ বিবিদিষা) সন্ন্যাস হইতে মুনিত্ব-রূপ এই ফল (লাভ করা গিয়া থাকে)—

(সমাধান)—তবে আমরা বলি, ভালই, আমরা তাহা স্বীকার করি এবং সেই হেতু বলি যে সেই সাধনরূপ সন্ন্যাস হইতে এই ফলরূপ সন্ন্যাস ভিন্ন। যেরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসী কর্তৃক তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত শ্রবণাদি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য সেইরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাসী কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সম্পাদন করা

কর্ত্তব্য। ইহা অগ্রে সবিস্তর বর্ণনা করিব। এই দুই সন্ন্যাসের মধ্যে অবান্তর ভেদ থাকিলেও পরমহংসস্বরূপে উভয়কেই এক ধরিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে "চতুর্বিধা ভিক্ষবঃ" * এই চারিটি মাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বিবিদিষা সন্ন্যাসী এবং শেষোক্ত বিদ্বৎ সন্ন্যাসী উভয়কেই পরমহংস বলে, একথা জাবালশ্রুতি (জাবালোপনিষৎ, ৪,৫) হইতে জানা যায়। তথায় (পাওয়া যায়), জনক সন্ন্যাস সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে যাজ্ঞবল্ক্য ("আশ্রমভেদে) বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া এবং পর পর যে যে প্রকার (কর্ম্মাদির) অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা বলিলেন, এবং তাহার পর অত্রি যজ্ঞোপবীতরহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে দোষ ধরিলে পর যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মজ্ঞানই তাঁহার যজ্ঞোপবীত" এই বলিয়া সমাধান করিলেন। এইহেতু বাহ্যোপবীতের অভাব দেখিয়া (বিবিদিষা সন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব নিশ্চিত হইল। এবং অপর (ষষ্ঠ) কণ্ডিকায় "পরমহংসগণ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া সম্বর্ত্তক, আরুণি প্রভৃতি অনেক ব্রহ্মবিদ্ জীবন্মুক্তের উদাহরণ দিয়া "অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ"—তাঁহারা অব্যক্তলিঙ্গ (আশ্রমবিশেষের চিহ্নাদিশূন্য), অব্যক্তাচার (সর্ব্বপ্রকার আচার বর্জ্জিত), অনুন্মত্ত (উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহারে রত) এই বলিয়া বিদ্বৎসন্ন্যাসিগণের অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর "ত্রিকাণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চেত্যেতৎ সর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ"—ত্রিকাণ্ড (ত্রিদণ্ড), কমণ্ডলু, শিক্য শিকা, পাত্র, জলপবিত্র, (জল ছাঁকনি), শিখা, যজ্ঞোপবীত ইত্যাদি বস্তু সমূহ 'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জলে পরিত্যাগ

---

* পারাশর মাধবীয়ে হারীতবচনঃ—

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ

* * *

কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।

চতুর্থঃ পরমহংসঃ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥"

করিয়া আত্মার অন্বেষণ করিবেক। এইরূপে যিনি ত্রিদণ্ড ছিলেন তাঁহার পক্ষে একদণ্ড চিহ্নিত "বিবিদিষা সন্ন্যাস বিধান করিয়া সেই বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফলস্বরূপ বিদ্বৎসন্ন্যাস নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"যথাজাতরূপধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব-ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্ন শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে বিমুক্তো ভৈক্ষ্যমাচরন্নুদরপাত্রেণ লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা শূন্যাগার-দেবতাগৃহ-তৃণকূট-বল্মীক-বৃক্ষমূল-কুলালশালাগ্নিহোত্র-নদীপুলিন-গিরি-কুহর-কন্দর-কোটর-নির্ঝর-স্থণ্ডিলেষনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স এব পরমহংসো নাম।"

যিনি সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের দ্বারা অবিকৃতচিত্ত এবং পরিগ্রহশূন্য (সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিবিহীন) থাকিয়া ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ নিরত, ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রাণধারণের নিমিত্ত যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বাধীনভাবে উদরপাত্রের দ্বারা (ভোজন পাত্র শূন্য হইয়া) ভিক্ষাচরণ করেন এবং লাভ অলাভকে সমান জ্ঞান করেন এবং অনির্দ্দিষ্টাশ্রয় হইয়া শূন্যভবন, দেবালয়, তৃণকুটীর, বল্মীক, বৃক্ষমূল, কুম্ভকারের কর্ম্মশালা (পোয়ান), অগ্নিহোত্র (হবন গৃহ), নদীপুলিন, গিরিগহ্বর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর (সন্নিহিত) যজ্ঞভূমি (প্রভৃতি) স্থানে (বাস করেন) এবং নিশ্চেষ্ট নির্ম্মম হইয়া শুক্লধ্যাননিরত, অধ্যাত্মনিষ্ঠ শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়পরায়ণ হইয়া সন্ন্যাসের দ্বারা দেহত্যাগ করেন তিনিই নিশ্চয় পরমহংস। সেইহেতু এই উভয়ের (বিবিদিষা ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসের) পরমহংসত্ব সিদ্ধ হইল। উক্ত উভয় প্রকার সন্ন্যাসের পরমহংসত্ব তুল্যরূপে সিদ্ধ হইলেও তাহারা পরস্পর বিপরীত স্বভাবের বলিয়া তাহাদের মধ্যে অবান্তরভেদও (অবশ্যই) স্বীকার করিতে হইবে। এই দুই সন্ন্যাস যে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত তাহা 'আরুণি' উপনিষদ্ ও 'পরমহংস' উপনিষদের পর্য্যালোচনায় জানা যায়। 'কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজানি" (আরুণিকোপনিষদ ১)—

"হে ভগবন্, কোন্ উপায় দ্বারা আমি নিঃশেষরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি" এই বাক্যের দ্বারা শিষ্য আরুণি গুরু প্রজাপতিকে শিখা, যজ্ঞোপবীত, স্বাধ্যায, গায়ত্রীজপাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগরূপ বিবিদিষা সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু প্রজাপতি (প্রথমে) "শিখাং যজ্ঞোপবীতং" (শিখা যজ্ঞোপবীত) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, (পরে) "দণ্ডমাচ্ছাদনং কৌপীনং চ পরিগ্রহেৎ"—দণ্ড, আচ্ছাদন (বহির্ব্বাস গাত্রবস্ত্র) ও কৌপীন গ্রহণ করিবে। এই বাক্যের দ্বারা দণ্ডাদিগ্রহণ বিধান করিলেন, এবং "ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ। সন্ধিংসমাধাবাত্মন্যাচরেৎ সর্ব্বেষু বেদেষারণ্যকমাবর্ত্তযেৎ। উপনিষদমাবর্ত্তয়েৎ।" (আরুণিকোপনিষদ্ ২)—তিনবার সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে স্নান করিবে, সমাধিতে আত্মার সহিত সন্ধি (সংযোগ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান) অভ্যাস করিবে, বেদ সমূহের মধ্যে "আরণ্যক" (অংশের) আবৃত্তি করিবে, উপনিষদের আবৃত্তি করিবে। এই বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের হেতু স্বরূপ যে আশ্রমধর্ম্ম সমূহ, তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিলেন। আর (পরমহংসোপনিষদে) "অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোঽয়ং মার্গঃ"—"পরমহংস যোগীদিগের পথ কিরূপ?" নারদ এই প্রশ্নের দ্বারা গুরু ভগবান্ প্রজাপতিকে বিদ্বৎসন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি "স্বপুত্র মিত্র" * ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্যাগের কথা বলিলেন, এবং "নিজের শরীরের উপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত, কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিবে" এই বলিয়া দণ্ডাদিগ্রহণ লোকাচার মাত্র ইহা দেখাইয়া "এবং তাহা মুখ্য নহে" এই কথা বলিযা দণ্ডাদি গ্রহণ যে শাস্ত্রীয় (অর্থাৎ একান্ত

---

* অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতং যাগং সত্রং স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরভোগার্থায় লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ, তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি, কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং * * * * আশাম্বরো (আকাশাম্বরো) ন নমস্কারঃ * * *"

কর্ত্তব্য) নহে তাহা বুঝাইলেন। পরে "তবে মুখ্য কি?" এই আশঙ্কা উঠাইলে বলিলেন—"ইহাই মুখ্য যে পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত এবং আচ্ছাদন (গাত্রবস্ত্র) ব্যবহার করেন না"; (এবং ইহা দ্বারা) দণ্ডাদি চিহ্ন রহিত হওয়াই শাস্ত্রানুমোদিত ইহা (বুঝাইয়া) "না শীত না গ্রীষ্ম" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এবং "দিগম্বর নমস্কারশূন্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা (পরমহংস) যে লোকব্যবহারের অতীত তাহা বুঝাইলেন, এবং পরিশেষে "যে ব্রহ্ম পূর্ণ, আনন্দ, এক এবং বোধস্বরূপ তাহাই আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কৃতকৃত্য হয়েন" * এই পর্য্যন্ত বাক্যের দ্বারা পরমহংসের (সকল কর্ত্তব্য) ব্রহ্মানুভবমাত্রে পর্য্যবসিত হয় ইহাই বিশেষরূপে বুঝাইলেন। অতএব বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য প্রদর্শিত সঙ্কেত অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ হইতে দেখিয়া লইতে হইবে। (স্মৃতিতে আছে) পারাশর-মাধবীয় স্মৃতি অঙ্গিরা বচন—

"সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণো যোগো জ্ঞানঞ্চ সন্ন্যাসলক্ষণম্।
তস্মাজ্‌জ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্ন্যসেদিহ বুদ্ধিমান্॥"

—সংসারকে একেবারে সারশূন্য জানিয়া এবং তাহার সারদর্শন করিবার অভিলাষে (কেহ কেহ) বিবাহ না করিয়া পরবৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। প্রবৃত্তিই যোগের (কর্ম্মের) লক্ষণ এবং সন্ন্যাসই জ্ঞানের লক্ষণ। সেইহেতু এই সংসারে যিনি বুদ্ধিমান্ (বিবেকী) তিনি জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের (কথা)।

"যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনং।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতশিখাং ত্যজেৎ॥
জ্ঞাত্বা সম্যক্ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা পরিব্রজেৎ॥"

* "যৎপূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি"।

—কিন্তু যখন তত্ত্ব জানা যাইবে অর্থাৎ সনাতন পরব্রহ্ম বিদিত হইবেন তখন একটি দণ্ড সংগ্রহ করিয়া উপবীতের সহিত শিখা পরিত্যাগ করিবেন। পরব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়া সব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।

ইত্যাদি বিদ্বৎসন্ন্যাসের (কথা)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, লোকের যেমন কেবল ঔৎসুক্যবশতঃ (চিত্রাঙ্কনাদি) কলাবিদ্যা জানিতে প্রবৃত্তি হয়, (ব্রহ্মবিদ্যা) জানিবারও ত' কখনও সেইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে, এবং এইরূপে যে ব্যক্তি পল্লবগ্রাহীমাত্র (অর্থাৎ অল্পজ্ঞ) এবং যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন (কিন্তু যাঁহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য নাই) সেইরূপ ব্যক্তিগণেরও বিদ্বত্তা বা ব্রহ্মজ্ঞান দেখা যায় কিন্তু তাহাদের ত' সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে দেখা যায় না। অতএব বিবিদিষা (জিজ্ঞাসা) ও বিদ্বত্তা (জ্ঞান) এই শব্দ দ্বয়ের কিরূপ অর্থ অভিপ্রেত (তাহা জানা আবশ্যক)।

(সমাধান)—বলিতেছি। যেমন তীব্র ক্ষুধা উৎপন্ন হইলে ভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে রুচি হয় না, এবং ভোজনেরও বিলম্ব সহ্য হয় না, সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম জন্মলাভের হেতু, সেই সকল কর্ম্মে অত্যন্ত অরুচি এবং জ্ঞানলাভের হেতু যে শ্রবণাদি তাহাতে অত্যন্ত ত্বরা জন্মে। সেই প্রকার বিবিদিষাই (জানিবার ইচ্ছাই) সন্ন্যাসের হেতু।

বিদ্বত্তার (জ্ঞানের) সীমা "উপদেশ-সাহস্রী"তে (এইরূপ) কথিত হইয়াছে:—

"দেহাত্মজ্ঞানবজ্‌জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকং।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥"

—দেহের প্রতি লোকের যেমন 'আমি' বুদ্ধি আছে যখন আত্মার প্রতি সেইরূপ 'আমি' বুদ্ধি হইবে (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে আত্মার কথা শুনা যায় 'সেই আত্মাই আমি', এইরূপ জ্ঞান জন্মিবে) তখন শেষোক্ত বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যায়।

শ্রুতিতে আছে (মুণ্ডক, ২।২।৯)—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।"

যিনি সেই পরাবরকে দর্শন করেন, তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদি সংস্কার) বিনষ্ট হইয়া যায়; তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাঁহার (প্রারব্ধভিন্ন) কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পরাবর—'পর' শব্দে হিরণ্যগর্ভাদির পদ বুঝায়। তাহা 'অবর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট যাঁহা হইতে, তিনি পরাবর অর্থাৎ পরব্রহ্ম।

হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যে (চিৎস্বরূপ) সাক্ষীর তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ আমিই বুদ্ধি এই প্রকার ভ্রমজ্ঞান, তাহা অনাদি কালের অবিদ্যা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া গ্রন্থির ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সেই হেতু তাহা গ্রন্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সংশয়—সংশয়সকল এইরূপ, যথা—আত্মা সাক্ষী অথবা কর্ত্তা, তাঁহার সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি ব্রহ্ম কি না, তাঁহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় কি না, বুদ্ধির দ্বারা জানা গেলেও তাঁহাকে জানিবামাত্রই মুক্তি হয় কি না ইত্যাদি।

কর্ম্মসমূহ—যে সকল কর্ম্ম এখনও ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করে নাই, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম আগামী জন্মের কারণ। এই হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতি তিনটি বস্তু অবিদ্যা-নির্ম্মিত বলিয়া আত্মদর্শনের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিতেও এই কথা পাওয়া যায়, যথা, (ভগবদ্গীতা, ১৮।১৭)—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

—যাঁহার ভাব অহঙ্কৃত নহে, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত (অর্থাৎ সংশয় প্রাপ্ত) হয় না, তিনি এই (দৃশ্যমান্) লোকসমূহের হত্যা করিয়াও হত্যা করেন না এবং (তদ্দ্বারা) বন্ধপ্রাপ্ত হয়েন না।

যাঁহার ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মবিদের সত্তা বা স্বভাব অর্থাৎ আত্মা।

অহস্কৃত নহে—অহঙ্কারের দ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাস বশতঃ ভিতরে আচ্ছাদিত নহে। অর্থাৎ আমিই কর্ত্তা এইরূপ বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি লিপ্ত হয় না—'বুদ্ধির লেপ' বলিতে সংশয় বুঝিতে হইবে।

এই (দুইটির) অভাববশতঃ, তিনি ত্রৈলোক্য বধ করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না। অন্য কোনও কর্ম্মের দ্বারা যে বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন না তাহা আর বলিতে হইবে না।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যদি এরূপ হইল তাহা হইলে বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা দ্বারাই ত আগামী জন্ম নিবারিত হইল এবং বর্ত্তমান জন্মের যে অবশেষ আছে তাহার ভোগবিনা ক্ষয় করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রযাসের ফল কি?

(সমাধান)—এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। কেন না বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যেমন বিবিদিষা-সন্ন্যাস-সম্পাদন আবশ্যক সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভের নিমিত্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের সম্পাদন আবশ্যক।

ইতি বিদ্বৎসন্ন্যাস।

জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বয়।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

১। জ্ঞানী ও ভক্ত।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানী ভক্ত নহেন। কিন্তু অজ্ঞানেও ভক্তি থাকিতে পারে না; যেহেতু অজ্ঞানী তমোগুণাচ্ছন্ন। তমোগুণী লোক মূঢ় অর্থাৎ পশুবৎ, সুতরাং জ্ঞানহীনের ভক্তিলাভ অসম্ভব।

জ্ঞানার্থে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে। তত্ত্ব শব্দে ভগবৎতত্ত্ব বুঝায়। অতএব যিনি ভগবৎতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই

জ্ঞানী বলে। ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে আর সমুদায়ই অজ্ঞান। গীতায় শ্রীভগবান্ ভক্তের চারিপ্রকার বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (৭।১৬)

হে অর্জ্জুন, রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানবান্ এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন। এই শ্লোকে ভগবান্ কেবল মাত্র চারিপ্রকার ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার অধিক আর ভক্ত থাকিতে পারে না। এই চারিপ্রকারের মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন প্রকার ভক্তই হৈতুক অর্থাৎ সকাম; কেবল জ্ঞানীই নিষ্কাম অর্থাৎ অহৈতুক ভক্ত। যেহেতু জ্ঞানীর, ভগবৎতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা ব্যতিরেকে অন্য কোনও কামনা নাই। অতএব কেবল জ্ঞানী ব্যতীত প্রকৃত অহৈতুকী পরাভক্তি লাভের আর কেহই অধিকারী নহেন। শ্রীভগবান পুনরায় জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

"উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥" (গীতা— ৭।৬)

ইঁহারা সকলেই মহান্; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ, যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। এখানে ভগবানের অভিপ্রায় এই যে অপর তিনটি ভক্তও শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু জ্ঞানী তাঁহারই স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানী ও তিনি এক। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে অভক্ত হইবেন?

আবার কেহ বা জ্ঞানীকে শুষ্ক ও কর্কশ এবং প্রেমহীন বলিতেও সঙ্কুচিত হন না। এই শ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান শব্দের কি অর্থ করেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই স্থানে জ্ঞানীভক্ত "কবীরের" একটি দোঁহা মনে পড়িল।

"পানিমে রহতু মীন্ পিয়াসিরে
শুনতু শুনতু লাগে হাঁসিরে।"

অর্থাৎ সাগর জলে মৎস্য ডুবিয়া থাকিয়াও যে তাহার জল পিপাসা মিটে না একথা শুনিলে হাসি পায়। বাস্তবিকই কি ইহা হাসিবার কথা নহে? যে ব্যক্তি প্রেমার্ণব, সচ্চিদানন্দ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি কিরূপে কর্কশ ও প্রেমভক্তিহীন হইবেন? এ বড় বিচিত্র কথা সুতরাং অশ্রদ্ধেয়। আবার কোন কোন ভক্ত বলেন যে, ভক্তই কেবল ভক্তির অধিকারী অপর কেহই নহেন, অর্থাৎ "জ্ঞানী" বা "যোগীর" ভক্তিতে অধিকার নাই। এখন দেখা যাক্ যে, জ্ঞানী ও যোগী কাহার সাধনা করেন? ভক্তেরা বলেন, যে "জ্ঞানী" পরব্রহ্মের উপাসক; আর "যোগী" পরমাত্মার সাধক। কেবল ভক্তই শ্রীভগবানের ভজনা করেন। তাহা হইলে "পরব্রহ্ম", "পরমাত্মা," ও "ভগবান্" তিনটি স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেছেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

> "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
> অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥" (১০।২০)

হে অর্জ্জুন, আমিই ভূতগণের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা এবং আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে তাহা হইলে পরমাত্মায় ও শ্রীভগবানে আর পার্থক্য রহিল না। সুতরাং "যোগী" পরমাত্মারূপে সেই সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানেরই উপাসনা করেন ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। নিম্নে শ্রেষ্ঠভক্তিগ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

> "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥
> জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনে বশে;
> ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ বুঝা যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব। অর্থাৎ অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবৎ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই তিন প্রকার সাধনায়, সেই অদ্বিতীয়, গুণাতীত পরব্রহ্মই ব্রহ্ম,

ও ভগবান্ এই তিনরূপে প্রকাশিত হন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, "জ্ঞানী" ও "যোগী" ইঁহারা উভয়েই সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানেরই উপাসক। জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি, তিনটী স্বতন্ত্র পথ মাত্র কিন্তু গন্তব্য স্থান তিনেরই এক। "জ্ঞানী" ও "যোগী" যদি ভগবানের উপাসকই হইলেন তবে তাঁহারা ভক্তিহীন হইবেন কিরূপে? কারণ, যিনি যে পথই অবলম্বন করুন, ভক্তিশূন্য ভগবৎ উপাসনা কখনই হইতে পারে না। যদি কেহ "সোনার পাথরবাটী" বলিতেও কুণ্ঠিত না হন তত্রাচ ভক্তিহীনের ভগবৎ সাধনা কখনই সম্ভব নহে,—ইহা সকল প্রকার যুক্তি ও তর্কের বহির্ভূত। শ্রীভগবান্ গীতায় যোগীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (৬।৪৬)

যোগী তপঃপরায়ণগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানবান্দিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, (ইষ্টপূর্ত্তাদি) কর্ম্মপরায়ণ জনগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিমত; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।' এ শ্লোকে ভগবান্ যোগীর স্থান সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যোগী মাত্রেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা নহে, এই হেতু যোগীদিগের মধ্যে আবার কে শ্রেষ্ঠ তাহা বলিতেছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥" (৬।৪৭)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে অর্পিত চিত্ত দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, তিনি সকল যোগীর মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ যোগী, ইহা আমার অভিমত। অতএব ভক্তিহীন যোগী শ্রেষ্ঠ নহেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবান্ গীতায় ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আবার এখানে "ভক্তযোগীকে"ও শ্রেষ্ঠ বলিলেন, সুতরাং প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে "যোগী" ও "জ্ঞানী" উভয়ই হইতে হইবে। কারণ, কর্ম্মযোগই জ্ঞানার্জ্জনের সোপান এবং জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত পরাভক্তি লাভ হওয়া সম্পূর্ণ দুর্লভ। যোগ বলিলে কেহ যেন

একটা কিম্ভূতকিমাকার জটিল কর্ম্ম বলিয়া বুঝিবেন না। "যোগ" শব্দের অর্থ একটিতে আর একটি যোজনা করা মাত্র। মনকে সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র ভগবচ্চিন্তায় আবিষ্ট করার নাম যোগ। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥" (২।৫০)

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানযোগী ইহজন্মেই সুকৃত ও দুষ্কৃত ত্যাগ করেন; অতএব তুমি তৎসাধনার্থ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যোগে যুক্ত হও। নিষ্কামকর্ম্মে কুশলতাই যোগ। এক্ষণে দেখা গেল যে, জ্ঞানী ও যোগী উভয়েই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

(২) জীব ও ব্রহ্ম।

যে সকল ভক্ত্যাভিমানী ব্যক্তি জ্ঞানীকে অভক্ত বলেন, তাঁহারা জ্ঞানার্থে বোধ হয় "সোহহং" জ্ঞান বুঝেন। কিন্তু "সোহহং" জ্ঞান নহে। জ্ঞানের পরাবস্থা, তখন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কেহই থাকে না, যেমন "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া আর ফিরিল না" তদ্রূপ। তাঁহারা আরও বলেন্ যে জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, একথা বলিলেও অপরাধ হয়। কারণ জীব চিরকালই জীব থাকিবে, জীব ও ব্রহ্মে একত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব। একথা কতকটা সত্য। যেহেতু জীবাবস্থা অবশ্যই ব্রহ্ম নহেন এবং হইতেও পারেন না। "ব্রহ্মই" নিজ মায়াবশে আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীব উপাধি ধারণ করেন। গুটিপোকা যেমন নিজ লীলায় আবৃত হইয়া নিজেই বদ্ধ হয়, সেইরূপ মায়াতীত ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব সাজেন মাত্র, নতুবা জীব বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" শাস্ত্রেও আছে, "মায়ামুগ্ধ জীব মায়ামুক্ত শিব"। যথা—

"তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবাত্তু তণ্ডুলঃ।
মায়াবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ মায়ামুক্তো সদাশিবঃ॥"

বেদান্ত বলেন, মায়াবৃত ব্রহ্মই জীব, আবার মায়ামুক্ত হইলেই স্বস্বভাবে

অবস্থিত হন। তখন তিনি নিজেই বলেন "সোঽহম্"—আমি সেই। অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম—মায়াবশে যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এখন তাহাই জ্ঞাত হইয়াছি অতএব "সোঽহম্"। সুতরাং সোঽহম্ শব্দে জীব ব্রহ্ম হয় ইহা বুঝায় না। যেমন "রজ্জুসর্প ভ্রম"। ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু ভ্রম দূর হইলে রজ্জু রজ্জুই থাকে, সর্প অবশ্যই রজ্জুতে পরিণত হয় না। সেইরূপ "শুক্তিতে রজত ভ্রম" অর্থাৎ ভ্রমান্তে যে শুক্তি সেই শুক্তিই থাকে। রজত কখনই শুক্তি হয় না; সুতরাং জীবভাবে ব্রহ্মত্ব নাই।

কেহ কেহ বলেন জীব অনাদি; কিন্তু যাহার আদি নাই তাহার উৎপত্তিও নাই এবং যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বিনাশও নাই। কিন্তু জীবের উৎপত্তি ও নাশ অপরিহার্য্য। যথা—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" (২।২৭)

যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত।

গীতায় শ্রীভগবান্ জীবের উৎপত্তির ক্রম এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥" (৩।১৪-১৫)

ভূত সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ হইতে, মেঘ যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে, কর্ম্ম বেদ হইতে ও বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখন উপর হইতে পর্য্যায় ক্রমে দেখিলে দেখা যায় যে ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সমুদয় উৎপন্ন বা সৃষ্ট বস্তুর আদি বা মূল কারণ একমাত্র সেই "পরব্রহ্ম" ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব জীবের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই সেই অদ্বিতীয় গুণাতীত ব্রহ্ম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভূত সকল অনাদি বা নিত্যবস্তু নহে, তবে তাহার

উৎপত্তিস্থান অনাদি ও নিত্য বটে। কিন্তু যে কোন কালে বা যে কোনও রূপেই হউক, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া ব্রহ্মত্ব অনিবার্য্য। অতএব "সোঽহং" বাক্যে অপরাধ নাই। যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম বলা হইতেছে না।

(৩) "ব্রহ্ম" জ্যোতি মাত্র নহেন।

এক শ্রেণীর ভক্তদিগের "ব্রহ্ম" শব্দের বুৎপত্তি অতি অপূর্ব্ব। তাঁহারা বলেন যে "ব্রহ্ম বস্তুটি" ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বা জ্যোতি মাত্র; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তেরাও তাহাই বলেন। তবেই ত ঘোর বিপদ! এইখানেই "নিগুর্ণ ব্রহ্ম" লোপ হইলেন। এখন দেখা যাক্ যে তাঁহারা এই "অঙ্গকান্তি" কোথায় পাইলেন? প্রভুপাদ কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে ব্রহ্মসংহিতা হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই নিম্নে পুনরুদ্ধার করিলাম। যথা—

"যস্য প্রভাপ্রভুবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি॥"

যদিও গোস্বামী ঠাকুরের এ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নহে, কিন্তু "ব্রহ্ম" গোবিন্দের অঙ্গকান্তি মাত্রই হইলে, তাঁহার নিগুর্ণত্ব লোপ হয় অর্থাৎ "নিগুর্ণ ব্রহ্ম" বলিয়া আর কিছুই থাকে না; কিন্তু নিম্নলিখিত মত ব্যাখ্যা করিলে বোধ হয় সে দোষ থাকে না। যথা—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রভা হইতে প্রাদুর্ভূত এবং অশেষকোটি বসুধাদি পৃথক্

পৃথক্ বিভূতিরূপে যিনি অধিষ্ঠিত সেই অনন্ত ও অশেষভূত নিষ্কল ব্রহ্ম আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এখানে "নিষ্কল ব্রহ্মই" আদিপুরুষ গোবিন্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যার "ব্রহ্ম" ও "গোবিন্দ" দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ এবং ব্রহ্ম বস্তুটি গোবিন্দ অপেক্ষা হীন বুঝাইতেছে। এখন দেখা যাক্, শাস্ত্র সকল ব্রহ্মকে কি বলিয়া নমস্কার করিতেছেন—

"অচিন্ত্যচিন্ত্যরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥"

যিনি চিন্তাতীত এবং চিন্তায় বিষয়ীভূত উভয়ই বটে, নির্গুণও বটে, সগুণও বটে এবং সমস্ত জগতের আধারস্বরূপ মূর্ত্তি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। ব্রহ্ম যদি চিন্তাতীত বা গুণাতীত হন তাহা হইলে তিনি কখনই "অঙ্গকান্তি" বা "জ্যোতি মাত্র" হইতে পারেন না। "জ্যোতি" বা "কান্তি" উভয় পদার্থই সগুণ, সুতরাং চিন্তা বা ধারণার বিষয়ীভূত, অতএব ব্রহ্ম অচিন্ত্য বা নির্গুণ নহেন। অঙ্গকান্তি বা রূপ হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত নশ্বর পদার্থ মাত্র; তাহা হইলে আর তিনি অবাঙ্মনসগোচর নিত্যবস্তু নহেন। ব্রহ্মের স্বরূপ যে কি তাহা আমি আর বুঝাইতে চেষ্টা করিব না যেহেতু আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহার বর্ণনা আছে। তবে বৈষ্ণব ভক্তেরা "জ্যোতি বা অঙ্গকান্তিকে" কিরূপে যে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই একটু বিচার্য্য। এই স্থানে "ব্রহ্মস্তোত্রম্" হইতে দুইছত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"যোগিনো যং হৃদাকাশে প্রণিধানেন নিষ্কলং।
জ্যোতিরূপং প্রপশ্যন্তি তস্মৈ শ্রীব্রহ্মণে নমঃ॥"

অর্থাৎ যোগিগণ হৃদাকাশে যাঁহাকে নিষ্কল জ্যোতিস্বরূপে প্রণিধান (উপলব্ধি) করেন সেই শ্রীব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে জ্যোতিই যে "ব্রহ্ম" তাহা বুঝাইতেছে না, ব্রহ্মের জ্যোতিই বুঝায়। অতএব গুণাতীত "ব্রহ্ম" যে কেবল "অঙ্গকান্তি" বা "জ্যোতি" মাত্র নহেন তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহাদিগেরও ধ্যেয় বস্তু আবশ্যক কিন্তু নিরাকারের ধ্যান সম্ভব নহে,

অথচ তাঁহারা স্থূল মূর্ত্তিরও ধ্যান করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থূলও নহে এবং একেবারে ধারণার বহির্ভূত নহে, এমন কোন সূক্ষ্ম পদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাই বোধ হয় "জ্যোতি"-ধ্যান ব্যবস্থা আছে। অনুমান হয়, সম্ভবতঃ যোগীদিগের এই জ্যোতিধ্যানকেই বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়া "ব্রহ্মকে" একটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থে পরিণত করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ "ব্রহ্ম" যে শ্রীগোবিন্দ হইতে অনেক হীন পদার্থ তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

(৪) সমন্বয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় দেখান মাত্র, দ্বন্দ্ব নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। পৃথক্ করিলে তাঁহার পূর্ণতা থাকে না। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ পূর্ণ নহেন, যেহেতু ঐশ্বর্য্যমাত্রই সগুণ পদার্থ। সুতরাং হ্রাসবৃদ্ধি ও ক্ষয়যুক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম অক্ষয় বলিয়াই তিনি পরিপূর্ণ; অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত সকল গুণশালী উপাধিই অপূর্ণ। শ্রীভগবান্ সগুণও বটেন আবার নিগুর্ণও বটেন —তাঁহার দুই অংশ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। সগুণ পদার্থ মাত্রই তাঁহার ব্যক্তাবস্থা আর অব্যক্তাবস্থাই তাঁহার নিগুর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। তাহাই গীতায় বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (৭।৪ ৬)

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্ত। হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা (অর্থাৎ জড় বলিয়া নিকৃষ্টা), ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটী জীবস্বরূপ অর্থাৎ চেতনাময়ী আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। পুনরায় বলিয়াছেন যে—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥" (১০।৪২)

অথবা হে অর্জ্জুন, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহুজ্ঞানে তোমার আবশ্যক কি? আমি সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। সুতরাং ভগবান্ ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র তারতম্য নাই। কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। অতএব ব্রহ্ম, ভগবান্ ও পরমাত্মা তিনই এক বস্তু এবং জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত একেরই উপাসক। উপাসক মাত্রই ভক্ত। এইরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতেও কোন বিরোধ দেখা যায় না। যেহেতু কর্ম্মযোগে জ্ঞান, জ্ঞানে ভক্তি এবং ভক্তিতেই মুক্তি লাভ হয়। পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি একই অবস্থা। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনিই "জ্ঞানী", আবার যিনি জ্ঞানী তিনিই "ভক্ত"।

সমালোচনা।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত।

তত্ত্বজ্ঞানামৃত নামক বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থখানি চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকরালপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাণপুর নিবাসী। গ্রন্থখানি অদ্বৈত মতাবলম্বী সাধক ও পাঠকবর্গের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিবে এবং তাঁহাদিগের মতের পরিপোষকরূপে সাধারণতঃ ব্যবহারে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এরূপ বৃহৎ আয়তনে ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকে শাস্ত্রীয় অনেক প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইবার অবসর পাইয়াছে এবং অনেক স্থলেই নানা জটিল যুক্তি ও তর্ক সম্বলিত হইয়া পুস্তকখানি অদ্বৈত "একদেশদণ্ডী" মতের একখানি বিশদ আলোচনাগ্রন্থের রূপ ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকারের বৈদিকশাস্ত্রজ্ঞান প্রচারে এবং

ব্যাখ্যানে এরূপ অসাধারণ উদ্যম ও কৃতিত্ব সহজেই পাঠকের মনকে অভিভূত করে এবং তজ্জন্য তিনি যথার্থই সকলের ধন্যবাদার্হ। ভারতবর্ষ এককালে যেমন নানা দর্শন ও জ্ঞানের আলোচনার অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এখন তেমনি নানারূপ অবস্থা ও ভাগ্যের বিপর্যায়ে তাহাকে তাহার সেই প্রাচীন জ্ঞানানুশীলন হইতে বিরত ও পরাঙ্মুখ থাকিতে হইয়াছে। নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখনও যে কচিৎ কোনও বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানদর্শনাদির চর্চ্চা করিতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বতন দেবপ্রতিম ঋষি ও জ্ঞানিগণের বহুপুণ্যের ফলস্বরূপই বুঝিতে হয়। আমরা আজ শ্রীযুক্ত করালপ্রসন্ন বাবুকে ভারতীয় সেই সনাতন সদ্ধর্ম্মের রক্ষণ-কল্পে লেখনীচালন করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছি। সনাতন উচ্চচিন্তা ও ভাব হইতে বিশ্লিষ্ট নানা ভ্রান্তিসঙ্কুল মতের বিলাসলীলায় মুহ্যমান আমাদের বর্ত্তমান দেশবাসিগণকে করালপ্রসন্ন বাবুর এই প্রীতি ও ভক্তির দান বড়ই মূল্যবান্ ও বড়ই সময়োচিত হইয়াছে। প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ পুস্তকখানির বিশদ সমালোচনা করিবার স্থান ও অবসরের অভাব সুতরাং এই পুস্তকে কোন্ কোন্ বিষয় মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে তাহার অল্প পরিচয় দিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম পাদে বিস্তারি ভেদ বর্ণনাপূর্ব্বক অষ্টাদশ প্রস্থানের তথা ষট্ নাস্তিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে ন্যায়শাস্ত্রঘটিত সুবৃহৎ প্রবন্ধ, তন্মধ্যে দুই খানি ন্যায়ের পুস্তক হইতে বহুল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। চিদ্ঘনানন্দ কৃত 'ন্যায়প্রকাশ' এবং নিশ্চল দাসকৃত 'বৃত্তিপ্রভাকর' নামক দুইখানি জটিল পুস্তকের সারাংশ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। সংস্কৃতানভিজ্ঞ অথচ শাস্ত্রীয় যুক্তিবিচারের স্বরূপনির্ণয়প্রয়াসী কৌতুহলী পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে অনেক ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় পাইবেন। তবে ইহার যুক্তিতর্ক যথাযথ অনুসরণ করিতে হইলে যে পরিমাণ

বুদ্ধিবত্তার প্রয়োজন হইবে তাহা বোধ হয় বিশেষজ্ঞ পাঠক ব্যতীত সাধারণ পাঠকের না থাকিতে পারে। গ্রন্থকার ইহার মধ্যে ন্যায় ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য দেখাইয়া বেদান্তমতে অনুমানের প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইয়াছেন। এই স্থলে তিনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ অনুমান প্রমাণের যে সুন্দর বিবরণটি আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনেক স্থলেই কোনও একটি বিচার যুক্তি ও তর্ক সহায়ে নিষ্পন্ন করিবার পর গ্রন্থকার তৎপরিশেষে একটি করিয়া উপসংহার লিখিয়া দিয়াছেন। এই উপসংহারগুলি বিচারে প্রতিপন্ন জিনিষগুলি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। ন্যায়োক্ত করণ লক্ষণের বেদান্তমতে বিচার এবং চতুর্থ পাদে বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞান, ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতির স্বরূপ-নিরূপণে গ্রন্থকার যেরূপ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দর্শনামোদী পাঠকবর্গের স্থিরভাবে পর্য্যালোচনার যোগ্য। তবে গ্রন্থকারের ভাষা বড়ই সংস্কৃতবহুল। যেখানে তিনি অপরাপর লেখক কর্ত্তৃক অনুবাদ ও টীকা টিপ্পনি প্রভৃতির সাহায্য লইয়াছেন সেখানে অবশ্যই নাচার কিন্তু তিনি স্বয়ং যেখানে বুঝাইয়াছেন সে সকল স্থলেও তাঁহার ভাষা অনেকস্থলেই অতি দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদাদিতে বর্ত্তমান ভাব ও ভাষার প্রয়োগ তত সুসিদ্ধ নহে কিন্তু তাই বলিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষাতে যে তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন একেবারেই অসম্ভব এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। প্রথম খণ্ডের উপসংহার ভাগে মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদিগণের যে সকল বিপ্রতিপত্তি আছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাদে গ্রন্থকার পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে মূর্ত্তিখণ্ডন, অবতারের ঈশ্বরত্ব বা ঈশ্বরের অবতারত্ব প্রভৃতি খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে পঞ্চ আস্তিক দর্শনের মত খণ্ডন, তৃতীয় পাদে বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক প্রভৃতির মত নিরসন

করিয়াছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য যে এই সকল খণ্ডনাদি তিনি অদ্বৈত বেদান্তমতের সাহায্যেই করিয়াছেন—যেখানে পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান বিরাজমান সেখানে কোনওরূপ অংশ, কলা বা ইতর মনোবৃত্তি অথবা আংশিক সুখ ও দুঃখময় লোক প্রভৃতিরও স্থান নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদীও যে সাধনার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপর সকলগুলিকেও স্বীকার করিয়া লইতে পারেন গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের ৩য় খণ্ডে তদ্বিষয়ক ইঙ্গিতও করিয়াছেন। পঞ্চ আস্তিকদর্শনের মত খণ্ডন বিভাগে গ্রন্থকার এমন বিশেষ কোনও আভাস দেন নাই যদ্দ্বারা ঐগুলির একটা যুক্তিসম্মত শ্রেণীবিধান ও পারম্পর্য্য বুঝিবার সহায়তা হইতে পারে। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের বহুত্ববাদ এবং ঈশ্বরবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় দর্শন ও সাধনা যে উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তপ্রোক্ত জীব ও সৃষ্টির একত্বরূপ পরমার্থতত্ত্বে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে ভারতীয় চিন্তাসমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাহাও যে একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তদ্বিষয়ে আলোকপাতও করিয়া গিয়াছেন। মনীষী বিজ্ঞানভিক্ষু তন্মধ্যে একজন। ২য় ভাগের চতুর্থপাদে গ্রন্থকার মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম ও থিয়সফিষ্টগণের ধর্ম্মমতাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। এই স্থলে একটি জিনিষ সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাহা এই যে বহু বিবদমান তথ্যের একত্র সমাবেশে গ্রন্থকার আত্মবিস্মৃত হইয়া কোথাও অপরের উপর অযথা গালিবর্ষণ করেন নাই —ইহা এযুগের লেখকদেরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই খণ্ড পাঠ করিলে অদ্বৈত বেদান্তমত কতদূর যুক্তিবিচারসম্পন্ন বা Rationalistic তাহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়। ৩য় খণ্ডে গ্রন্থকার কতকটা ২য় খণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির সহিত সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে পরস্পর বিরোধী মতগুলির মধ্যে একটা সাধনসূচক ঐক্যসূত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায়। ইহাতে প্রথমপাদে মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে পুরাণাদি শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক কারণব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে মূর্ত্তি প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য, উপাসনার

জন্য প্রতীকাদি অবলম্বন এবং অবতারাদির তাৎপর্য্যও আনুষঙ্গিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেদান্ত মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্ব্বপক্ষের আক্ষেপ ও তৎপরিহার প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে। ৩য় পাদে গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারী ভেদে অদ্বৈতবাদ বর্ণনে ইনি বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। চতুর্থপাদে বেদের প্রামাণ্যাদি সম্বন্ধে বিচার। কিন্তু এই সকল বিশদ বর্ণনার পরেও আমাদের এক এক সময়ে মনে হয় যে গ্রন্থকার যেন কি একটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে গিয়াও সমর্থ হইয়া উঠিলেন না—সেটা বোধ হয় যে প্রথাবলম্বনে তিনি এই পুস্তকখানির রচনা করিয়াছেন তাহারই অসম্পূর্ণতাবিধায় ঘটিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে মুখে সমন্বয়বাদী হইলেও অন্তরে অন্তরে ঘোর বৈশিষ্ট্যবাদী। সাধনার প্রথম সোপানে তাহাই ইষ্টানিষ্টসূচক বলিয়া ধর্ত্তব্য—কিন্তু তাই বলিয়া অপরের ধর্ম্মমত ভ্রান্ত অথবা গুপ্ত না হইলেও তাহা অধম ও নিম্ন শ্রেণীর এরূপ মতামত ব্যক্ত প্রকাশ একান্ত অবহিত ও প্রকৃত ধর্ম্মসাধনার বিরুদ্ধ। যুক্তিতর্কের প্রয়োগস্থলে তিনি যেমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন এক্ষেত্রেও সেইরূপ করা অনেকটা বাঞ্ছনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে জীবের সংসারগতি, জীবন্মুক্ত প্রসঙ্গ, গুরুশিষ্যের লক্ষণ ও গুরুভক্তি প্রভৃতি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পাদের উপসংহারে গ্রন্থকার সকল প্রকার সাধনা ও মতবাদাদি যে, হয় প্রত্যক্ষ অথবা অপরোক্ষভাবে জীবকে সেই বেদান্তস্বীকৃত নির্ব্বাণমুক্তির দিকেই লইয়া যাইতেছে এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মসংস্থ হওয়া ও আত্মজ্ঞান লাভ করাই যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও পরম পুরুষার্থ সে কথা সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইরূপে গ্রন্থখানির আদ্যন্ত লেখকের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি নানাস্থানে মুদ্রিত হওয়ার গোলমালে এবং অন্যান্য কারণে ইহাতে অনেক বানান সম্পর্কীয় ভুল রহিয়া গিয়াছে। কোনও ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেগুলি

শোধিত হইবার সম্ভাবনা। আমাদের প্রার্থনা এই যে ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচারকল্পে করালপ্রসন্ন বাবুর উদ্যম ও কৃতিত্ব আরও বিস্তৃত আকার লাভ করুক এবং তিনি যেন এইরূপে নিজে আচার্য্য শঙ্কর প্রদর্শিত অদ্বৈত মার্গের সাধক হইয়া অপরকেও তদ্ভাবভাবুক হইয়া তদবলম্বনে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

গত আগষ্ট মাসের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর ভগবানের ইচ্ছায় মানভূম ও বাঁকুড়া জেলায় শস্যের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে। আশুধান্য পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কিছু কিছু ঘরেও উঠিতেছে। বরিশাল জেলার অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। তাই আমরা বাগদা, ইন্দপুর, কোয়ালপাড়া, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া, ভারুকাঠি, গুঠিয়া, কুণ্ডা এবং দেওঘরের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছি। অন্যান্য কেন্দ্র হইতে চাউল বিতরণ কার্য্য চলিতেছে। নিম্নলিখিত কেন্দ্র সমূহে ২৮ শে আগষ্ট হইতে ২৪ শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বিতরিত চাউলের পরিমাণ দেওয়া গেল।

কেন্দ্রের নাম	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
বাগদা	৯৭০	১৯০৵৫
ইন্দপুর	১৮৪	৩৫/৬
কোয়ালপাড়া	১৩৯	১২৵৬
গঙ্গাজলঘাটি	১৪৪	২১।৭
দত্তখোলা	৪৬৪	৪৭॥৯
বিটঘর	৪২৮	৪২/৬
ভারুকাঠি	১৩০	১৯॥০
মিহিজাম	৪৯৮	৫৭৵০
ভুবনেশ্বর	১৬৬	৪৪॥৬

ঝটিকাপ্রপীড়িত লোকগণের সাহায্যার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ব্ববঙ্গে যে ভীষণ লোকক্ষয়কারী ঝড় হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তারিত সংবাদ এখানে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে আমরা খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ২৮শে তারিখে একখানি টেলিগ্রাম পাই—উহাতে তিনি আমাদিগকে ঐ অঞ্চলে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত সেবক পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত কার্য্যের জন্য খরচপত্র ও অন্যান্য সাহায্য তাঁহারাই দিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই অন্যত্র দুর্ভিক্ষ ও বন্যানিবারণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও বর্ত্তমান কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর খুলনায় সেবক প্রেরণ করি। কিন্তু আমাদের সেবক চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, আমাদের হাতে খরচপত্রের ভার দেওয়া হইবে না; তবে আমরা ইচ্ছা করিলে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে কার্য্য করিতে পারি। আর, যদি আমরা পৃথকভাবে কাজ করিতে চাই তবে বাগেরহাট সবডিভিসনে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। তাঁহার কথামত আমাদের সেবক তথায় গমন করিয়া স্থানীয় সবডিভিসন্যাল অফিসারের সহিত দেখা করিতে তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই। অগত্যা আমাদের সেবক ৩রা অক্টোবর তারিখে ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু তাঁহার মুখে ঐ সব স্থানের ভয়ানক অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আমরা অবিলম্বে অপর কোন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সেবক পাঠাইবার সঙ্কল্প করি এবং ৬ই রাত্রে এক দল ঢাকায় ও আর

এক দল বরিশালে—এই দুই দল সেবক পাঠান হয়। বরিশালের সেবকগণ সংবাদ পাঠান যে উক্ত জেলার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই—কেবল বানরিপাড়া থানার কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সেখানে বাগ্‌ধা নামক স্থানে একটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই কেন্দ্রটী ভালরূপে চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া এই সেবকদল ফরিদপুরে রওনা হইবেন। কারণ, যে সকল জেলা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ফরিদপুর তাহাদের অন্যতম। জনসাধারণের নিকট হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবার মত অর্থ সাহায্য পাইলেই তাঁহারা তথায় কেন্দ্র খুলিবেন।

অন্য যে দলটী ঢাকায় গিয়াছিলেন তাঁহারা তথায় ইতিমধ্যেই কলমা, লতপদী, বজ্রযোগিনী ও কামারখাড়া নামক স্থানে চারিটী কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই চারিটী কেন্দ্রই বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন এবং নারাণগঞ্জ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ঝড়ের পরদিন হইতেই সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা মিশন গরীব লোকদের গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং যাহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি না হয় তজ্জন্য যে সকল হতভাগ্য লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে তাহাদের মৃতদেহের সৎকার করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ৪২৫টী মৃতদেহ দাহ অথবা কবরস্থ করিয়াছেন। নারাণগঞ্জ সেবাশ্রম ১০টী কেন্দ্র খুলিয়া ক্রয়মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছেন।

আমরা আমাদের সেবকগণের নিকট হইতে এবং অন্য নানা ভাবে যে সকল সংবাদ পাইতেছি তাহাতে এই একই কথা জানিতে পারিতেছি যে লোকের কষ্টের অবধি নাই। ঝড় যে যে স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উড়াইয়া সকলকেই গৃহহীন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী যাহার যাহা কিছু সঞ্চিত চাউল ছিল সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভয়ানক অন্নকষ্ট

উপস্থিত। স্থানীয় বাজারে এখনও যে সামান্য পরিমাণ চাউল রহিয়াছে তাহা এরূপ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে যে গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকদের তাহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত। যদি শীঘ্রই এই সকল অঞ্চলে চাউল আমদানী করিয়া সস্তাদরে বিক্রয় করা না হয় তবে লোকেরা নিশ্চয়ই অনাহারে মরিয়া যাইবে!

এরূপক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে লোকদের দুটী দুটী খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছি যে, প্রথমতঃ চাউলের দোকান খুলিয়া ক্রয়মূল্যে উহা বিক্রয় করিব এবং যাহাদের তাহাও ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই সেই সকল গরীব লোকদের বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করিব। এই সকল করিয়া যদি হাতে টাকা থাকে তবে আমরা যথার্থ গরীব লোকদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা এই লক্ষ লক্ষ অন্ন-বস্ত্র-গৃহহীন দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি। তাঁহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ইতিপূর্ব্বে যত বার নর-নারায়ণ সেবা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি ততবারই তাঁহারা মুক্ত-হস্ততার পরিচয় দিয়া তাহা উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। আশা করি, এবারও তাঁহারা এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে:—

(১) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

(২) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

কলিকাতা,
১৭ই অক্টোবর, ১৯১৯।

(সাঃ) সারদানন্দ।
সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে

প্রাপ্তি-স্বীকার।

২রা মে হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত বেলুড়মঠে প্রাপ্ত।

দুঃখিনী ভগিনী, ভাগলপুর, ৫৲
মাঃ হীরালাল দাস, মেকিনসন ৫২৲
শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটী, রেঙ্গুন, ২১০০৲
শ্রীযুত মনোমোহন মুখার্জ্জি, আরামবাগ, ৫৲
,, অনিরুদ্ধ নারায়ণ সিংহ, চিরিরিয়াকোট, ৫৲
এস. সেরুনী, বরাবাকী ২৲
শ্রী ভি, কে, এস্, আয়ার, সান্দুর, ১০।/০
,, হরলাল দাস গুপ্ত, ভাগলপুর, ৩৲
,, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মুলকুণ্ডি, ।০
,, ভবনাথ মুখার্জ্জি, ভাগলপুর, ২৲
,, শচীন্দ্র নাথ মিত্র, গোপালগঞ্জ ৩৲
শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটী, সুন্দরদি, ২৲
,, এম, বি, দত্ত, দার্জ্জিলিং, ৩০৲
,, সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত, রাঁচি, ৩৲
,, রোহিণী গাঙ্গিত, কলিকাতা ১০৲
,, এস, ভি, কালি, জার্দগাঁও, ২৫৲
শ্রীমতী নিরুপমা দাসী, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুত বি, এন, মুখার্জ্জি, ভবানীপুর, ৩৲
,, নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, মতিহারী, ৩৲
মাঃ কেদার নাথ গুহ, গোলকণ্ডা ৪৲০
শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর রায়, আচলিতা, ১০
ইন্দাস হাই ইংলিশ স্কুল, ১৫৲
শ্রীত্রিগুণাচরণ গুহ, ময়মনসিংহ ।৶০
,, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, বরিশাল, ৩৲
,, জে, সি, রায়, বৈতালাবাগ, ৪৲
ভ্রাতৃদ্বয়, কলিকাতা, ২০৲
মাঃ এম, বি, দত্ত, দার্জ্জিলিং ১
টি, দাস, মোরাদাবাদ,

,, এ, এল, এম, ডি, মিন্‌স্‌, সারনাথ ৫
,, জি, সেঠ, জামসেদপুর, ১০৲
,, নকুর চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, ভদ্রখালি, ।০
,, সুরেন্দ্র নাথ দে, ,, ১৲
,, সুরেন্দ্র মোহন ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা, ।০
,, সত্যচরণ দাস,
,, পরেশ নাথ মজুমদার, বকবাও,
,, ডি, এন, মুখার্জ্জি, মেসোপটেমিয়া, ৬২।/০
,, বি, এল, গুপ্ত, বসবা, ১৭১।০
,, কুমুদ দত্ত, ২
,, মিসেস্ এ, বি, ব্যানার্জ্জি, রেঙ্গুন, ১০
,, সুবোধ চন্দ্র গুপ্ত, সালকিয়া, ২৲
,, মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা, ২০৲
,, দেবেন্দ্র নাথ সামন্ত, সিরিমলিয়ান ৩৲
মাঃ অমূল্য কুমার চ্যাটার্জ্জি, শান্তিপুর, ৯।/০
শ্রীচারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা, ২৲
,, অশ্বিনী কুমার ঘোষ, পেগু, ১০
,, চণ্ডী চরণ মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১০
,, এইচ, এইচ, মৈত্র, হালিথিয়া ২৲
,, রমেন্দ্র নাথ দে, কলিকাতা, ১
,, পান্নালাল সিংহ, ধপ, ১০৲
,, রমেশচন্দ্র বসু, রেহাবাড়ী, ১০৲
,, অন্নদা প্রসাদ মুখার্জ্জি মজিল, ১৩৷০
,, মুণীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, ঝারিয়া, ৫০৲
,, এন এম মুখার্জ্জি ও তাঁহার বন্ধু, মান্দয়, ৮৲
,, নন্দলাল [illegible], ২
[illegible] জোরহাট,

অগ্রহায়ণ, ২১শ বর্ষ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত।).

১৭১৯, টার্ক ষ্ট্রীট,

সান্‌ফ্রান্সিস্কো।

২৮শে মার্চ্চ, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত। [illegible] দি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচক্র ফিরবেই ফিরবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাটছি আর যত বেশী খাটছি, ততই ভাল বোধ কচ্ছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার করেছে, নিশ্চিত বুঝতে পারছি। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি—এই ব্যাপারেরই অপর দিকটা উহারই মত কঠিন, যদিও উহা নেতি ভাবাত্মক—সেটার দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটা হচ্ছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার—তা থেকে নিজেকে আলগা করে নেবার—শক্তি।

এই আসক্তি ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

আমি —র দানের সংবাদ পেয়ে যে কি সুখী হলাম, তা কি বল্‌বো। * * সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কার্য্য হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জান্‌তে পারুন বা নাই পারুন, রামকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁকে এক মহৎ অংশ অভিনয় কর্ত্তে হবে। *

তুমি অধ্যাপক —র যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম, জো ও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (Clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকূল হতে আরম্ভ হয়েছে। * *

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। * * মিস —র বিশেষ বন্ধু সুইস যুবক ম্যাক্স—র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস —ও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন আর তাঁরা আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্চি। তাঁরা লিখ্‌ছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষ ঘুরে আস্‌বে। বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে মাটির নীচে কিছুদিন থেকে পচ্‌তে হবে। গত দু বছর এইরূপ মাটির নীচে বীজ পচ্‌ছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছট্‌ফট্ করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায় রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটাই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে গেছে—আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা খুসি খাই, রাত্রি বারটায় শুই, আর কি তোফা নিদ্রা! পূর্ব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার শক্তি লাভ করি নি। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত।)

সান্‌ফ্রান্সিস্কো।
৬ই এপ্রিল ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে যাব জানি না।

মিসেস—বল্‌ছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখ্‌তে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে, তুমিও তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর প্যারিসের কাযটা। * *—কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কায শেষ হয়ে গেছে। আমি দিন পনেরর ভিতর চিকাগোয় যাচ্ছি, যদি সেথায় থাকে। * * ইতি

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজী হইতে অনুদিত।)

প্লেস দে এতাত ইউনিস, প্যারিস,
২৫শে আগষ্ট, ১৯০০।

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম—আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যসমূহ প্রয়োগের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। * *

এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে আর আমার কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের

হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তার পর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়্‌বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল। আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ কচ্ছি।

আমি এখন বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেবা কল্লাম—তা ভুল করেই হ'ক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হ'ক—এখন আমি কার্য্য থেকে অবসর নিলাম।

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নহি বা কাহারও নিকট দায়ী নই। আমার এতদিন আমার বন্ধুদের কাছে একটা বাধ্যবাধকতা বোধ ছিল—ও ভাবটা যেন দীর্ঘস্থায়ী ব্যারামের মত আমায় আঁকড়ে ধরেছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম—আমি কারুর কিছু ধার ধারি নি। আমি ত দেখ্‌ছি, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপকারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তায় প্রতিদানস্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ করেছে, আমার অনিষ্টচেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছে। * *

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখ্‌ছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক্ না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি। এখন ত কাযের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? কেবল এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা কর্ব্বে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারো সম্বন্ধে আমার কখন ঈর্ষা

হয় নি। কোন বিষয়ে মেশ্‌বার জন্য আমি কখনও আমার শিষ্যদের সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্য জাতিদের একটা বিশেষত্ব এই আছে যে, তাঁরা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে, ভুলে যায় যে, একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অপরের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হোত যে তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁক্‌বে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা করবে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাৎ রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা পছন্দ তাই কর, নিজের কায বেছে নাও। * * * *

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, মায়ের ইচ্ছা,—আমি আমার আত্মীয়গণের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পূর্ব্বে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক, শত্রুই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় করবার সাহায্য করছে। সুতরাং মা তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদাদি জান্‌বে। ইতি

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ,
বিবেকানন্দ।

জাতীয় জীবনে কর্ম্ম ও বৈরাগ্য। *

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

সাহিত্যে সময় সময় অনেক অদ্ভুত রকমের মতবাদের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকিলেও ইতিহাসের সাক্ষ্য সমর্থন না করিলেও, সাধু ভাষার ছটায় ও ভাবের সৌন্দর্য্যে অনেক সময় কাল্পনিক সৃষ্টিও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচারিত হয়। সাহিত্য বাস্তবজীবনের হুবহু নকল নয় বাস্তবজীবনের সম্ভাবিত ছায়াও সাহিত্যের একমাত্র উপাদান নয়। তাহার অন্তরালে যে ছায়াময় একটা কল্পনার জগৎ রহিয়াছে—সাহিত্য সেই অব্যক্ত জগতের সত্যঃসৃষ্টিও বটে। কল্পনার জগতে মানুষের গতিবিধি সহজভাবে সম্পন্ন হয়। কঠোরমূর্ত্তি সত্য সেখানে পুলিশের সাজ পোষাক লইয়া তাহার স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দেয় না। কাজেই সাহিত্যে নানা রকমের অদ্ভুত মত গঠন সহজ হয়। কিন্তু অতীত কিংবা বর্ত্তমানের বাস্তবজীবন সম্বন্ধে কোন মতবাদ গঠন করিয়া তাহাকে যদি কঠিন সত্যের নিগড়ে আবদ্ধ করা না হয়—ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া যদি শুধু ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া প্রচার করা হয়—তবে সত্যের অপলাপ হয়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ অনেক মতবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। একটী মতবাদ আমাদের জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও ইতিহাস লইয়া গঠিত। এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের মত এই যে আমাদের জাতীয় জীবন কর্ম্মবিমুখ বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈরাগ্য জাতীয় জীবনের কর্ম্মবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া তাহার বিকাশের পথরোধ করিয়াছে। আমরা চিরকাল বৈরাগ্য অবলম্বন

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত

করিয়া পরকালের ভাবনায় জর্জ্জরিত রহিয়াছি। বাস্তবজীবনের প্রতি—ইহকালের কর্ম্মজগতের প্রতি যথেষ্ট আস্থা প্রদর্শন করি নাই। তাই আজ আমরা জগতে অতি হীন দুর্ব্বল অশক্ত ও অক্ষম জাতি। এই বৈরাগ্যরূপ অন্তঃশত্রুই আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপন্থী।

বর্ত্তমান জগতে আমরা যে অধঃপতিত জাতি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছে এখন এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতনের একটা জবাবদিহি করা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ততঃ আর কোন কারণে না হউক, নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্যও এরূপ জবাবদিহির বিশেষ আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে। জবাবদিহির চেষ্টাও এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। বর্ত্তমান অতীতেরই ফল। অতীতের দোষেই বর্ত্তমানের অধঃপতন। অতীত জীবনের কোন্ অমার্জ্জনীয় দোষে বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহারই অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আবশ্যক।

যে অসংখ্য কার্য্যকারণপরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি, বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা সেই দুর্ভেদ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার অনুরূপ সত্যনিষ্ঠা, সামর্থ্য ও সাধনা আমাদের নাই। ঐতিহাসিক বিচারে আমাদের রুচি নাই। জাতীয় জীবনের প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাই নাই বলিয়া, তাহার অভিব্যক্তির পূর্ণ মূর্ত্তিটী আমাদের মানস-দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা গঠন করিবার আমরা অবসর পাই নাই। বুদ্ধির কণ্টকাকীর্ণ কুটিল পথে না চলিয়া—আমরা কল্পনার ঋজুপথ অবলম্বন করিয়াছি। কল্পনা-উদ্ভাসিত মানসপটে যার যার পছন্দ মত জাতীয় জীবনের ছবি আঁকিয়া আমরা তাহার দোষাবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আলোচ্য মতবাদ এইরূপ আবিষ্কারের ফল। ছবি যেমন আমাদের কল্পিত দোষও তেমনই কল্পিত। জাতীয় জীবনের বৈরাগ্যের উপর

অধঃপতনের দোষ চাপাইয়া দিয়া আমরা জবাবদিহির দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফলে আমাদের সহজবুদ্ধি এত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে যে আমরা কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। সহজ বিষয়ও মস্ত মস্ত মতবাদের সাহায্য ভিন্ন আমাদের বোধগম্য হয় না। সাধারণ বিষয়েও আমরা এমন সব গম্ভীর তত্ত্বের অবতারণা করি—কোনমতে মিল বা স্পেন্সারের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এমন জটিলতার সৃষ্টি করি কিংবা সাংখ্য ও বেদান্তের ঝড় তুলিয়া আমাদের চিত্তকে এমনই অভিভূত করিয়া দিই যে, আমাদের স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের এই দার্শনিকতার অভ্যাসটী আরও বিশেষ করিয়া প্রবল হয়। আলোচ্য মতবাদও এইরূপ দার্শনিকতারই ফল। আমাদের সহজবুদ্ধি আমাদের জীবনে বৈরাগ্যের অনুচিত প্রভাব দেখিতে পায় না।

কাল্পনিকতার প্রভাবে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ না করিয়াও দুই চারিটী তথ্য জানিয়াই আমরা দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে ব্যস্ত হই। নব্যবাঙ্গালার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভেই এইরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমবাবু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—পাশ্চাত্যজাতি চিরকাল ইহকালকে চাহিয়াছে, তাঁহারা তাহা পাইয়াছে। আমরা চিরকাল চাহিয়াছি "পরলোক"—কিছুই পাই নাই। সেই অবধি কথাটা বাঙ্গালা সাহিত্যের ধুয়া হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যিকগণের তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ইহা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বঙ্কিমবাবুর প্রভাব অসাধারণ। তাঁহার ন্যায় একজন শক্তিশালী সাহিত্যিকের 'গম্ভীর ভাবপূর্ণ উক্তিটী যে শাখাপল্লবিত হইয়া বিপুল আকারে আমাদের আলোচ্য মতবাদে পরিণত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইহা দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধর্ম্ম বা

কর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতায় কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার থাকিতে পারে না—ন্যূনাধিক্যবশতঃ বিশিষ্টতা থাকিতে পারে। বিশিষ্টতা একটা জাতির স্বরূপের অংশ মাত্র। ধর্ম্ম থাকিলেই যে কর্ম্ম থাকিবে না কিংবা কর্ম্ম থাকিলেই যে ধর্ম্ম থাকিবে না এরূপ প্রমাণ ত মানুষের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ইতিহাসও আমাদের সহজ বুদ্ধিরই সমর্থন করে। জাতীয় জীবনের অধঃপতনের প্রারম্ভ হইয়াছে বাঙ্গালা দেশ হইতে। বৈরাগ্যই যদি অধঃপতনের কারণ হয় তবে বাঙ্গালার ইতিহাসে বৈরাগ্যের অনুচিত প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, কর্ম্মবিমুখ বৈরাগ্য কখনই বাঙ্গালার মাটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশে সন্ন্যাস নাই। বাঙ্গালার শৈব শাক্ত বৈষ্ণব কেহই বৈরাগ্যবাদী নয়। বাঙ্গালার বাউল, ফকির, দরবেশ, তথাকথিত "বৈরাগী"—সকলেই গৃহী। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধুয়া ধরিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই ইহা সুনিশ্চিত। প্রেম ও সেবা লইয়াই বাঙ্গালায় অধিষ্ঠান করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশ—বাঙ্গালার সাহিত্য—কর্ম্মবাদী, সেবাবাদী ও ভক্তিবাদী। মোক্ষ মুক্তি—নির্ব্বাণ বাঙ্গালীর আবিষ্কার নয়। বাঙ্গালার মাটিতে বুদ্ধ ও শঙ্করের জন্ম কল্পনা করা যায় না। বঙ্গমাতা প্রসব করিয়াছেন চৈতন্যদেব। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও চৈতন্যদেব নির্ম্মমভাবে গৃহের সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। মাতাপত্নীর তত্ত্ব লইতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেন নাই। নব্য বাঙ্গালার রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ও বাঙ্গালার এই কর্ম্মবাদ ও সেবাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এইখানেই বাঙ্গালা দেশের প্রাণ। ইহাকে আর যা কিছু বলিতে পার, কর্ম্মহীন বৈরাগ্য বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

প্রাদেশিক বিশিষ্টতা ছাড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ধরা যাউক। ভারতবর্ষের ইতিহাসেই আমরা কি দেখিতে পাই? জাতীয় জীবনের যে কোন অবস্থায় বা যে কোন সময়ে কর্ম্মশৈথিল্যের বা কর্ম্মবিমুখ

বৈরাগ্যের নিদর্শন পাই কি? রামায়ণ ও মহাভারত কর্ম্মমুখর প্রাচীন ভারতের কর্ম্মচাঞ্চল্যের জীবন্ত ছবি ও অকাট্য প্রমাণ। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন বৈরাগ্যের ফল নয়। বৌদ্ধ ভারতের কর্ম্মকাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট অধ্যায়—তাহার অপলাপ অসম্ভব। কোন কোন মনীষীর মত এই যে, 'বৌদ্ধযুগের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির দিনে সমাজে বৈরাগ্যের প্রভাব প্রবল হইয়া সমাজশরীরকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। তাহারই ফলে ভারতবর্ষ ইসলামের করতলগত হয়। এরূপ ধারণা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাস এরূপ মতের সমর্থন করে না। পৃথিবীর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, 'ইসলামের দৃপ্ত-অস অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিয়া অপ্রতিহতগতিতে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। একমাত্র ভারতবর্ষই ইসলামের গতিরোধ করে। পাঁচশত বৎসরেও ইসলাম ভারতবর্ষ জয় করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, ইসলাম ভারতবর্ষে পরাজিত হইয়া স্বীয় সাধনার অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসও যাঁহারা সহৃদয়তার সহিত পাঠ করিয়াছেন—উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে নিয়তির শেষ আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, প্রাগ্‌ব্রিটিশযুগেও জীবনসমরে ক্লান্ত ও অবসন্ন হিন্দুজাতি নিদ্রিত ছিল না। তাহারই কর্ম্মকাহিনী এই যুগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈরাগ্যের প্রতিধ্বনি নাই।

ভারতবর্ষের সাহিত্যেই কি কর্ম্মবিমুখতার প্রশ্রয় আছে? ভগবদ্গীতার কর্ম্মের আহ্বান—কর্ত্তব্যের বজ্রকঠোর আহ্বান কে না শুনিয়াছে! পৃথিবীর আর কোন্ জাতি কর্ম্মের এরূপ উচ্চ-আদর্শ গঠন করিতে পারিয়াছে? বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি কোথাও কার্য্যের অবমাননা নাই, কর্ম্মহীন বৈরাগ্যের উপদেশ নাই। যুগযুগান্তরের ভূয়োদর্শন ও সাধনার ফলে ভারতবর্ষ মানবজীবনের সমগ্রতার, পূর্ণতার ও অনন্ত

সম্প্রসারণতার এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ গঠন করিয়াছে যাহাতে তাহার পক্ষে একদেশদর্শী হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ভারতীয় সাহিত্যের কোন বিভাগেই স্থান পায় নাই। ভারতীয় সাহিত্যে যে বৈরাগ্যের আদর্শ আছে তাহা মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনার উচ্চতম বিকাশ। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে তাহার বিরোধ নাই। বস্তুতঃ, কর্ম্মজগতের প্রতি আস্থা না থাকিলে হিন্দুজাতি কবেই উৎসন্ন হইয়া যাইত! হিন্দুজাতির জ্ঞান কখনই এরূপ সাংঘাতিক ভাবে বিপর্য্যস্ত হয় নাই। তবে ব্যবহারিক জগৎ, ভোগের জগৎ, কর্ম্মের জগৎ তার কাছে চরম সত্য নয়,—মানব-জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর এই তথাকথিত বৈরাগ্যের বোঝা চাপাইয়া দিতেছেন,—ইহা নিতান্তই অনুচিত। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশে আলোচনা একবারেই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৈরাগ্যের বিভীষিকা মনে রাখিলে বৌদ্ধধর্ম্মকে বোঝা যাইবে না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ বৈরাগ্যে নয়—বৌদ্ধধর্ম্মের গতি কর্ম্মে। কর্ম্মগুণেই বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীতে আদরণীয় হইয়াছিল। তাহার কর্ম্মকাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসের বিশিষ্ট কথা। সম্রাট্ অশোক কর্ম্মবাদীই ছিলেন। কর্ম্মের গৌরবেই বৌদ্ধভারত সমুজ্জ্বল।

আলোচ্য মতবাদের সহিত বাস্তবজীবনের কোনই সম্বন্ধ নাই। আমাদের সহজবুদ্ধি যেমন ইহার অনুমোদন করে না, ইতিহাসের সাক্ষ্যও তেমন ইহার সমর্থন করে না। বস্তুতঃ, ইহা আমাদের কাল্পনিকতার, দার্শনিকতার ফল। বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে কল্পনার চেষ্টা মাত্র। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের দার্শনিক স্বরূপ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বৈরাগ্যরূপী শত্রু যেমন সাহিত্যিক সৃষ্টি, তাহার সঙ্গে সংগ্রামও তেমনি সাহিত্যিক। এরূপ বিকৃত সাহিত্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতে পারে—জাতীয় জীবনের বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে—কিন্তু ইহা আমাদিগকে

আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে না, আমাদের সত্যবোধকে জাগ্রত করিয়া তোলে না।

এইরূপ মিথ্যা মতবাদ গঠনের কারণও নব্য বাঙ্গালার জীবনে যথেষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী ভারতীয় সাহিত্যের ধর্ম্মগ্রন্থাদির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছেন, ভারতবর্ষের অত্যধিক প্রশংসাও করিয়াছেন। কেহ বা হিন্দুজাতিকে দার্শনিকের জাতি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। আমরা তাঁহাদের উদারতায় ও সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাদের প্রশংসা বাণী গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে গৌরব বোধ করিয়াছি। জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিকতার ভাগ—জ্ঞানের ভাগ আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি; কিন্তু জাতীয় জীবনের কর্ম্মকথা সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বাক্! এই অধঃপতিত জাতির কর্ম্মকাহিনী প্রচার করিবার তাঁহাদের কোনই আবশ্যক নাই, বরং কর্ম্মহীনতার ভাব জাগরূক রাখিতে প্রয়াসী থাকাই স্বাভাবিক। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা কিছুতেই আত্মবোধ খর্ব্ব করিতে পারেন না। তাঁহারা এই দার্শনিক জাতির কর্ম্মগুরু। এই নব কর্ম্মদীক্ষায় আমাদের দার্শনিকতা ভিন্ন নিজস্ব আর কিছুই রহিল না। গুরুর হাত হইতে না পাইলে আমাদের কিছুই পাওয়া হয় না—কিছুই আমাদের মুখরোচক হয় না। কাজেই আমরা দেখিলাম জাতীয় জীবনের কর্ম্মের ঘরে বিশাল শূন্যতা। সে দিকে একটা মস্ত ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়া যখন দৃষ্টিপাত করিলাম সেখানে বিকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

বৃটিশ যুগের প্রারম্ভে বাঙ্গালী জীবন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে সে মূর্চ্ছিত। তাহার স্বাতন্ত্র্যের গৌরব নাই—আত্মস্থ থাকার গৌরব নাই। পাশ্চাত্য যখন বর্দ্ধিত কর্ম্মশক্তি লইয়া নব্য বাঙ্গালার সম্মুখে উপস্থিত হইল, পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালী তাহার দিকে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাহার আত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিতে লাগিল তাহার গুরুর দেশের—তাহার কল্পনার স্বর্গের—

চতুর্দ্দিকে। সে দেখিল ফ্রান্সের কর্ম্ম-উন্মত্ততা, আমেরিকার কর্ম্ম-সফলতা, আর ইংলণ্ডের কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মনৈপুণ্য। কর্ম্মের একটা বিরাট্ আদর্শ তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল। এই মানস-আদর্শ বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপর ফেলিয়া যখন সে তুলনা করিল, তখন সে কর্ম্মের প্রতি একটা নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। জাতীয় জীবন তাহার নিকট কর্ম্মহীন বৈরাগ্যের ছায়াস্বরূপে প্রতিভাত হইল। যে খৃষ্টজগতের বর্ত্তমান কর্ম্মশক্তি দেখিয়া এইরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিল, সেই খৃষ্টজগতে ও খৃষ্টধর্ম্মেও যে বৈরাগ্যের প্রভাব কম ছিল না, সে দিকে তাহার দৃষ্টি করিবার অবসর রহিল না।

এই বৈরাগ্যের অপবাদ কেবল হিন্দুজাতির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক ভারত ত শুধু হিন্দুর নয়। হিন্দুধর্ম্মই ভারতের একমাত্র ধর্ম্ম নয়। অন্যান্য জাতির লোকসংখ্যাও ভারতে কম নয়। তাঁহারাও ত উন্নতি করিতে পারিতেছেন না—হিন্দুর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারিতেছেন না। ইস্‌লামে বৈরাগ্য নাই। পৃথিবীর অন্যত্র ইস্‌লাম অধঃপতিত কেন? জাপানের যে ধর্ম্ম চীনেরও সেই ধর্ম্ম। জাপান উন্নত হইল, চীন এখনও অধঃপতিত কেন? সংক্ষেপে, আইরিস জাতি পতিত হইয়াছে কি বৈরাগ্যের প্রভাবে?

বৈরাগ্যের অপবাদ একটা মিথ্যা কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা নাই, এমন নয়। সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিকতা ও বাক্যাড়ম্বরের প্রাদুর্ভাবও অতিমাত্রায় বর্ত্তমান। লেখায়, বক্তৃতায়, কংগ্রেসে, সাহিত্য-পরিষদে, আইন আদালতে আমাদের কৃতিত্ব আছে। জাতীয় জীবনের ভাবের দিক্‌টা—জ্ঞানের দিক্‌টা আমরা বুঝিয়া লইয়াছি। কর্ম্মকঠোর জীবন বাঙ্গালার আদর্শ নয়। জাতীয় জীবনের কর্ম্মের দিক্‌টা আমরা দেখিতে পাই নাই। বর্ত্তমান জীবনের বিফলতা আমাদের কাছে এখন ভীষণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা কল্পনার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়া আমরা লজ্জানিবারণ করিতে চাই। অতীতের নামে কলঙ্ক আরোপিত

করিয়া নিজেকে প্রতারিত করিতে চাই। ইহাতে আমাদের বর্ত্তমান আত্মাভিমান বৃত্তির তৃপ্তি হইতে পারে কিন্তু সত্যের অপলাপ হয়। দেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও আদর্শের হানি হয়।

শিক্ষিত বাঙ্গালী জাতীয় অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়াছে তাহার ধর্ম্মে, তাহার সমাজে ও পরিবারে—সর্ব্বশেষে তাহার প্রকৃতিতে, তাহার মনে, তাহার অতীন্দ্রিয় সত্তায়, আত্মার দার্শনিক স্বরূপে। মানুষের রাজ্যে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক কিছু নাই। সমাজজীবনে দোষ অসম্পূর্ণতা চিরকালই রহিয়াছে ও থাকিবেও। এই সকল অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী এতদিন বক্তৃতার ছটায় বাঙ্গালা দেশ মুখরিত করিয়াছে। দৈববাণীর ন্যায় সে সব বক্তৃতা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আন্দোলনের স্রোত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মরুভূমিতে অন্তর্হিত হইয়াছে—সমাজের প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই, সমাজের হৃদয়দেশ আলোড়িত করিতে পারে নাই। কারণ, তাহাতে সত্যের স্বাভাবিক তেজ নাই—ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। অধঃপতনের মূল কারণ সেখানে নয়। কাজেই তাহা জাতীয় জীবনের আত্মবোধকে জাগ্রত করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান অধঃপতনের কারণ জাতীয় জীবনের ধর্ম্মেও নাই, সমাজেও নাই, বৈরাগ্যেও নাই। জাতীয় জীবনের স্বরূপে সেই কারণের অন্বেষণ বৃথা। শুধু আমাদের মনের মধ্যে খুঁজিলেই চলিবে না। অনুসন্ধান করিতে হইবে অন্যত্র—বহির্জগতে। তাহাকে দেখিতে হইবে বাহিরের আবেষ্টনে—পৃথিবীর ইতিহাসে—মানবজাতির জীবন সংগ্রামে। যে জাগতিক বিধানে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এক কথায় প্রাচীন পৃথিবী—অধঃপতিত সেই জাগতিক বিধানে আমাদের পতনের কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। বিশ্বের ইতিহাসে জাতীয় ইতিহাসের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শুধু জাতীয় জীবনের স্বরূপে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাস যে ভীষণ সত্যের ইঙ্গিত করিতেছে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পৃথিবীতে যে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের কর্ম্মশক্তি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মের পথ দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ আমাদের বৈরাগ্যপ্রবণতা নয়—আমাদের ভোগবিমুখতা নয়—যথার্থ কারণ আমাদের সম্প্রসারণের স্থানাভাব। আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই বাধাবিঘ্নের দুর্ভেদ্য প্রাচীর কর্ম্মের পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা জটিল ব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছি। নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না—ব্যূহভেদের মন্ত্র জানি না; সর্ব্ববিষয়ে স্বকর্তৃত্ব হারাইয়া জীবনে কর্তৃত্বশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কর্ম্মের কেন্দ্র হস্তান্তর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। সামাজিক আচার ব্যবহারে পর্য্যন্ত আমরা স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া বহিঃশক্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা মোল্লা তাঁদের দৌড়ও ঐ বহিঃশক্তির মসজিদ পর্য্যন্ত। এই আত্মবিসর্জ্জনের প্রারম্ভ স্বাবলম্বন ও স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ—বাঙ্গালা দেশ হইতে। কিন্তু মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী এই কঠিন সত্যকে কাব্য ও কল্পনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যতদিন আমরা এই সত্য গ্রহণ না করি—আমাদের সুস্থ ও সবল আত্মা ফিরিয়া না পাই—ততদিন আমরা অধঃপতনের কারণ বুঝিতে পারিব না।

শঙ্করের শৈশব।

(শ্রীমতী—)
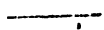
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

শিশু শঙ্করের পদার্পণে নিঃসন্তান শিবগুরুর নিরানন্দ পুরী এক্ষণে আনন্দ-নিকেতন। পুত্রবিহনে যে গৃহ এতদিন নির্জ্জন কারাগারস্বরূপ বোধ হইত, সে গৃহ আজ স্বর্গের নন্দন কানন। শিশুর হাস্যকোলাহল যেন তথাকার পিকরব—শিশুর হস্তপদ-সঞ্চালন যেন ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য, শিশুর অঙ্গসৌরভ যেন পারিজাত গন্ধ—শিশুর সহাস্য বদনকমল যেন তাহার প্রস্ফুটিত কুসুমদাম।

নবনীতকোমল মধুরকান্তি সুকুমার শিশু অঙ্কে নব প্রসূতি বিশিষ্টাদেবীর সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি অনিমেষ নেত্রে পুত্রের অনিন্দ্যসুন্দর মুখপানে কখন চাহিয়া রহিয়াছেন, কখন বা সাদরে পুত্রকে বক্ষঃসুধা পান করাইতেছেন। স্নেহাবেগে তাঁহার পীনপয়োধরে সুধাধারা যেন শতধারে ক্ষরিত হইতেছে। বিশিষ্টাদেবী যেন আজ মাতৃভাব মূর্ত্তিমতী। জননীগর্ব্বে তাঁহার পবিত্র আননে এক অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিবগুরু পত্নীর এই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া জগন্মাতার মাতৃমূর্ত্তি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আজ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন, নিঃসন্তান সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই মাতৃমূর্ত্তি দর্শন কেন দুর্ল্লভ, পুত্র না হইলে মানব কেন পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না। সংসারী ব্যক্তিকে রমণীর এই জননীমূর্ত্তি দেখাইয়া মুক্তিপথের পথিক করিবার জন্যই বুঝি ভগবান্ জীবগণকে এইরূপ পুত্ররত্ন দান করিয়া থাকেন।

কিন্তু মহামায়ার মায়াতে ত্রিজগৎ মুগ্ধ—বিশ্ববাসী সকলেই আবদ্ধ। মায়ার বন্ধনে মানব নিয়তই জড়িত হয়, গুটীপোকার

ন্যায় আপনার নালে আপনিই আবদ্ধ হইয়া থাকে। পণ্ডিত শিবগুরু ও বিশিষ্টাদেবী আজি মায়ামুগ্ধ হইয়া স্বপ্ন কথা বিস্মৃত হইলেন। ভগবান্ শঙ্করই যে পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে অবতীর্ণ, একথা তাঁহাদের চিত্তপট হইতে তিরোহিত হইল। শঙ্কর যতদিন গর্ভে ছিলেন, যতদিন তাঁহারা পুত্রমুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন নাই, ততদিন তাঁহারা তন্ময়চিত্তে নিয়ত শিবেরই অনুধ্যান করিয়াছিলেন। পুত্রচিন্তার উদয় হইলে প্রথমে, ভগবান্ শিবকেই পুত্ররূপে কল্পনা করিতেন। কিন্তু মায়ার কি মোহিনী শক্তি! পুত্র-জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সে ভাব অন্তর্হিত হইল। পুত্রে শিবত্ব জ্ঞান অপসৃত হইয়া পুত্রত্বজ্ঞানই প্রকাশিত হইতে লাগিল। এখন শঙ্করের শুভা-শুভের জন্য ব্রাহ্মণদম্পতী সদাই উৎকণ্ঠিত। যদি শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, যদি শিশু অসুস্থ হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণদম্পতী সর্ব্বদাই উতলা থাকিতেন। বিশেষতঃ, বিশিষ্টাদেবীর দিনে দিনে এই ভাব অতিশয় প্রবল হইতে লাগিল। পক্ষিণী যেমন শাবককে পক্ষপুটে আবৃত রাখিয়াও শাবকের অনিষ্টাশঙ্কায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে; বিশিষ্টা-দেবীও তদ্রূপ শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করিয়াও যেন নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। পুত্রকে বক্ষঃচ্যুত করিয়া শয্যায় শয়ন করাইতেও যেন তাঁহার ইচ্ছা হইত না। তিনি আহার নিদ্রা বিশ্রাম সকলই যেন ভুলিয়া অহর্নিশি পুত্রের চাঁদমুখখানি দেখিতে ভালবাসেন।

এইরূপে কয়েকমাস গত হইলে শান্ত শিশু ক্রমেই অশান্ত হইতে লাগিল, সে এক্ষণে আর মাতৃবক্ষে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না। সে মায়ের কোল হইতে মাটীতে নামিয়া খেলাধূলা করিতে চাহিত। মা তাহাকে একবার ছাড়িয়া দিলে সে আর সহজে মায়ের কোলে আসিতে চাহিত না, তিনি ধরিতে গেলে সে হাসির লহর তুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়াও যাইত। তাহার অমিয় অধরে অমিয় হাসি, মুখে আধ-আধ মা মা বুলি ব্রাহ্মণদম্পতীর কর্ণে যেন অমৃত সিঞ্চন করিত। তাঁহাদের নিকট জগৎই যেন সেই শিশুরত্ন। তাঁহাদের

ধ্যান জ্ঞান সবই এখন সেই শিশু। গৃহকর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলই যেন সেই শিশুর কল্যাণার্থে।

ব্রাহ্মণদম্পতীর বহু সাধনায় ধন একমাত্র পুত্র এই শিশু, তাঁহারা যে শিশুগত প্রাণ হইবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই শিশুর এমনি আকর্ষণশক্তি যে, প্রতিবেশী যে কেহ এই শিশুকে একবার দেখিত, সে আর যেন চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই শিশুর প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নানা উপলক্ষে শিবগুরুর গৃহে আসিতেন এবং শঙ্করের চাঁদ-মুখখানি একবার দেখিয়া যাইতেন, অথবা শিশুকে কোলে লইয়া একবার আদর করিয়া যাইতেন।

শিবগুরু পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি যথারীতি শঙ্করের দশবিধ সংস্কারের জন্য সতত যত্নবান্ থাকিতেন। ছয়মাস পূর্ণ হইলে তিনি শঙ্করের অন্নপ্রাশনক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এদিকে বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে শঙ্কর সমুদয় মাতৃ-ভাষা উচ্চারণে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া শিবগুরু তাঁহার কর্ণবেধ সংস্কারে আর বিলম্ব করিলেন না এবং দ্বিতীয় বর্ষে বিদ্যারম্ভ সংস্কার করাইয়া দিলেন। অপূর্ব্বচরিত্র শঙ্করের সকলই অপূর্ব্ব—তিনি অচিরে বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করিয়া তৃতীয় বর্ষে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা দেখিয়া শিবগুরু শীঘ্রই তাঁহার চূড়াকরণ সংস্কার সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিলেন।

শিবগুরু পুত্রের এই অসাধারণ ধীশক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইলেও বিশেষ ভাবিত হইয়াছিলেন। কারণ, এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্তানকে মানুষ করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। তিনি ভাবিলেন পঞ্চমবর্ষেই পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করাইয়া পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিবেন, কারণ, মনু বলিয়াছেন—"ব্রহ্মতেজ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ কুমারকে পঞ্চবর্ষে উপনীত করিবে।"

কিন্তু হায়! মানুষ ভাবে একরূপ, বিধাতা ঘটান অন্যরূপ। মানুষ গড়ে আর কাল তাহা ভাঙ্গে। কালের কঠোর তাড়নায় শিবগুরুর

সে বাসনা পূর্ণ হইল না। শঙ্করের তিন বর্ষ পূর্ণ হইতে না হইতেই শিবগুরু ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

শঙ্করজননী সহসা এই অভাবনীয় বিপদে একেবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। যদিও শিবগুরু প্রৌঢাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি মৃত্যুর জন্য আর কে কবে প্রস্তুত হইয়া থাকে? তাই মৃত্যু যখন অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সকলেই মৃত্যুকে অভাবনীয় বিপদ্ ভাবিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদেবীরও আজি তাহাই ঘটিল। তিনি পতিহারা হইয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। একে তাঁহার প্রৌঢাবস্থা, তাহাতে এই নাবালক অপোগণ্ড শিশু, তিনি যেন চিন্তার অকূলপাথারে ভাসিলেন।

কাল যেমন শোকে সান্ত্বনা প্রদান করে, এমন আর কিছুই নহে, কালে সকলই সহিয়া যায়। নচেৎ ভগবানের লীলা চলে না। তাই বিশিষ্টাদেবী ক্রমে পুত্রের মুখ চাহিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বুঝিলেন, এক্ষণে এই শিশুর লালন পালন শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সকল ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে এক মহান্ কর্ত্তব্যভার উপস্থিত। শোকে অভিভূত হইয়া থাকিলে তাঁহার চলিবে না, তিনি শোক সম্বরণ না করিলে কে তাঁহার এই শিশুকে পালন করিবে। পিতার অসীম স্নেহ হারাইয়া বালক দিন দিন মলিন হইতেছে—তাঁহাকেই তাহার পিতার অভাব মোচন করিতে হইবে, নচেৎ পুত্রের জীবনসংশয় হইবে। আর সে কথা ভাবিতেও বিশিষ্টা-দেবীর হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তাই তিনি আবার হৃদয় বাঁধিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

সুখের দিনে বিশিষ্টাদেবী যাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আজ এই দুঃখের দিনে সহসা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় পতির সেই স্বপ্নকথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তাঁহার শিশু শঙ্কর যে সেই ভগবান্ শঙ্কর, একথা মনে পড়াতে বিশিষ্টাদেবীর যেন অনেক দুশ্চিন্তা দূর হইল। কিন্তু হায় সে কতক্ষণের জন্য, পুত্রকে কখন ম্রিয়মাণ দেখিলেই বিশিষ্টা

দেবী পূর্ব্বাপর সকলই বিস্মৃত হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া রোদন করিতেন।

যথারীতি শিবগুরুর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। জ্ঞাতিগণ শঙ্করকে নিতান্ত নাবালক দেখিয়া তাঁহাকে পিতৃধন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবী জ্ঞাতিগণের এই অভিসন্ধি অচিরে বুঝিতে পারিলেন। প্রতিকূল জ্ঞাতিকুলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির জন্য বালক শঙ্করকে লইয়া তিনি পিতৃগৃহে যাইবার মনস্থ করিলেন এবং অবিলম্বে তথায় যাইলেন। শিবগুরুর পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের পর সংসারে অন্য রমণী না থাকায় বিশিষ্টাদেবীর পিত্রালয়ে আসা আর ঘটিয়া উঠিত না, তাই এক্ষণে বহুদিন পরে সপুত্র তাঁহাকে দেখিয়া পিত্রালয়ের সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। জ্ঞাতিগণের অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারাও কিছুদিন বিশিষ্টাদেবীকে তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং শঙ্কর ও বিশিষ্টাদেবীকে সকলে যথেষ্ট আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ কমনীয়মূর্ত্তি, মধুরপ্রকৃতি শঙ্কর সকলের অতিশয় আদরণীয় হইলেন। তিনবর্ষের শিশু শঙ্করকে পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞ জানিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

এইরূপে সকলের আদরযত্নে পালিত হইয়া শঙ্কর ক্রমে চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পড়িলেন। দিনে দিনে শঙ্করের বিদ্যানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল, তিনি শিশুগণোচিত খেলাধূলা ছাড়িয়া সর্ব্বদা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে রত থাকিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বালপ্রকৃতি ক্রমে যেন চিন্তাশীল ও গম্ভীর হইতে লাগিল। তাঁহার এই অসাধারণ ভাব দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং ভাবিতেন এ বালক কখনই সাধারণ মানব নহে।

শঙ্কর পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে বিশিষ্টাদেবী পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করাইয়া পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণের জন্য চিন্তিতা হইলেন। তিনি ভাবিলেন আর এস্থানে বিলম্ব করা উচিত নহে, এই বার স্বগৃহে গিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া তিনি পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোগত ইচ্ছা অবগত হইয়া পিত্রালয়ের সকলে এত শৈশবে শঙ্করকে উপনীত করিয়া গুরুগৃহে প্রেরণে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিশিষ্টাদেবী স্বামীর আদেশ স্মরণ করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি শঙ্করকে লইয়া স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। নয়নাভিরাম বালক শঙ্করকে বিদায় দিতে সকলেরই নয়ন সিক্ত হইল।

বিশিষ্টাদেবী বহুদিন পরে গৃহে ফিরিয়াছেন দেখিয়া প্রতিবেশিনীরা আনন্দিতা হইলেন। অতঃপর তিনি গ্রামের পূজনীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ও পতির বন্ধুবর্গকে স্বগৃহে আনাইয়া শঙ্করের উপনয়ন এবং গুরুগৃহে প্রেরণের জন্য পরামর্শ চাহিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ গুরুগৃহের কঠোরতা স্মরণ করিয়া এত অল্প বয়সে উপনয়ন দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু শিবগুরুর ইহাই একান্ত ইচ্ছা ছিল জানিয়া এবং বিশিষ্টাদেবীরও আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে আর কেহই তাহাতে বাধা দিলেন না।

অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করের উপনয়ন সংস্কার হইয়া গেল। শিবগুরুর বন্ধুজন মধ্যে একজন গ্রামসন্নিকটস্থ গুরুগৃহে সংবাদ দিলেন যে, শীঘ্রই শঙ্করকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা হইতেছে। শঙ্করকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিবার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পুত্রের অদর্শন চিন্তায় বিশিষ্টাদেবী ততই কাতর হইতে লাগিলেন। যাহার মুখ চাহিয়া পতিশোক বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাকে দূরে পাঠাইয়া একাকী এই নির্জ্জন গৃহে কিরূপে বাস করিবেন, ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী এবং ধর্ম্মশীলা নিষ্ঠাবতী রমণী—মায়াতে অন্ধ হইয়া তিনি কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইবেন? তিনি ভাবিলেন, প্রাণ হইতে প্রিয়তর ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজের জন্য গুরুগৃহবাস একান্ত প্রয়োজন, আমি তাহাতে কেন কাতর হইতেছি। এই ভাবিয়া তিনি মনকে দৃঢ় করিলেন এবং মনে মনে পুত্রকে ভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া চিন্তা হইতে বিরত হইলেন।

অতঃপর একদিন প্রাতে বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর যাত্রাকালে কুলদেবতা কৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া মাতার পদধূলি মস্তকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। একজন নায়ার পরিচারিকা শঙ্করকে লইয়া গুরুগৃহে গমন করিল।

সেবাধর্ম্মের ক্রমবিকাশ।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ।)

আমরা যে সার্ব্বভৌমিক মহাব্রতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার শক্তি অত্যদ্ভুত। উহা ইতর ধর্ম্মের সকল পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের সকল গণ্ডী ভেদ করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করে। এই সেবাধর্ম্ম কোনও বিশেষ জাতি, সমাজ বা শরীরের অপেক্ষা করে না, এ ধর্ম্মে বর্ণবিচার নাই—এ ধর্ম্ম পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে অতি মহান্ দেবমানবকে পর্য্যন্ত প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করে, কিন্তু সে বন্ধনে মুক্তিরই প্রকাশ। যেখানে প্রেম সেখানেই ত্যাগ—সেখানে 'আমি' 'আমার' বলিয়া কিছু নাই। পরের তরে আপনার ক্ষুদ্র আমিটি নিঃশেষে যে ভুলিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট পরমপ্রেমস্বরূপ পরমাত্মা প্রকটিত হইয়া তাহাকেও প্রেমস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে—তাহার আবার বন্ধন কোথায়? মুক্তি যে তাহার পায় পায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে যে সকল দ্বন্দ্বের মধ্যে—সকল 'লীলা'র মধ্যে—একমাত্র পরমাত্মার স্ফুরণ দর্শনে সশক্তিক শ্রীভগবানের লীলার পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ যখন

আপনা হইতে অভেদ অনির্ব্বচনীয়রূপা আদিভূতা সনাতনী জগজ্জননীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া আপনাকে বহুরূপে ঈক্ষণ করিলেন, তখন সেই রসক্রীড়াসাগরে কত সুখ দুঃখ, জরা ব্যাধি, বিরহ মিলন, স্বর্গ নরক, আলোক, আঁধারের আবর্ত্ত—কত করুণ, বীভৎস, শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, রৌদ্র, শান্ত রসতরঙ্গের হিল্লোল কল্লোল—কত মায়া, দয়া, স্নেহ, মমতা, ভ্রান্তি, শান্তি, কান্তির বীচিমালার উত্থান হইল, কে তাহার গণনা করিবে? ক্রমে সে রসক্রীড়া-রঙ্গভঙ্গে 'বহু' আত্মহারা হইয়া পড়িল—আত্মস্বরূপ হারাইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গমঞ্চে আত্মহারা না হইয়া পরমাত্মীয় একের সহিত নিজ হৃদয়তন্ত্রী ঠিক সুরে বাঁধিয়া তাঁহার লীলার সহায়ক হন। সে তন্ত্রীর কি অপূর্ব্ব ঝঙ্কার—সে কণ্ঠের কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী,—

> "প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,
> কভু দেখি, আমি তুমি তুমি আমি।
> বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,
> তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী।

জগৎটা তাঁহার কাছে একটা বিরাট পূজার উপকরণ সামগ্রীতে পরিণত হয়। দেহের প্রতি স্পন্দনটি পর্য্যন্ত যেন সেই বিরাট আমির সেবাতে নিরত বলিয়াই বোধ হয়। বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছু তখন থাকে না। ইহাই বর্ত্তমান যুগের সেবাধর্ম্মের নীতি। এই কথাটি পূজ্যপাদ স্বামীজি তাঁহার একখানি সংস্কৃত পত্রে অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন —

"শ্রীভগবান্ সমষ্টিরূপে সকলেরই প্রত্যক্ষ। সুতরাং জীবেশ্বরের অভেদহেতু জীবসেবা এবং ভগবৎপ্রেম একই পদার্থ।' বিশেষ এই,—জীবে জীববুদ্ধি করিয়া যে সেবা করা হয় তাহাকে দয়া বলে, প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধি করিয়া যে সেবা তাহাই প্রেম। আত্মার প্রেমাস্পদত্ব শ্রুতি, স্মৃতি এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভগবান্

শ্রীচৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছেন তাহাও ঠিক,—ঈশ্বরে প্রেম, জীবে দয়া ইত্যাদি। দ্বৈতবাদ হেতু সেখানে তাঁহার জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-বিজ্ঞাপক সিদ্ধান্ত সমীচীন। কিন্তু আমরা যে অদ্বৈতবাদী—আমাদের নিকট জীববুদ্ধি বন্ধনের নিমিত্ত। সেইহেতু আমাদের প্রেমই একমাত্র শরণ—দয়া নহে। মনে হয়, জীবের প্রতি 'দয়া' শব্দের প্রয়োগ সাহস মাত্র। আমরা দয়া করিতে পারি না, সেবাই করিতে পারি। আমাদের অনুকম্পানুভূতি সম্ভব নয়, পরন্তু সর্ব্বভূতে প্রেমানুভব বা স্বানুভবই সম্ভব।"

কথিত সেবাধর্ম্ম বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইদানীং বেদান্ত শব্দার্থের অপচয় ঘটিয়াছে। বেদান্ত শব্দে আজকাল অনেকেই শাস্ত্রে যাহা "অজাতবাদ" বলিয়া খ্যাত তাহাই বুঝিয়া থাকেন এবং কেহ বা আচার্য্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন—কিন্তু উভয়েই ইহার অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ। বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষভাগ অর্থাৎ উপনিষদ্ কাণ্ড। এই উপনিষদ্ ভাগই সকল মতবাদের খনি—ভারতীয় দ্বৈতাদ্বৈত সকল বাদেরই আশ্রয়স্থল। উক্ত অপূর্ব্ব জ্ঞানগ্রন্থের সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ আছে—উহা "বেদান্ত সূত্র" বা "বেদান্ত দর্শন" নামে পরিচিত। উক্ত দর্শনোপরি দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি নানাজাতীয় নানা আচার্য্যের ভাষ্য বর্ত্তমান। ইহা হইতেই বেশ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বেদান্তে বা বেদান্ত-দর্শনে সকল ভাবই বর্ত্তমান এবং সেই হেতু সকল আচার্য্যগণের ভাষ্যই সকল মত সম্বলিত, মাত্র তাঁহারা কোনও বিশেষ ভাবকে তাঁহাদের ভাষ্যমধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার যাঁহারা বেদান্ত বলিতে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই উক্ত বাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয় না। যেমন "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যদি আমরা বলি যে, গীতাতে শ্রীভগবান্ সকলকেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, ইহা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ,

সেইরূপ অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয়ের সম্পূর্ণ ভাষ্য এবং ভাষ্যকার কৃত অন্যান্য স্তবস্তুতি যথাযথরূপে অধ্যয়ন না করিয়াই 'শিবোহহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি দুই চারিটী বচন পাঠ করিয়া বা শুনিয়া উহাকে অজাতবাদ—যে বাদে জগৎ নিঃশেষরূপে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা দত্তাত্রেয়, গৌড়পাদ, অষ্টাবক্র প্রভৃতি দুই একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর মত—বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অদ্বৈতবাদে যেমন নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে তেমনি লীলাও স্বীকার করা হইয়াছে—দার্শনিকের ভাষায় ঐ নিত্য ও লীলাকে পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে মাত্র। এ জগৎ লীলাময়ের লীলা, ইহা সকল শাঙ্কর মতাবলম্বীই স্বীকার করেন। প্রমাণস্বরূপ আচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিতেছি,—"যেমন লোকমধ্যে কোনও এক প্রাপ্তকাম রাজার অথবা রাজ-অমাত্যের—যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সমস্তই আছে তাহার—বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র লীলারূপা প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হইতে দেখা যায়, অথবা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে সেইরূপ। লীলায় যৎকিঞ্চিৎ উল্লাসাদি প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে কিছুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা অভিসন্ধি নাই। কোন বুদ্ধিমান্ অমুক হউক বা হইবে ভাবিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করেন না। তাহা স্বভাব বশে আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের যে কাল-কর্ম্ম-সচিব মায়াশক্তি আছে সেই মায়াশক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবের বশেই সৃষ্টি হয়, কেহ তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম নহে। জগৎসৃষ্টিতে যে পরমাত্মার কোনও রূপ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি অথবা প্রয়োজন আছে তাহা নহে। শ্রুতি ও যুক্তি দুএর কোনটির দ্বারা প্রয়োজনসদ্ভাব নিরূপিত হয় না। তিনি সৃষ্টি করেন কেন? চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকেন না কেন? এ অনুযোগ করিতে পার না। স্বভাবরূপ কারণ থাকিলে তাহার কার্য্য নিতান্ত অপরিহার্য্য। আমরা মনে করিতেছি, জগৎ-রচনা অতি গুরুতর কার্য্য, কিন্তু পরমেশ্বরের নিকট ইহা গুরুতর নহে।

তিনি অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন—তাঁহার নিকট ইহা লীলাই, অন্য কিছু নহে। যদিও লৌকিক লীলায় কিছু না কিছু প্রয়োজনের অস্তিত্ব উহ্য করিতে পার, কিন্তু ঈশ্বরের জগৎরচনারূপ লীলায় অত্যল্প প্রয়োজনও উহ্য করিতে পারিবে না। কেননা তিনি আপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি করেন নাই, অথবা তাঁহার এ প্রবৃত্তি উন্মাদের প্রবৃত্তির ন্যায়, ইহাও বলিতে পার না। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ—সমস্তই জ্ঞানপূর্ব্বক করেন।" (বেদান্তসূত্র—২ অ, ১ পা, ৩৩ সূ ভাষ্য)।

ভাষ্যে যে "লীলারূপা প্রবৃত্তি"র উল্লেখ আছে, তাহার স্বরূপ কিরূপ তাহা আচার্য্য অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।" (আনন্দ-লহরী)

"শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না।" এই লীলারূপা অনির্ব্বচনীয়া শক্তি মানিলেই, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, ভগবান্, ভক্ত, ভাগবৎ, সেব্য, সেবক, সেবা সকলই মানিতে হয়। উপাধিযুক্ত মায়াধীশ ঈশ্বর, উপাধিযুক্ত মায়াধীন জীব। 'এক' ঈশ্বর উপাধিযুক্ত হইয়া 'বহু' হইয়াছেন। উপাধিহীন অবস্থায় যাঁহাকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলা হইয়াছে, সোপাধিক অবস্থায় সেই একই বস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। তাই ভাগবৎকার বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অতএব, অদ্বৈতবাদ মানিলেই যে লীলা অস্বীকার করিতে হইবে—জড় হইয়া থাকিতে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। মায়াবাদী ছিলেন বলিয়া বুদ্ধ, শঙ্কর, বা বিবেকানন্দ কর্ম্মকুশলী ছিলেন না এরূপ বলিতে পার না। তবে একটা খুব উচ্চ অবস্থা আছে,

যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি একীভূত হয়। সেখানে কোনও কর্ম্ম সম্ভব নহে। এই অবস্থাই পারমার্থিক বা নিত্য নামে অভিহিত। এই "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বয়ং" অবস্থায় যে কোন প্রকার ক্রিয়ার কল্পনাও করা যায় না, এ কথা যাঁহারা লীলা মানেন তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। আজ যে সেবাধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুগধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে তাহা একদিনের পরিণতি নহে। প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত শতাব্দীর ভাব-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া স্মৃতি যুগে উহা কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং স্মৃতি যুগেরও শত সহস্র বৎসর পরে ঐতিহাসিক যুগে আবার উহা কিরূপভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, অতঃপর আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে সেবাধর্ম্ম ইষ্টাপূর্ত্ত-দত্ত প্রভৃতি নামে বীজাকারে বর্ত্তমান ছিল। ইষ্ট অর্থে যজ্ঞ। প্রতি গৃহস্থকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে হইত। উহা ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ নামে খ্যাত। ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এবং ভূতযজ্ঞ সেবাধর্ম্মের অন্তর্গত। বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে উদ্ধার করিয়া ধূলি না লাগে এমন ভাবে ভূমিতে কুক্কুর, পতিত, কুক্কুরোপজীবী, পাপরোগী, কাক ও কৃমিদিগকে প্রদান করার নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি ভোজন করানর নাম নৃযজ্ঞ। আপূর্ত্ত অর্থে বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদি স্থাপন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ ইত্যাদি। জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ, ঘৃত, গো প্রভৃতি দান দত্ত কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত ছিল। "ইষ্টাপূর্ত্তেদত্তমিতি কর্ম্ম তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ ইষ্ট, আপূর্ত্ত ও দত্ত, এই সকল কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান মার্গ প্রাপ্তব্য। "তেষাং ইষ্টাদিকারিণাং যদা তৎ কর্ম্ম পর্য্যবৈতি বিপরিক্ষীণং ভবতি তদা পুনরাবর্ত্তন্তে পুনরত্রৈব জন্ম

লভন্তে"। অর্থাৎ ইষ্টাদিকারীদের পুণ্য ক্ষীণ হইলে তাহারা পিতৃলোক হইতে স্খলিত হইয়া পুনরায় পৃথিবী আশ্রয় করে।

ক্রমে এই ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, আপূর্ত্ত এবং দত্ত মিলিত হইয়া স্মৃতিযুগে দান ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল এবং ইহা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করায় বেদব্যাস প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে পরোপকারই একমাত্র ধর্ম্ম। ভীষ্মদেব অন্ন, প্রাণ এবং অভয়দানকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। মনু "জলদান, অন্নদান, ধেনুদান, ভূমিদান, বস্ত্রদান, তিলদান, স্বর্ণদান ও ঘৃতদান প্রভৃতি সকল দান অপেক্ষা বেদশিক্ষাদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ—অতএব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্য ফলদাতা—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দান ধর্ম্মের শাসনে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে কত বলি, শিবি, কর্ণ প্রভৃতি দানবীরগণের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কিন্তু যতই উৎকর্ষ লাভ করুক, এই দানধর্ম্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকাম বলিয়াই পরিচিত ছিল। জগতের স্থিতিকারণ এবং নিঃশ্রেয়সহেতু যে সনাতন ধর্ম্ম তাহা দীর্ঘকাল পরে অনুষ্ঠাতৃগণের হৃদয়ে কামোদ্ভব হেতু অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই জন্য শ্রীভগবান্ তদ্ধর্ম্মের রক্ষাকল্পে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়েন। তিনিই প্রথম সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করেন,—

"তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন তাঁহারা ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণ বুদ্ধিতে বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা ক্রিয়া করিবেন। তিনি এই নিষ্কাম দান ধর্ম্ম ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক।

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

দান অবশ্য কর্ত্তব্য এই প্রকার মনে করিয়া, "অনুপকারীকে" অর্থাৎ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ ব্যক্তিকে, অথবা প্রত্যুপকার করিতে

সমর্থ হইলেও তাঁহার কাছে কোন প্রকার প্রত্যুপকার লাভের অপেক্ষা না করিয়া যে দান করা যায় এবং "দেশে" অর্থাৎ পুণ্য কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে, "কালে" অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যকালে এবং "পাত্রে" অর্থাৎ বিদ্বান্, চরিত্রবান্ সৎপাত্রে যে দান অনুষ্ঠিত হয়—তাহা সাত্ত্বিক।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

যে দান প্রত্যুপকারের জন্য অর্থাৎ সময় বিশেষে এই ব্যক্তি আমার প্রত্যুপকার করিবে—এই প্রকার আশায়, অথবা ফললাভের জন্য অর্থাৎ ঐ দান করিলে যে 'অদৃষ্ট' বা পুণ্য হয় তাহা পাইবার জন্য, অথবা খেদের সহিত যে দান করা হয়, তাঁহাই রাজস দান বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

"অদেশে" অর্থাৎ অপুণ্য দেশে—যে দেশ অন্ত্যজজাতি এবং অন্যান্য অশুচি দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং "অকালে" অর্থাৎ পুণ্যের হেতু বলিয়া যে কাল প্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ সংক্রান্ত প্রভৃতি বিশেষ দিন নহে, অপাত্রে অর্থাৎ মূর্খ, তস্কর প্রভৃতিকে যে দান করা হয় এবং পুণ্য দেশকাল সত্ত্বেও যে দান অসৎকৃত হয় অর্থাৎ প্রিয়বচন ও পাদপ্রক্ষালনাদি-পূর্ব্বক না হয়, অথবা অবজ্ঞাত অর্থাৎ পাত্রকে অবজ্ঞা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা তামস বলিয়া খ্যাত।

দানাদি নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রথম প্রচার সর্ব্বসাধারণের নিকট ইহাই প্রথম। স্বর্গাদি অভ্যুদয়ের হেতু যে প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা দেবাদি স্থানপ্রাপ্তির নিমিত্ত সত্য। কিন্তু দানাদি কর্ম্ম যদি ফলাভিসন্ধান বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠায় যোগ্যতা প্রদান করে বলিয়া উহা জ্ঞানোৎপত্তিরও হেতু বটে। সেই জন্য এই নিষ্কাম দানাদি ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়স ধর্ম্মের মধ্যেই

পরিগণিত। শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া যতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করেন।"

যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ সত্ত্বেও এই দানধর্ম্ম স্মৃতিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই এবং নিষ্কাম ধর্ম্মের সহিত ত্যাগীর হৃদয়বত্তার উপযুক্ত সম্মিলন হয় নাই। উহা তখন ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ছিল. তবে কিঞ্চিৎ দয়াযুক্ত হওয়ায় অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়সের দ্বারস্বরূপ ছিল মাত্র। শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম হইতেই ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দান ধর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম, ত্যাগ এবং হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তাঁহার সার শিক্ষা ছিল নিবৃত্তি ও পরোপকার। জগতে আর কোনও ধর্ম্ম পূর্ব্বে এমন আত্মত্যাগের মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে পারে নাই—

"যৎকিঞ্চিদ্ জগতোদুঃখং তৎসর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্বশুভৈঃ সর্ব্বৈর্জগৎ সুখিতমস্তু চ॥"

"জগতে যত কিছু দুঃখ আছে তৎসমস্তই আমাতে আসুক এবং আমার ও বোধিসত্ত্বগণের পুণ্যে জগৎ সুখী হউক।" এই অপূর্ব্ব পরার্থে ত্যাগই ইদানীং সেবাধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। প্রভেদ কেবল দার্শনিক মত লইয়া। বৌদ্ধ পরোপকারের দ্বারা নিজের ক্ষণিক আমির—যাহা অবিদ্যাপ্রসূত এবং যাহা পঞ্চ দুঃখাত্মক সংসারের জনক—তাহার ধ্বংসসাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে চান, আর বৈদান্তিক সেবাধর্ম্মের দ্বারা বিজ্ঞান আত্মার বিলয় করিয়া পরমাত্মার স্ফুরণ সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে চান। বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই স্বীকার করেন যে, ত্যাগ করিতে হইলে নিজের ক্ষুদ্র আমিটিকে ভুলিতে হইবে। যিনি নিঃশেষে এই ক্ষুদ্র আমিটিকে ভুলিতে পারিবেন তাঁহারই নিকট সত্য প্রকাশিত হইবে। এই ত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম দান ধর্ম্ম সঙ্ঘবদ্ধ করিলেন। এই দান ধর্ম্ম আমরা চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারি—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যা-

দান, এবং ধর্ম্মদান। সমগ্র ক্ষুধার্ত্ত জীবজন্তুকে এবং গৃহাগত অতিথিকে আহার্য্যদানের নাম অন্নদান, সঙ্কটাপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা রক্ষা করার নাম প্রাণদান। উহা অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাদান অন্ন ও প্রাণদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, বিদ্যা দ্বারা উভয়ই সিদ্ধ হয়। পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনা বা বিদ্যার্থী-দের প্রতিপালনই এই দানের প্রকৃতি। ধর্ম্মদান আবার বিদ্যাদান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, জীব ধর্ম্মসাহায্যে এই দুস্তর সংসার-সাগর অতিক্রমে সমর্থ হয়।

এই চতুর্ব্বিধ দান শ্রুতি এবং স্মৃতির যুগেও বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে ভগবান্ বুদ্ধ এই দানধর্ম্ম এক নবালোকে আলোকিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং উহা সন্ন্যাসী গৃহস্থের সমবায়ে এক বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া প্লাবনের ন্যায় ভারতে এবং ভারতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মিশর হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে দর্শন বিজ্ঞান ভারতবাসী অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা কি করিয়া সমগ্র জাতির বাস্তব জীবনে পরিণত করিতে হয়, ভগবান্ বুদ্ধই তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাদান করেন। স্বামীজি সত্যই বলিয়াছিলেন—Budha came to whip us into practice.

এই সমবায়-সঙ্ঘের ফলে ভারতে এবং ভারতেতর প্রদেশে যে কত অন্নসত্র, পান্থনিবাস, পশুশালা, চিকিৎসালয়, অনাথ আশ্রম—কত চতুষ্পাঠী, বিদ্যালয়, পরীক্ষাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, মঠ, বিহার, স্থাপিত হইয়াছিল—কত দর্শন, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যার আদান প্রদানে ভারত মহিমান্বিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের আলোকে এক নবসত্যের প্রকাশ হইয়াছে। স্থবির পুত্র (Therapeuts) নামক কোনও এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় মিশর দেশান্তর্গত আলেক্-জেন্দ্রিয়া নগরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদেরই একটী শাখা প্যালেষ্টাইনে (Palestine) আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহারাই পরে

তদ্দেশীয় ভাষায় ঈষানী (Essene) বলিয়া পরিচিত হন। জন দি ব্যাপটিষ্ট (John the Baptist) এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। ইঁহার নিকট হইতে ভগবান্ যীশুর অভিষেক ক্রিয়া (Baptism) সম্পাদিত হয়। প্রকৃত কথায় বলিতে হইলে খ্রীষ্টধর্ম্ম এই ঈশানী (Essene) সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ বলিতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ঈশানী সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্মেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। নির্জ্জন বাস, স্ত্রী ও পুরুষের আজীবন কৌমার ব্রত, অহিংসা, বর্ণবিভাগ, স্ত্রীজাতির হীনত্ব, অভিষেক, গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, ইহুদি মন্দিরে আগমন, পশুবধের বিরোধিতা, আত্মার অমরত্ব, বহুজন্মবাদ, সঙ্ঘ, ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি, স্পর্শদোষ, ভোজনকালে মৌনাবলম্বন, সাধারণ ভাণ্ডার, ক্ষেত্রে কার্য্য, নিরামিষ ভোজন, আলখেল্লা পরিধান, আহারের পূর্ব্বে ও পরে জয় উচ্চারণ, মলত্যাগের পর তদুপরি মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত করণ, পুত্রার্থে ভার্য্যা, একব্রহ্মোপাসনা, মদ্য মাংস ত্যাগ, ঔষধ বিতরণ প্রভৃতি মতবাদ এবং পদ্ধতি ঈশানী এবং স্থবিরপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে, এই সম্প্রদায়ীরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কারণ, তৎকালীন পাশ্চাত্য ধর্ম্মের মধ্যে কোথায়ও ঐরূপ আচারপদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না, বরং উহাদের আচার পদ্ধতির সহিত অস্মদ্দেশীয় আচার পদ্ধতিরই সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহা ছাড়া আরও যথেষ্ট প্রমাণ আছে, বাহুল্য হেতু উহাদের উল্লেখ করা হইল না।

ভগবান্ খৃষ্ট এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে উত্থিত হইয়া উহার নীতি এবং সঙ্ঘের সহিত ইহুদি ধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ এবং স্বানুভূতি একত্রিত করিয়া এক বিশাল প্রাসাদের সৃষ্টি করেন—যাহাতে আজ শত শত বর্ষ ধরিয়া কত কোটী প্রাণী আশ্রয় লাভ করিয়া রহিয়াছে। এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রসারের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ দানধর্ম্মও ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত দান-ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় দ্বৈত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'সকলে ঈশ্বরের পুত্র,' 'ঈশ্বরাদেশ', "ভগবৎ কর্ম্ম" এই সকল দ্বৈতপ্রধান

নীতি দাতার প্রেরয়িতা ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের যে দানের কথা বিশ্ববিখ্যাত ছিল এই প্রেরণাই তাহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু সত্বগুণাধিষ্ঠিত এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, ঘোর রজোগুণসম্পন্ন জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহার Catholicity বা উদার ভাব ধীরে ধীরে সম্প্রদায়িকতায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। ক্রমে জড়বিজ্ঞানের উত্থানের সহিত উহা কখনও বা নামে মাত্র ধর্ম্মহেতু, কখনও বা একেবারে ধর্ম্মভিত্তিহীন Philanthropy নাম গ্রহণ করিয়া জাতীয় শক্তি রক্ষা এবং বিস্তারের যন্ত্রস্বরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। পরে ইংরাজের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যস্থাপনের সহিত নানাবিধ পাশ্চাত্য হিতসাধন মণ্ডলীও প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে উহা মহা-কার্য্যকরী হয়। ঐ সকল সম্প্রদায়ের প্রসাদে ভারতীয় নানা ইতর জাতি মনুষ্যপদবাচ্য হইয়াছে এবং বহু নিম্ন সমাজ উচ্চ সমাজের অমানুষিক উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কেবল নিম্ন সমাজ কেন, উচ্চ সমাজও ঐ সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষরূপে অনুগৃহীত।

পাশ্চাত্য এই সকল হিতসাধন সম্প্রদায় দেখিয়া ভারতবর্ষীয় জনসমাজের মনে পুনরায় তাহাদের অতীত গৌরব কাহিনী জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু উহা পাশ্চাত্যানুসরণে কতকটা আধ্যাত্মিক ভিত্তিহীন হইয়া প্রকটিত হইতে লাগিল। ভারতীয় বদান্য ব্যক্তিদের উৎসাহে বহু বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, কিন্তু ঐ পরোপকার ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইল জড়বাদ এবং মাত্র জাতীয়তার উপর। তখনও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা উহার প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি কোথায় খুঁজিয়া পান নাই। যদিও ইদানীং অনেকে সেবাধর্ম্মের নানারূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, কিন্তু আচার্য্য বিবেকানন্দের পূর্ব্বে পরোপকার ব্রতের যে কোনও রূপ দার্শনিক ভিত্তি থাকিতে পারে, উহা যে ধর্ম্মের অঙ্গ, রাজনীতি বা সমাজ নীতির দিক্ দিয়া না দেখিলেও কেবলমাত্র উহা দ্বারাই যে দেশ, সমাজ এবং জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা কাহারও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই। স্বামীজিই সর্ব্বপ্রথম ঐ দান-

ধর্ম্ম বা পরোপকার ব্রতকে অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার প্রকৃতিকে প্রেমাত্মক করিয়া উহার সেবাধর্ম্ম নাম সার্থক করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তি প্রকরণ ভাষ্যে, একস্থলে বলিতেছেন—"ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ" শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়াছেন। যথা, "যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য এইরূপ ভেদ বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যদ্রূপ পশু, সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ। সে ইহ লোকে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায় উপকার করে এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল ভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে। ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী; আত্মবিৎ নহে অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়।" অর্থাৎ শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন জ্ঞান পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন সৎকর্ম্ম করিব? উহার দার্শনিক ভিত্তি কি? বৈদিক যুগে উহা দেবতা (বিদ্যা) ও জীব-সংসরণ-গতি (পঞ্চাগ্নি বিদ্যা) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রকরণে যে 'আত্মজ্ঞ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ দেবতা ও জীব-সংসরণ-গতি জ্ঞান (বিদ্যা)। অনাত্মজ্ঞ অর্থে যিনি উক্ত জ্ঞান বা বিদ্যা সম্পন্ন না হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম (অবিদ্যা) করেন। বিদ্যাযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে দেবত্বাদি ব্রহ্মলোক লাভ করা যায় এবং অবিদ্যা যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পিতৃলোকাদি অল্পকালস্থায়ী সুখভোগ করা যায়।

কিন্তু স্মৃতিযুগে উক্ত ইষ্টাপূর্ত্তদত্ত দান ধর্ম্ম নামে প্রথিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইল। পরে ঐতিহাসিক যুগে ঐ দান ধর্ম্ম হৃদয়বত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরোপকার ব্রত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। পরে উহা যখন

যেরূপ আধার পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এক একু করিয়া সেগুলির আলোচনা করিতেছি।—

বৈদিকযুগে ইষ্টাপূর্ত্তাদির বিধান ছিল। ইহা দ্বারা স্বর্গাদি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু সে ভোগ সাপ্ত। শাস্ত্র বলিতেছেন, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি'। তবে এই গতাগতির লাভ কি? ইহা দ্বারা ত নিত্য আনন্দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কিন্তু যদি নিষ্কাম ভাবে দান ধর্ম্মের পালন কর তাহা হইলে বাসনারূপ চিত্তের কলুষ দূর হইয়া তুমি জ্ঞান, ভক্তি লাভ করিতে পারিবে, যাহা দ্বারা মুক্তি অনিবার্য্য। কিন্তু তুমি ত সৎকর্ম্ম কর নিজের জন্য। আজ যদি ভগবান্ তোমাকে হঠাৎ মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তুমি ত অজ্ঞানান্ধ, দীন হীন আমাদের প্রতি একবারও তাকাইবে না। দার্শনিক ভাষায় তুমি আত্মতৃপ্ত হইতে পার কিন্তু গ্রাম্য ভাষায় তুমি স্বার্থপর!

কিন্তু দয়া অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। নিষ্কাম সৎকর্ম্ম যদি দয়ার দ্বারা অলঙ্কৃত হয় তাহা হইলে পরোপকার ব্রতের যথার্থ দার্শনিক ভিত্তি আমরা পাইতে পারি।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, দয়ারূপ বৃত্তিতেও আমাদের যথেষ্ট স্বার্থ আছে। দয়াপরবশ হইয়া পরার্থে যে ত্যাগ কর তাহাতে কত আনন্দ হয় বল দেখি? তুমি নিজের কষ্ট দূর হইলে যেরূপ আনন্দ উপভোগ কর সেইরূপ অপরের কষ্ট লাঘব করিলে সেই আনন্দ তুমি নিশ্চই ভোগ করিতে পার। কিন্তু আনন্দই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার যেরূপ ত্যাগের দ্বারা আনন্দ, আমার সেইরূপ ভোগের দ্বারা আনন্দ বোধ হয়। এরূপ যথেষ্ট কার্য্য আছে যাহাতে তোমার কষ্ট হইতে পারে কিন্তু আমার তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ হয়।

ইহার উত্তরে বলিতে হয়—কিন্তু ভগবানের এবং শাস্ত্রের

আদেশ ত মানিতে হইবে। আমরা সকলে তাঁহার সন্তান, শাস্ত্র তাঁহার বাণী। তিনি যখন সকলকে অন্ধকার হইতে আলোকে, অশান্তি হইতে শান্তিতে লইয়া আসিবার আদেশ করিয়াছেন তখন উহা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

তিনি হয়ত বলিবেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ অন্ধকার, অশান্তি সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহা দূর করিবার আদেশই বা প্রচার করিলেন কেন? আমি আজীবন দুঃখ ভোগ করিতেছি, অপরে আজীবন ভগবৎ প্রদত্ত সুখ ভোগ করিতেছে, এই অবিচার সত্ত্বেও আমি অপরকে সাহায্য করিতে যাইব কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছা করিলেই ত সকলের দুঃখের লাঘব করিতে পারেন। তিনি কি অশক্ত হইয়াছেন যে তাঁহার সন্তানদিগকে অপরের সাহায্য করিতে হইবে? ইহা ত ভগবানের পক্ষে অতি কলঙ্কের কথা। কর্ম্ম ফলের দ্বারা ইহার কোনও মীমাংসা হইতে পারে না। কর্ম্মফল আমরাও মানি, কিন্তু ভগবানের আদেশ মানিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না।

তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—ভগবানের আদেশ মান বা না মান যখন আমরা সমাজে বাস করিতেছি তখন আমাদিগকে পরস্পর সাহায্য করিয়া চলিতেই হইবে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের অপেক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সমাজ একটি বৃহৎ যন্ত্রস্বরূপ। কোন একটি যন্ত্রকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি অটুট রাখা প্রয়োজন, নচেৎ তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ জনসমাজের প্রত্যেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্য করা প্রয়োজন, নচেৎ সমাজযন্ত্রটি শিথিল হইয়া একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। সমাজে দুঃখ দারিদ্র্য থাকা মানে, ঐ যন্ত্রটির কোনও না কোন স্থানটি বিগড়াইয়াছে। সমাজরূপ দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হইলে দেহের সকল অংশই সবল সুস্থ রাখিতে হইবে। কিন্তু তোমরা যে জনসমাজের প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া "Greatest good of the greatest number" এই নীতির অনুসরণ করিতে চাও, সামান্যতঃ উহার ব্যবহার চলে না। কারণ,

সমাজশরীরের যথেষ্ট অব্যবহার্য্য অঙ্গ আছে, যাহাদের উপকারিতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব তাহাদের পরিত্যাগ নিষেধ করিতে পার না। কিন্তু তোমার হৃদয় তাহা করিতে দিবে না। সমাজেরও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়—এক সমাজ অপর সমাজের বিরোধী। যদি বিভিন্ন সমাজ নিজ নিজ উন্নতি সাধন করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে অপরের নাশের দ্বারা। লোকে ইহাই দৃষ্ট হইতেছে। আর যে সমাজদেহের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতা কল্পে অতি দীনহীনকেও সাহায্যের প্রয়োজন দেখাইয়াছ, তাহারই বা সার্থকতা কোথায়? সমগ্র সমাজসঙ্ঘের সাধনার সে সমষ্টি ফল, ব্যক্তিগত জীবনে তাহার ভোগের ভয়ানক অবিচার দৃষ্ট হওয়ায়, ঐ সঙ্ঘের নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ—যাহারা ঐ ফলভোগ হইতে বঞ্চিত তাহারা—তোমার ঐ সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছেন এবং একই ভ্রমে পতিত হইয়া পূর্ণ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপর ব্যক্তি ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত। কিন্তু সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দার্শনিক ভিত্তি কোথায় এবং কোন্ সর্ব্বশক্তিমান্ দিব্য জ্ঞান সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত করিতে পারে তাহা তাঁহারা অবগত নন। অধিকন্তু, তাঁহারা যেমন নিজ নিজ স্বার্থকে লক্ষ্য করিয়া পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিতে চান, সেইরূপ সমাজসঙ্ঘের উচ্চশ্রেণীরও যে স্বার্থ বর্ত্তমান সে বিষয়ে তাঁহারা কথঞ্চিৎ অন্ধ বলিলেও চলে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশঙ্করের মস্তিষ্ক এবং শ্রীচৈতন্যের হৃদয় সমবায়ে এমন এক মহাপুরুষের বঙ্গদেশে আবির্ভাব হইল যিনি অবলীলাক্রমে অদ্বৈত পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রেম নির্ঝরিণীর আবিষ্কার করিলেন এবং সেই বার্ত্তা সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট বহন করিলেন। অদ্বৈত পর্ব্বতের কঠিন হৃদয়নিঃসৃত "রস"-তৃপ্তমানব আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া, বুঝিতে পারিল বহুকালের একদেশী চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক কত দুর্ব্বল, স্ব স্ব ভোগসুখ চরিতার্থ করিতে গিয়া হৃদয় কত সংকীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে

অদ্বৈতরসতৃপ্ত মানবহৃদয় এক নব ভাবে মাতোয়ারা। প্রেমিক মানবহৃদয় এখন বুঝিতেছে, যে, এক অস্তি-ভাতি-প্রিয় রূপ সত্তা জীব জগৎ ঈশ্বর হইয়া ক্রীড়ায় মগ্ন। সে আনন্দরসক্রীড়ায় ভক্তের ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব অবসর। এত দিন আমরা অনুমানের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি—শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ, ক্রুশ, প্রতিমা, মনোময়ীমূর্ত্তি, জ্যোতিঃতে চৈতন্য বুদ্ধি করিয়া, সেই চৈতন্যের উপাসনা করিয়াছি, কিন্তু এখন এস প্রেমিক, এস ভক্ত, আমরা বর্ত্তমানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। এখানে অনুমানের স্থান নাই—জীবন্ত চৈতন্য খেলিয়া বেড়াইতেছে।

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥"

সমগ্র জীবন এখন আর হেয় বা ভোগদুষ্ট নয়, উহা আজীবন তপস্যা এবং পূজা—সকলই পরার্থে, সেই পরপুরুষের নিমিত্ত। এখন আর কর্ম্ম নয়, উহা সেবা বা পূজা। চণ্ডালের পথমার্জ্জন, রাজার রাজ্যশাসন, কৃষকের হলচালন, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা সমস্তই এখন সর্ব্বভূতান্তর্যামীর পূজার অঙ্গীভূত। ব্রহ্মবাদীর অধ্যয়ন, গৃহস্থের ধর্ম্ম, বানপ্রস্থীর তপস্যা, সন্ন্যাসীর মোক্ষ এখন একই স্বরাটের উপাসনার উপকরণভেদ মাত্র।

এই জীবন্ত ভগবৎসেবা আজীবন ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুই প্রকারের ত্যাগী সাধক আছেন—যিনি সংসারে সুখ দুঃখে বীতরাগ, বিবিক্তদেশসেবী এবং সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপ ধ্যানে রত, জীবের সুখে বা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে যাঁহার বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য আসে না—তিনি আত্মসুখী ত্যাগী। আর যিনি এই সংসারে বাস করেন কিন্তু ইহার সুখ দুঃখ ভোগ করেন না, সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমাত্মীয় আত্মার সর্ব্বভূতে স্ফুরণ দর্শন করিয়া সকল দ্বন্দ্ব সহ্য করেন এবং আজীবন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন তিনি ভক্ত ত্যাগী। আচার্য্য বিবেকানন্দ এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মহাপুরুষ। তিনি কেবল নিত্যের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন না। বর্ত্তমান শ্রীভগবানের

বিরাট্ লীলার তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। তিনি তাঁহার পত্রাবলীতে যে বিরাট্ উপাসনার পূজাপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি করিতেছি:—আমি মুক্তি বা ভোগ কামনা করি না। সকল জীবের সমষ্টিস্বরূপ শ্রীভগবান্—একমাত্র যাহাতে আমি বিশ্বাস করি—তাঁহার পূজার নিমিত্ত যদি আমাকে বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যদি সহস্র যন্ত্রনায় তাড়না সহ্য করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত। আমার ভগবান্ সর্ব্বজাতির, সর্ব্ববর্ণের দুষ্ট, দুঃখী, দরিদ্র। যিনি দৃষ্ট—সত্য—যাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষ জানি—যিনি উচ্চ নীচ, মহাপুরুষ পাপী, দেবতা কীটে সমভাবে বর্ত্তমান, তাঁহার উপাসনা কর, অপর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেল। যাঁহাতে আমরা ছিলাম, আছি ও থাকিব—যাঁহার সহিত আমরা এক—যিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ জীবন বর্জ্জিত, তাঁহার উপাসনা কর, অপর প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেল। রে বাতুল! তুমি কাহাকে সাহায্য করিবে? তুমি তোমার নিজের জন্য ইচ্ছামত কিছুই করিতে পার না, তুমি পিপাসিত হইয়া এক পাত্র জলপান করিতে গেলে উহা হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়, তুমি আবার কাহার কি করিবে? বরং তুমি তাঁহার সেবা কর—সর্ব্বভূতে তাঁহার পূজায় ব্রতী হও—আত্মস্বরূপের পূজায় পৌরোহিত্য গ্রহণ কর।

আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা ও তাহার প্রতিকারের উপায়।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ন্যায় "দরিদ্র ভাণ্ডার" আর একটী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক গ্রামেই অন্ততঃ দু একটি ব্যক্তি বা পরিবার আছে যাহাদের বাৎসরিক অন্ন সংস্থানের কোন উপায় নাই। ইঁহারা ভদ্রসন্তান বলিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না, কাজেই সম্বৎসরের মধ্যে অধিক দিবসই ইঁহাদের উপবাস বা অর্দ্ধোপবাসে অতিবাহিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে নিয়মিত সাহায্য দান কল্পে একটি "দরিদ্র ভাণ্ডারের" বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাণ্ডারের নিমিত্ত বহুল অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে না—মাত্র সাধারণ মুষ্টিভিক্ষাতেই এই অনুষ্ঠানটি বেশ চলিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যখন সেবকগণ সাধারণের বিশ্বাস ও সহানুভূতিভাজন হইবেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যেক বাড়ী হইতে দৈনিক এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা সংগ্রহ করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য এই ভিক্ষা সপ্তাহে, পক্ষে বা মাসে একদিন সংগ্রহ করিলেই হইবে—গৃহস্থগণ প্রতিদিন একমুষ্টি তণ্ডুল কোন পাত্রে জমাইয়া রাখিবেন। আমাদের দেশের গৃহস্থগণ নিজের দারিদ্র্য সত্ত্বেও গৃহাগত ভিক্ষুক বা অতিথিকে ফিরাইয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন—কাজেই নিঃস্বার্থ ভদ্রসন্তানগণের আবেদনে প্রতিদিন একমুষ্টি তণ্ডুল দান তাঁহারা অনায়াসে এবং আনন্দের সহিতই করিবেন।

কিন্তু একটি কথা, গৃহস্থগণের মনে যদি কোনও কারণে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে মুষ্টিভিক্ষার তণ্ডুলের অপব্যয় হইতেছে—সেবকদিগের বনভোজনে উহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়াছে—তাহা হইলে তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবেন। এইরূপ সন্দেহের কোনও কারণ

যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্য সেবকদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। প্রতি সপ্তাহে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের পর তণ্ডুল ওজন করিয়া হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং বিতরণের পরেও বিতরিত তণ্ডুলের সঠিক ওজন খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। পরে মাসান্তে, ষণ্মাসান্তে বা বৎসরান্তে সাহায্যদাতৃগণের নিকট জমা খরচের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সেবকদিগের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। উল্লিখিত অনুষ্ঠান দুইটি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কয়েকটি অতি অল্পব্যয়সাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বে পল্লীস্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ণনা করিবার সময়ে যে যে অনায়াসসাধ্য এবং অল্পব্যয়সাপেক্ষ সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছি, সেবকগণ সেইগুলির অনুষ্ঠানও করিতে পারেন।

কিন্তু এই সংস্কার কার্য্য করিবার নিমিত্ত সেবকদিগকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা কোনও সংস্কার কার্য্যের প্রচার করিবার পূর্ব্বে আপনারা উহার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অভ্যস্ত হইবার পর বন্ধুবান্ধব এবং অন্যান্য পল্লী-বাসীর নিকট কু অভ্যাসটির তীব্র সমালোচনা না করিয়া, মিষ্ট ভাষায় উহার কুফল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন এবং বিনীতভাবে তাঁহা-দিগকে ঐ অভ্যাসটি ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। তৃতীয়তঃ, এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। এক ব্যক্তিকে দিনের পর দিন অনুরোধ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, অনেক সময়ে জড়তা নিবন্ধন আমরা নূতন কিছু করিতে পারি না। সেবকগণ যদি স্বীয় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অপরকে এই সব বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন। তাঁহারা অবসরানুযায়ী কাহারও বাড়ীতে একটি ফিল্টার তৈয়ারী করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর চতুঃপার্শ্বস্থ বনজঙ্গল ও আবর্জ্জনা সাফ করিয়া দিবেন, কাহারও বাড়ীর জল নিকাশের পথ করিয়া দিবেন ইত্যাদি। এইরূপভাবে সহায়তা করিয়া সেবকগণ

যদি নম্রভাবে কোনও সংস্কারবিশেষের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিতে থাকেন, তাহা হইলে মনে হয় তাহার জড়বৎ শরীরেও জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

জল গরম করিয়া ফিল্টারে ছাঁকিয়া লওয়া, গৃহের ভিতরের ও বাহিরের আবর্জ্জনা মুক্ত করা, পুষ্করিণীতে প্রস্রাব শৌচাদি বন্ধ করিবার নিমিত্ত ঘটি বা গাড়ু ব্যবহার করা এবং রমণীগণের শৌচাদির জন্য টাট্ বাঁধিয়া দেওয়া, মশারি ব্যবহার করা, পরিধেয় বসনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা; ধুনাগন্ধকের ব্যবহার করা, আঁতুড়ঘরের সুব্যবস্থা করা প্রভৃতি এই শ্রেণীর সংস্কার কার্য্যের মধ্যে গণ্য।

এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের দ্বারা যখন সেবকগণের উপরে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে তখন তাঁহারা আর একটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। গ্রামে "সমবায়-সমিতি" গঠনই এই তৃতীয় অনুষ্ঠান। এ বিষয়ে সেবকগণের প্রথম কার্য্য, সমবায়-সমিতির দ্বারা কিরূপে সর্ব্বসাধারণ উপকৃত হইতে পারেন ইহা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।

বস্তুতঃ, আমরা পূর্ব্বে কৃষকদিগের দারিদ্র্যের যে কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি তৎসমুদয়ই এই সমবায়-সমিতির দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। এই সমবায়-সমিতি গঠন করিতে হইলে প্রথমতঃ মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত, দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীদিগের নিকট হইতে এই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। তাঁহারা যেমন বারোয়ারী, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য অর্থদান করিয়া থাকেন, এই সমবায়-সমিতির জন্যও তদ্রূপই করিবেন। বরং বারোয়ারীর চাঁদা সমুদয়ই ব্যয়িত হয় এবং গ্রামবাসীদিগের লাভের মধ্যে যাত্রা শুনার ক্ষণিক আনন্দ, কিন্তু সমবায়-সমিতিতে তাঁহারা যে অর্থ প্রদান করিবেন তাহা মূলধনরূপে একটি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিবে এবং বৎসরান্তে প্রত্যেকে লাভের কিছু কিছু অংশ পাইবেন। এতদ্ব্যতীত সমবায়ের ব্যবসায়গুলিতে প্রত্যেকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা ভোগ করিবেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, পল্লীবাসিগণ এই সমবায়-

সমিতিতে অর্থদান করিলে তাঁহাদের একটি চিরস্থায়ী লাভের ব্যবস্থা হইবে।

যিনি ১০৲ টাকা সমিতিতে দিবেন তিনিই সমিতির সভ্য হইবেন। তিনি ১০৲ টাকার অনুযায়ী লাভাংশ ও সমিতির অনুষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবেন। এই ১০৲ টাকা এককালীন না দিয়া প্রতি মাসে ২॥০ টাকা করিয়া চারি মাসে দিলেও চলিবে। যখন সেবকগণ সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে সমবায়-সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা আদৌ শক্ত হইবে না।

এইরূপে সংগৃহীত মূলধনের এক অংশ দ্বারা গ্রামে একটি দোকান খুলিতে হইবে। এই দোকানে বস্ত্র, তৈল, লবণ, চিনি, মশলা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইকারী দর অপেক্ষা সামান্য অধিক দরে দেওয়া হইবে। বড় মহাজনদিগের নিকট হইতে এই দ্রব্যাদি পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া অতি সামান্য লাভাংশ রাখিয়া গ্রামে বিক্রয় করিতে হইবে। মেম্বর ব্যতীত অপর কাহাকেও এত অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইবে না। অবশ্য যদি গ্রামে এমন কেহ থাকেন যাঁহার সমিতির সেয়ার ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে সেবকগণ চাঁদা তুলিয়া তাঁহার জন্য একটি সেয়ার ক্রয় করিয়া দিবেন। তথাপি মেম্বরগণের সুবিধা অপর কাহাকেও ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।

এই দোকানে অন্ততঃ একজন দোকানদার নিযুক্ত করা প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই লাভের একাংশ এই দোকানদারের মাহিনার জন্য ব্যয় করিয়া অপরাংশ বৎসরান্তে মেম্বরগণের মধ্যে করিয়া দিতে হইবে। সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন দোকানের হিসাব ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। দোকানদারের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া সেবকগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। এমন কি, দ্রব্যাদি ক্রয়ও সেবকগণ নিজেরা করিলেই ভাল হয়।

সমবায়-সমিতির দ্বিতীয় অনুষ্ঠান অল্পহারে ঋণদান। বৎসরে শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা সুদে ঋণদান করিতে পারিলে পল্লী সমাজের, এমন কি, সমগ্র দেশের যে কতদূর উপকার সাধিত হয়

তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের গভর্ণমেণ্টও দেশ হইতে দারিদ্র্যের এই কারণটি দূর করিবার মানসে গ্রামে গ্রামে সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া অল্পহারে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

আমাদের সেবকদিগের চেষ্টায় অনুষ্ঠিত সমবায়-সমিতির পক্ষে অল্পহারে ঋণদানের ব্যবস্থা করা অতি সহজসাধ্য। তবে এই বিষয়ে দুইটি সমস্যা আমাদের মনে উদয় হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি এই যে, যদি কেহ ঋণগ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করে তাহা হইলে কি সেবকগণ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিবেন? এইরূপ কার্য্য কিন্তু সেবকগণের রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু মনে হয়, চারিটি ব্যবস্থাতে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। প্রথমতঃ, সেবকদিগের নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা তাঁহারা দীন মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবিগণের বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা পাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যদি ভাল করিয়া এই দরিদ্র সমাজকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহাদেরই প্রভূত উপকার সাধনের নিমিত্ত এই অনুষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই এই অনুষ্ঠানটির অহিতাচরণ করিতে কোন প্রকারে প্রয়াসী হইবে না। আমাদের এই সত্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে যথার্থ ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা তস্করের চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হয়। তৃতীয়তঃ, মেম্বর ব্যতীত আর কাহাকেও এত অল্পহারে ঋণদান করা হইবে না। তাহা হইলে ঋণী ব্যক্তির অন্ততঃ ১০৲ টাকা ত সমবায়-সমিতির দখলেই থাকিবে। চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তিকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে অপর তিন বা চারি ব্যক্তিকে তাহার ঋণের জন্য দায়ী হইতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে ঋণের অর্থ অনেকটা নিরাপদ হইবে। এই পদ্ধতিটিতে ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে খুবই সফলতা দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে ইহা যথাযথভাবে কার্য্যকরী হইবে কিনা বলা যায় না। উপস্থিত আমাদের দেশে কেহ কাহারও দায়িত্ব লইতে সহজে স্বীকৃত হন না এবং যদিও দায়িত্ব গ্রহণ করেন তথাপি তাঁহার দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এই পদ্ধতিটি প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ, যে সকল ব্যক্তি কোনও ঋণীব্যক্তির

দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পারিবেন যে, ঐ ব্যক্তি কোনও প্রকারে অর্থের অপচয় না করেন, এবং ঐ ব্যক্তির অর্থাগমের সময় আসিলেই তাঁহারা উহার নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন। যদি কোনও কৃষক ঋণ গ্রহণ করে এবং যদি তাহার জমির মালিক তাহার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে ফসল তুলিবার সময়েই তিনি তাহার নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন।

ঋণ দান বিষয়ে দ্বিতীয় সমস্যা এই যে, যদি এককালীন বহু লোক এত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে যাহা সমবায়-সমিতির পক্ষে দান করা অসম্ভব, তাহা হইলে কি করা হইবে? এই বিষয়ে একটি কথা জানিলেই এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে। কৃষকগণ সাধারণতঃ খুব সামান্য অর্থের জন্য ঋণবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের বহু অর্থের প্রয়োজন কচিৎ দৃষ্ট হয়। তারপর সমবায়-সমিতি নিজ মূলধন অনুযায়ী কত টাকা পর্য্যন্ত এক ব্যক্তিকে ঋণ দান করিতে পারেন তাহা যদি স্থির করিয়া লন তাহা হইলে এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হয়।

আমাদের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ কৃষির অনুন্নতি। সমবায়-সমিতির চেষ্টায় এই কারণটিও দূর করা যাইতে পারে। সেবকগণ যদি স্থানীয় কৃষিবিভাগের ইনস্‌পেক্টরের সহিত আলাপ করিয়া এবং কৃষিতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমাদের কৃষিক্ষেত্রে যে সকল বিজ্ঞানসম্মত সার, যন্ত্র এবং নূতন শস্যের বীজ বিশেষ উপযোগী সেই সকল সমবায়-সমিতির অর্থে ক্রয় করিয়া কৃষকদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন এবং অল্পহারে ভাড়া খাটান তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। মনে করুন, যদি সমবায়-সমিতি একটি Hand Pump ক্রয় করিয়া ঘণ্টায় দুই বা চারি পয়সা হারে ভাড়া খাটান, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের কত সুবিধা হয়। সমবায়-সমিতির আর্থিক অবস্থা যদি বিশেষ স্বচ্ছল হয় তাহা হইলে সেবকগণ কৃষিক্ষেত্রে কূপ আদি খননের ব্যবস্থাও করিতে

পারেন। সাধারণতঃ পল্লীবাসিগণ নগদ টাকা খরচ করিতে পারেন না। এই জন্যই কৃষিক্ষেত্রে কূপাদি খননের আবশ্যকতা অনুভব করিলেও কেহ সহজে ঐরূপ কার্য্যে হাত দেন না। যদি পাশাপাশি কয়েকখানি জমির সত্ত্বাধিকারিগণ একটি কূপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমবায়-সমিতির নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ কর্জ্জ করিয়া কূপটি খনন করাইয়া লইতে পারেন, এবং বৎসরান্তে শস্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন। একটি কাঁচা কূপ খনন করিবার খরচ ২৫।৩০ টাকা এবং পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া এই কার্য্য করিলে প্রত্যেকের ঋণভার অতি সামান্যই হয়। এইরূপে যদি সেবকগণ পল্লীবাসী কৃষিজীবীদিগকে কূপের প্রয়োজনীয়তা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং উপযুক্ত ঋণ দান করিয়া কূপখননের সহায়তা করিতে পারেন তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে জলের অভাব দূর করা অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে।

কৃষিক্ষেত্রোপযোগী যন্ত্রের ন্যায় ইক্ষুপেষণ যন্ত্র, ধান এবং দাল ভাঙ্গার যন্ত্র, ঘৃত মাখমাদি প্রস্তুতকরণ যন্ত্র, নানাবিধ ফল হইতে আচার ও মোরব্বা প্রস্তুতকরণ যন্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সমবায়-সমিতি ভাড়া খাটাইতে পারেন।

কৃষকদিগের দারিদ্র্যের চতুর্থ কারণ অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয়। দুইটি ব্যবস্থার দ্বারা সেবকগণ কৃষকদিগকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা যথাসময়ে সমবায়-সমিতি হইতে কৃষকদিগকে ঋণ দান করিয়া দাদন গ্রহণ ও অসময়ে শস্য বিক্রয়রূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের মধ্যে একটি শস্যাগার নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানে কৃষিদিগের পণ্যদ্রব্য জমা করিয়া উপযুক্ত সময়ে উহা সহরের বড় মহাজনের নিকটে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে, সেবকগণ কৃষকদিগকে অল্পমূল্যে শস্য বিক্রয়রূপ ভীষণ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে পারেন। একস্থানে বহু শস্য মজুত হইলে মহাজনগণ আপনারাই সেখান হইতে শস্য ক্রয় করিয়া লইতে আসিবেন—সেবকদিগকে হাটে শস্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থাও বোধ হয় করিতে

হইবে না। এই কার্য্যটি করিবার জন্য সমবায়-সমিতি শস্য বিক্রয়ের অর্থ হইতে অল্পহারে কিঞ্চিৎ লাভাংশ রাখিয়া দিবেন। এখানেও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায় সমিতির মেম্বর ব্যতীত অপর কোন কৃষকই এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না।

সমবায়-সমিতি কিরূপে দারিদ্র্যের চারিটি কারণ দূর করিতে পারেন তাহা আলোচনা করা হইল। কিন্তু এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মূলধন অধিক না হইলে সমবায়-সমিতির সকল অনুষ্ঠানগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। মূলধন যতই অধিক হইবে সর্ব্বসাধারণ ততই লাভবান্ হইবে। মূলধন বৃদ্ধি করিবার জন্যই মেম্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোন সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া উচিত নহে। সুবিধা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া সকলেই মেম্বর হইবে। এ বিষয়ে কোন প্রকার কোমলতা প্রদর্শন করিলে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির ক্রমবর্দ্ধনের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পাশাপাশি দুই তিনখানি গ্রাম সমবেত হইয়া সমবায়-সমিতি গঠন করিলে মূলধন অধিক হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। প্রচারকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে একটি বড় গ্রামেও অনায়াসে সমবায়-সমিতির কার্য্য সুন্দর ভাবে চলিতে পারে।

(সমাপ্ত)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(জীবন্মুক্তি স্বরূপ)

(পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, (১) জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে? (২) জীবন্মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ কি? (৩) কি প্রকারেই বা জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে? (৪) জীবন্মুক্তি সাধনের প্রয়োজনই বা কি?

(তদুত্তরে বলা যাইতেছে)—শরীরধারী লোকমাত্রেরই চিত্তে "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা," (ইত্যাদি রূপ অভিমান) ও (বিবিধ প্রকার) সুখ দুঃখ দৃষ্ট হয়—তাঁহারা চিত্তের ধর্ম্ম। ক্লেশস্বরূপ বলিয়া তাহারাই পুরুষের বন্ধন। সেই বন্ধনের নিবারণই জীবন্মুক্তি।

('শঙ্কা')—আচ্ছা, এই বন্ধন নিবারিত হইবে কোথা হইতে? (সুখ দুঃখাদি চিত্তধর্ম্মের) সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইতে?—অথবা চিত্ত হইতে? (অর্থাৎ এই বন্ধনটা আছে কোথায়?) যদি বল, 'সাক্ষী হইতে এই বন্ধন নিবারিত হইবে', (তবে বলি) তাহা বলিতে পার না। কেন না, সাক্ষীর প্রকৃত স্বরূপ জানিলেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই এই বন্ধন নিবারিত হয়। (বন্ধন যদি সাক্ষীর প্রকৃতিগত হইত তাহা হইলে সাক্ষীর সেই প্রকৃতি বা স্বরূপকে জানিবামাত্রই বন্ধন নিবারিত হইত না। বন্ধন সাক্ষিস্বরূপে নাই বলিয়াই, সাক্ষি স্বরূপ জানিলেই তাহা নিবারিত হইয়া থাকে)। আর যদি বল, 'বন্ধন চিত্ত হইতে নিবারিত হইবে', তবে বলি তাহা অসম্ভব। কেন না, যদি জল হইতে তাহার দ্রবত্ব নিবারণ করা সম্ভব হয়, যদি অগ্নি হইতে তাহার উষ্ণতা নিবারণ করা সম্ভব হয়, তবেই চিত্ত হইতে কর্ত্তৃত্বাদি (অভিমান) নিবারণ করা সম্ভব হইবে, কারণ দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব যেমন জল ও বহ্নির স্বভাবগত ধর্ম্ম, কর্ত্তৃত্বাদিও ঠিক সেইরূপ চিত্তের স্বভাবগত ধর্ম্ম।

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যাহা স্বভাবগত, তাহার আত্যন্তিক বা সম্পূর্ণরূপ নিবারণ সম্ভবপর না হইলেও, তাহার অভিভব বা আংশিক দমন সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন জলের স্বভাবগত দ্রবত্ব, জলের সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিলে অভিভূত হইতে পারে, যেমন বহ্নির উষ্ণতা মণিমন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে পারে, সেইরূপ চিত্তের বৃত্তি সমূহকে যোগাভ্যাস দ্বারা অভিভব করিতে পারা যায়।

(শঙ্কা)—ভাল, বলা হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সমগ্র অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নষ্ট হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম ত আপনার ফল দিতে ছাড়িবে না, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটাইয়া, আপনার ফল দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সুখ দুঃখাদি ঘটাইবার নিমিত্ত, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে নিয়োজিত করিবে। আর চিত্তবৃত্তির সাহায্য বিনা সুখ দুঃখাদির ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহা হইলে চিত্তবৃত্তির অভিভব কি প্রকারে হইতে পারে?

(সমাধান)—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কেননা (চিত্তবৃত্তির) অভিভব দ্বারা যে জীবন্মুক্তির সাধন করিতে হইবে, সেই জীবন্মুক্তিও সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রারব্ধ ফলের মধ্যেই গণ্য। (এই হেতু প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবন্মুক্তির প্রতিবন্ধক ঘটাইবে না)।

(শঙ্কা)—তাহা হইলে (প্রারব্ধ) কর্ম্মই জীবন্মুক্তি সম্পাদন করিবে। পুরুষের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

(সমাধান)—তোমার, এ আপত্তি ত কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও তুল্যরূপে উঠিতে পারে (কিন্তু কৃষি বাণিজ্য বিষয়ে পুরুষের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন—এ কথা ত বলা চলে না)।

(খণ্ডন)—(প্রারব্ধ) কর্ম্ম স্বয়ং অদৃষ্ট স্বরূপ (অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের নামান্তরই অদৃষ্ট)। তাহা যথোপযুক্ত দৃষ্ট সাধনের সমাবেশ ব্যতিরেকে ফল উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া কৃষি বাণিজ্যাদিতে পুরুষের চেষ্টার অপেক্ষা আছে। (প্রত্যুত্তর) জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা উঠাইয়াছ তাহারও ঠিক ঐরূপই সমাধান হইবে। কৃষি

বাণিজ্যাদিতে যেস্থলে পুরুষপ্রযত্নসত্ত্বেও ফলোৎপত্তি দেখা যায় না, সেস্থলে ধরিতে হয় যে কোন প্রবল অদৃষ্ট বা কর্ম্ম প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছে। সেই প্রবল অদৃষ্ট বা কর্ম্ম নিজের ফলসাধনোপযোগী অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্ট কারণসমূহ উৎপাদন করিয়াই প্রতিবন্ধক ঘটায়। সেই প্রতিবন্ধক আবার প্রবলতর প্রতিকারক কারীরী যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা নিবারিত হয়, এবং সেই প্রতিকারক কর্ম্ম, নিজের ফলসাধনোপযোগী বৃষ্ট্যাদিরূপ দৃষ্টকারণ সমূহ উৎপাদন করিয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধককে দূর করে। অধিক আর কি বলিব, তুমি প্রারব্ধ কর্ম্মের অত্যন্ত ভক্ত হইলেও, মনে কল্পনাও করিতে পারিবে না যে, (জীবন্মুক্তি সাধন বিষয়ে) যোগাভ্যাসরূপ পুরুষচেষ্টা একান্ত নিষ্ফল। অথবা যদি বল, প্রারব্ধ কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষাও প্রবল (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া বন্ধনকে বজায় রাখিবে) তাহা হইলে জানিও যে যোগাভ্যাস আবার সেইরূপ প্রারব্ধের অপেক্ষাও প্রবল এবং তাহার বলেই উদ্দালক (১) বীতহব্য প্রভৃতি যোগিগণ নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। যদ্যপি আমরা (কলির জীব) স্বল্পায়ুঃ বলিয়া আমাদের পক্ষে সেই প্রকার যোগ সম্ভবপর হয় না, তথাপি কামাদিরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধ মাত্র যে যোগ, তাহাতে আবার প্রয়াস কি? যদি শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের শক্তি স্বীকার না কর, তাহা হইলে চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষশাস্ত্র পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রেরই নিষ্ফলতা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। (আর) কখন কখন কর্ম্মে ফলবিসম্বাদ ঘটে অর্থাৎ কর্ম্মে (অভিষ্ট) ফললাভ ঘটে না, তাই বলিয়াই যে (শাস্ত্রবিহিত) পুরুষপ্রযত্ন নিষ্ফল, একথা বলা চলে না। তাহা হইলে কোনও সময়ে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া সকল রাজাই গজারোহী, অশ্বারোহী প্রভৃতি সেনা উপেক্ষা করিত। এইহেতু আনন্দবোধাচার্য্য বলিতেছেন:—

"অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া কেহ আহার পরিত্যাগ করে না, ভিক্ষুকের ভয়ে কেহ হাঁড়ি চড়াইতে বিরত থাকে না, ছারপোকার ভয়ে

---

(১) যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের—উপশম প্রকরণে ৫১ হইতে ৫৫ অধ্যায়ে উদ্দালকের এবং ৮৪ হইতে ৮৮ অধ্যায়ে বীতহব্যের বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে।

কেহ লেপাদি বহিরাবরণ ব্যবহারে বিরত হয় না।" শাস্ত্রবিহিত পুরুষপ্রযত্নের যে শক্তি আছে তাহা বসিষ্ঠের সহিত রামের যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায়। বসিষ্ঠ রামায়ণে "সর্ব্বমেবেহ হি সদা" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ৪।৮) এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "তদমু তদপ্যবমুচ্য সাধুতিষ্ঠ।" (মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ ৯।৪৩) এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ তাহা পাওয়া যায়, যথা:—

বসিষ্ঠ—"সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্প্রযত্নাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥

"বসিষ্ঠ কহিলেন—হে রঘুনন্দন, এই সংসারে সকল লোকেই সম্যক্ প্রযত্নবিশিষ্ট (সম্যক্ শব্দের অর্থ অবিরত;—"অনুপরমঃ এবং সম্যক্প্রয়োগঃ") পৌরুষ দ্বারা সকল সময়েই সকল বস্তু অবশ্য লাভ করিতে পারে। সকল বস্তু অর্থাৎ পুত্র, বিত্ত, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোকাদি ফল। পৌরুষ দ্বারা—অর্থাৎ পুত্রকামযাগ, কৃষিবাণিজ্য, জ্যোতিষ্টোম, ব্রহ্মোপাসনা রূপ পুরুষপ্রযত্নের দ্বারা।

"উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতং।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥" ৫।৪।

শাস্ত্রবিগর্হিত ও শাস্ত্রানুমোদিত ভেদে পৌরুষ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ অনর্থপ্রাপ্তির কারণ হয়, এবং শাস্ত্রানুমোদিত পৌরুষ পরমার্থলাভের কারণ হয়। শাস্ত্রবিগর্হিত পৌরুষ—পরদ্রব্যহরণ পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি। শাস্ত্রানুমোদিত পৌরুষ—যথা নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। অনর্থ—নরক। পরমার্থ—স্বর্গাদি, 'অর্থের' অর্থাৎ অভিষ্ট বস্তুর মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরমার্থ।

"আবাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষযত্নেন সোঽর্থঃ * সম্পাদ্যতে হিতঃ॥" ৫।২৮॥

"অলং"—সম্পূর্ণরূপে, সম্যগ্রূপে।

* পাঠান্তর—'স্বার্থঃ সম্প্রাপ্যতে যতঃ'

"গুণৈঃ"—উক্তগুণ সমূহের সহিত "যুক্ত" বা "মিলিত" হইয়া।

হিতং—শ্রেয়োরূপ "মোক্ষ"।

(সৎ) শাস্ত্রচর্চ্চা, সৎসঙ্গ প্রভৃতি সদ্‌গুণ বাল্যকাল হইতে সম্যক্ অভ্যস্ত হইলে, পুরুষের চেষ্টা তাহাদের সাহায্যে সেই কল্যাণকর অর্থ (অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ মোক্ষ) সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীরামঃ—প্রাক্তনং বাসনাজালং নিয়োজয়তি মাং যথা।

মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিং করোম্যহম্ ॥ ৯।২৩।

শ্রীরাম কহিলেন—"হে মুনে, পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত বাসনা সমূহ আমাকে যে প্রকারে চালাইতেছে, আমি সেই প্রকারেই চলিতেছি। আমি পরবশ, আমি কি করিব?"

বাসনা শব্দে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ জীবগত সংস্কার বুঝিতে হইবে।

বসিষ্ঠঃ—অত এব হি (১) হে রাম শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষি শাশ্বতম্।

স্বপ্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈব নান্যথা ॥ ৯।২৪।

বসিষ্ঠ কহিলেন—"হে রাম, এই হেতুই তুমি কেবল স্বপ্রযত্ন-সম্পাদিত পৌরুষ দ্বারা অবিনশ্বর শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে, অন্য উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হইবে না।"

"এই হেতুই"—যেহেতু তুমি বাসনার অধীন সেই হেতুই তোমার বাসনার অধীনতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, স্বকীয় উৎসাহের দ্বারা সম্পাদিত কায়মনবাক্য জনিত পুরুষচেষ্টার আবশ্যকতা আছে।

(ক্রমশঃ)

(১) পাঠান্তর—"হি রাম ত্বং"।

সমালোচনা।

স্বামী বিবেকানন্দ (জীবন চরিত)—শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু, এম, এ, বি, এল প্রণীত ও স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত। ইহা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' নামক ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজীর ন্যায় এই পুস্তক চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৯৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এখনও যন্ত্রস্থ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকারের নিকট, ১৯নং শাঁখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ও উদ্বোধন কার্য্যালয়।

স্বামিজীর বিস্তৃত জীবনী বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহা ইংরাজী গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ নহে—ফলে, অনুবাদসুলভ ভাষার জড়তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইহাতে ইংরাজী গ্রন্থ অপেক্ষা কতকগুলি অধিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া স্বামিজীর জীবনের এই সকল ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থের প্রথমভাগে স্বামিজীর বংশপরিচয়, জন্ম, বাল্যকথা হইতে আরম্ভ করিয়া বরাহনগর মঠে তপস্যা পর্য্যন্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার পরিব্রাজক বেশে ভারতভ্রমণ ও আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর সঙ্কলন করা হইয়াছে। যে মহান্ ত্যাগী ও প্রেমিক পুরুষের জীবনাবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, পাঠক গ্রন্থপাঠে তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ না হউক আংশিক চিত্র যে মনোমধ্যে চিত্রিত করিতে পারিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, তাঁহার প্রবল স্বদেশানুরাগ, তাঁহার আচণ্ডালপ্রবাহিত প্রেম, তাঁহার গভীর জ্ঞান, তাঁহার তীক্ষ বুদ্ধি,

তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ, তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য, তাঁহার প্রগাঢ় গুরুভক্তি, তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির কথা পাঠ করিতে করিতে পাঠক স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র—একাধারে এত অধিক গুণের সমাবেশ—জগতের ইতিহাসে বাস্তবিকই অতি বিরল!

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বামিজীর জীবনালোচনা যেরূপ উপযোগী ও কল্যাণপ্রদ, তাহাতে যত অধিক সংখ্যক লোক ইহার সহিত পরিচিত হয় ততই মঙ্গল। ইহা যেরূপ বিচিত্র ঘটনাবহুল তাহাতে পুস্তকখানি একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ, ইহার ভাষা খুব প্রাঞ্জল হওয়ায় স্ত্রীপুরুষ সকলেই আগ্রহ সহকারে ইহা পাঠ করিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থকার স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—ঐ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। এ কার্য্যের ভার তিনি সুধী পাঠকবর্গের জন্যই রাখিয়া দিয়াছেন। মহাপুরুষের জীবনের ঘটনাবলী সমালোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা বড়ই কঠিন কার্য্য। দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে লেখক হয়ত তাঁহার কার্য্যের গৌরববৃদ্ধি করিতে গিয়া জগতের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, অথবা নিজের মনগড়া কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'খাট', সাম্প্রদায়িক, বা নিজের ভাবে ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছেন! শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। ইহাতে আর যাহা হউক, একটী সুবিধা এই হইয়াছে যে, প্রত্যেকেই স্বামিজীসম্বন্ধে স্বাধীন মত গঠন করিতে সমর্থ হইবেন এবং যাঁহার যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

উপনিষদ্—ঈশ কেন (পকেট সংস্করণ)—রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্তৃক অনূদিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত লক্ষ্মণ শাস্ত্রি দ্রবিড় কর্তৃক সংশোধিত। ইহাতে মূল, অন্বয়, অক্ষরার্থ, শঙ্করভাষ্য-সংক্ষেপরূপা শঙ্করার্চ্চনা নাম্নী টীকা ও তাৎপর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। লোটাস লাইব্রেরী, উদ্বোধন কার্য্যালয় ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুত রাজেন বাবুর নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত। হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, দর্শন যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী মাত্রেরই আয়ত্ত করা সুলভ হয় তাহার চেষ্টাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে হয়। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গত কয়েক বর্ষ হইতে লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত বেদান্ত দর্শন ও বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থাদির সম্পাদকতা করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উপনিষদ্ শাস্ত্রের বহুল প্রচার কামনা করিয়া উহা যাহাতে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালীর গৃহে নিত্য পঠিত হয় তজ্জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি দ্বাদশখানি প্রধান উপনিষদের এক অভিনব ক্ষুদ্রাকার সংস্করণ বাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেরূপ পরিশ্রম করিয়া পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পুস্তকপরিচয়প্রসঙ্গে তিনি লিখিতেছেন—

"আচার্য্য শঙ্কর ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই 'শঙ্করার্চ্চনা' টীকা রচিত হইয়াছে। ইহাতে আচার্য্যের ভাষ্যই কেবল অন্বয়মুখে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভাষ্য পড়িয়া মূল বুঝিতে হইলে ভাষ্যের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। আর সেই জন্য বিচারাংশগুলি ইহাতে গৃহীত হয় নাই। 'অন্বয়' মধ্যে প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নাই; কারণ, তাহাতে অন্বয়ার্থীর অসুবিধাই। 'অক্ষরার্থকে' অন্বয়ের সম্পূর্ণ অনুগামী করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, উহাতে মূলের ভাষা বুঝিতে সুবিধা হইবে। 'তাৎপর্য্য' মধ্যে গৃহীত ভাষ্যাংশেরই অনুবাদ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে মন্তব্যও আছে।

পাঠের সুবিধার জন্য মূলাংশ পুনরায় পৃথগ্‌ভাবে শেষে সংযোজিত করা হইল।"

আলোচ্য পুস্তিকায় ঈশ ও কেন উপনিষদ্ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে অক্ষরার্থ সন্নিবেশিত হওয়ায় উপনিষদের মূল বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অনেকে মূলের দিকে তত লক্ষ্য করেন না—মোটামুটি একটা অর্থ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চান। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ, এই উপায়ে শাস্ত্রার্থ মনে থাকে না, দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে অনুবাদকের যেখানে ভুল থাকিয়া যায়, পাঠক অজ্ঞাতসারে তাহা গলাধঃকরণ করিতে বাধ্য হন। এ পুস্তিকা উক্ত দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অক্ষরার্থে যাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে তাহা তাৎপর্য্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটী বেশ সুচিন্তিত হইয়াছে, তবে ইহার ভাষা আর একটু প্রাঞ্জল হইলে আরও ভাল হইত। পুস্তিকার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি চমৎকার। আকার ক্রাউন ৩২ পেজি, ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আট আনা।

আমরা আশা করি, ইহা গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে উপনিষদের বলপ্রদ, প্রাণপ্রদ সত্যসমূহ প্রচারিত করিয়া দেশে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহের বিশেষ সহায়তা করিবে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

উড়িষ্যা প্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের কোন আশ্রম ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী ঐ অঞ্চলে একটী মঠস্থাপনা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ৺ভুবনেশ্বর ধামই ঐ কার্য্যের জন্য মনোনীত করেন এবং ঐ স্থানে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ কার্য্য শেষ হওয়ায় তিনি মঠপ্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধানন্দ, শঙ্করানন্দ, অম্বিকানন্দ প্রভৃতি মঠের

কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের সহিত তথায় গমন করেন। বিগত ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে বিধিমত পূজা, হোম, পাঠ ইত্যাদির সহিত উক্ত প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবাও হইয়াছিল।

মঠের সীমানার মধ্যে একটী দাতব্য ঔষধালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে প্রত্যহ বহু রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে।

অজন্মা, দৌর্ম্মূল্য প্রভৃতি কারণে স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসিগণকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে দেখিয়া উক্ত মঠের তত্ত্বাবধানে একটী সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে চাউল বিতরণ করা হইতেছে।

সংবাদপত্র-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ব্রহ্মদেশের আকিয়াব জেলা জলপ্লাবনে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ফলে তথাকার ধান্য-ক্ষেত্রগুলি এরূপ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে এবৎসর উহা হইতে ৵১ সেরও ধান্য পাইবার আশা নাই। ইতিপূর্ব্বে উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর ধরিয়া অজন্মা প্রভৃতি কারণে উক্ত স্থানের দরিদ্র অধিবাসীরা অতি কষ্টেই দিনযাপন করিতেছিল। তাহার উপর এবৎসর বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহারা সকলেই প্রায় নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ, উক্ত স্থান সমূহে এত অধিক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত স্থান দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বন্যার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জনৈক সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানন্দ কার্য্যব্যপদেশে রেঙ্গুনে, উপস্থিত ছিলেন। তিনি অধিবাসিগণের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যকল্পে রেঙ্গুন হইতে তথায় গমন করেন এবং উক্ত স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া চৌঙ্গাংকোয়াতে (পোঃ কায়িকমারো) একটী সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত কেন্দ্র হইতে ৪৫ খানি গ্রামের দুঃস্থ অধিবাসিগণকে এ পর্য্যন্ত নুন, লঙ্কা ও ২৫০/০ মণ চাউল সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ কার্য্য এখনও কয়েক

মাস ধরিয়া চলিবে। বন্যার জন্য উক্ত স্থান সমূহে নানাবিধ উৎকট ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ঔষধ পথ্য বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে প্রায় দুই হাজার রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় কৃষকগণকে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে চাষ আবাদ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কৃষি বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টরের পরামর্শে ও অনুমোদনে একটী 'আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কৃষকগণ যাহাতে আগামী বৎসরের চাষের সময় উত্তম বীজাদি পায়, তাহারও চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে শস্যের অবস্থা ভাল হওয়ায় আমরা আমাদের সাহায্যকেন্দ্রগুলি অক্টোবর মাসের শেষভাগে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। নিম্নে ২১ সে সেপ্টেম্বর হইতে ২৬ সে অক্টোবর পর্য্যন্ত চাউলবিতরণ কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

কেন্দ্রের নাম	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ।
বাগদা	৯৭০	৪৯⁄
ইঁদপুর	১২০	৬।০
দত্তখোলা	৪৬৯	১৪৩।৫
বিটঘর	২৬৯	৯৬॥২
মিহিজাম	৫১৩	৮৫॥৫
ভুবনেশ্বর	২৫৯	৮৫৮১

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এই মহৎ কার্য্যে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

গতবারের কার্য্যবিবরণীতে আমরা অর্থাভাব, প্রভৃতি নানা অসুবিধার কথা প্রকাশ করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমরা অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ সবডিভিসনে কলমা, কামারখাড়া, বজ্রযোগিনী, সোনারঙ্গ এবং লতপদী এই পাঁচটী স্থানে সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছি। প্রথম চারিটী কেন্দ্র টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত এবং উহাদের অধীনে আরও পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র আছে। লতপদী কেন্দ্র সিরাজদিঘা থানার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত সিরাজগঞ্জ থানায় সোনার গাঁ নামক স্থানে আর একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নিম্নে ১০ই অক্টোবর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ সকল কেন্দ্রের চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

ঢাকা।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৪৫	৮৯৫	১১৯৸৯
লতপদী	১০	৩৫৫	৪৩/১
বজ্রযোগিনী	২২	২৮০	২৯/৭
কামারখাড়া	৩০	৫৪৮	৪৩৸২
সোনারঙ্গ	৭৫	৩৬৮	১৮।৬
সোনারগাঁ	২৬	৪০৯	২১।৮

উল্লিখিত কেন্দ্রগুলি হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিতে হইলে প্রতি সপ্তাহে ২৫০/০ মণ চাউলের প্রয়োজন। সুতরাং যদি সস্তা রেঙ্গুন চাউলও বিতরণ করা যায় তাহা হইলে ন্যূন পক্ষে সাপ্তাহিক ১৬০০৲ টাকার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক

স্থান আছে যেখানে সাহায্যকেন্দ্র খোলা আবশ্যক। বর্ত্তমানে অর্থাভাববশতঃ আমরা তথায় কেন্দ্র খুলিতে পারিতেছি না। আমরা এই বিষয়ে সহৃদয় দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি।

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত ভারুকাঠি গ্রামে এবং গৌরনদী থানার অন্তর্গত বাগধা গ্রামে দুইটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। নিম্নে ১৫ই অক্টোবর হইতে উক্ত কেন্দ্রদ্বয়ের চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

বরিশাল।

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ভারুকাঠি	১২	১৩৭	১১৸৭
বাগধা	১৬	২৭০	১৪/০

আমরা পুনরায় খুলনা জেলার বাগেরহাট সবডিভিসনে সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের সেবকগণ উপস্থিত মোল্লাহাট থানায় অবস্থান করিতেছেন। কারণ, উক্ত গ্রামে এমন একখানি ঘরও নাই যেখানে মানুষ বাস করিতে পারে। ঝড়ের সময় বন্যায় কয়েক খানি ক্ষুদ্র গ্রামও মধুমতী নদীর গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঘরবাড়ী ও গাছপালা ভাঙ্গিয়া রাস্তাঘাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের অবধি নাই।

২৫সে অক্টোবর মোল্লাহাট কেন্দ্র হইতে ৬খানি গ্রামের ১১৮ জন লোককে ৬/২৷৷০ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে।

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ফরিদপুর জেলার পালং থানার অন্তর্গত কুমোরপুর গ্রামে একটী সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তথাকার কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইলেই প্রকাশিত করিব।

আমরা বিনামূল্যে চাউল বিতরণ এবং দোকান খুলিয়া ক্রয়-মূল্যে বা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছি বটে কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ গৃহ নির্ম্মাণ বা বস্ত্র বিতরণ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিতেছি না। অথচ ঐ দুইটী বিষয়ে সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন। যদিও ঐ কার্য্যে বহুল অর্থের প্রয়োজন তথাপি আমরা

আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণের সহায়তায় আমাদের সে অভাব দূর হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

(১) প্রেসিডেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশন মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন আফিস, ১ নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৩০-১১-১৯ (স্বাঃ) সারদানন্দ,

কলিকাতা। সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

(৫ই জুন হইতে ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধনে প্রাপ্ত)

শ্রীনৃত্যলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৪৪৮।০
অনেক ভদ্রলোক, কুচবেহার, ৫৲
শ্রীনৃসিংহ চন্দ্র দে, কলিকাতা, ১০৲
শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ, ,, ৬০৲
,, হরিদাস কুণ্ডু, ,, ৪৲
গভর্ণমেণ্ট প্রেস্টাং, দিল্লী, ২০৲
শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা, তানতাবিন, ২।৵০
শ্রীজানকী নাথ সাহা, কলিকাতা, ১৲
সেবক মণ্ডলী, জেটি পাওয়ার হাউস, গোঁসাইডাঙ্গা, ৪।৵০
শ্রীমতী সুনীতিবালা, কলিকাতা, ১৲
সেক্রেটারী-দরিদ্র-ভাণ্ডার, জিয়াগঞ্জ, ৫৲
শ্রীভগবান দাস, পোর্টব্লেয়ার ১০৲
শ্রীমতী মনীবালা, কলিকাতা, ৪৲
শ্রীনাথুমল পাঞ্জাবী, ,, ৫৲
,, ননীগোপাল বসু, ,, ৭৲
,, হৃষীকেশ ঘোষ, শুকচর, ৫৲
,, অমূল্য চন্দ্র বসু, ৫৲
অনেক বন্ধু, বম্বে ২৫৲
শ্রীভঞ্জকান্ত সরকার, রাজারামপুর, ১৲
দরিদ্রভাণ্ডার, বোয়ালমারী ১৲
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা, ৪।০
,, ভূপেন্দ্র কুমার বসু, ,, ৫৲
মৌলুবী লিয়াকৎ হোসেন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৲
শ্রীরাজেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, ,, ৫৲
,, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ,, ২৲
সেক্রেটারী বার লাইব্রেরী, হাওড়া, ৭০৲
শ্রীবিমান বিহারী বসু, রাঁচি, ৫৲
,, দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা, ৮৲
,, সুশীল চন্দ্র বসাক, ,, ১৲
,, উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ৪৲
,, রমেশ চন্দ্র সরকার, ভাজা, ২৲
অনেক বন্ধু, আঁটপুর ২৫৲
শ্রী বি, সি, গুহ, মিনগী, ৫০৲
,, নরেন্দ্রমোহন সেন, ঝিনেদা, ২৲

ই, বি, রেলের কর্ম্মচারিগণ, চিৎপুর রোড ৪৸৴০
মাঃ ম্যানেজার, হুতবাদী, ২৫৲
শ্রীমতী সুরুচি বালা ঘোষ, কুমিল্লা, ১০৲
শ্রীরাম, বাঙ্গালোর, ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ৩০৲
" " রেঙ্গুন, ১১৫৲
হারমনি, নিউজিল্যাণ্ড, ১২৲
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, কলিকাতা, ১৫৲
মিঃ জগৎপ্রসাদ, লাহোর, ১০৲
জনৈক বন্ধু, ১০৲
শ্রীরোহিণী কান্ত রায়, কলিকাতা, ॥০
জনৈক বন্ধু, ৫৲
মিঃ এন, কে, রায়, বাগদাদ, ২৲
শ্রীঅনুরূপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফাইজাবাদ ৫৲
" রামকৃষ্ণ সেন, কলিকাতা, ৫৲
" অতুলকৃষ্ণ দে, " ৪৲
" দুর্গাচরণ রক্ষিত, গোবোরডাঙ্গা, ৫৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী, কলিকাতা, ১০
" মায়া " ১৲
" সরলা বালা দাসী, " ১৲
জনৈক বন্ধু, " ১৲
মাঃ শ্রীগঙ্গারাম, পোর্টব্লেয়ার ১০৲
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, সিঙ্গখালি, ৩৲
মিঃ ডি, দিনরাজ, কোয়ালালামপুর, ৬০৲
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৩৲
" বিজয়কৃষ্ণ বসু, কালীঘাট, ১০৲
" সুধাংশু শেখর ঘোষ, কলিকাতা, ৫৲
" ব্রজলাল পাল, " ১০৲
মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউট, বড়বাজার, ৩০৲
মিঃ আর, সি, দত্ত, মাইরেঙ্গলা, ১৲

মাঃ জে, বি, ঘটক, করাচি ৬৲
জনৈক বন্ধু, ১০৲
" মহিলা, মাঃ ঢাকার কাঙ্গিলাল ১০৲
শ্রীরবীন্দ্রনাথ আশ, কলিকাতা ১৲
" এককড়ি ঘোষ, " ৩৲
" হীরালাল নিওগী ভদ্রেশ্বর, ৫৲
" উপেন্দ্র নাথ দে, গোঁসাইডাঙ্গা, ৪৲
সুবেদার শ্রী এ, পি, ঘোষ, বাগদাদ, ১০৲
শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ, " ৫৲
শ্রী— কলিকাতা, ১৫৲
[illegible]
" মোহিনীমোহন রায়, ডায়মণ্ডহারবার ১
" গঙ্গাদাস সরকার, কৃষ্ণনগর, ৫৲
শ্রীকানাইলাল পাল, কলিকাতা, ৫০৲
" ব্রজলাল পাল, " ১০৲
" উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ৩৲
" কুমুদিনী বসু, কলিকাতা, ১৲
" মহেন্দ্রলাল সরকার, বেসিন, ৫৲
শ্রীমতী চারুলতা চৌধুরী, কলিকাতা, ১০৲
" লক্ষ্মীমণি দাসী, " ৮০৲
" শুভাষিণী গুহ, গোবিন্দপুর, ২৲
শন্দালি স্কুলের ছাত্রগণ, ১০৲
শ্রী কে, এন, ঘোষ, আমুখাল, ৫৲
শ্রীমতী সরোজবাসিনী দাসী, কলিকাতা, ১৲
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র নন্দী, " ৫৲
" অচ্যুত কুমার নন্দী, " ১৲
জনৈক বন্ধু, " ১০৲
শ্রীযুত সুরেন্দ্র লাল সেন, আরারিয়া, ৫৲
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গাবতলী, ৫৲
" বিহারী লাল, কলিকাতা ৫৲

শ্রীরামকৃষ্ণ নরসিংহ তিরুমালি,
বাঙ্গালোর, ৫০৲

„ পাঠি কারদা ভেঙ্গন, কোটার, ৫৲

„ ডি, কে, দুত্ত, সেভক, ১৲

„ সি, কৃষ্ণস্বামী পিলাই, বেলারী, ১০৲

„ জে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়পুর, ২৷০

ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ে প্রাপ্ত
মাঃ শ্রীপরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সাহা, কলিকাতা, ৫১৲

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী, কাশী, ২৷০

ফ্রেণ্ড সানরাইজ লিটারারী ক্লব,
কলিকতা, ১০১৲

সুধীরের পিতামহী, „ ৬৷০

জনৈক বন্ধু ২৲

দরিদ্র বান্ধব সমিতি, সম্বলপুর ৪০৲

ডি।১৩ কোম্পানী, ৪৯নং বেঙ্গলী
রেজিমেণ্ট ৪৲

শ্রীবিধুভূষণ পাল, বহরমপুর, ১৲

„ হরিপদ দত্ত, পৈটা, ৫৲

৺রায় শ্রীশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী স্মরণার্থ
মাঃ তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী, ১০০৲

রাজা যাদবেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের
কন্যা রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণরমণী,
শোভাবাজার রাজবাটী, ৬৭৲

শ্রীযুত যোগানন্দ সিংহ, ভবানীপুর, ৪৲

„ সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাটনা, ৩০৲

ফেমিন রিলিফ ফণ্ড, ২৲

কুমুদ সেনের স্মৃতিরক্ষার্থ ৪১।৶৫

জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ৪৲

শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু, বর্দ্ধমান, ২৲

জনৈক বন্ধু, হাজারীবাগ, ৩০৷০

শ্রীমতী জীবনবালা, তাম্রাবীন ৫৲

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বরিশাল, ২৲

শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দাসী, বর্দ্ধমান, ১০৲

জি, জি, বাপীকর, ৪৫৲

জে, আর, ব্যানার্জ্জী, বিদ্যাসাগর কলেজ ২০০৲

শ্রীসন্তোষ কুমার দে, কলিকাতা ১৯৲

মাঃ পি, সি, মজুমদার, যশোর, ৫৲

খুচরা আদায়, কলিকাতা, ৫৲

সমদুঃখী, কলিকাতা, ৭৲

মাঃ কিরণবাবু, জনৈক বন্ধুর মাতা ১৫৲

শ্রীদিবাকর দে, কলিকাতা ৫৲

শ্রীকৃষ্ণগোপাল সাহা মোদক, কলিকাতা ১০৲

জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১০৲

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দে, „ ৬৲

জনৈক বন্ধু, ১৷৵০

ঐ ।০

শ্রীরাজকুমার ব্যানার্জ্জী, চন্দননগর ৫৲

„ পি, বসু, কলিকাতা, ১২৲

„ শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র, ১০৲

„ ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র ১০৲

ভ্রাতৃবৃন্দ, ৩৷৶৫

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়, ২৫৲

দেপাই, এ, এন, সুর, থানিকিন, ১০৲

জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১৲

শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় „ ৫৲

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী, ২৲

খুচরা আদায় ২৲

পৌটদের স্ত্রী, ১০৲

শ্রীমতী ময়না দাসী, দেয়া, ২৲

বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ড, কলিকাতা, ৬০০০৲

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল, „ ৫০৲

মাঃ রায় সাহেব শ্রী এস, এম, ঘোষ,
পুণা, ৩৫৲
শ্রীকেদার নাথ ঝাঁ, নিজকুপি, ১। •
„ দেবী প্রসাদ শীল, কলিকাতা ৫৲
„ জে, কে, সরকার, „ ৫০৲
„ হরিচরণ দে, „ ৪৲
শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা বসু, „ ৫৲
শ্রী এস গনেশম্ ট্রিপ্লিকেন, ১০৲
মিসেস্ পীলিত, সীতাপুর ১০৲
ডাঃ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় ৪৲
শ্রীতারাকান্ত বিশ্বাস, কালারবেয়রা, ১৲
„ অমূল্য কুমারি ভড়, কলিকাতা, ২৲
অনৈক সেবক, কাশী ১৲
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সরকার, কালীর্ণা, ২২॥৵০
„ ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, কলিকাতা, ১০৲
ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নের সভ্যগণ, „ ৩৮৲
বেঙ্গলী এসোসিয়েসান,
মাঃ শ্রী জে, সি, বিশ্বাস, পুনা, ১০০৲
বি, এন, রেলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের
আফিসের কর্ম্মচারিগণ, কলিকাতা, ২০৮৵০
শ্রীমতী মালিনী দাসী, „ ১০৲
উত্তর ইটালী, কমলা লাইব্রেরী, „ ৩৫৲
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, মসাট, ৫৲
„ প্রফুল্লকুমার সরকার, ঢেনকানল, ১০৲
বি, আর, ও অফিসের কর্ম্মচারিগণ
মাঃ শ্রীআর, কে, ঘোষ, ইরাক, ২১।০
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী,
কলিকাতা, ২২৫৲
অনৈক বন্ধু,
মাঃ শ্রীরবীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, „ ১৫৲

শ্রী এন, এন, ঘোষ, „ ১২৲
„ ডি, কে, এম, আয়ার, সেন্দকন, ।০
„ এ, বি, সামন্ত, কলিকাতা ১০৲
৺হেমচন্দ্র সেটের স্মরণার্থ, „ ১০৲
"তমপু" „ ৫৲
শ্রী শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, „ ২৲
„ সুধীন্দ্র বসু, „ ৫০৲
„ তারাপ্রসন্ন দত্ত, „ ২০৲
শ্রীমতী সরস্বতী দেবী „ ২৲
„ ব্রজমোহিনী, ভাগলপুর, ৫
শ্রীধ্যানানন্দ সিংহ, ভবানীপুর, ৩।৵০
„ অরুণ দাস সরকার, দমারপুর, ৸০
সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড, কোন্নগর, ২৫
"লক্ষ্মীনিবাস" বাগবাজার,
৺গঙ্গানারায়ণ গুপ্তের স্মরণার্থ
মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী, ২৫
শ্রীকালীদাস দাস, কলিকাতা, ২
জে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং „ ৮
শ্রীনিরঞ্জন রায়, ধুলিয়ণ, ৫
অনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ১
„ „ ১
„ পুনা ১
কতিপয় বন্ধু, মাঃ শ্রী এইচ্ এম
বায় চৌধুরী, বি, কোম্পানী
৪৯নং রেজিমেণ্ট, করাচি, ৭
শ্রীবিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী, মীরগঞ্জ, ২
„ পশুপতি আঢ্য, কলিকাতা, ৩
„ যতীন্দ্র মোহন বসু, গৌরীপুর, ২
বজবজ সঙ্ঘ ভাণ্ডার,
মাঃ শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, ১০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

সোমবার।

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কহিতেন, "যারা দাবাবড়ে খেলে তাদের মাথা ধরে যায়, আর যারা বসে বসে কেবল উপর চাল দেয় তাদেরই মনে হয় এইবার এই বড়েকে ধরেচে, এইবার এই গজকে ধরেচে ইত্যাদি।" তুমি এখন খেলতে বসেচ তাতেই মাঝে মাঝে মাথা ধরে। তোমাদের অবস্থা দেখেই খুব শিক্ষা হচ্চে। প্রার্থনা যেন শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হয়ে যাই।

"দেখে শুনে ভয় করে প্রাণ কেঁদে উঠে ডরে,
রেখো আমায় কোলে করে স্নেহের অঞ্চলে ঘিরে।
তাইতে তোমারে ডাকি মা।"

আশীর্ব্বাদ কর যেন মায়ামুগ্ধ না হই। সত্যপথে খুব এগিয়ে যাই। সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি মানুষে দিতে পারে কি? আমার মনে হয়, ভগবান্ কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এইরূপ করেন। মানুষের দৃষ্টি অতি কম। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব একটী গল্প বলতেন,—

এক রাজা মন্ত্রীর সহিত মৃগয়ায় গিয়াছিল। হঠাৎ রাজার আঙ্গুল কাটিয়া গেলে রাজা মন্ত্রীকে কহিল, 'ইহার কারণ কি?' মন্ত্রী উত্তর দিল, "অবশ্য ইহার মধ্যে কোন গভীর অর্থ আছে।" রাজার মনোমত উত্তর না হওয়ায় চটিয়া মন্ত্রীকে এক কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহারও কি গূঢ় কারণ আছে?" মন্ত্রী কহিল, "অবশ্য।" এই সময় বনপথ দিয়া একদল ডাকাত যাইতেছিল। তাহারা রাজাকে পাইয়া মা কালীর কাছে বলি দিবার নিমিত্ত লইয়া গেল। পূজাদি

শেষ করিয়া বলি দিবে এমন সময়ে দেখিল রাজার হাতের আঙ্গুল কাটা। তখন গালি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। রাজা জীবনদান পাইয়া মন্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া ভগবান্‌কে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিল এবং মন্ত্রীকে কূপ হইতে তুলিয়া তাহার নিকট সকল বিবরণ কহিল।

কোন কাজই বৃথা যায় না। তবে আমরা মানুষ, মানুষের বুদ্ধির মত অল্পে হতাশ ও অল্পে সন্তুষ্ট হই। ইহাই মানুষের ধর্ম্ম।

* * * *

ইতি—দাস

বাবুরাম।

মঠ, বেলুড়

১৮।৮।১৬

স্নেহভাজনেষু—

তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। সুস্থ আছ জানিয়া হইলাম। ওরে বাবা, দেহধারণ কল্লেই ভালমন্দ আছে, সুখদুঃখ আছে, স্তুতি নিন্দা আছে। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে নয়, সৎ অসৎ বলে নয়—আমাদের স্বভাবই ঐ এক রকম, তাই তাদের আপনার মনে করি।

৺কাশী যাবে উত্তম। সৎসঙ্গও পাবে তথায়। প্রাণভরে আত্মারামকে ডেকে যাও, যেমন অবস্থায় রাখ্‌বার তিনি রাখ্‌বেন। কর কেবল 'নাহং' 'নাহং', জপ 'নাহং' 'নাহং', ভাব 'নাহং' 'নাহং'। আমি যাই হই না কেন নাথ, তোমাকে এই রকম আমাকেই নিতে যে হবে হে। আমার আর কেবা আছে প্রভু! তুমি আমার আমি তোমার। জান্‌বে নিত্যসম্বন্ধ তাঁর সহিত আমাদের।

এখানকার সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। মহারাজ বাঙ্গালোরে ভাল আছেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

প্রেমানন্দ।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ঈশ্বরে বিশ্বাস, পাপস্বীকার, প্রার্থনার অভ্যাস, বলিদানে প্রবৃত্তি এবং পরকালের আশা—এই ভূমা ভিত্তির উপর সকল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। পাপস্বীকার প্রভৃতি গৌণ বিষয়ে সকল ধর্ম্ম একমত না হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক এই তিনটী সনাতন সত্যই যে ধর্ম্মের প্রাণ, পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম্ম ইহাতে একমত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্কারও ঈশ্বর, আত্মা ও পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ম্যাক্সমূলার আমরণ ধর্ম্মের ইতিহাস অনুশীলন করিয়াও ধর্ম্মের উপর্য্যুক্ত লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করিবার সময় মানবজাতির এই সাধারণ সংস্কার দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের যে অন্য কোন লক্ষণ থাকিতে পারে তাহা একেবারেই তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাঁহার সংজ্ঞা অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম "ধর্ম্ম" বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মে উল্লিখিত পাঁচটী লক্ষণের একটীও বর্ত্তমান নাই। অথচ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এক অতি প্রাচীন ও প্রধান ধর্ম্ম এবং এখনও প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী জুড়িয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান নাই। পাপস্বীকার, বলি, প্রার্থনা নাই। পরলোকের আশা নাই। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসও ভ্রান্তদৃষ্টিজনিত অভিমান ও উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দয়রূপে নিরাকৃত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা ভিত্তি, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা অনাদৃত, অস্বীকৃত ও নিরাকৃত। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশিষ্টতা। অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য ও বিরোধও এইখানে। গতানুগতিক

বিবেকানন্দ সোসাইটীর সাপ্তাহিক ধর্ম্মাধিবেশনে পঠিত।

পথ ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতন পথের অনুসরণ করিয়াছে এবং মানবজাতির সাধারণ সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের এক নূতন ভিত্তি আবিষ্কার করিয়াছে। কাজেই পুরাতনের সঙ্গে, সাধারণের সঙ্গে তাহার স্বরূপের সাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি—প্রজ্ঞার একটা নূতন সৃষ্টি এবং সেইজন্যই মানব ইতিহাসেরও একটী বিশিষ্ট কথা। যাহা বিশিষ্ট, তাহার বৈশিষ্ট্যই প্রণিধানযোগ্য—সেইখানেই তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে।

সাধারণই হউক, আর বিশিষ্টই হউক, ধর্ম্মমাত্রই মানবজীবনের কোন না কোন সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা সাময়িক, যাহার অস্তিত্ব আজ আছে কাল নাই, এমন সত্য লইয়া কোন ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম মানুষের জীবনের নিত্যসহচর। অন্তরাত্মার সঙ্গে তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ। সেখানে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণার অবসর নাই। জীবনের সকল সত্য সকল ধর্ম্মে না থাকিতে পারে, জীবনের পূর্ণাভিব্যক্তি হয়ত অদ্যাপি নাও হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কোন না কোন অংশ বা অংশবিশেষ অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জীবনের কোন্ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কোন্ সনাতন সত্যের উপর ইহার মহান্ সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার আলোচনা ও অনুসন্ধানই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানবজীবনের একদিক্ গতির, আর একদিক্ স্থিতি ও পরিণতির। গতির দিক্ তাহার স্পষ্ট অনুভূতির বিষয়—ধ্রুব জ্ঞানের বিষয়—কর্ম্মের বিষয়। পরিণামের দিক্ তাহার অস্পষ্ট অনুভূতির বিষয়—আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার বিষয়। গতির দিকে বর্ত্তমান ও ইহকাল। পরিণামের দিকে ভবিষ্যৎ ও পরকাল। অন্যান্য ধর্ম্ম ইহকালকে পশ্চাতে ফেলিয়া পরকালকে ধর্ম্মজীবনের কেন্দ্র স্থির করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম পরকালকে পশ্চাতে ফেলিয়া ইহকালকে অবলম্বন করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছে গতির দিক্, কর্ম্মের দিক্। পরিণামের দিক্—কল্পনার দিক্ বাড়াইয়া তুলিয়া গতির দিক্, বাস্তব জীবনের দিক্ খর্ব্ব করে নাই।

পরকালের প্রত্যাশায় ইহকালকে অবজ্ঞা না করিয়া উন্নত ধর্ম্মজীবন গঠনে যত্নবান্ হইয়াছে। ইহাতে অতীন্দ্রিয়ের অনিশ্চয়তা নাই—বৃথা মতবাদের দৌরাত্ম্য নাই—অন্ধবিশ্বাসের আড়ম্বর নাই—বিশ্বাসের নির্ভরতা নাই। আশা ও আকাঙ্ক্ষা কঠোর বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিমিত। কল্পনার দ্বার সঙ্কীর্ণ। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ। বর্ত্তমান জীবনে—প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তবজীবনে- আদর্শজীবন লাভ, ইহার চরম লক্ষ্য।

মানবের রাজ্যে দুইটী বিভিন্ন সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। একটী প্রকৃতির সৃষ্টি আর একটী মানবের প্রজ্ঞার সৃষ্টি। জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক সৃষ্টির স্বতঃস্ফূরণ হইয়াছে। প্রজ্ঞার সৃষ্টি মরণশীল মানবের সচেষ্ট সাধনার ফল। প্রকৃতির সৃষ্টি মানবের সহজাত। প্রজ্ঞার সৃষ্টি তাহার সাধনা। প্রকৃতি ও প্রজ্ঞার চিরন্তন বিরোধ। মানবজীবন এই বিরোধের সমরক্ষেত্র। ইহার এক প্রান্তে অদৃষ্ট দৈব—অপর প্রান্তে পুরুষকার ও প্রযত্ন। একটীর আবির্ভাব হৃদয়ে, অপরের জন্ম সবল মস্তিষ্কে। জীবনের এই সনাতন দ্বন্দ্ব মানবজাতির চিন্তাস্রোতকে দুই পৃথক ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। প্রকৃতি মানব-হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে লইয়া অজ্ঞাত পরিণামের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা প্রকৃতির উপর তাহার তীক্ষ্ণরশ্মি ফেলিয়া প্রকৃতির যতটুকু আলোকিত—প্রত্যক্ষজ্ঞানের আয়ত্ত ও অনুমোদিত—সেইটুকু গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট পরিণামের সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতি টানিতেছে মানুষকে অনন্তের দিকে, অতীন্দ্রিয়ের দিকে; অজ্ঞেয় পরিণামের দিকে—প্রজ্ঞা টানিতেছে তাহাকে সান্তের দিকে, প্রত্যক্ষের দিকে, ইহকালের পরীক্ষিত ও সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে। দুই দিকের ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রকৃতির সৃষ্টি, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রজ্ঞার সৃষ্টি।

অব্যক্ত প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টি ছুটিয়াছে স্রষ্টার অন্বেষণে। স্বপ্নাবিষ্ট মানব ছুটিয়াছে সেই মহান্ অজ্ঞেয়ের অন্বেষণে, বিশ্বাতীতের পথে।

তাহার স্বপ্নের দেশ, আশার দেশ, তাহার অজ্ঞাত পরিণামের দেশ—সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অন্বেষণে। অনন্তের পথে এই মহাপ্রস্থানে তাহাকে কেহ বাধা দেয় নাই, কেহ তাহার গতিরোধ করে নাই। প্রজ্ঞা তখনও জাগরিত হয় নাই। তখনও তাহার স্বাতন্ত্র্য বোধ হয় নাই। একটা দুর্নিরীক্ষ্য আলেয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ইহকাল ও ইহলোককে পশ্চাতে ফেলিয়া, অতিদূর বহুদূর পথিক চলিয়া গিয়াছে। বিরাম নাই, শান্তিবোধ নাই, কাতরতা নাই। সম্মুখেই বৈতরণী, জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়ের মাঝখান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পরপারে সেই চির-বাঞ্ছিতের দেশ—বিশ্ববিধাতার রহস্য-মন্দির—জীবন-যানের শেষ গন্তব্য স্থান। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে প্রজ্ঞার জন্ম হইয়াছে, পুষ্টি হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য বোধ হইয়াছে। প্রজ্ঞা আর প্রকৃতিকে অনুসরণ করিতে পারিতেছে না। জ্ঞেয়ের সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতি যে শ্রুতির বিদ্যুৎরেখা দেখিয়া অগ্রসর হইতেছিল; প্রজ্ঞা সেই ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পায় নাই। প্রজ্ঞা অন্ধ-প্রকৃতির অনুসরণে অসম্মত। কিন্তু প্রজ্ঞা প্রকৃতিরই কনিষ্ঠা কন্যা। প্রজ্ঞাকে ছাড়িয়া প্রকৃতির চলিবার শক্তি নাই। তাই প্রজ্ঞার শাসনে প্রকৃতির গতি রুদ্ধ হইল। অনন্তের যাত্রিকের আশার আলোকে নিবিয়া গেল! মানুষের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল! নৈরাশ্যে মানবাত্মা গতিহীন হইয়া পড়িয়া রহিল!

নৈরাশ্যের অন্ধকারে আধ্যাত্মিক জগৎ সমাচ্ছন্ন। বাস্তব-জগতের দুঃখের হাহাকার সেই অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছে। আশার আলোক নাই। প্রজ্ঞার দীপ্তি নাই। জীবন-তরণী গভীর অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গতিহীন হইয়াছে। নির্গমনের পথ নাই। মুক্তির উপায় নাই। কিন্তু মুক্তি চাই, গতি চাই, জীবন-স্রোত চাই। মানুষের ধর্ম্ম চাই। মুক্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য প্রজ্ঞা ধ্যানমগ্ন হইল। প্রজ্ঞার সাধনা সার্থক হইল। ধ্যানলোক হইতে মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনিত হইল—"দুঃখসন্তপ্ত মানব অজ্ঞেয়কে জানিবার চেষ্টা করিও না। বিশ্বের অন্তরালে কি আছে, সৃষ্টির নেপথ্যে কি রহস্য রহিয়াছে,

জানিবার প্রয়াস পাইও না। তোমার স্বপ্নাবিষ্ট মস্তিষ্ক হইতে ঐ চিরন্তন অজ্ঞেয়ের গুরুভার দূরে নিক্ষেপ কর। বৈতরণীর তটস্থ মহাসমাধি হইতে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। বিশ্বাতীতের পথ ছাড়িয়া একবার বিশ্বের পথে ফিরে এস। বিশ্বাতীত কোন অসীম কারুণিক নিয়ন্তার দর্শন প্রতীক্ষায় কালযাপন করিতেছ—বৃথা তোমার আশা! স্বর্গে অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় মর্ত্তে দুঃখের দিন গণিতেছ—নিষ্ফল তোমার উদ্যম! সুদূর আকাশে নক্ষত্র উদয়ের আশায় গৃহের আলোক তোমার দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। বিশ্বাতীতের পথে দাঁড়াইয়া বিশ্বের পথ দেখিতে পাও নাই। অজ্ঞেয়ের অন্বেষণে যাইয়া জ্ঞেয়ের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। এইবার প্রত্যাবর্ত্তন কর। জ্ঞেয়ের প্রতি—বিশ্বের প্রতি—জীবনের গতির প্রতি প্রবুদ্ধ হও। পুরুষকার ও প্রযত্নের দ্বারা জীবনের দুঃখ ধ্বংস কর। ইহলোকেই প্রেম ও নীতির আদর্শ জগৎ সৃষ্টি কর।" বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজাতির প্রতি এই প্রত্যাবর্ত্তনের আহ্বান, ইহকালের আশা, উদ্যম ও কর্ম্মের আহ্বান।

প্রজ্ঞা স্বাধিকারের সীমারেখা অতিক্রম করিতে অসম্মত। বিশ্বের নিয়ন্তা সম্বন্ধে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্বন্ধে, বিশ্বের আদি কারণ ও শেষ পরিণাম সম্বন্ধে প্রজ্ঞা নির্দ্দয়রূপে নিস্তব্ধ। তাহার মর্ম্মভেদী মৌন নীরবতার ভাষায় শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়া দেয়—"হতভাগ্য মানব, আদির কথা, চরমের কথা জিজ্ঞাসা করিও না। মানবের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিও না। অপ্রাপ্যকে পাইবার আশা করিও না। ভাষা যাহার সন্ধান না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে, বুদ্ধি যাহার ধারণা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে, প্রজ্ঞার প্রখর আলোক যেখানে স্তিমিত হইয়া যায়, বিশ্বের সেই আদি কারণের অন্বেষণ করিও না। জীবনের প্রয়োজনের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা নাই। অনাবশ্যকের আবশ্যকতাকে বাড়াইয়া তুলিয়া লীলার জগতের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না।" ব্যষ্টি আত্মার অস্তিত্বে প্রজ্ঞার আস্থা নাই। প্রজ্ঞা দেখিয়াছে বিশ্বে ধর্ম্মচক্র, নীতির রাজত্ব, কার্য্যকারণের নিত্য প্রবাহ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের বিচিত্র গতি ও

পরিণতি। তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের জগতে ব্যক্তিত্ব আছে, বিশিষ্টতা আছে। ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতার আপেক্ষিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। ঈশ্বর ও আত্মা কেহই যদি না থাকিল, তবে মানুষের জগতে আর রহিল কি? কেন, "আর্য্যসত্য"ই রহিয়াছে—মানুষের দুঃখময় জীবন রহিয়াছে। দুঃখের যেমন উৎপত্তি আছে তেমন তার বিনাশও আছে, বিনাশ করিবার পথও আছে। প্রজ্ঞা সেই পথ আবিষ্কার করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজাতির দুঃখবিমুক্তির পথ-নির্দ্দেশ মাত্র। দুঃখবিমুক্তির চরম ফল আদর্শজীবন লাভ—নির্ব্বাণ লাভ। নির্ব্বাণের পরপারে কিছু আছে? জিজ্ঞাসা করিও না। প্রজ্ঞাকে ব্যথিত করিও না। যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব, প্রজ্ঞা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহা হেতুতত্ত্বের বহির্ভূত প্রজ্ঞা সেখানে নীরব।

ব্যক্তির জীবনে সময় সময় এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন মানুষ মতবাদ বা বিচার বিতর্ক দূরে ফেলিয়া যাহা সে ধ্রুব জানে তাহাই লইয়া জীবনকে সাধনার পথে, সাফল্যের পথে পরিচালিত করিয়া দেয়। মানুষ তখন তত্ত্ব চায় না—সে চায় সাধনা ও সাফল্য। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনেও এইরূপ একটা সময় উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বর ও আত্মা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব, কাব্য ও কল্পনার কুজ্ঝটীকা দ্বারা সতত সমাচ্ছন্ন। প্রজ্ঞার তীক্ষ্ণ রশ্মিও সেই ধূম্র-আবরণ ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ। শ্রুতির ক্ষীণ আলোক প্রজ্ঞা উপেক্ষার নয়নে দেখিয়াছে। ধর্ম্মের সনাতন ভিত্তি প্রজ্ঞার নিকট যথেষ্ট বাস্তব বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বিচার বিতর্কে সমাজ-মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে জাতি-হৃদয়ে জ্ঞান, প্রেম, নীতি ও কর্ম্মের যে গভীর অনুভূতি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার মুক্তি চাই মর্ত্ত্যজগতে সেই সনাতন আদর্শজীবনের বিকাশ চাই, স্পর্শযোগ্য জীবনে তাহার অনুভূতি চাই। নিবিড় মেঘরাশি যেমন তড়িৎ আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া বর্ষণ করে, জাতিহৃদয়ও সেইরূপ প্রজ্ঞার আঘাতে গতিশক্তি পাইয়া কর্ম্ম ও নীতির আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জাতিহৃদয়ের প্রতি প্রজ্ঞার তড়িৎ আঘাতজনিত শান্তিজল।

মহাভারতের মহা বিপ্লবের ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। বৈদিক ধর্ম্ম, বৈদিক সমাজ ও সভ্যতার কেন্দ্র ও প্রাণস্বরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভাবহীন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রনিবদ্ধ ধর্ম্ম কায়ক্লেশে আশ্রমের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জীবনধারণ করিয়া থাকে। শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে জনসাধারণের সঙ্গে বৈদিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমাজে নূতন চিন্তা ও নূতন যুক্তিপ্রণালীর উন্মেষ হয়। স্বাধীন চিন্তা শ্রুতির অধিকার, শ্রুতির প্রমাণ গ্রহণ করে না। জ্ঞানের দিক্ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। ধর্ম্ম মানুষের সহজাত। জ্ঞানের দিক্‌পরিবর্ত্তন হইলেও তাহার ধর্ম্মের আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, জ্ঞানের যখন যে অবস্থা সেই অবস্থার উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে যুগে যুগে যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়।

ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ মানবের দেবজীবন লাভ। যুগ-যুগান্তরের ধ্যানলব্ধ আদর্শকে কর্ম্মজগতে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাকে অতীন্দ্রিয় শ্রুতিগম্য তত্ত্ব ছাড়িয়া প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞার অধিকারে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। অনন্ত-অজ্ঞেয়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে জ্ঞেয়ের উপর, প্রজ্ঞার অধিগম্য তত্ত্বের উপর, প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের জাগ্রত আত্মা একদিন চাহিয়াছিল—বিশ্ব-মানবের দুঃখ দৈন্য মুছিয়া ফেলিতে, হিংসার দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শজগৎকে ইহলোকে প্রত্যক্ষীভূত করিতে। সেইজন্যই বৌদ্ধধর্ম্মরূপ মহান্ আয়োজন। ভারতের সনাতন আদর্শকে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগম্য করিতে হইলে তাহাকে শাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া সহজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

মানুষ যখন অজ্ঞেয়ের অন্বেষণ ছাড়িয়া জ্ঞেয়কে বরণ করিয়া লয়, দর্শন ছাড়িয়া বিজ্ঞান গ্রহণ করে, ধর্ম্মও তখন জ্ঞেয়ের অধিকারে আসে। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ জ্ঞেয়ের উপর, বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোম্‌তে

(August Compte) যেমন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের উপর 'ধ্রুববাদ' দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধও তেমন ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত ও স্পর্শযোগ্য সত্যানুভূতি লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দর্শনের ইতিহাসে ধ্রুববাদ দর্শনের যে স্থান, ধর্ম্মের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মেরও সেই স্থান। বৌদ্ধধর্ম্ম ধর্ম্মের ধ্রুববাদ।

কর্ম্মবিমুখ-বৈরাগ্যপ্রবণ বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি কেহ কুটীল কটাক্ষপাত করিও না। বৌদ্ধধর্ম্মের গতি বিশ্বাতীতের পথে নয়, বিশ্বের পথে—কর্ম্মের পথে। ইহাতে স্বর্গের প্রলোভন নাই। কোনও অসীম কারুণিক অতীন্দ্রিয় পুরুষের অহৈতুক কৃপার প্রতীক্ষায় জীবনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ নাই। বিশ্বের যদি কোনও নিয়ন্তা থাকেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তৎপ্রতি উদাসীন। জীবনের গতি ও পরিণতির জন্য তাঁহার কৃপাদৃষ্টির আবশ্যক নাই। মানবের পুরুষকার ও প্রযত্নই তৎপক্ষে যথেষ্ট ও একমাত্র অবলম্বন। বৌদ্ধধর্ম্ম জীবনসংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন সমর্থন করে নাই—স্বাবলম্বন ও প্রযত্ন দ্বারা জয়লাভই তাহার অন্তরের কথা। পরলোকের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে নাই। কিন্তু তাহার প্রধান চেষ্টা ইহলোকের প্রত্যক্ষ জীবনকে মহীয়ান্ গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে—ইহজীবনে আদর্শজীবন লাভ করিতে। বৌদ্ধযুগের কর্ম্ম-প্রভাবে ঐতিহাসিক ভারত গৌরবান্বিত। পৃথিবীর ইতিহাসের তাহা বিশিষ্ট অধ্যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম এইরূপ আত্মস্থ, প্রযত্নশীল ও কর্ম্মপ্রাণ।

ধর্ম্মের ইতিহাস অধর্ম্ম, যুদ্ধ, রক্তপাত প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত। শান্তির নামে সমর করিতে, প্রেমের নামে রক্তপাত করিতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ইতিহাসের ইহা ভীষণ সত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে পরিমুক্ত। সাম্প্রদায়িকতার বিষবহ্নি কখনই তাহার গাত্র স্পর্শ করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের এই নির্ব্বিরোধিতার প্রধান কারণ ইহার বৈজ্ঞানিকতা। কাল্পনিকতায় মানুষের স্বাতন্ত্র্য বেশী, সেখানে মানুষে মানুষে বিরোধের সম্ভাবনীয়তাও বেশী। বৈজ্ঞানিকতায় বিরোধের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। সেখানে বিশ্বমানব একই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। কোন ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষের

স্বার্থের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়াছে বিশ্বে সাম্য ও নীতির রাজত্ব—জীব জড়, মানব পশু সকলেই বিশ্বনিয়মের অধীন। কোন পার্থক্যের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া এই উদার দৃষ্টির গতি রোধ করিতে পারে নাই।

মানবের দুঃখবোধে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম। এই দুঃখবোধ বৈজ্ঞানিক উদার দৃষ্টির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যে বিশ্বপ্রেমের সৃষ্টি করিয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মের সাহিত্য ও ইতিহাস তাহাতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্ম বিশ্বসেবা। বিশ্বের জীবজন্তু কেহই এই সেবার মহোৎসব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সৃষ্টির প্রতি পরমাণু জাগতিক বিধানে নির্দ্দিষ্ট অভিব্যক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। কাহারও গতিরোধ করিও না, কাহারও হিংসা করিও না। মুহূর্ত্তেই আঘাতে বিশ্বে দ্রোহ উপস্থিত হইবে, জীবনপথ কণ্টকিত হইবে, বিশ্বের দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। দুঃখ ধ্বংস করিতেই গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব। এই সহৃদয়তা বৌদ্ধধর্ম্মকে গভীর করুণরসে আপ্লুত করিয়া বাঁধিয়াছে। তাহাতে মানবত্বের ও মানবমহত্ত্বের যে মোহিনীমূর্ত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা চিরকাল মানবজাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার আদর্শ হইয়া থাকিবে।

কেহ কেহ "দুঃখবাদ" বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অপবাদ দিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, দুঃখবোধেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও মহত্ত্ব। মানবত্বের কল্যাণ মূর্ত্তি দুঃখবোধেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানের ফল অতৃপ্তি ও দুঃখবোধ। যিনি যত জ্ঞানী তিনি তত দুঃখী। অথবা যাহার দুঃখবোধের শক্তি যত বেশী তিনি তত জ্ঞানী। সক্রেটীস জ্ঞানের উপাসক, সক্রেটীস অতৃপ্ত। কোম্‌তে জ্ঞানী, তিনি মানবদুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ "বুদ্ধ"—মানবের দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত এবং সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত। ভারতবর্ষ একটা বৃথা সুখের প্রলোভন মানবজাতির সমক্ষে উপস্থিত করে নাই। তাহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মানব-দুঃখের মহাসঙ্গীত এবং প্রাচীনতম দর্শনের প্রারম্ভ দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বিশিষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব যেখানে সেখানে এবং যখন তখন হইতে পারে না। ইহার পশ্চাতে ধর্ম্মজীবনের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি থাকা আবশ্যক। এই ধর্ম্ম গৃহীত ও প্রচারিত হইতে বিশিষ্ট দেশ কাল ও পাত্রের আবশ্যক। যে দেশ মানবের সকল ধর্ম্ম, সকল আশা ও সকল কল্পনাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া মানবজাতির উন্নতির সহায় হইয়াছে, একমাত্র সেই দেশেই ইহার আবির্ভাব ও প্রথম প্রচার সম্ভব হইয়াছে। সেই চিরকল্যাণময় দেশেরই গভীর ধর্ম্মজীবনের স্পর্শ-যোগ্য অংশের উপর ইহার মহান্ সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিজ জন্ম-ভূমিতে এই ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারিল না। পিতৃদ্রোহী রাজপুত্রের ন্যায় স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাহাকে বৈদেশিক উপনিবেশে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে! ভারতবর্ষে তাহার নামগন্ধ লুপ্তপ্রায়! কোটী কোটী ভারতবাসী একদিন যে জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল, অতীতের কোন্ অন্ধতম গুহায় তাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। বিজ্ঞানের নূতন আলোকে জ্ঞানের দিক্‌পরিবর্ত্তন হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বৎসমাজ অজ্ঞেয়বাদ, ধ্রুববাদ, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদের প্রতি অনুরক্ত। সে দেশে একটা প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবাদের অভ্যুত্থান অপ্রত্যাশিত নয়। কোম্‌তের "মানবত্বের ধর্ম্মে" তাহারই সূচনা দৃষ্ট হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট সমধিক আদরণীয় ও সম্মানিত হইতে পারে। ভারতবর্ষেও বৌদ্ধ আদর্শ শিক্ষিতজনের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের মনীষিগণ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিতও হইয়াছেন। ভারতের ইতস্ততঃ যে সেবাব্রতের উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে শ্রীগৌতমবুদ্ধের লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাব তাহাতে গতিশক্তি প্রদান করিতে পারে।

মানবমহিমার মানদণ্ডস্বরূপ, জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, বিশ্বপ্রেম ও কর্ম্মময় জীবনের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ ভগবান্ বুদ্ধের দেব-জীবন

ভারতবর্ষের চিরউপাস্য আদর্শ। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্মের যতটুকু ভারতের সনাতন আদর্শের সহিত একসূত্রে গ্রথিত, ততটুকু রক্ষিত ও জাতিহৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষে তাহার বিলুপ্তির মূল কারণ। তাহার বর্ত্তমানপ্রিয়তাই তাহাকে ভারতের অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেয় নাই এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনীয়তা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। যাহা বিশিষ্ট তাহা আংশিক—তাহা অসম্পূর্ণ। দেশকাল-পাত্রদ্বারা তাহা সীমাবদ্ধ। মানবত্বের সমগ্রতার, অনন্ত সম্প্রসারণতার স্থান তাহাতে নাই।

ভারতবর্ষ চাহিয়াছে ভূমাকে, পূর্ণতাকে, প্রজ্ঞা ও প্রকৃতির সম্মিলিত মানবত্বকে, সমস্ত বৈশিষ্ট্য গ্রাস করিয়া সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের বিশ্ব-মানবকে। বৈশিষ্ট্যের অধিকার সেখানে স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষ বেদ-বেদান্তের দেশ, আত্মা-পরমাত্মার দেশ। সে দেশের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ জগতের পশ্চাতে এমন এক বৃহত্তর জগতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, যাহার দর্শনে হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়—সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। এই বৃহত্তর জগৎ মানবের প্রত্যক্ষের অতীত—অতীন্দ্রিয় হইলেও তাহা ধ্রুব, নিত্য ও সনাতন। ইহা তাহার কল্পনার আশ্রয়, ধ্যানের বিষয়, আশার চরম লক্ষ্য এবং জীবনযানের শেষ গন্তব্যস্থান। কর্ম্মের জগৎ, নীতির জগৎ, বিজ্ঞানের জগৎ কিংবা লীলার জগৎ তাহার কাছে চরম সত্য নয়—মানব-জীবনের শেষ কথা নয়।

পদ্মের জীবন-নাট্য। *

(শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ)

"ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুটেছে।
ঐ যে মধু আশে, উড়ে এসে ভ্রমরা সকল জুটেছে।
(রসিক মন)।
রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন বসে ভুলে যায় ;
রসের কুল কিনারা, পায় না তারা, যারা রসে মেতেছে।
(রসিক মন)।
এ কমল যেমন তেমন নয়, ফুটলে পরে দিনে রেতে এক ভাবেতে রয় ,,
যে জন যত ঘাঁটে, তত ফোটে, মধু উড়ে তার কাছে।
(রসিক মন)।
ফিকির চাঁদ রসের কথা কয়, এ রস পেয়ে না যায় ভুলে, এমন কেহই নয় ,
এ রস রসিক বিনে, ভেবে মনে, বোঝে এমন কে আছে।
(রসিক মন)।"

—৺কাঙ্গাল হরিনাথ।

মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, শেষ নাই, সীমা নাই, চারিদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোন্ দেশের পারে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিম্নে সীমাহীন সবুজ রঙের বিচিত্র বর্ণ-ভঙ্গিমা কাঁচা, তাজা সবুজের সতেজ নবীনতা হইতে গাঢ়তম সবুজের ধূসর গাম্ভীর্য্য পর্য্যন্ত রেখায় রেখায় আপনার সত্তা ফুটাইয়া স্পন্দিত, উচ্ছ্বসিত, আকুলিত হইয়া দূর দূরান্তরে মিলাইয়া গিয়াছে। সবুজ সে আপনাকে বহু করিয়াছে কারণ সে পৃথিবীর ; সে বিচিত্র, সে চঞ্চল। সে আপনার আনন্দ-হিল্লোলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আপনাকে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বিকাশে প্রস্ফুটিত করিয়াছে। আকাশ সে আকাশেরই, বিচিত্র-বহুকে আপনার দিকে

---

* শাঁখারিটোলা 'ইয়ংমেনস্ ইউনিয়নে' পঠিত।

টানিয়া এক করিতেছে কারণ উপরে সকলেই চাহিয়া থাকে, মাথা তুলে। সে শান্ত, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন; সে উদার, গম্ভীর কারণ সে অদ্বৈত—সবুজের বর্ণহিল্লোল স্তব্ধনেত্রে ধ্যান করিতেছে। সবুজ বিচিত্র, চঞ্চল, উচ্ছ্বসিত, প্রবাহিত কারণ সে সুন্দর, তাই সে আকাশের দিকে আপনার চাঞ্চল্য প্রসারিত করিয়া দিতেছে। অদ্বৈত ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলনের মাঝে বায়ুতরঙ্গ অবাধগতিতে চলিয়াছে, কারণ সে মঙ্গলময়, মুক্ত স্বাধীনতার উদ্দাম উচ্ছ্বাস। আকাশের গায়ে চিত্রিত গাঢ়তম হরিৎবর্ণের চক্রবালরেখায় গিয়া আমাদের কল্পনা থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ঢালু আকাশের ঘেরাটোপের ধারে সবুজ গাছের সারি অনন্ত জিজ্ঞাসার যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে। বাতাসে বাতাসে, ফুলে, ফলে, পাখীর কণ্ঠে, মানুষের হৃৎস্পন্দনে "কেন", "কি" ও "কোথায়" রাগিণী গভীর ও করুণভাবে বেদনায় বাজিয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যাসূর্য্যের বর্ণ বৈচিত্র নীল ও হরিৎবর্ণের মাঝে বিদায়ের অশ্রুজল আঁকিয়া দিয়া গেল।

গ্রামপ্রান্তে ঘন গাছের মাঝে সরোবরের চারিধারে বড় বড় গাছের সারি জলের বুকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শত শত বাহুবেষ্টনে ভালবাসার অন্তঃপুর রচনা করিয়াছে। তাদের ছায়ার মাঝে মায়ায় ঘেরা অতীত দিনের বিচিত্র গাথা সুপ্ত হইয়া আছে। হাওয়া লাগিলেই তারা হু হু করিয়া উঠে। গাছেদের ফাঁক দিয়া মাথার উপর নীল আকাশ আর চারি পাশে ধূ ধূ করা সবুজ মাঠ দেখা যায়। এখানে আলোছায়ার কোলাকুলি—সুখদুঃখের গালাগালি। সরোবর ছাইয়া পদ্মফুলের গাছ—কেউ ফোটে, কেউ লুটে, কেউ ঝরে, কেউ মরে।

সরোবরের পাশ দিয়া হাটের পথে কত লোক আসা যাওয়া করে—কেউ বা উদাস মনে গাহিতে গাহিতে যায়, কেউ বা কাঁদিয়া চলিয়া যায়, কেউ বা হাসে, কেউ বা চুপ কিন্তু আসা যাওয়া করে সকলেই। হাটের দিনে গরুর গাড়ির সারি যখন ক্যাঁচ্‌ ক্যোঁচ্‌ করিয়া চলিতে থাকে তখন চাষাদের মুখর কোলাহলে চারিদিক ধ্বনিত হইয়া উঠে।

কৃষক বালিকাদের চঞ্চল চরণের আঘাতে ধূলি উড়িয়া ঘাসের রঙ্ ধূসর হইয়া যায়। কাল' কাল' নধর ছেলে মেয়েগুলি ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়; মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ বা বকিতে বকিতে যায়, কেউ বা পিছাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যায়; কিন্তু আসে যায় সকলেই; ধূলিও উড়ে, কোলাহলও ধ্বনিত হয়।

একদিন চারিদিক ঘনাইয়া ঘোর করিয়া আসিয়াছে। বাদল সন্ধ্যায় বর্ষার ঝরঝর, দমকা বাতাসের আঘাতে পাতায় মরমর। নিঝুম বর্ষাসন্ধ্যায় ঝিল্লি ও ভেকের একটানা তীব্র স্বরের মধ্যে একটা অলসতা গভীরভাবে বাজিতেছে। সরোবরে পদ্ম ত ফুটেছে অনেক— হাওয়ার তালে জলের বুকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্থির হইয়া উঠিতেছে আর পদ্মপাতার জলাংসে তু' অতি তরল, আছে কেবল টুপ্ টুপ্ টুপ্ শব্দ। ধ্বনিতেই পর্য্যবসিত সব। সকল ক্ষুদ্র জীবনের গানের ঝঙ্কার বৃহতের ওঁকারে পরিণত হইতেছে। এক কোণে এক পদ্মকুঁড়ির বুকের ভিতর কিসের কোলাহল লাগিয়া গিয়াছে! রূপ, রস, গন্ধে মিলিয়া আসর বসাইয়াছে। গন্ধ তখন চঞ্চল হইয়া বলিতে লাগিল, "পাপ্ড়ি ভাই! খোল', তোমার হৃদয়! ঐ যে আকাশ থেকে জলের ধারা, আহা! সে কত দূর দেশের, অসীম জীবনের রসধারা বহিয়া আনিতেছে! একবার বুক খোল', অনন্তকে ধর! আমায় মুক্তি দাও, আমি এ বর্ষার মাতামাতির মাঝে আপনাকে ছাড়িয়া দিই! ঐ শোন' গোঁ গোঁ করিয়া বাতাস আমায় ডাকিতেছে! আমি কোথায় কতদূরে মুক্তপ্রাণের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া বহিয়া যাইব! খোল' ভাই! খোল', তোমার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দাও!" পাপ্ড়ি ঘাড় নাড়িয়া দিল। ভোঁ করিয়া ভ্রমর উড়িয়া গেল। রূপ ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "গন্ধ! অত যাই যাই ক'র না, আমার বুকে লাগিয়া থাক'! তুমি চাও মুক্তি নিজের মঙ্গলের জন্য, আমি চাই মুক্তি বিশ্বের জন্য! দেখ', তুমি ত ফুলের বাহুল্য! বাহুল্যই জগতের ঐশ্বর্য্য আর ঐশ্বর্য্য সকলের চেয়ে বড় সম্পদ্ কারণ সে অনাবিল আনন্দের বিকাশ! তাইতে সকলের মায়া! বলে না "নাতির নাতি স্বর্গে বাতি"? তুমি স্বাধীন কারণ মঙ্গলময়, আমি স্বাধীন

কারণ আমি সুন্দর! আমি ফুলের ফোটানোটাই সার্থক করিয়া তুলি! দেখ', তুমি গুণ আর আমি রূপ! রূপ গুণের সমাবেশই কি ভাল নয়?' লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন হ'লেই মধুর হয়! দেখ', রূপ না হ'লে শুধু গন্ধে কি বিশ্বকে বশ করা যায়? যেখানে রূপ আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া উঠে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে আপনাকে জাগাইয়া তুলে সেইখানেই তুমি আসিয়া জোট'! আমিও রূপ ছাপিয়ে রাখিতে পারিতেছি না! আমিও চাই মুক্তি, পাপ্‌ড়ির গায়ে আঘাত করচি যদি খুলে যায় কিন্তু ভয় হয় পাছে উবিয়া যাও!"

গন্ধ—"দেখ' রূপ! আমি ত' তোমার বুকে টল্‌টল্ করিতে থাকি কিন্তু কোথা থেকে পোড়া বাতাস এসেই যে আমায় নিয়ে যায়। তুমি ত' একটা ভাব ফুটিয়ে বিশ্বের আনন্দ-সাগরে ভেসে ওঠ। তোমার ও বিকাশের মাঝে একটা ব্যাপ্তি, একটা জাগরণ, একটা স্পন্দন জাগিয়া ঝরিয়া পড়ে! তুমি বিশ্বের বিয়োগান্ত নাটক? পরিবর্ত্তনের ব্যথাভরা মহাযাত্রার মধ্য দিয়া তুমি অনন্তকাল চলিতেছ' কিন্তু আমারও ত ভাই আমার উপর হাত নেই! আমি মনে করি থাকি কিন্তু বাতাস আসিয়া কার মঙ্গলের জন্য আমায় টানিয়া নেয়! আমি সব ভুলিয়া নাচিয়া চলিয়া যাই!" ভোঁ ভোঁ করিয়া ভ্রমর আসিয়া বলিল, "তা বৈ কি! একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেল', পাপ্‌ড়ি খুলিয়া যাক্, আমি একটু মধু খাই!"

রস গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'চুপ্ কর'! বড় গোলমাল হচ্চে! তুমি গন্ধ, তুমি রূপ, তোমাদের বাইরে তোমরা আপনাদের সত্তা বিকাশ করিতেছ'! কিন্তু সকলের পিছনেই আমি আছি! গন্ধ, তোমার গন্ধের চাঞ্চল্যে আর রূপ, তোমার রূপের প্রস্ফুটনে আমি স্থির, গম্ভীর, নিত্য, অদ্বৈত! তোমরা যে বিচিত্র, বহু সে শুধু আমারি করস্পর্শে! অন্তরের রসে ভরপুর না হ'লে ত' পাপ্‌ড়ি খুল্‌বে না। অন্ধকারে চুপে চুপে এই কুঁড়ি রসের স্পন্দনে ফুল হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে! কুঁড়ি যখন রসে টলমল্ ক'র্‌বে তখন আপনিই ফুল হ'য়ে ফুটবে, বুক খুল্‌বে! মানুষের বয়সের যে তফাৎ সে শুধু রসের তারতম্যে! হৃদয়

যখন রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তখনই সকল অঙ্গে তাহার পূর্ণ জোয়ার আসে। দেখ', কুঁড়িতে আর ফুলে বিশেষ তফাৎ নেই! কুঁড়ির ভিতর যখন রস গভীর হয় তখনই ফুল ফুটিয়া ওঠে! ফুলের ফোটা তখনই সার্থক হয়! রসের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা বদ্ধ! ফুল ফুটলেই ত গন্ধ উড়িয়া যাইবে, রূপ ঝরিয়া পড়িবে। ফুল হওয়া পর্য্যন্ত এই যে ফুলের এখনও-যা-হয়নির ধীবগতি ইহাই ত' সৃষ্টিরহস্য! ফুল হওয়াটার পরই পূর্ণচ্ছেদ; রূপ, গন্ধ গিয়া তখন বিশুদ্ধ রস জাগিয়া থাকে, বিশ্বের মনের ভিতর ফুলের বিচিত্র রস সৃষ্টি করিতে থাকে! বস্তু যায়, স্মৃতি থাকে! ফুলের আরম্ভে রস, অন্তে রস, প্রস্ফুটনে রস, রস তার সকল অঙ্গে, হৃদয় ভিতরে, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত ভাবটা ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করে! ঐ প্রয়াসই বিশ্বের আদি ও একমাত্র লীলা! ঐ ইচ্ছাশক্তিই বিরাট ভগবানের বিচিত্র মূর্ত্তির প্রকাশ—সেইজন্যই এত ঠাকুরের পূজা! তাই ফুল তুলিয়া দেবতার পায়ে দেওয়া হয়! তাই ভক্তিরসে যখন হৃদয় ভিজিয়া যায় তখন হৃদ্‌পদ্মাসনে দেবতা আসিয়া বসেন! রস চায় আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে রূপ, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের বিকাশে; আপনার আনন্দ-হিল্লোলকে বহুধা করিয়া চারিদিকে প্রসারিত করে।"

"টুপ্ করিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টিজল পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া ভিতরে পড়িল। গন্ধ শিহরিয়া উঠিল, রূপ উদাস হইয়া রহিল। রস চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমারি মধ্যে কেবল একটা ফুটিবার আকাঙ্ক্ষা! কোথা হ'তে এ আকাঙ্ক্ষা আসিতেছে তা ত' বুঝিতে পারি না! অনন্তকাল ধরিয়া সকলের পিছনে আমি বাহিরকে বিকশিত করিতেছি! এই যে বাহিরের বিকাশ—আমার মধ্য হইতে, আমার ভিতর দিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে, না আর কারুর ভাবের ছায়া আমার মধ্য দিয়া প্রস্ফুটিত হয়? এই ত' পদ্ম রূপে, গন্ধে ফুটিয়া উঠিবে, এই পদ্মের ছবি আমার ভিতর ছিল, না আর কারুর ভাবের ছায়া? কিন্তু আমি ত' স্থির হইয়া বসিয়া এই ফুলকে ফুটাইতেছি! আমার এ স্থৈর্য্য, এ অটল গাম্ভীর্য্য, এ অসীম ধ্যানস্থভাব কে আনিয়া দিল?"

এক ফোঁটা বৃষ্টির জল অনন্তের বিপুলতা তার বুকের মধ্যে পুরিয়া পদ্মর কুঁড়ির ভিতর আকুল করিয়া তুলিল। রূপ অন্ধকারে ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল; ফুটিবার আনন্দে আপনহারা হইয়া কল্পনায় কোথায় চলিয়া যাইতেছে:—"এই বিশ্বের রূপ-বৈচিত্র্য অনন্তকাল ধরিয়া নব নব পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কেবল যে ফুটিয়া চলিয়াছে সে কার প্রভাবে? এই যে রূপ হঠাৎ ফুটিয়া উঠিতেছে, বিকাশের আনন্দে সমস্ত হৃদয় হিল্লোলিত হইতেছে এ রূপ কোথা হইতে আসিল? এই যে নীরবে আপনার সমস্ত কর্ম্মচাঞ্চল্যকে এক কেন্দ্রে আনিয়া একটা ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সাধনা এর আনন্দটাই কি প্রতিদান? আমি যে ছড়াইয়া গিয়াছি—অসীম, অনন্ত, বহুদূর, বহুদূর, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, চারিদিকে আমার যে বিপুল প্রসার! বাহিরে, অন্তরে, অঙ্গে, মনে, সর্ব্বজীবের সকল রকম বিকাশে আমার উচ্ছ্বাস কি আবেগভরে আমায় নাড়া দিতেছে! আমি এ ফুলের মধ্যে যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু বিশাল বিশ্বসৌন্দর্য্যের এক কণা! আমি ফুটিব, ঝরিব, তারপর—"

বাতাসভরে পদ্মকলিকা দুলিয়া উঠিল, চারিদিকে জল ঝরিয়া পড়িল। ভোমরা তখন ভোঁ ভোঁ করিয়া উড়িতে লাগিল। বাহিরে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বাদল সন্ধ্যার ঝিল্লির একটানা তীব্র সুর তরবারির মত অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়া যাইতেছে। সরোবরের চারিপাশে ভেকের মকমকি অলসভাবে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গন্ধ তখন কুঁড়ির অন্ধকারে বসিয়া বাতাসের কথা ভাবিতেছে, "হায়! যদি একবার খোলা পাইতাম উড়িয়া যাইতাম, বাতাসের বুকের উপর দিয়া কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতাম! কত প্রান্তর, কত পর্ব্বত, কত গ্রাম, কত নগরের উপর দিয়া চলিয়া যাইব! আমি ত' কোনও রূপবিশিষ্ট নই কিন্তু যার রূপ আছে সেই যে আমায় বুকে করিয়া ধরে! তার দেওয়া নেওয়া শেষ হ'লেই আমি উড়ে যাই! এ সংসারে দেওয়া নেওয়া মিট্‌লেই ব্যস্! আমি ত উড়ি, রূপ ঝরিয়া পড়ে! ভাব চলিয়া যায়, ছাপ থাকে! আমায় ত' কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে না আমি শুধু অসীমে নাচিয়া চলিব! সেই নদীতীরে কত

ফুলের রাশি ফুটিয়া আছে, জলে ভাসিয়া যাইতেছে! মনে পড়ে এক দিন ফুলের গাছের ফুলের গন্ধের সঙ্গে যখন আমার মিল হ'ল তখন কত কথা মনে প'ড়ে গেল'—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ফুল কুড়ুতে আসৃত, তাদের সাজিভরা ফুলের রাশি বাতাসে কাঁপিয়া উঠিত! কে একজন একগাছা ফুলের মালা একটী মেয়ের গলায় পরিয়ে দিলে! দূর হ'ক বাতাস যে আমায় দাঁড়াতে দেয় না, উড়িয়ে নিয়ে চল্ল'! পালতোলা নৌকাখানি শাঁ শাঁ করিয়া চলিয়াছে! সন্ধ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন! একটী ছোট মেয়ে তাই দেখিতেছে আমি তার চুলের রাশি কাঁপাইয়া পালে গিয়া আঘাত করিলাম, পাল কাঁপিয়া উঠিল! একদিন সাঁঝের বেলায় হু হু করে বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে চ'লে আস্‌চি! ঘাটের পথ বড় পিছল! একজন কিশোরী কলসীকক্ষে চলিয়াছে! চেন' চেন' বলিয়া বোধ হইল! ওহোঃ। একেই একদিন দেখেছিলুম! এর গলাতেই কে একজন মালা পরিয়ে দিয়েছিলো! দেখ্‌তে তখন ফুটফুটে ছিল! এখন ত মুখ শুকিয়ে গিয়েছে! কোনও অলঙ্কার, আভরণ নেই! ঘাটের উপর বসিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল! জল লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছে! দেহের ভার আর বইতে পারে না! এমন সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল! কলসী ভাঙ্গিয়া গেল! "মাঃ" বলিয়া একটা বুকফাটা তপ্তশ্বাস বাতাসে মিশিল! উঃ, কি গরম! কি জ্বালা! এমন সময় দূরে কে গেয়ে উঠ্‌ল'—

ওমন! ওপারেতে আঁধার হ'ল
মেঘ রয়েছে জমে!
ওতুই, এপারেতে অবাক্ হ'য়ে
রইলি কেন থেমে!

বোঁও করিয়া এক দমকে বাতাস সাবিয়ে নিয়ে গেল! তার কাণের কাছে পারের ডাক হুহু করিয়া শুনাইয়া দিলাম!"

সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে যখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। শোঁ শোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক দমকে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিতেছে। ঝমঝম্ করিয়া বৃষ্টি

পড়িতেছে ঝিঁঝিঁদের ঝিল্লিধ্বনি সুরের ছায়াপথ রচনা করিয়া অনন্তধ্বনিতে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। ভেকেরা মক্‌মক্‌ করিয়া গল্প ভাঙ্গাইয়া ফেলিতেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন থম্‌থম্‌ করিতেছে। একটা কিসের অব্যক্ত বেদনা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। আজি এ ভীষণ অন্ধকারে ভীষণকায় কে যেন কার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। নিঝুমতা আরও গাঢ়, গভীর ও উৎকট হইয়া উঠিল। এমন সময় টোকা মাথায় দিয়া হাটের পথ দিয়া চাষা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। চারিদিক স্তব্ধ হইয়া আপনাদের ধ্যানে আপনারা মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল।

ওতার বয়ান যখন পড়ে মনে
　　　　নয়ান ভাসে জলে!
ঘাটের পথে আনাগোনা
　　　　সন্ধ্যে হ'য়ে এলে!
এই সাঁঝের বেলায়,
　　　　গাছের তলায়,
কি জানি কোন্ অঘোর খেলায়
　　　　থেকে থেকে শিউরে উঠি
　　　　　　　　মনে পড়ে গেলে!
কেঁদে কেঁদে বইছে হাওয়া,
শেষ হ'ল না নেওয়া দেওয়া
আঁধার পথে আছি ব'সে
　　　　জোনাকি পোকা জ্বলে!
হায় রে হায়!
　　　　বাদল যখন আসে নেমে
　　　　দাঁড়িয়ে থাকি থমকি থেমে!
　　　　হু হু হু দমক দিয়ে
　　　　　　　　কান্না কেবল তোলে!

জ্ঞানলাভের বিভিন্ন উপায়।

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি এল)

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে উপায়ে জ্ঞানলাভ করা হয় তাহাকে প্রধানতঃ পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তি ও পরীক্ষা এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। কোন জিনিষ সাধারণভাবে দেখা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভাবে দেখা উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। এই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভাবে বিশেষ করিয়া দেখার নাম পর্য্যবেক্ষণ। বিশ্বের আদি যুগ হইতে দুই চারিটি লোক নানাবিধ ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া আসিতেছেন, ঐ জ্ঞান ক্রমে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী যুগের মানবসন্তান সেই সকল জ্ঞান সহজভাবে লাভ করে—তাহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কত ধৈর্য্যের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল সে কথা তাহারা ভুলিয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে—বৎসরের পরিমাণ নির্ণয়। শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা এইভাবে একটীর পর একটী ঋতুর আবির্ভাব হয়, আবার শীত ফিরিয়া আসে, মানব ইহা সহজেই লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু ঠিক কত দিন পরে এই পুনরাবর্ত্তন ঘটে তাহা প্রথমে নির্ণয় করা যায় নাই। দুই চারিজন (যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন) তাঁহারা দেখিলেন, নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থানের সহিত বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাবের একটা সম্বন্ধ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের অবস্থান সূর্য্যের বিপরীত—এক পূর্ণিমার পর দ্বিতীয় পূর্ণিমার সময় নক্ষত্র-মণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রের অবস্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সময়ের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভাবে সূর্য্য রাশিচক্রে ভ্রমণ করেন। বহু পর্য্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা নির্ণয় করা হইল যে সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে অদ্য যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন ৩৬৫ দিন পরে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসেন।

অতএব ঋতুর পুনরাবর্ত্তন বা বৎসরের পরিমাণকাল ৩৬৫ দিন। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, গ্রহদের গতি এই সকলের জ্ঞানও বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লাভ করা হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে নিউটন মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে পর্য্যবেক্ষণ ও যুক্তি ব্যতীত পরীক্ষাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে।

পর্য্যবেক্ষণ, যুক্তি ও পরীক্ষার সাহায্যে পাশ্চাত্যজগতে অতি দ্রুতভাবে মানবের জ্ঞান ও শক্তি বাড়িয়া যাইতেছে। যে সকল অতি ক্ষুদ্র প্রাণী লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া মানবশরীরে নানারূপ রোগের উৎপত্তি করিতেছিল, অণুবীক্ষণের সাহায্যে তাহারা আজ ধরা পড়িয়াছে এবং ঔষধের দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে। লক্ষ কোটি ক্রোশ দূরে যে সকল জ্যোতিষ্ক স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কৌতূহলীনেত্রে আমাদের সূর্য্যমণ্ডলীর ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল আজ তাহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ লইয়া যাইতেছে। রেলগাড়ী মোটরকার প্রত্যহ ৫।৬ শত ক্রোশ ছুটিয়া লোকজন জিনিষপত্র এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতেছে। "এয়ারোপ্লেনের" সাহায্যে লোকে আকাশে উড়িতে শিখিয়াছে এবং আরও দ্রুতভাবে যাইতে পারিতেছে। বৃহৎ জাহাজ অসীম সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি দিতেছে। সমুদ্রে ডুবিয়া জাহাজ চলিতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন এবং জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইবেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছেন।

পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে পাশ্চাত্যজগতে জ্ঞানের রাজ্য আশ্চর্য্যভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহারা জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র উপায় নহে। যোগশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবার আর এক উপায়ের উল্লেখ আছে। তদ্গতচিত্তে কোন বস্তুর ধ্যান করিতে করিতে আমাদের হৃদয়, ঐ বস্তুতে সমাহিত হয়—ঐ বস্তুর সহিত এক

হইয়া যায়। ঐ বস্তুটি কি তখন আমরা তাহা জানিতে পারি। এই ভাবে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা বস্তুর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধেরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু এই শব্দ স্পর্শ ব্যতীত বস্তুর একটা স্বরূপ আছে। আমাদের চক্ষু যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির রূপ বলিয়া কিছু থাকিত না, কারণ, চক্ষুর সাহায্যে আমাদের মন বস্তু সম্বন্ধে যাহা ধারণা করে তাহাই রূপ। আমাদের ত্বগিন্দ্রিয় যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির স্পর্শ বলিয়া কিছু থাকিত না। এইরূপে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলি যদি না থাকিত তাহা হইলে বস্তুটির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কিছুই থাকিত না, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় না থাকিলে বস্তুটির ধ্বংস হইত না, বস্তুটি থাকিত। এই যে শব্দ স্পর্শাদি ব্যতীত বস্তুর স্বতন্ত্র অবস্থান ইহাই বস্তুর স্বরূপ। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ, যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি সেই ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিরই জ্ঞান জন্মাইতে পারে, শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অথচ মানুষের ভিতরের জিনিষ যেমন তাহার পোষাক পরিচ্ছদ হইতে ভিন্ন এবং বড় সেইরূপ বস্তুর স্বরূপ বস্তুর শব্দ স্পর্শাদি অভিব্যক্তি হইতে ভিন্ন এবং বড়।

পর্য্যবেক্ষণ, প্রভৃতির দ্বারা আমরা যে জ্ঞানলাভ করি তাহা সর্ব্বদা নির্ভুল হয় না। কারণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুটি কিরূপ দেখায়, অর্থাৎ তাহার শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কি তৎসম্বন্ধেই আমরা অব্যবহিত ভাবে (directly) জ্ঞান লাভ করি, তাহার পর অনুমানের দ্বারা স্থির করি বস্তুটি কি। মরীচিকাতে যেমন অনেক সময় জলভ্রম হইয়া থাকে আমাদের পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানে সেইরূপ অনেক সময় ভ্রম প্রমাদ হয়। মরীচিকাতে জলভ্রম হইবার কারণ এই যে দূর হইতে মরীচিকার রূপ এবং জলের রূপ এক। জিনিষটার

স্পর্শ রস প্রভৃতি দূর হইতে গ্রহণ করা যায় না; শুধু রূপই গ্রহণ করা যায় এবং সেই রূপ জলের রূপ হইতে ভিন্ন নহে। ইহা হইতে মন স্বতঃই অনুমান করিল—ইহা জল। অবশ্য যিনি বিজ্ঞ হইবেন তিনি বিবেচনা করিবেন শুধু রূপ দেখিয়াই জল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। রূপ এক হইলেও স্পর্শ রস প্রভৃতি ভিন্ন হইতে পারে। এজন্য তাঁহারা স্পর্শ রস প্রভৃতি না দেখিয়া বস্তুটী কি, তাহা সিদ্ধান্ত করিবেন না। ঠিক এই রকম যুক্তির সাহায্যে কল্পনা করা যায় যে দুইটি বস্তুর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এক হইলেও তাহারা যথার্থ এক বস্তু না হইতেও পারে। এই পাঁচটি গুণ এক হইলেও বস্তু দুইটির মধ্যে এক ষষ্ঠ গুণ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিতে পারে, যে ষষ্ঠগুণটি ধরিবার মত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমরা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করিতে পারি—সে অনুমান যে অভ্রান্ত হইবে তাহা বলিতে পারি না। ব্যবহারিক জগতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অভ্রান্ত জ্ঞান বলিয়াই মনে করা হয় কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান সব সময় অভ্রান্ত হয় না বাস্তবিক পক্ষে, ব্যবহারিক জগতে বস্তুর অভিব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব সময় আমাদের কোন সঠিক ধারণা থাকে তাহা নহে। শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধের সমষ্টিকেই আমরা বস্তুর স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ এই সকল শব্দ স্পর্শাদি হইতে বিভিন্ন। শব্দস্পর্শাদি আমাদের মনের ধারণামাত্র,—অর্থাৎ, আমাদের মনের নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত হওয়া—আমাদের মনের অংশ। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিত।

দেখা গেল যে পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অব্যবহিত ভাবে (directly) উপলব্ধি করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যোগশাস্ত্রোক্ত জ্ঞান-লাভের যে উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহার সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অব্যবহিত (direct) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহার জন্য বস্তুটি দেখিবার প্রয়োজন নাই, স্পর্শ করিতে হয় না—শুদ্ধ বস্তুটি চিন্তা করিতে হয়।

তাহাতে মন ঐ বস্তুটির সহিত এক হইয়া যায় এবং বস্তুর স্বরূপ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এরূপ শক্তি লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। পণ্ডিচারীর উত্তরযোগী প্রণীত Yogic Sadhan নামক ইংরাজীপুস্তকে একস্থলে এই দুই প্রকার জ্ঞানলাভের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝান হইয়াছে। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে:—

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাউক তুমি একটি লোককে দেখিতেছ। তুমি জানিতে চাও সে কিরূপ লোক, তাহার চিন্তা কিরূপ, তাহার কার্য্য কিরূপ প্রভৃতি। এখন একজন বৈজ্ঞানিক অথবা ইন্দ্রিয়াপেক্ষ ব্যক্তি কিরূপভাবে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করে দেখা যাউক। সে যে লোকটীকে পর্য্যবেক্ষণ করে, সে কি বলে তাহা মনোযোগ দিয়া শোনে, তাহার কথন ও বদনভঙ্গী ভাল করিয়া দেখে, তাহার কার্য্যাবলী এবং সে কিরূপ লোকের সহিত মিশে এই সকল বিষয়ের খবর রাখে। এ সকলই বস্তুটির বাহ্যিক সত্তা সম্বন্ধীয়। তৎপরে সেই জ্ঞানান্বেষী তাহার পূর্ব্বলব্ধ বাহ্যিকজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে যুক্তি বিচার করে। সে বলে "এই লোকটা এই সব কথা বলে অতএব এর চিন্তাপ্রণালী নিশ্চয়ই এই রকমের অথবা এর চরিত্র এইরূপ ধরণের হইবেই হইবে। এর কাজকর্ম্মতো এই কথাই বলে, এর মুখভঙ্গীতেও তো ইহাই সূচিত হয়।"—এইরূপেই তাহার যুক্তিপরম্পরা চলিতে থাকে। ইহাতেও যদি সে সকল রকম প্রয়োজনীয় খবর পায় নাই বলিয়া মনে করে তাহা হইলে সে বাকীটুকু তাহার কল্পনা অথবা পূর্ব্ব লব্ধ জ্ঞানের স্মৃতির সাহায্যে পূরণ করিয়া দেয় অর্থাৎ অপর সকল লোকের সম্বন্ধে, তাহার নিজের সম্বন্ধে, অথবা মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার পুস্তকলব্ধ কিম্বা অপরের নিকট হইতে শ্রুত জ্ঞানের, যে অভিজ্ঞতা, তাহার সাহায্যেই সে এইরূপ করে। সে অনুভব, পর্য্যবেক্ষণ, বৈপরীত্যসন্ধান, তুলনাকরণ, সিদ্ধান্তানুমান, যুক্তি সাহায্যে তথ্য নির্দ্ধারণ, অনুকল্পন, স্মৃতি সাহায্যে নির্ণয় প্রভৃতি প্রথায় কার্য্য করিয়া থাকে—এবং এই সকলের একত্র সংহত ফলকেই সে

যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান অথবা শুধু জ্ঞান, প্রকৃত সত্য এই সকল আখ্যা দিয়া থাকে। ঠিক ঠিক বলিতে গেলে সে এইরূপ একটা সম্ভাব্য সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে এই কথাই বলিতে হয়। কারণ তাহার সিদ্ধান্তগুলি যে সত্য সত্যই কোনও বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য এবং তাহার পর্য্যবেক্ষণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের সাহায্যলব্ধ জ্ঞানের চিত্তন ব্যতীত যে আরও কিছু, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব।

এখন যিনি যোগী তিনি কিরূপে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করেন দেখা যাউক। তিনি একেবারে আপনাকে জ্ঞেয় বস্তুটির যথার্থ স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ করেন। তিনি হয়তো তাহার আকার কখনও চোখে দেখেন নাই, নামও শোনেন নাই অথবা তদ্বস্তুগত কোনও বিশিষ্ট গুণের অভিজ্ঞতাও হয়তো তাঁহার নাই কিন্তু তবুও জিনিষটি কি বুঝিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। কারণ, তাঁহার স্বরূপ সত্তা যাহা তাহার সহিত উহাও যে (অখণ্ড) একরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি (যোগী) যে লোকটিকে অথবা যে বস্তুটিকে বুঝিতে চাই তাহার সহিত আমাকে, আমার আত্মাকে বিশেষ সম্বন্ধ করি। আমার যে প্রজ্ঞা তাহা অপর লোকটির অথবা বস্তুটিরও প্রজ্ঞা হইয়া উঠে। আচ্ছা, কি উপায়েই বা আমি এইরূপ করিয়া থাকি? উত্তরে বলা যায় যে কেবল স্থির হইয়া সেই ব্যক্তি বা বস্তুটিকে স্বায় বুদ্ধিতে প্রণিধান দ্বারা। যদি আমার বুদ্ধি একেবারে সম্পূর্ণ পবিত্র অথবা বেশ কতকটাও—পবিত্র হইয়া থাকে, যদি আমার মন শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি জ্ঞেয় বস্তুটির সম্বন্ধে সত্য কি তাহা বুঝিতে হইব সমর্থ।

(২১ হইতে ৩ পৃঃ)

এই রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা গঠিত স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র যে একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহা দার্শনিকগণ বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানলাভ করা অতি দুরূহ কারণ, এই সূক্ষ্ম শরীর আমাদের চক্ষু ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এজন্য

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পরিচিত পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি উপায় ইহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হয় না। কোন্ চিন্তার পর কোন্ চিন্তা আসিয়া পড়ে, কোন্ অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখা যায়—এই সকল লক্ষ্য করিয়া অনুমানের সাহায্যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মানবের অন্তর রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করেন। কিন্তু এই উপায়ে অন্তর রাজ্যের সমস্ত খবর পাওয়া যায় না, যে সকল খবর পাওয়া যায় তাহার সকলই আবার নির্ভুল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, আত্মা সম্বন্ধে বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকের ধারণা অত্যন্ত অনিশ্চিত ছিল। এই স্থূল দেহ ব্যতীত যাহা কিছু সকলই আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই আত্মাকে তাঁহারা কখনও mind বলিয়াছেন, কখনও soul বলিয়াছেন; ইচ্ছা করা, অনুভব করা, জ্ঞান লাভ করা সকলই আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। হিন্দু দার্শনিক এই অন্তর রাজ্য বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মধ্যে নানা বিভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াছেন—যথা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। ইহারা সকলেই আত্মা হইতে বিভিন্ন এবং জড় পদার্থমাত্র। হিন্দু দার্শনিক যোগপ্রভাবে এই সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন—অনুমানের সাহায্যে নহে, এজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত বিশদ ও নির্ভুল। জন্ম, মৃত্যু, পরলোক, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। কারণ, এই সকল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার উপাদান পাশ্চাত্য দার্শনিকের পক্ষে অতি সামান্য। শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে।

মানবের অন্তর রাজ্যের জ্ঞানলাভে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তি যদি অনুপযোগী হয় তাহা হইলে যে অবাঙ্মনসোগোচর পরম পুরুষ অচিন্ত্যনীয় কৌশলে এই বিশাল জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয়ে এই পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-যুক্তি পদ্ধতি যে একান্ত অসমর্থ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় না হইলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চলে না। কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন,—অথবা দিব্যদৃষ্টি না পাইলে তাঁহাকে দেখা যায় না—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি

ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ", "যন্মনসা ন মনুতে", "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যই তাহার প্রমাণ। ভগবান্ যুক্তিরও একান্ত বাহিরে, তর্ক ও যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া।"

যেমন পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না, সেইরূপ আমাদের মন বুদ্ধি দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কারণ, মনের শক্তি যতই বাড়ুক না কেন, তাহার একটা সীমা থাকিবে, কিন্তু ভগবান্ অসীম। সসীম মনের দ্বারা অসীম ভগবান্‌কে কিছুতেই আয়ত্ত করা যায় না। ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে মনেরও পারে যাইতে হইবে—সসীমের রাজ্য ছাড়াইয়া অসীমের রাজ্যে যাইতে হইবে। এই অবস্থা একমাত্র মনের নিরোধ দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে এবং মনের নিরোধের নামই যোগ। "যোগাশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।" কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ করিবার যথার্থ উপায় তাঁহার অনুগ্রহ। ভগবানের অনুগ্রহ হইলে যোগ অভ্যাস না করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়, কিন্তু অনুগ্রহ না হইলে শুদ্ধ যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। শ্রুতি বলিতেছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।" তবে দেখা যায়, যাহারা তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তিনি তাহাদের প্রতি কৃপা করিয়া দেখা দেন।

অতএব আমরা জ্ঞানলাভ করিবার তিনটি উপায় দেখিতে পাইলাম। (১) পর্য্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-যুক্তি। স্থূলজগতের পক্ষে ইহা উপযোগী। যদিও এই পদ্ধতিতে অভ্রান্তরূপে পদার্থের তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না, তথাপি ব্যবহারিক জগতে ইহার খুব উপযোগিতা আছে। যে জ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের নানারূপ সুবিধা সৃষ্টি, ও প্রকৃতির উপর মানবের অধিকার বিস্তার সে জ্ঞানলাভে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্ম জগৎ ও ভগবৎতত্ত্ব নির্ণয়ে ইহা একান্ত অসমর্থ। (২) যোগাভ্যাস। স্থূল জগতের তত্ত্ব নির্ণয়ের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপযোগী; অধিকন্তু সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। (৩) ভগবানের অনুগ্রহ। ইহাই ভগবান্ লাভ করিবার

একমাত্র উপায়। শুদ্ধ তাহাই নহে, ইহার দ্বারা কি স্থূল জগৎ কি সূক্ষ্মজগৎ সর্ব্ববিষয়ে চরম জ্ঞান লাভ করা যায়। কারণ, ভগবান্‌কে জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না।

যস্মিন্ "বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

গুরুগৃহে শঙ্কর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(শ্রীমতী—)

উপহার লইয়া গুরু সন্নিকটে যাইতে হয়, একথা বিশিষ্টাদেবীর অবিদিত ছিল না। তিনি পরিচারিকা হস্তে সমিধ, কুশ অজিন, বস্ত্র এবং গুরু পূজার উপকরণাদি সমস্তই দিয়াছিলেন। মুণ্ডিতমস্তক সদ্যউপনয়নসংস্কৃত, কৌপীনধারী বালক শঙ্কর বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে যাইতেছেন। জ্ঞানালোক লাভের আনন্দে তাঁহার চিত্ত পরম প্রফুল্ল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ অপরিচিত স্থানে শিক্ষকের কঠোর শাসনাধীনে থাকিতে হইবে এ চিন্তা বালকের হৃদয়ে একবারও স্থান পাইতেছে না। তিনি ইহাতে তিলমাত্র চিন্তিত বা ভীত নহেন, মায়ের অদর্শন দুঃখও তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিতেছে না। তিনি সানন্দে সোৎসাহে দ্রুতপদসঞ্চারে পথ চলিতেছেন। পরিচারিকা দ্রব্যসম্ভার মস্তকে লইয়া দ্রুতগমনে অক্ষম হইয়া মধ্যে মধ্যে শঙ্করকে ধীরগমনে অনুরোধ করিতেছে।

শঙ্কর প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি সমাপন করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কোনপ্রকার উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ক্রমে দিনমণির দ্বিপ্রহর লক্ষণ প্রকাশ হইল। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রতাপ ক্রমে অনুভূত হইতে লাগিল। পথও বড় অল্প ছিল না এবং পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পক্ষে সে পথ অতিক্রম করা

সহজসাধ্য নহে। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইলেও, প্রভাকরপ্রভায় তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বদনকান্তি অরুণবর্ণ ধারণ করিল, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। যেন জ্ঞানরাজ্যে প্রভাতকাল সমাগত, এবং তথাকার নবদূর্ব্বাদল-সমাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নিশাশেষের শিশিরবিন্দু নিচয় উদীয়মান জ্ঞানসূর্য্যের অরুণ কিরণে ঝলমল করিতেছে!

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইতে না হইতেই পরিচারিকা দূর হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শঙ্করকে গুরুধাম প্রদর্শন করাইল। তখন সহসা শঙ্করের গতি মন্থর হইল, তিনি পরিচারিকার নিকট মাতৃপ্রদত্ত দ্রব্যগুলি যথাযথভাবে রক্ষিত কিনা একবার দেখিয়া লইলেন, এবং পরিচারিকাকে অন্য কথা না বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে জননীর বিশেষরূপ সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন। পরিচারিকাও তাঁহাকে সমুচিত আশ্বাস দিয়া বলিল, বাছা, সেজন্য কোন চিন্তা করিও না। তুমি মন দিয়া বিদ্যাভ্যাস কর এবং তোমাদের কুল উজ্জ্বল কর।

এইরূপে কথায় কথায় শঙ্কর আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমপ্রান্তে একটী সরোবর ছিল। শঙ্কর হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি হইয়া গুরু দর্শন করিবেন ভাবিয়া সরোবর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। পরিচারিকা ক্লান্তিবশতঃ আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

এদিকে দ্বিপ্রহর সন্নিকট দেখিয়া আশ্রমস্থ বালকগণ মধ্যাহ্ন স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনার জন্য একে একে সরোবরে সমবেত হইতেছিল। শঙ্কর সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যার্থী বালকগণের প্রতি কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিদ্যার্থিগণ এই অপরিচিত বালককে দেখিয়া কেহ বা তাঁহার সহিত আলাপের জন্য ইচ্ছা করিল, কেহ বা বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না। ইতিমধ্যে একটী বালক সহসা শঙ্করকে চিনিতে পারিল। সে সত্বর শঙ্করের নিকটস্থ হইয়া সানন্দে

বলিয়া উঠিল, "কি ভাই শঙ্কর এখানে কেন ? তুমি কি গুরুগৃহে আসিলে ?" শঙ্করও পরিচিত বালককে দেখিয়া সহর্ষে তাহার কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন, "ভাই আমি তোমাকেই খুঁজিতেছিলাম, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমায় গুরুদেবের নিকট লইয়া চল।" বালকটী শঙ্করের কথায় সানন্দে স্বীকৃত হইল। বহুদিন পরে একটী পরিচিত বন্ধুকে পাইয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, সে তখনই শঙ্করকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। শঙ্করের পরিচারিকাও তাহাদের অনুসরণ করিল।

বালকটী শঙ্করকে লইয়া অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইল। অধ্যাপক মহাশয় তখন অধ্যাপনান্তে ছাত্রগণকে বিদায় দিয়া নিজেও মধ্যাহ্নকৃত্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কয়েকটী বালক গুরুর আদেশ অপেক্ষায় তথায় দণ্ডায়মান, কেহ বা মঠের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পরিচারিকাসহ শঙ্করকে দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় ইহাদের পরিচয়ার্থ কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। ইতিমধ্যে শঙ্কর সসম্ভ্রমে গুরুচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণিপাত করিলেন এবং পূজোপকরণাদি চরণপ্রান্তে রক্ষা করিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মধুর বচনে তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শঙ্করকে উত্তরের অবসর না দিয়া পরিচারিকা তখন অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণামপূর্ব্বক শঙ্করের পিতা মাতার পরিচয় প্রদান করিয়া শঙ্করের বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিশিষ্টাদেবীর আগ্রহাতিশয্য ও বিনীত প্রার্থনা নিবেদন করিল।

অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করের পিতা শিবগুরুকে বিশেষভাবেই চিনিতেন। তিনি পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ বাছা, আমি ইহাদিগকে ভালরূপে জানি, আর বলিতে হইবে না। এই বলিয়া অধ্যাপক মহাশয় শঙ্করের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমিই সেই শিবগুরুর পুত্র শঙ্কর ? শিবগুরু আমার পরম মিত্র ছিলেন। তোমার দর্শনে আমি পরম সুখী হইলাম। তুমি যে শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে ইহা আমি

পূর্ব্বেই জানিতাম। তোমার অসাধারণ মেধা ও বিদ্যানুরাগের কথা আমি তোমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম। তিনি তোমায় পঞ্চম বর্ষেই উপনীত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন, এরূপ ইচ্ছাও আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক আশীর্ব্বাদ করি তুমি পিতার ন্যায় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে এবং তোমার পিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে যাও বৎসগণ স্নানাহার কর, বেলা অধিক হইয়াছে, আহারান্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া শঙ্করকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করতঃ শঙ্করের অসাধারণ চরিত্রের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতে বলিলেন। পরিচারিকা বিশিষ্টাদেবীর শিক্ষামত গুরুপত্নীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, এই বালকটী ইহার পিতামাতার বড় আদরের ধন। দেখিতে নিতান্ত বালক না হইলেও ইহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। আপনি ইহাকে পুত্রজ্ঞানে পালন করিবেন। এ বালক সর্ব্বদা লেখা পড়া লইয়াই পাগল, আহারাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাকে খাইতে না বলিলে কখন চাহিয়া খায় না।" গুরুপত্নীও সম্নেহ বাক্যে তাহাকে আশ্বাস দিলেন।

তিনি শঙ্করের প্রফুল্ল বদন, কমনীয় মূর্ত্তি এবং বিনীত ভাবে বড়ই মুগ্ধ হইলেন, বাৎসল্য স্নেহে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। তিনি সযত্নে শঙ্করের স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরিচারিকাও সেদিন সেই মঠে প্রসাদ পাইয়া অপরাহ্ণে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করের শিক্ষা আরম্ভ হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই অধ্যাপক মহাশয় বুঝিলেন এ বালক সাধারণ বালক নহেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি শঙ্করের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অদ্ভুত প্রতিভা, দেবচরিত্র, দেব দ্বিজ ও গুরুভক্তি, এবং শান্ত স্বভাবের পরিচয় পাইতে লাগিলেন। শঙ্করের সহপাঠিগণ তাঁহার বিদ্যানুরাগের জন্য তাঁহাকে খেলার সঙ্গী করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইত, কিন্তু তাঁহাকে একবার দেখিলেই সব ভুলিয়া যাইত।

শঙ্করের কোমল স্বভাবে এবং ভদ্র ব্যবহারে কেহই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারিত না।

শঙ্করের গ্রহণ ও ধারণ শক্তিও অসাধারণ ছিল। গুরু একবার যাহা বুঝাইয়া দিতেন তিনি তখনই তাহা বুঝিয়া লইতেন এবং তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। কেবল তাহাই নহে তিনি অপর ছাত্রের পাঠগুলিও একবার শুনিলেই শিখিয়া ফেলিতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শঙ্কর ইহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। কেবল আচার্য্য মধ্যে মধ্যে শঙ্করকে নূতন পাঠ দিবার সময় দেখিতেন, যে সে সমুদয় শঙ্করের অবগত ও কণ্ঠস্থ হইয়া রহিয়াছে। একদিন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া এ বিষয় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন; শঙ্করও যেরূপে তাহা অবগত হইয়াছেন বিনীতভাবে গুরুচরণে নিবেদন করিলেন। ইহাতে আচার্য্যের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক চুম্বন করিয়া অশেষ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইরূপে দিনে দিনে শঙ্কর বিদ্যালয়ের সকলেরই পরম আদরের পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিদ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বলও অসাধারণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি বয়সে নিতান্ত বালক হইলেও আকৃতি প্রকৃতিতে অচিরে যেন যুবার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। দৃঢ়তা, একাগ্রতা, গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতায় তাঁহাকে যেন মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

আচার্য্যদম্পতী শঙ্করের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু ইহাতে অপর ছাত্রগণ কেহই শঙ্করের প্রতি হিংসা করিত না। তাঁহার উদারতা, সরলতা এবং বাধ্যতা প্রভৃতি গুণে ছাত্রগণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিত, অনেক সময় তাঁহার গৌরবে তাহারা নিজেদের গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত।

গুরুগৃহে বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের অনেক কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত। নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, আহ্নিক, সন্ধ্যা, বন্দনা, অধ্যয়ন, গুরুসেবা, দ্বিপ্রহরে ভিক্ষায় গমন, দিনান্তে একবার মাত্র ভোজন, রাত্রে তৃণশয্যায় শয়ন ইত্যাদি নানা

কঠোর নিয়মের অধীন থাকিতে হয়। শঙ্কর বালক হইলেও এ সকলই যথানিয়মে পালন করিতেন। কেবল তিনি নিতান্ত বালক বলিয়া আচার্য্য ভিক্ষাপর্য্যটনাদি কয়েকটী কর্ম্ম প্রায়ই শঙ্করকে করিতে দিতেন না। কিন্তু শঙ্কর তাহাতে একটু দুঃখ অনুভব করিতেন, কারণ তাঁহার সঙ্গিগণ এ কার্য্য আনন্দে অনুষ্ঠান করিত।

এইরূপে শঙ্করের গুরুগৃহবাসে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল। এই দুই বৎসরের ভিতর শঙ্কর গুরুর যাহা কিছু বিদ্যা সমুদয়ই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইতিহাস পুরাণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ও সাঙ্গবেদ সমস্তই দুই বৎসরে তাঁহার শিক্ষা হইল দেখিয়া আচার্য্য শঙ্করকে আর যেন মনুষ্য বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। শঙ্করের শিক্ষাগুরু হইয়া তিনি নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতে লাগিলেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই দেখিলেন এক্ষণে আর শঙ্করের গুরুগৃহবাসের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্করকে পুত্রাধিক প্রিয় জ্ঞান করিতেন। তিনি তাঁহার বিদ্যার পূর্ণতার জন্য একদিন বলিলেন, "বৎস! তুমি এইবার এখানেই কিছুদিন অধ্যাপনা কর, তোমার যাহা কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা অধ্যাপনা দ্বারা তিরোহিত হইবে। অনন্তর গৃহে যাইয়া বিদ্যা প্রচার করিও।"

এই বলিয়া আচার্য্য শঙ্করকে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শঙ্কর নিত্য নিয়মিত অধ্যাপনাতে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা গুরুসেবায় রত থাকিতেন। অপর বালকের গুরুসেবার ভার তিনি নিজে যাজ্ঞা করিয়া লইতেন। গুরুর নিকটে অবস্থান, গুরুর সহিত শাস্ত্রালোচনা, গুরুর অনুগমন, তাঁহার বড়ই প্রিয়কার্য্য বলিয়া বোধ হইত। গুরুও শঙ্করকে পাইলে যেন মহান্ আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু প্রয়োজন সবই শঙ্করের দ্বারা নিষ্পন্ন করাইতেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, একদিন শঙ্করের ইচ্ছা হইল "অদ্য ভিক্ষা করিয়া গুরুকে ভোজন করাইব"। তিনি সেদিন ভিক্ষার জন্য

গুরুদেবের অনুমতি লইয়া কয়েকটী বিদ্যার্থিসহ ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন।

কয়েক গৃহে ভিক্ষার পর কিছুদূর গমন করিয়া তিনি এক দরিদ্রের কুটীরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যার্থীরা তাহা দেখিয়া কহিল, "মহাশয়! ওখানে যাইবেন না, ওখানে এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণী বাস করে, সে ভিক্ষা দিতে পারিবে না।" শঙ্কর কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বিদ্যার্থিসহ ভিক্ষার্থ সেই ব্রাহ্মণীর গৃহেই গমন করিলেন।

শঙ্কর 'নারায়ণ হরি' বলিয়া কুটীরদ্বারে দাঁড়াইলেন। অতিথিসমাগম বুঝিয়া ব্রাহ্মণী দ্বারপথে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারে বিদ্যার্থিগণসহ দেববালকসদৃশ শঙ্করকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ও স্নেহের সঞ্চার হইল। কিন্তু তখনই নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং কুটীরের চারিদিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণভাবে অতিথিগণ সমক্ষে আসিলেন।

ব্রাহ্মণী বড় দরিদ্রা, তাঁহার ভিক্ষা দিবার সামর্থ্যই নাই। পরিধানে ছিন্ন বসন। মাসের অর্দ্ধেক দিন তাঁহার উপবাসে যায়। দেহ জীর্ণশীর্ণ মলিন। তাহাতে তিনি আবার পতিহীনা অভাগিনী এবং কতকগুলি অপোগণ্ড শিশুর জননী। নিজের প্রাণপণ পরিশ্রমে এবং পল্লীবাসীর দয়াতে কোনরূপে তাঁহাদের প্রাণধারণ হয়। তাঁহারই দ্বারে আজি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার্ত্ত ব্রহ্মচারী বালকগণ!

কি সর্ব্বনাশ! কি ভিক্ষা দিবেন। গৃহে ত কিছুই নাই। কিরূপে লজ্জা নিবারণ হয়, হরি লজ্জা রক্ষা করুন, অতিথি যে ফিরিয়া যায়। অতিথি বিমুখ হইলে অধর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত কাতরভাবে দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে কেবলই ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

শঙ্কর ব্রাহ্মণীকে নীরব নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুনরায় 'নারায়ণ হরি' বলিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। ব্রাহ্মণীর হৃদয় তখন ব্যাকুল হইল, কিন্তু তখনই মনে হইল গৃহে সদ্যসংগৃহীত ধাত্রী ফল আছে। তখন তিনি ব্যস্তভাবে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি আমলকী ফল লইয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণী আমলকী ফলগুলি লইয়া শঙ্করের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাবা! আমি বড় দুখিনী, মুষ্টিভিক্ষাদানেও ভগবান আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন। আমার গৃহে এক মুষ্টি চাউল নাই যে তোমায় দেই। যাহা ছিল তাহা আমার ঠাকুরদের জন্য পাক করিয়াছি। তোমরা দয়া করিয়া এই আমলকী ফলগুলি লইয়া সন্তুষ্ট হও।

ব্রাহ্মণী এই বলিয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে শঙ্করের ভিক্ষাপাত্রে দুই আমলকী ফলগুলি দিলেন। শঙ্কর দেখিলেন, ব্রাহ্মণীর অশ্রুজলে ধৌত হইয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রে পতিত হইল।

পরদুঃখকাতর কোমলহৃদয় শঙ্কর সকলই বুঝিলেন। ব্রাহ্মণীর কাতরতায় তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং অতি কষ্টে নয়নের অশ্রুজল সম্বরণ করিলেন।

তিনি মধুর সম্বোধনে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, 'মা! আপনার স্নেহভক্তিপূত এই দানই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হইয়াছে। আমাদের গুরুদেব বড় ধাত্রীফলপ্রিয়। আপনার গৃহপ্রাঙ্গণে আমলকী বৃক্ষ দেখিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমাদের মনোবাঞ্ছা যেমন অযাচিতভাবে পূর্ণ করিলেন, ভগবান্ আপনার মনোবাঞ্ছাও তেমনি পূর্ণ করিবেন। মা! আপনি দুঃখিত হইবেন না। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে অচিরে আপনার গৃহে মা লক্ষ্মীর কৃপাবারি বর্ষিত হইবে।'

শঙ্কর এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

শঙ্করের অমৃতমাখা আশীর্ব্বচন শুনিয়া ব্রাহ্মণীর অশ্রু সংবরণ হইল। শঙ্করের দরিদ্রের প্রতি মমতা দেখিয়া ব্রাহ্মণীর মন ভক্তিপূর্ণ হইল। তিনি ছিন্নঅঞ্চলে নয়ন মুছিতে মুছিতে কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

জীবন্মুক্তি স্বরূপ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে।
প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা ॥ ৯।২৫ ॥

"বাসনা সমূহ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, শুভ ও অশুভ। হে রাম, এই উভয় প্রকার বাসনার মধ্যে এক প্রকার মাত্র বাসনা, অথবা উভয় প্রকারেরই বাসনা তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আছে? (এবং যদি এক প্রকার মাত্র বাসনাই তোমার পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতরূপে আসিয়া থাকে, তবে তাহা শুভ কিংবা অশুভ বাসনা?)

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটির মধ্যে তুমি কি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ অথবা উভয়ের দ্বারাই? এইটি (প্রথম) বিকল্প। যদি একটি মাত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে সেটি শুভ না অশুভ?"--এইটি (দ্বিতীয়) বিকল্প (তাৎপর্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে)।

বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীয়সে।*
তৎক্রমেণাশু তেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৯।২৬॥

তত্র—সেই (প্রথম) পক্ষে। যদি প্রথম পক্ষই ধর অর্থাৎ কেবল শুভ বাসনা দ্বারাই পরিচালিত হইতেছ মনে কর, তবে কেবল সেই আচরণের দ্বারাই সনাতন পদ অচিরে প্রাপ্ত হইবে।

সেই আচরণের দ্বারাই— অর্থাৎ বাসনা-প্রবর্ত্তিত আচরণের দ্বারাই অর্থাৎ অন্য প্রকার প্রযত্ন ব্যতিরেকেও। সনাতন পদ অর্থাৎ মোক্ষ।

* পাঠান্তর— চেদজ্ঞনীয়সে।" তৎক্রমেণ শুভেনৈব।'

অশুভাচ্চালিতং যাতি শুভং তস্মাদপীতরৎ।
জন্তোশ্চিত্তং তু শিশুবত্তস্মাত্তচ্চালয়েদ্বলাৎ॥ ৯৩২॥

জীবের চিত্ত অশুভ বিষয় হইতে চালিত হইলে, তাহা হইতে পরিশেষে শুভ বিষয়ে গমন করিয়া থাকে। সেইহেতু (লোকে) যেমন শিশুকে চালিত করিয়া থাকে সেইরূপ চিত্তকেও বলপূর্ব্বক চালিত করিবে।

যেমন লোকে শিশুকে মৃত্তিকা ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত করে, মণিমুক্তার আকর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া খেলার বস্তু বর্ত্তুলাদি ধরিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ সৎসঙ্গের দ্বারা চিত্তকেও অসৎসঙ্গ হইতে এবং (সৎসঙ্গের) বিরোধী বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে।

সমতাসান্ত্বনেনাশু ন দ্রাগিতি শনৈঃ শনৈঃ।
পৌরুষেণ (১) প্রযত্নেন লালয়েচ্চিত্তবালকম্॥৯৩৩॥

(রাগাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তের স্বাভাবিক) সমতা সম্পাদন দ্বারা, চিত্তকে নির্দ্দোষ করিলে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে। যেমন সান্ত্বনা দ্বারা বালককে শীঘ্র বশে আনিতে পারা যায় সেইরূপ। কিন্তু পৌরুষপ্রযত্নসাধ্য হঠযোগ দ্বারা তাহাকে শীঘ্র বশে আনিতে পারিবে না, কিন্তু সেই উপায়ে চিত্ত অল্পে অল্পে বশে আইসে।

কোন চপল পশুকে বন্ধন স্থানে প্রবেশ করাইবার দুইটী উপায় আছে। তাহাকে হরিদ্বর্ণ তৃণাদি দেখান, গাত্র চুলকাইয়া দেওয়া প্রভৃতি এক প্রকার উপায়, আর কঠোর বাক্য প্রয়োগ, দণ্ডাদির দ্বারা তাড়না প্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকারের উপায়। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা একেবারেই প্রবেশ করান যায়, শেষোক্ত উপায় প্রয়োগ করিলে পশুটি ইতস্ততঃ দৌড়িতে থাকে, পরিশেষে তাহাকে প্রবেশ করান যায়। সেইরূপ চিত্তকে শান্ত করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায় তাহাকে শত্রুমিত্রাদিকে সমান জ্ঞান করিতে শিখান—তদ্দ্বারা বিনা ক্লেশে চিত্তকে বুঝান যায়। দ্বিতীয় উপায়—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার

(১) পাঠান্তর—"পৌরুষেণৈব যত্নেন পালয়েৎ"।

ইত্যাদির অভ্যাস, তাহা পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত অক্লেশকর যোগ দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্তাধীন করিতে পারা যায়; শেষোক্ত হঠযোগের দ্বারা চিত্তকে শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে (বিলম্বে) বশে আসিবে।

দ্রাগভ্যাসবশাদ্যাতি (১) যদা তে বাসনোদয়ম্।
তদাভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন॥ ৩৫।

হে শত্রুদমন, যখন অভ্যাসবশতঃ অনতিবিলম্বে শুভবাসনার উদয় হইবে, তখন বুঝিবে তোমার অভ্যাস সফল হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সহজসাধ্য যোগাভ্যাসবশতঃ যখন তোমার অনতিবিলম্বে শুভবাসনা উদিত হইবে তখন তোমার অভ্যাস সফলতা লাভ করিয়াছে বলিতে হইবে। এত অল্পকালে ফলোদয় হওয়া অসম্ভব, এরূপ আশঙ্কা করিও না।

সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর।
শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন॥ (২)॥৩৬॥

শুভ বাসনার অভ্যাস পূর্ণ হইয়াছে কিনা সন্দেহ উপস্থিত হইলে শুভবাসনাই অধিকতর সংগ্রহ করিবে। হে তাত, শুভবাসনার বৃদ্ধি হইলে কোনও দোষ নাই। শুভ বাসনা অভ্যাস করিতে করিতে তাহা সম্পূর্ণ হইল কিনা, সন্দেহ উপস্থিত হইলে তখনও শুভবাসনা অভ্যাস করিতে থাকিবে। যেমন কোন ব্যক্তি সহস্র সংখ্যক জপে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার শেষ শত সংখ্যক জপ সম্বন্ধে যদি (করিয়াছি কিনা) বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সে ব্যক্তি আবার একশত জপ করিবে। যদি তাহার জপ বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ফলে সম্পূর্ণতা লাভ হইবে, আর যদি (পূর্ব্বেই) সম্পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অধিক জপ বশতঃ সহস্রজপে কোন দোষ ঘটিবে না সেইরূপ।

অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ভবানজ্ঞাততৎপদঃ।
গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্ণীতং তাবদাচর॥

(১) পাঠান্তর—"প্রাগভ্যাসবশাদ্যাতা"।
(২) পাঠান্তর—"অত্যন্তবাসনাবৃদ্ধৌ শুভ দোষো ন কশ্চন"

ততঃ পক্ককষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা।

শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘো নিরোধিনা ॥*

যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার মন ব্রহ্মাত্মৈক্য বিচারে প্রবীণতা লাভ করে এবং তুমি সেই (পরম) অবস্থা—অদ্বৈতাত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, ততদিন তুমি গুরু, শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যাহা কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর। তাহার পর তোমার রাগদ্বেষাদি বাসনাকষায় পরিপক্ক হইয়া বিনাশোন্মুখ হইলে এবং তুমি অদ্বৈততত্ত্ব অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিলে, চিত্তনিরোধাভ্যাসী হইয়া এই শুভবাসনা সমূহও পরিত্যাগ করিবে।

যদতিসুভগমার্য্যসেবিতং তচ্ছুভমনুসৃত্য মনোজ্ঞভাববুদ্ধ্যা।

অধিগময় পদং যদদ্বিতীয়ং তদনু তদপ্যবমুচ্য সাধু তিষ্ঠ ইতি ॥২।৪৩

তুমি শুভবাসনাসম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা সেই আর্য্যগণসেবিত অতিসুন্দর কল্যাণকর পথের অনুসরণ করিয়া, সেই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ কর, তদনন্তর তাহাও পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থান কর।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ সুগম। টীকা নিষ্প্রয়োজন। সেইহেতু যোগাভ্যাস দ্বারা কামাদির দমন সম্ভবপর বলিয়া জীবন্মুক্তি বিষয়ে আর বিবাদ করা চলে না।

ইতি জীবন্মুক্তি স্বরূপ।

* পাঠান্তর—নিরাধিনা—"কর্ত্তব্যতারূপমানসীব্যথাহীনেন"

† পাঠান্তর—পদং সদাবিশোকং।

আত্মসমর্পণ।

(স্বামী পরমানন্দ)

প্রকৃত ভক্ত অন্তরে সর্ব্বদাই ভগবৎ শক্তির প্রেরণা অনুভব ক'রে থাকেন। নতুবা তিনি ভক্তই নন। ঐশী-শক্তিকে ত্যাগ করে প্রকৃত ভক্ত নিজে স্বাধীন হ'তে চান না। তিনি জানেন যিনি তাঁর নিজের কাজ করছেন; উহাতে তাঁর নিজের কোন নিন্দা বা স্তুতির অধিকার নাই। যতক্ষণ আমরা তাঁকে না ভুলি, ততক্ষণ সব ঠিক থাকে। অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে আমরা তাঁকে ভুলে যাই। অহঙ্কারই আমাদের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। সুতরাং যুদ্ধ করে ওটাকে বিনাশ করতে হবে। এস আমরা তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে যাতে তাঁর সন্তানদের একটু আধটু সেবা করতে পারি তজ্জন্য একান্তমনে প্রার্থনা করি। নচেৎ এ জীবনের আর মূল্য কি? পবিত্রভাবে জীবন যাপন করে তাঁর সন্তানদের যতদূর সম্ভব সেবা কত্তে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য—উহাতেই আমাদের অধিকার।

সময়ে সময়ে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা এতই কঠোর হয়ে ওঠে যে মনে হয় যেন উহা হইতে মুক্ত হবার বুঝি গত্যন্তর নাই। কিন্তু এ জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। মেঘ অপসারিত হ'লে আবার জীবনে আশার সঞ্চার হয়। সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থাতে হিমাদ্রিবৎ অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকতে হবে। জগৎ যায় আর থাক, তাতে কি? আমাদিগকে অচল অটল থাকতে হবে। সাহস অবলম্বন কর, সত্যের সম্মুখীন হও।

যদি তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ থাকে তবে তাহা লাভ করতে জীবন অতিবাহিত কর। সত্যের জন্য—আদর্শের জন্য আমাদিগকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। ইহাই ঈশ্বর সেবার একমাত্র উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। দুর্ব্বলতা, কপটতা দ্বারা তাঁর সেবা করা যায় না। একমাত্র অকপট সাধনা ও বীর্য্যের দ্বারাই তাঁর সেবা করা যায়।

এগিয়ে পড়। কার কি হচ্চে দেখ্‌বার জন্য পেছু ফিরো না। আমার মত শত সহস্র এই মুহূর্ত্তে মর্‌তে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের কোনই ক্ষতি হবে না। সত্যের বিনাশ নাই; ইহা চিরদিনই তাহার প্রভা বিকাশ কর্‌তে থাক্‌বে। সত্যের সেবা কর—সত্যের জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন কর। মনে রেখো বর্ত্তমান জীবন প্রাক্তন চিন্তা ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ এবং এইরূপে ভবিষ্যৎ জীবন ও বর্ত্তমানের চিন্তা ও কর্ম্মরাশির উপর নির্ভর কর্‌ছে। অতএব বেশ বুঝা গেল, আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই উপর নির্ভর কর্‌ছে। প্রাক্তন বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম দ্বারা ধৌত হয়ে নাশ পাবে।

যা একবার ভগবৎচরণে নিবেদন করা হয়েছে তা আবার নিজসুখের জন্য ব্যবহার কর্‌বার অধিকার আমাদের নাই। যিনি ঈশ্বরের সেবায় নিজ দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তিনি নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় ভাব্‌বেন না, বরং ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন কর্‌তে নিজ ইচ্ছাকেও বলি দিবেন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ।

সকামভাবে ঈশ্বর উপাসনাকে কখন আত্মসমর্পণ বলা যায় না, কারণ, যদি কোনরূপে বাসনা চরিতার্থ না হয় তবেই আমরা উপাসনা ত্যাগ করে দিই। বরং এ অতি ঘৃণিত স্বার্থপরতা। এই অনার্য্যজুষ্ট দুর্ব্বলতাকে ত্যাগ কর্‌বার জন্য মানবের সাহস ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ত্যাগমার্গ বড়ই দুর্গম। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বড়ই শক্ত কিন্তু ইহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। শিষ্যের গুরুর আজ্ঞায় বিনা প্রশ্নে কামানের বা বাঘের মুখে যেতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। ইহাই প্রকৃত ভক্তি।

আর এক বস্তু চাই—সাংসারিক সমস্ত বস্তুতে আসক্তিশূন্যতা। মন থেকে কাম কাঞ্চন মুছে ফেলে দিতে হবে।

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

এইটী প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে চেষ্টা কর, তাহলেই তুমি মুক্তিলাভ করবে। অহঙ্কারকে ধ্বংস কর আর বল "তৃণাদপি সুনীচেন"। তা হলেই সমস্ত অপবিত্রতা বিগত হবে, পরে তুমি ঐশীভাবাপন্ন হবে। তখনই তুমি ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করবার অধিকারী হবে। অহঙ্কার আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ অবস্থান করছে সুতরাং ইহাকে ধ্বংস কর ও দৃঢ়স্বরে বল "নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ"। প্রকৃত শক্তি বিকাশ করে দুর্ব্বলতাকে নাশ কর। মনে রেখো—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

তবে এস, আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাকে দূর করি। আমাদের দুর্ব্বলতা দেখলে লোকে সুবিধা পেয়ে বসে। কেমন করে নিজেদের মর্য্যাদা রাখতে হয়, বিশেষতঃ যখন আমরা এই প্রকৃতির লোকের মাঝে থাকি, আমাদিগকে তাই শিখতে হবে। দুষ্টলোকদের নিকট হতে নিজেদের রক্ষা করতে ফোঁস করতে হবে কিন্তু কখনও প্রকৃত কোন অনিষ্ট করা হবে না। যে মুহূর্ত্তে আমরা অপরের ক্ষতি করতে চেষ্টা করি সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পতন হয়। আমরা অনিষ্টকারীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ি এবং এইরূপে আমরা নিজেদেরই ক্ষতি করে বসি। আমাদের আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমাদের সময়ে সময়ে ফোঁস্ করতে হবে। মা বলে 'অপরের যাতে প্রকৃত ক্ষতি হয়, এমন প্রবৃত্তি যাতে না জাগে তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, বিশেষভাবে তারই দিকে।'

গিরিসদৃশ অটল বিশ্বাসসম্পন্ন হও। বিশ্বজননী তোমার হাত ধরুন। আমরা তাঁর হাত ধরলে হাতছেড়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তিনি ধরলে আর তার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মায়ের ঐশীইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে আমাদিগকে সমস্ত বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে। মা ছাড়া অন্য কাকেও তোমার পবিত্র হৃদয় অধিকার করতে দিও না, বোকার মত চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগ দ্বারা বিষণ্ণ হয়ো না। মনে রেখো তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁর উপর একান্ত বিশ্বাস রেখে মুক্ত হয়ে যাও।

সবেগে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হউক সবই ঠিক থাকবে কেন না কি

জন্য এ প্রশ্ন না ক'রে ধীর ও শান্তভাবে তাঁকেই মেনে যেতে হবে। দুঃখ আসে, মা'র দান ব'লে তাকে আলিঙ্গন কর। কে জানে কেমন করে তিনি আমাদের চরিত্র গঠন করবেন? সাংসারিকতা ও পবিত্রতা দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, এই কথাটী মনে রাখা চাই। একটী যদি উত্তরে যায়, অপরটী নিশ্চয়ই দক্ষিণে যাবে।

আমাদের প্রতিকার্য্যেই সাহসী, বীর্য্যবান্ ও নির্ভীক হ'তে হবে। দুঃখ আসলে বলতে হবে "বেশ, এস" ও বীরের ন্যায় প্রশান্তভাবে দাঁড়াতে হবে। তৎক্ষণাৎ তারা নিশ্চয়ই তোমার কাছ থেকে ভয়ে পালাবে। তাদিগকে জয় করবার এই হচ্চে প্রকৃত উপায়। সাহসী ও নির্ভীক হও। একটা সাহসের কথায় অনন্ত শক্তি এনে দেয় সুতরাং মনকে সদাই সাহসী ও উৎফুল্ল রাখ।

ভগবানের জন্য সর্ব্বদা সুখী, সবল ও সানন্দচিত্তে অবস্থান করা, প্রকৃতই মহান্ নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে করতে প্রতিদিন তোমার পবিত্রতা ও শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণ ও তাঁর নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যতীত হয় না। মা স্বার্থশূন্য অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও অপূর্ণ রাখেন না। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করবেন ও শক্তি প্রদানে কৃপণতা করবেন না। তিনি নিশ্চয়ই তোমায় ঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তুমি মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা কর; আর তিনি কি তোমায় অসুখী করতে পারেন? কখনই তাহা করেন না। করুণাসিন্ধু তিনি—তিনি কি তাঁর ছেলেকে অসুখী করতে পারেন? দুঃখ আসে ভয় করো না, নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবেন ও তোমার দুঃখের অংশ গ্রহণ করবেন।

তুমি বলবে, তবে কেন প্রায়ই আমাদের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে? আমরা তার কিছুই জানি না। জানি মাত্র, আমরা তাঁর সন্তান। এর বেশী জানবার ইচ্ছা করা আমাদের উচিত নয়। জগজ্জননী মা সবই জানেন। জগৎ তাঁর, তিনি তাঁর সন্তানদের যত্ন

করবেন। আমাদের কেবল ভাবা উচিত—"আমরা তাঁর নির্ব্বোধ সন্তান, তাঁর সন্তানদের ভৃত্য মাত্র।" নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সন্তানদের সেবা করাতেও একটা আনন্দ আছে। সুতরাং এস আমরা তাঁদের সেবায় নিযুক্ত থাকি। কিন্তু এতেও বিশেষ গোল আছে, কারণ, আমরা প্রকৃত সেবা কিসে হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মূর্খতাবশতঃ আমরা যাদের সেবা করতে চাই তাদেরই অনিষ্ট করে বসি। ঠিক ধারণাশক্তি না থাকলে জীবনধারণ বড় কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবু তাঁরই উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করতে চেষ্টা করতে হবে। যদিও সময়ে সময়ে আমাদের হৃদয়াকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবু আমাদিগকে ধীর ও শান্তভাবে অবস্থান করতে হবে। ভয়শূন্য মনে দৃঢ়তার সহিত আমাদিগকে অগ্রসর হতে হবে। ফলের জন্য চিন্তা কি? মনে রেখো সৎকর্মের দ্বারা মঙ্গলই হয়। বাহ্যতঃ অন্যরূপ দেখালেও উহাতে মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই হতে পারে না এবং সৎপথই একমাত্র অবলম্বনীয়।

আমরা সকলেই তাঁর ঐশীশক্তিতে পরিচালিত। এস, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁরই উপর নির্ভর করি ও প্রাণ খুলে বলি "মা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক"। এসব মনে রেখো সময়ে সময়ে আমাদের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বটে কিন্তু ওকে দূর করতেই হবে। নির্ভীক ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে হবে। চরিত্র বল মহৎ বস্তু। সুতরাং নির্ভীকভাবে সমস্ত বাধা বিপত্তিরই সম্মুখীন হতে হবে। ভয় কাকে? বিশ্বজননীর সন্তান আমরা। জগৎই মার, তবে ভয় কাকে? এইরূপ প্রাণপ্রদ বিশ্বাস চাই।

জীবন, শক্তি, পবিত্রতা নিঃস্বার্থ ভালবাসা যা কিছু আছে সবগুলিরই বিকাশ কর। এ সকলে তোমার জন্মগত স্বত্ব আছে। এগিয়ে পড়। সাহসে ভর করে এগিয়ে পড় মৃত্যু তোমার নাই। অমৃতের পুত্র তুমি। সমস্ত অপবিত্রতা, সমস্ত কুসংস্কার ত্যাগ কর। তুমি কি জাননা যে তুমি মুক্ত, তোমার কোন বন্ধনই নাই, তুমি সব পাশ থেকে মুক্ত, তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ।

হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, নাম, যশ এসব ত কেবল কুসংস্কার মাত্র। তাদের সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ওগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবিয়ে দাও। এটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল। প্রাণে প্রাণে বোঝ তুমি মুক্ত। তুমি মুক্ত। যেখানেই যাও তুমি মুক্ত। ভয় কি? মূর্খ লোকগুলো যা বকে বকুক, তাদিকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখ, তারা কূপমণ্ডূকই থাকুক। এগিয়ে পড় পিছন ফির না। তারা যা বলে বলুক, যা করে করুক, কিছুই দরকার নাই। ধীর দৃঢ়ভাবে এগিয়ে পড়, আর মুক্তকণ্ঠে বল্‌বার

"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
(আবার) কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী আমরা তোমার তন্ত্রে চলি।
যেমন বলাও তেমনি বলি মা যেমন করাও তেমনি করি॥"

"মা তোমারই ইচ্ছায় সব হয়। আমি কিছু নই মা, আমি কিছু নই।"

ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় হলেই মানব মুক্ত হয়ে যায়। অহঙ্কারই ধ্বংসের বীজ। ইহার মত শত্রু মানুষের আর নাই। ওটাকে দলে দাও, দলে দাও, চিরতরে মেরে ফেল। তবে জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হবে। একবার ভাব তুমি কে? তুমি কেন ঝগড়া করে মর। তুমি যে সেই বিশ্বপতির সন্তান। তুমি নাম, যশ, নিন্দাস্তুতি সুখদুঃখের বাইরে। তুমি ওসব থেকে মুক্ত। মূর্খেরাই কেবল বড় হতে চায়; অপরের নিকট হতে নাম যশ চায় ও তা না পেলেই অসুখী হয়। কি মূর্খ! এই ক্ষণিক বস্তু নিয়ে কি হবে? এ জগতে আবার সত্য কি আছে? আমাদের সদসৎ বিচার করতেই হইবে। দাসভাবে জীবন যাপন করে সুখ কি? কেন প্রবৃত্তির দাস হব? তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে তাদিগকে বরং দাস কর্‌বো। তাদিগকে জয় কর্ত্তেই হবে। আমাদের যথেষ্ট

কাজ করবার রয়েছে। এ কাজটা কঠিন কিন্তু সর্ব্বাগ্রে এটা কর্ত্তেই হবে। যদি মুক্ত হতে চাও তবে এটা কর্ত্তেই হবে। যদি ভয় করে এ কাজ না কর বা করতে চেষ্টা না কর তবে অনন্তকালেও জন্মমৃত্যু ও কষ্টের হাত হতে এড়াতে পারবে না। ঈশ্বরের কৃপায় রাস্তা খোলা আছে। দৃঢ়তার সহিত নির্ভীকভাবে আনন্দচিত্তে এগিয়ে যাও। একটা ভার বহন করা শক্ত বটে কিন্তু যিনি ভারটী সরিয়ে দেন তাঁর পক্ষে উহা আরও কঠিন। সুতরাং কেমন করে তাঁর ঋণ মানুষ শুধবে? পবিত্র, অপ্রাকৃতভাবে তাঁর কথামত জীবন যাপন করলেই কেবল সে ঋণ কতক শোধ করা যায়। আর অন্য কোন রাস্তা নেই। শারীরিক সাহায্য বা সেবায় কি হয়?

সকল রকম কুড়েমি ত্যাগ কর, কাজে এগিয়ে পড়। মনে রেখ, তুমি দেহ নও, জড় নও। তুমি চৈতন্যস্বরূপ—নিত্য, মুক্ত শুদ্ধ, বুদ্ধ, আত্মা। এই আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখ, তাহলে কোন কিছুতেই তোমার শান্তিভঙ্গ করতে সমর্থ হবে না।

মা তোমায় রক্ষা করবেন। তাঁর কৃপা না হলে কেহই কোন সৎকর্ম্ম করতে সমর্থ হয় না। এ কথাটা যেন আমরা না ভুলি। তাহ'লেই আমরা নিরাপদ্‌। মাকে ভুলে মানুষ বিপদে পড়ে এবং জাগতিক বস্তুবিশেষকে সত্য ও প্রকৃত মনে করে তৎপ্রতি ধাবিত হয়। তাঁরই কৃপায় হাজার বছরের অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে ঘুচে যায় ও জাগতিক সুখ তুচ্ছ বলে বোধ হয়। তবে এস মা'র যাবজ্জীবন কি সুখে কি দুঃখে সব সময়ে তাঁরই গৌরব গাথা গাইতে থাকি। এস তবে তাঁরই চিন্তায় নিমগ্ন হই। তাঁরই স্বর্গীয় প্রেমে পাগল হই। সংসার এখনই মন থেকে স্বভাবতঃই খসে পড়বে। মানবীয় হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসা, ঘৃণা, নাম, যশ, নিন্দা স্তুতি এসবে কি এসে যায়? এস আমরা এ সব ভুলে গিয়ে একাগ্রমনে আমাদের সমস্ত ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে মা'র সেবা করি।

আমরা মা'র প্রিয় পুত্র। তিনি কখন তাঁর মাতৃ-ভালবাসা দানে কৃপণতা করতে পারবেন না নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে

সুখ ও শান্তি দান করবেন। সুখদুঃখের তরঙ্গ আসবে ও যাবে। তারা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রকৃষ্ট উপাদান; দৃঢ়ভাবে উদাসীন হও। জগৎ থাক্ আর যাক্ তাতে তোমার আমার কি? হিমাদ্রিবৎ অটলভাবে দাঁড়াও। নিজের আদর্শের উপর স্থির বিশ্বাস রাখ। বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ দ্বারাই কেবল মানব সত্যের অনুভূতিলাভ করতে সমর্থ হয়। বৃথা তর্কে বা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় সত্যলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মানুষের শত্রুতা মিত্রতায় কি হয়? তারা কি করতে পারে? মা'ই সব করেন। তিনি সব। তিনিই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। প্রতিমুহূর্ত্ত মায়ের সেবায় নিযুক্ত কর। আর যা কিছু কর—ভালই হউক আর মন্দই হউক—সব মিথ্যা, সব মায়া, সব অজ্ঞানতা, সব ভস্মে ঘৃতাহুতিমাত্র! সত্য এক এবং মাই সেই একমাত্র সত্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এ সমস্তের তিনিই একমাত্র কারণ। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কিছুই সম্ভবে না। তিনি আমাদের মা। তিনিই জগতের মা। মার নিকট থাকলে কোন কিছুতেই আমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। বিশ্বাস চাই, শক্তি চাই, সাহস চাই। মনে রেখ, মার ইচ্ছা হলে সব সম্ভব হতে পারে। মূকও বাচাল হতে পারে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে। মার শ্রীচরণে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন ত্রিজগতে কেহই তাঁর অনিষ্ট করতে পারে না। তিনিই একমাত্র ভয়শূন্য।

সরলভাবে, একান্ত মনে মার চরণে আশ্রয় লও। ভয়, ভাবনা কিছুই তিষ্ঠুতে পারবে না। তবে বল, প্রাণভরে বল, "জয় মা আনন্দময়ী।" আবার বল, জোর ক'রে বল "জয় মা আনন্দময়ী।" সব অমঙ্গল সত্বই নাশ পাবে। তিনিই কেবল একমাত্র অমঙ্গল নাশ করতে সক্ষম। তিনিই একমাত্র তাঁর নিরীহ তদ্গতপ্রাণ সন্তানদের রক্ষক। আর বলবার রইল কি? মার গৌরবগাথা ছাড়া সবই মিছে। মাই আমাদের উৎপত্তি ও স্থিতির একমাত্র কারণ। তিনিই শাশ্বত সুখ ও শান্তির আধারস্বরূপ।

তবে এস আমরা শান্তিতে মার ক্রোড়ে ঘুমাই। ছেলেদের কেমন করে আদর যত্ন কর্ত্তে হয় মাই সব চেয়ে ভাল জানেন। ঠাকুর বল্‌তেন—'মা যখন ছেলের হাত ধরে থাকেন বা যতক্ষণ ছেলে মার কোলে থাকে ততক্ষণ তার পতন সম্ভাবনা কোথায়?' তিনিই সব। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। মায়ের শ্রীচরণ পূজা যদি না করব তবে আর কার পূজা করবো? যাক্। অন্য সব চিন্তাই আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যাক্। তবে পাপ অমঙ্গল কোথা থাক্‌বে? হৃদয়ের সব স্তরগুলি মাতৃভাবে পূর্ণ হলে চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়, ভ্রান্তি আর কোথায় থাকবে?

তোমরা সকলেই সেই মধুর গানটী জান—তবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।" এইরূপ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মকর্ম্ম তুচ্ছ। তিনি পাপনাশ করিবার জন্য তীর্থে গমন করেন না—মা'র নাম ছাড়া অন্য কোন কিছু শুনিতে চান না। চান কেবল সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা মার নাম গান শুনিতে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করেন না। করেন কেবল, যাতে মঙ্গলময়ীর ইচ্ছার অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে তিনি সংসার ভুলে গিয়ে কেবল মার চরণকেই সার করেছেন, তিনিই কেবল দুস্তর সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সমর্থ। তাঁর কোন ভয় থাকে না। তিনি কারো নিন্দাস্তুতি গ্রাহ্য করেন না, সর্ব্বদা মাতৃনামরূপ অমৃতপানে মত্ত থাকেন।

মাই একমাত্র গতি। মাই একমাত্র শান্তি সকলের নির্ভর। তাঁরই নিকট প্রার্থনা কর এবং তাঁরই চিন্তায় নিমগ্ন হও। তিনিই একমাত্র প্রকৃত আশ্রয়। তিনিই সকল সুখ ও শান্তির মূলীভূত কারণ। তবে এস আমরা মার প্রেমসমুদ্রে ডুবে যাই। এস আমরা তাঁরই ভালবাসায় মত্ত হই। সংসার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হবে যা কিছু তাঁর উপযুক্ত নয় সব অপসৃত হবে। তুমি বল প্রাণ ভরে বল—"জয় মা আনন্দময়ী।" তাঁর আগমনে পাপ ভয় ভ্রান্তি দূর হবে—সমস্তই শান্তিময় হয়ে যাবে।

বালকের ন্যায় সরলভাবে প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। আমরা সকলে তাঁরই ছেলে। কেন কাউকে আমরা ভয় করবো? মা আমাদের রক্ষা করবেন জগতের শত গোলমালে মাকে বিস্মৃত না হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় "মার পূজা কর," একথা ছাড়া তোমাদিগকে আর কি বলব! ইহাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চ ও মহত্তর কর্ম্ম কিছুই নাই।

বল,—"মা আমায় তোমার চরণে প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত ভক্তি দাও। আমি আর কিছুই চাই না মা। ধন চাই না—মান, যশ কিছুই চাই না—ধর্ম্ম চাই না—অধর্ম্ম চাই না। তুমি সব নাও। আমায় তোমার চরণে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আমার জ্ঞান নাও, অজ্ঞান নাও, কেবল শুদ্ধাভক্তি দাও। আমার সুখ নাও, দুঃখ নাও, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

দিনরাত এইরূপে প্রার্থনা কর—প্রকৃত প্রেম ভক্তির জন্য কাঁদ। ইহাই ঠিক ঠিক পূজা বা সাধনা। এই সাধনে নিমগ্ন হও; সংসার আপনা হতে পালাবে, আর তুমি আনন্দ ও শান্তিসাগরে ভাসতে থাকবে।

ভুলোনা, জগতের যত কিছু সবই তাঁর ইচ্ছায় হচ্চে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাঁর মহিমা কে বুঝে? কে তাঁর মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ? [চণ্ডীতে কি আছে দেখ,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিংস্তূয়সে তদা॥
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"]

তবে আর কেন, অহংকার ত্যাগ কর, দীনকণ্ঠে বল—

"নাহং নাহং," তুঁহু, তুঁহু।" মা আমি নই মা। তুমিই সব। মা, তোমার রাতুল চরণে শুদ্ধাভক্তি দাও। যেন কখনও তোমায় ভুলে না যাই। মা, তোমার অমৃতময়ী নামে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাস দাও মা! আমি এখানে থাকতে চাই না আমায় কোলে তুলে নে মা। মা, ঘর বাড়ী আশ্রয় সবই আমার তুমি। তোমার কাছে আমায় যেতে দাও। তোমার কাজ হবে। তবে এইমাত্র কর, যেন আমি নিঃস্বার্থ পবিত্রভাবে তোমার কাজ করতে পারি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। বল দাও মা! জ্ঞান দাও মা, যেন আমরা মনমুখ এক করে বলতে পারি, "তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"*

বিষ্ণু-তত্ত্ব

(অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ)

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সামান্য কয়েকটীমাত্র বচনে ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুকে যে ছোট দেবতা বলিয়া বুঝিতে হইবে তাহা নয়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭ সূক্তে কথিত আছে যে বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন।

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূলহমস্য পাংসুরে ॥১৭॥

তাহার প্রথম দুইপদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও ততদূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এই ভাবে উপদেশ করিয়াছেন—

* বোম্বাই বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত স্বামী অভেদানন্দের 'Path of Devotion নামক পুস্তক হইতে অনূদিত

যে ইদস্য ত্রিণেশ্বদূর্শোঽভিখ্যায় মহে ত্ৰ্যাভুরণ্যতি।

তৃতীয়মস্য কিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ংতঃ পতত্রিণঃ ।৫।১।১৫৫।৫

যাঁহারা সুধী অর্থাৎ জ্ঞানী তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় বিষ্ণুর "পরমপদ" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততম্ ।১।২২।২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ।

১।১৫৪।৫

এই বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ।১।২২।১৯

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান বিশেষ সমুচ্চ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে ব্রাহ্মণভাগে বিষ্ণুর সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম পুরুষের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানব জ্ঞানের অতীত 'পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবাঃ।" ১।১

ঐ যে অগ্নি তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম (অন্তিম); অন্যদেব ইহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখস্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শস্ত্র প্রভৃতি (শস্ত্র=গীতিবহিত ঋক্‌স্তুতি বিশেষ—আনন্দগিরি, তৈত্তি উ ১।৮) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্ত্তমান।

শতপথব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্ব্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্ব্বেই তাহা লাভ করেন, সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হন এবং এইজন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু "বিষ্ণু পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহার পরমপদ সম্প্রদারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে বামন দেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। এজন্য বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন। সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়াণী উপনিষদে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে (১৩) বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্‌ বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃদ্‌বৈ নামৈষা তনূর্ভগবতো বিষ্ণো র্যদিদমন্নম্‌।"

কঠোপনিষদেও কিন্তু বিষ্ণুকে পরম পুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান্‌ তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন, সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌॥ ৩য় বল্লী।৯।

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্য্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থপদ প্রক্ষেপ করে তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুক", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুক।"

রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বিষ্ণু সর্ব্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। আর বাসুদেব ও বিষ্ণু অভিন্ন। ভীষ্মপর্ব্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে এক তাহাও বলা হইয়াছে।

অশ্বমেধ পর্ব্বের (অধ্যায় ৫৩-৫৫) অনুগীতাভাগে উল্লিখিত আছে যে, দ্বারকা প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভৃগুবংশীয় উতঙ্ক ঋষির সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ঋষি জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কুরু পাণ্ডবের মধ্যে সখ্যস্থাপন করিয়াছেন কি না। শ্রীকৃষ্ণ তদুত্তরে বলেন যে, পাণ্ডুগণ রাজ্যলাভ করিয়াছেন এবং কুরুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ঋষি ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার নিকট অধ্যাত্ম বা আত্মদর্শন ব্যাখ্যা করেন তবেই তিনি অভিশাপ দিতে বিরত হইবেন, নতুবা তাঁহার অভিসম্পাত হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিস্তার নাই। উতঙ্কের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্মব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিরাট্ স্বরূপ দর্শন করাইলেন। ভগবত গীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন,

ইহা তাহাই যা তাহার অনুরূপ স্বরূপ; কিন্তু এখানে এই স্বরূপের নাম, "বৈষ্ণবরূপ"। ভগবদ্গীতায় কিন্তু ইহার এ নাম না। যাহাই হউক দেখা যাইতেছে, ভগবদ্গীতা ও অনুগীতা এই উভয় মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বিষ্ণু যে অভিন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শান্তিপর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া স্তুতি করেন। এই স্তবে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মহাকাব্য যুগে বিষ্ণু পরম পুরুষ বলিয়া পূজিত হইলেও নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ইহুদীয় ধর্ম্ম—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কর্ত্তৃক বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। পাণিনি কার্য্যালয়, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। ক্রাউন ১১৬পৃঃ, মূল্য বার আনা।

আজ আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। আমাদের রাজা ধর্ম্মসম্বন্ধে খুব উদার নীতি অবলম্বন করিলেও খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ কর্ত্তৃক ভারতের অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। আমরা মিশনারিগণের কৃপায় খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থ সমূহের কিছু কিছু অংশের বঙ্গানুবাদও পাইয়াছি।

আমাদের বেদমূলক সনাতনধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও অত্যন্ত উদার ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত কত নূতন নূতন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের এখানে অভ্যুদয় হইয়াছে—কিন্তু সকলেই এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারে আমাদের আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই, বরং আনন্দেরই কারণ আছে। কারণ, উহা দ্বারা দেশবিদেশে একটী জনসঙ্ঘ কি ভাবে ও কি প্রণালীর ভিতর দিয়া ভগবানের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পরিণামে উহার সাক্ষাৎও পাইয়াছিল, আমরা তাহারই পরিচয় পাইব মাত্র।

কিন্তু ইহার জন্য কর্ত্তব্য—আমাদের সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্বদ্গণ উক্ত গ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়া ও তৎসম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া উহার জ্ঞান চারিদিকে বিস্তার করিয়া দেন

খ্রীষ্টিয়গণের প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের দুইটী বিভাগ—ওল্ড টেষ্টামেণ্ট বা প্রাচীন সংহিতা ও নিউ টেষ্টামেণ্ট বা নব সংহিতা। এই শেষ ভাগেই যীশুখ্রীষ্টের ও তৎশিষ্যগণের ধর্ম্মপ্রচারের বিবরণ আছে—এই ভাগটী এদেশে কতকটা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ভিত্তির উপর নিউ টেষ্টামেণ্ট স্থাপিত—সেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টই ইহার ভিতর অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশ, কিন্তু ইহার তেমন প্রচার নাই। কিন্তু উহা ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান—এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোকই স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, ইহুদী বা হিব্রু বা ইব্রীয়গণের উহাই একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট হইতে সংক্ষেপে ইহুদীজাতির ইতিহাস ও ধর্ম্মের সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং প্রমাণস্বরূপ অনেক পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে আরও বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য কৌতূহল হয়, ইহাই এই পুস্তকখানির উপযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণ। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পরবর্ত্তী অন্যান্য ইহুদী গ্রন্থ হইতেও বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই জাতির ধর্ম্মেতিহাস যেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে সংকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্রবাবু বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থের প্রথম ভাগটী বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার হস্তলিখিত বলিয়া এই গ্রন্থের ভাষা, বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছু আবশ্যক নাই। তবে এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ সারিতে হইয়াছে বলিয়া স্থানে স্থানে একটু কট মট বোধ হয় মাত্র।

আশাকরি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সকল বাঙ্গালীই অধ্যয়ন করিয়া নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং উদার হৃদয়কে উদারতর করিবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ৪ঠা মাঘ, ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী ১৯২ · সাঃ, রবিবার, বেলুড়মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব হইবে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

আমাদের পূর্ব্ব বিবরণীতে জানাইয়াছি যে আমরা ঝটিকাগ্রস্ত স্থানে ১০টি সাহায্য কেন্দ্র খুলিয়াছি। তন্মধ্যে ৫টী ঢাকার মুন্সিগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত টাঙ্গিবাড়ি এবং সিরাজদিখা থানায় এবং ১টী নারায়ণগঞ্জ সাবডিভিসনের অন্তর্গত বৈদ্যেরবাজার থানায়। উহাদের আমরা ঐ সমস্ত জিলায় আরও ৩টী কেন্দ্র খুলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জনৈক সেবক আড়িয়াল বিলের নিকটস্থ গ্রামসকলের ভীষণ দুরবস্থার কথা বর্ণনা করায় আমরা শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গ্রামসিদ্ধি এবং রাড়িখাল নামক গ্রামদ্বয়ে ২টী এবং টাঙ্গিবাড়ি থানার অন্তর্গত আড়িয়াল নামক গ্রামে আরও ১টী কেন্দ্র খুলিয়াছি। সরকার বাহাদুর ঐ সকল স্থানে প্রতি ইউনিয়নে ৫০মণ করিয়া চাউল বিতরণ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু উহা আমরা পর্য্যাপ্ত বোধ না করায় সাপ্তাহিক আরও ৭০০ মণ করিয়া চাউল ঐ সকল স্থানে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত পালং থানায় কুমারপুর গ্রামে একটি কেন্দ্র পূর্ব্বে খোলা হইয়াছিল বর্ত্তমানে কাগদি নামক স্থানে আরও একটী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

বরিশালে ঝালকাঠি ও বাগধা এবং খুলনা মাগুরাহাট কেন্দ্র ছাড়া অপর কেন্দ্র খোলা হয় নাই। ফরিদপুর উদয়পুর ইউনিয়নের অন্তর্গত মোল্লাহাট থানায় প্রেসিডেন্সি ডাঙাসুনের কমিশনার বাহাদুরের অনুরোধে আমরা চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছি।

এই সকল স্থান ব্যতীত ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জ সাবডিভিসনের নানাস্থান হইতে অত্যন্ত কষ্টের কথা আমাদের সেবকেরা লিখিয়া পাঠাইতেছেন কিন্তু অর্থের অপ্রতুল হেতু আমরা সাহায্য কেন্দ্র আর বাড়াইতে পারিতেছি না। এ দিকে দারুণ

শীতকাল উপস্থিত,—দেশবাসীরা গৃহহীন এবং বস্ত্রহীন হওয়ায় হিম সহ্য করিতে না পারিয়া নানা রোগে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি নানাস্থানে ম্যালেরিয়া; ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড কলেরা প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দিয়াছে। আমরা আমাদের সকল কেন্দ্র হইতেই হোমিওপ্যাথিক এবং এ্যালোপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু যদি আমরা যথোপযুক্ত ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ এবং বস্ত্রদান করিতে না পারি তাহা হইলে দেশবাসীর মৃত্যু সংখ্যা ভীষণ ভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

আশা করি, সহৃদয় দেশবাসিগণ এই কার্য্যে যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিবেন।

নিম্নে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহ হইতে সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

জিলা—ঢাকা

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৪৮	৯৩৮	১৭৸৪
,,	৪৭	৯৮৩	৫০৸১
,,	২৮	৮৩২	৪২৸০
,,	৩২	৯৪০	৪৮।২
[illegible]পদা	১০	৩৫৩	১৮৸৪
,,	১০	২৯৪	১৬/৮
,,	১৩	৩৭৬	১৯॥২
,,	১৩	৪৬৬	২৪/৪
,,	১৩	৪৬২	২৪/
বজ্রযোগিনী	২১	৩২৬	১৭/৯
,,	২২	৩০১	১৭॥৩
,,	২২	৩৩৬	২০/৪
,,	২৮	৫৬০	৩০/৯
,,	২৪	৫৩১	৩১/৫
কামারখাড়া	৪৬	৭৭৭	৪০॥৬
,,	৪৩	৭০৮	৩৮॥২
,,	৪৩	৯৮১	৫০/৬

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কামারখাড়া	৪৩	১০৫৯	৫২৸৴
,,	৪৩	১০১০	৫০॥০
সোণারঙ্গ	২৬	[illegible]	৩১।৭
,,	২৮	৫০১	২৬/৮
,,	২৯	৫৪৪	২৮৸৩
,,	৩৬	৭৮২	৪০৸৪
,,	৩৭	[illegible]	৪২/৭
সোণাবগাঁ	৯৫	৫১৪	২৭/৪
,,	৯১	৫৫৭	৩০/৩
,,	১০৬	৬৩৮	৩৩৸২
গ্রামসিদ্ধি	৭	১৭১	১০ ০
,,	১১	২১০	১১ ০
,,	২০	২১১	১২ ২
রাড়িখাল	–	২৬২	১০৷৵০
,,	৮	৪০৫	২৩/০
আরিয়াল	২৪	৩৯১	২০/০
,,	২৩	৩৬৬	১৮॥৪

জিলা—বরিশাল

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
ঝালকাঠী	১৮	১৩৩	৭৸৮
,,	২০	১২৩	৬॥৭
,,	২১	৩৫৩	১৯/৩
,,	২৩	৩৯৮	২১৸০
,,	২৭	৫৩০	২৭॥৪
বাগধা	১০	১৯৯	১৬/২

জিলা—ফরিদপুর

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কুমারপুর	[illegible]	৩৭২	১৮ ৭৴
,,	২১	৬২৬	৩০৸৪
,,	২১	৫৪৬	৩৩।২
,,	২১	৬১৩	৩৩/৮
,,	২১	৫২৭	৩১৸০
কাগদী	১১	৩৪৬	১৮/২

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কাগদী	১১	৩৭২	১৯/৯
,,	১১	৪৬৪	২৪/৮
,,	১০	৪৫৭	২৩।৪
জিলা—খুলনা			
উজয়পুর	১৩	২৯১	১৫/০
,,	১৭	৪০১	২০॥০
,,	১৬	৩৯৯	২১॥১
,,	১৭	৩৭৬	৩৪/০
,,	১৬	৩১১	২৪।৬

যাঁহারা এই কার্য্যে অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা উহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও হইবে।

(১) প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া।

(২) সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, কলিকাতা।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১লা জুন হইতে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

রায় বি, এম্, বসু বাহাদুর, পাথারী, ৫০৲
টি, দাস, রামপুর,
শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ মিত্র, নৈহাটী, ১৲
,, এম্,এ, নারায়ণ আয়াঙ্গার, বাঙ্গালোর, ৫৲
নারিকেলডাঙ্গা ইনিষ্টিটিউট, ৫০৲
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিদ্যান্ত, লক্ষ্ণৌ, ৫০৲
জামসেদপুর ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট, ১৫৲
,, এম্, এল্, গোসাঞি, পেগু ২০৲
,, মাঃ রাম, রেহাবী, ৩৸৵০
নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মেসোপোটেমিয়া, ২৲
ডিব্রুগড় গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, ১১৷০

শ্রীযুত এস্, পি, নিয়োগী, পাউরী, ৪০৲
শ্রীমতী নন্দবালা নিয়োগী, ,, ৫৲
শ্রীযুত নিশিকান্ত পাল, ঢাকা, ২৲
দরিদ্র হিতকারিণী সভা, কলিকাতা, ১০৲
শ্রীমতী সরোজিনীবালা দেব্যা, রাজসাহী ১৲
মির্জ্জাফর লেনের কতিপয় ভদ্রলোক, ৮৸০
টাঙ্গণবেড়ীয়া রামমূর্ত্তির বেনিফিট, ৪০৲
শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দাস, ময়না, ৪৲
,, কে, মুখার্জ্জি, পোর্টব্লেয়ার, ৫৲
,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ,, ৫৫৲
,, এন্, কে, দাস, মবিন, ১০৲
,, তারক নাথ বিশ্বাস, খুলনা,

শ্রীযুত এস্, এন, ব্যানার্জ্জি, বাঁকুড়া, ১০
,, এন্, ডি, মহাভা, বম্বে, ৩
,, সুশীলচন্দ্র মিত্র, আরা, ৪
,, ভূষণচন্দ্র পাল, কলিকাতা, ৩০
,, তিনকড়ি ব্যানার্জ্জি, ,,
ডাওয়েজার মহারাণী, কুচবেহার,
,, সুশীলচন্দ্র দাস, কলিকাতা,
কুমারডুবি চ্যারিটি ফণ্ড, বরাকর, ৫
শ্রীমতী বিমলা দেবী, বোয়ালিয়র, ২৸৵০
শ্রীযুত বিজয় মোহন বর্দ্ধি, দিনাজপুর, ২
মালয় উপদ্বীপ, ৮।০
,, এন্, এন্, রায, মালয় উপদ্বীপ, ৮।০
,, কে, এস্, সেন, ,, ৪।০
,, বি, বি, মজুমদার, ,, ২৸০
,, ননীলাল মাইতি, ইনানগিয়ট ২
রামকৃষ্ণ এন্ কালবাগ, বম্বে, ৬২
,, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১
অনাথ ভাণ্ডার বালী, ৫
,, সতীশচন্দ্র গুহ, ঢাকা, ১
,, এম, এল, গোস্বামী, পেগু,
,, জগন্নাথ মল্লিক, কলিকাতা, ১৫
মাঃ ফণীভূষণ ঘোষ, উডেলি পারস্থ, ১৪।
,, এস, সি, সেন, আলনাভার, ৫
,, নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি, ব্যাটুর,
,, পান্নালাল ধর, ,, ২
,, জে, সি, চ্যাটার্জ্জি, বর্ম্মা,
বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র, কলিকাতা,
শ্রীমত্যা প্রকাশিনী দত্ত, ,,
মাঃ বি, এন, গুপ্ত, বাসরা, ২২
শ্রীমতী সবিতা ভেন, আমেদাবাদ,
শ্রীযুত কেশবচন্দ্র হা, নবগ্রাম, ৷০
,, মহাদেব চন্দ্র বিশ্বাস, মেজপাড়া,

শ্রীযুত রামস্বামী আয়াঙ্গার, ময়লাপুর, ৩
,, উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিযা, ৫
অ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর ৫
শ্রীমতী মুক্তকেশী দাসী, বরিশাল, ২৫
শ্রীযুত ডি, কে, সিং, পেগু, ১০
,, ম্যাক্টুন জ্যাক্, ১
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী, রেঙ্গুন, ১০
শ্রীযুত পুণ্ডরীকাক্ষ বসু, কাদাই, ১
আই, বি, চ্যাটার্জ্জি, গড়েনরিচ, ৫
,, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মতলবগঞ্জ, ১
শ্রীমতী হেমনলিনী ঘোষ, হালিমারা ২
শ্রীযুত রামলাল কানু, ধূপধারা, ২
,, হরিপদ ঘোষ, গোয়াল পাড়া, ২৸০
,, অক্ষয়কুমার লাহা, কলিকাতা, ১০
টাটা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কেরাণীবৃন্দ, ১০
বেদান্ত ক্লাস ক্রাইষ্ট চার্চ্চ,
সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, ধুবড়ী
শ্রীযুত এ, কে, ঘোষ, কাযেকটাপা
,, বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, বজবজ,
,, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা, ২
,, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, নৈহাটি,
,, মনি, আলমবাজার ৫
,, বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা, ২
,, এ, কে, আদিত্য, ,, ১৫
ম্যাঃ কে, এন মুখার্জ্জি, বাগদাদ, ৫০
শ্রীযুত এ, ডি, লিঙ্গম্ ব্রিটিশনর্থ বোর্ণিও, ১৩।০
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা, ৫
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মহেশতলা, ৩০
,, শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি, শিবপুর, ১
এন, এন, মুখার্জ্জি, মাণ্ডালে, ৫
ডাঃ যোগেন্দ্র নাথ রায়, ভবানীপুর, ১০২
শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ২
,, পি, সি, বাবিক, ২৫
মডেল স্কুল, নিউপোকাবহাট, ১।৵০